মুসলমানদের পতনে

বিশ্ব কী হারালো?

(ISLAM AND THE WORLD)

সাইয়্যেদ আবুল হাসান আলী নদভী

ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين

মুসলমানদের পতনে

বিশ্ব কী হারালো?

(ISLAM AND THE WORLD)

সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী (র)

আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী

অনূদিত

মুহাম্মদ ব্রাদার্স

৩৮, বাংলা বাজার, ঢাকা

মুসলমানদের পতনে

বিশ্ব কী হারালো?

(ISLAM AND THE WORLD)

আমাদের কথা

সকল প্রশংসা আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের নিমিত্ত। লাখো দরূদ ও সালাম হ্যরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর প্রতি, যাঁর আগমনে এ দুনিয়া ধন্য হলো এবং আমাদেরকে এক আল্লাহ্র বান্দার পরিচয়ে সম্মানিত করলো।

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন-বিধান আর এ বিধান দুনিয়াতে আগমনের মুহূর্ত হতে বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে কায়েমী স্বার্থবাদী ও তাগূতী শক্তির বাঁধার সম্মুখীন হয়ে আসছে। আম্বিয়াই কিরাম (আ)-এর মেহনত-মুজাহাদা ও কুরবানী, আসহাবুন নবী রিদওয়ানুল্লাহি তা'আলা আলায়হিম আজমাঈনের জিহাদী জযবা, পীর-মাশায়েখ বুযুর্গ ও আলিমে দীনের অক্লান্ত পরিশ্রমের বদৌলতে ইসলামের মর্মবাণী আজ আমাদের পর্যন্ত পৌছেছে। আর বিভিন্ন সময়ের এসব ঘটনা নিয়ে বিজ্ঞজনেরা সীরাত, মাগাযী ও ইতিহাস লিখে আমাদের চিন্তার খোরাক যুগিয়েছেন আলোকবর্তিকা হাতে পেতে। কিন্তু আজ সারা বিশ্বব্যাপী মুসলমানরা যেভাবে নির্যাতিত ও নিপীড়িত হচ্ছে, সে সবের ওপরও আলোচনা ও পর্যালোচনা হচ্ছে, কিন্তু কেউ এর সঠিক কারণ উদঘাটনে সক্ষম হয় নি। কী কারণে এককালের অর্ধ-জাহানের শাসকদের এ অধঃপতন, কিসের জন্য এ বিপর্যয় আর এ বিপর্যয়ের কারণে গোটা মুসলিম জাহানসহ সারা দুনিয়ারই বা কী ক্ষতি হচ্ছে? এসব বিষয়ের ওপর বলতে গেলে তেমন কেউ কলম ধরেন নি। গত শতাব্দী হতে আজ পর্যন্ত যত লেখক-গবেষক ও ইতিহাসবিদ এসেছেন ও বিদায় নিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ও সবার আগে যাঁর নাম এসে যায় তিনি হলেন বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ আলিমে দীন মুফাক্কিরে ইসলাম আল্লামা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী (র)। আর তাঁরই লেখা বিশ্বব্যাপী আলোড়ন সৃষ্টিকারী ইতিহাসের এক অনন্য গ্রন্থ "মুসলমানদের পতনে বিশ্ব কী হারালো?" মূল বইটি আরবীতে লেখা যার নাম "মা-যা-খাসিরা'ল আলামু বি-ইন্হিতাতিল মুসলিমীন" ইংরেজিতে অনূদিত হয়ে "Islam and the World" নামে প্রকাশিত হয়। এছাড়াও বিশ্বের বিভিন্ন ভাষাতে অনূদিত হয়ে বইটি ব্যাপক সুনাম অর্জন করেছে।

বাংলাদেশী মুসলমানদের হক ছিল বাংলা ভাষায় বইটি হাতে পাবার। আর সে হক আদায়ে আল্লাহ্ পাক আমার মত এক নগণ্য গুনাহ্গার বান্দাকে তৌফিক দিবেন তা ছিল আমার কল্পনারও বাইরে। এ আমার জন্য এক পরম সৌভাগ্যের বিষয়।

কীভাবে আর কোন ভাষায় আমি এর শুকরিয়া আদায় করতে পারি! কেবলই বলতে পারি আল-হামদুলিল্লাহ।

বাংলা ভাষা-ভাষী মানুষের দীর্ঘ দিনের আকাঙ্ক্ষিত এ বইটি সেই চাহিদা পূরণে "মুসলমানদের পতনে বিশ্ব কী হারালো" নামে আজ প্রকাশ পেল। বইটি সর্বস্তরের পাঠকদের পিপাসার্ত মনের তৃষ্ণা মেটাতে সক্ষম হবে বলে আমরা মনে করি। সেই সাথে যাঁরা গবেষণারত ও ইতিহাসের ছাত্র, তাঁদের জন্য এ এক অমূল্য সম্পদ হিসেবে বিবেচিত হবে বলে আমরা আশাবাদী। বইটি প্রকাশ করতে যাঁরা আমাদের সহযেগিতা করেছেন, তাঁদের প্রতি আমরা আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁদের জাযায়ে খায়ের দান করুন।

আল্লামা নদভী (র)-র সকল পুস্তক প্রকাশের লিখিত অনুমতিপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান মজলিস নাশরিয়াত ই-ইসলাম কর্তৃপক্ষ আমাদের আগ্রহে সাড়া দিয়ে শর্তসাপেক্ষে বইটি প্রকাশের অনুমতি প্রদান করেন। এই মুহূর্তে আগ্রহী পাঠকের স্বার্থে আমরা এই দুরূহ কাজে হাত দিয়েছি। পাঠকের প্রয়োজন পূরণে এ প্রয়াস সফল হলে আমরা আমাদের শ্রম সার্থক মনে করব। আল্লাহ পাক আমাদের এ প্রয়াস কবুল করুন এবং দোজাহানের কামিয়াবী দান করুন এটাই আমাদের এ মুহূর্তের একান্ত মুনাজাত।

২৩ এপ্রিল, ২০০২ইং — প্রকাশক
ঢাকা।

মুসলমানদের পতনে

বিশ্ব কী হারালো?

(ISLAM AND THE WORLD)

দারুল উলূম নদওয়াতুল উলামা-র বর্তমান রেক্টর, আল্লামা
সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী (র)-এর সুযোগ্য ভাগ্নে ও স্থলাভিষিক্ত
খলীফা হযরত মাওলানা সাইয়েদ মুহাম্মদ রাবে হাসানী নদভী (দা.বা)-এর

বাণী

হযরত মাওলানা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী (র) এমন একজন আলেমে দীন ও দা'ঈ-এ ইসলামের জীবন অতিবাহিত করেছেন, যিনি আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন বহুমুখী প্রতিভা, যোগ্যতা ও অন্তর্দৃষ্টির অধিকারী ছিলেন। তিনি নিজের এসব প্রতিভা ও যোগ্যতা দ্বারা মুসলিম জাতির পথপ্রদর্শকের ভূমিকা পালন করেছেন। বিদ্যমান পরিস্থিতির উপর দৃষ্টিক্ষেপণ করে মুসলিম জাতিকে সেসব সংকট-সমস্যা সম্পর্কে অবহিত করেছেন। আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে যেসব সমস্যা-সংকটের সে সম্মুখীন তিনি বিভিন্ন সংকট আত্মপ্রকাশের আগেই নিদর্শনাদিদৃষ্টে সেগুলো চিহ্নিত করেছিলেন যা যথার্থ প্রমাণিত হয়েছে।

তাঁর বিভিন্ন প্রবন্ধ-নিবন্ধ ও গ্রন্থে অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন চিন্তা-চেতনা এবং তাঁর নিজের জীবনে সেগুলোর প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায়। মুসলিম জাতির উত্থান-পতনের যে চিত্র তিনি 'মা-যা খাসিরাল আলামু বি-ইনহিতাতিল মুসলিমীন' নামক তথ্যবহুল গ্রন্থে অংকন করেছেন, পতনের পর পুনরুত্থানের জন্য যে পরামর্শ দিয়েছেন এবং পথ-প্রদর্শন করেছেন, বক্ষ্যমান গ্রন্থ অধ্যয়নে তা পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। বক্ষ্যমান গ্রন্থের মতই হযরত আল্লামা নদভী (র) প্রণীত আরেকটি গ্রন্থ হচ্ছে 'মুসলিম মামালিক মে ইসলাম আওর মাগরেবিয়াত কী কাশমাকাশ' (মুসলিম বিশ্বে ইসলাম ও পাশ্চাত্য সভ্যতার দ্বন্দ্ব)। এ গ্রন্থে চলমান মুসলিম বিশ্বের চিত্র পর্যালোচিত হয়েছে। অনুরূপ আরেকটি গ্রন্থ হচ্ছে তাঁর আত্মজীবনী 'কারওয়ানে যিন্দেগী' (জীবনপথের যাত্রী)। এ গ্রন্থে তিনি ভবিষ্যতে মুসলিম জাতির জীবনে সৃষ্টি হতে পারে এমন সব সংকট-সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেছেন এবং সেগুলো সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করেছিলেন। তাঁর সব গ্রন্থ বিশেষত 'মা-যা খাসিরাল আলামু বি-ইনহিতাতিল মুসলিমীন' এবং আত্মজীবনী 'কারওয়ানে যিন্দেগী' মুসলিম জাতির জন্য অত্যন্ত কল্যাণকর এবং পথপ্রদর্শক দু'টি গ্রন্থ।

হযরত মাওলানা আবুল হাসান আলী নদভী (র) তাঁর সব গ্রন্থই আরবী অথবা উর্দু ভাষায় প্রণয়ন করেছেন। তাঁর প্রণীত সব গ্রন্থই সমগ্র মুসলিম জাতির জন্য কল্যাণকর, কিন্তু অঞ্চল বিশেষে মুসলমানদের মাতৃভাষা বিভিন্ন। তাই

বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের মুসলমানদের মাতৃভাষায়ও তাঁর গ্রন্থাবলী অনুবাদের প্রয়োজন দেখা দেয় যেন গ্রন্থগুলোর কল্যাণকারিতা অত্যন্ত বিস্তৃত ও সম্প্রসারিত হয়। ইংরেজী ও তুর্কী ভাষায় তাঁর অধিকাংশ গ্রন্থেরই অনুবাদ হয়েছে। বাংলা ভাষায়ও তাঁর বেশ কয়েকটি বই অনুদিত হয়েছে এবং আরও বইয়ের অনুবাদের কাজ চলছে। হযরত আল্লামা নদভী (র)-এর খলীফা মাওলানা আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী সাহেব, পরিচালক, ইসলামী বিশ্বকোষ বিভাগ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ এবং মাওলানা সালমান সাহেব বাংলাভাষায় হযরত নদভী (র)-এর বিভিন্ন গ্রন্থ অনুবাদে বিশেষ মনোযোগ দান করেছেন।

বক্ষ্যমান গ্রন্থ 'মা-যা খাসিরাল আলামু বি-ইনহিতাতিল মুসলিমীন'-এর অনুবাদ (মুসলমানদের পতনে বিশ্ব কী হারালো?) করেছেন মাওলানা আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী সাহেব। এ গ্রন্থখানা খুবই কল্যাণপ্রদ হবে বলে আমি দৃঢ় আশা পোষণ করছি এবং বাংলাভাষায় এ গ্রন্থের অনুবাদ প্রকাশিত হওয়ায় সন্তোষ প্রকাশ করছি। ইন্‌শাআল্লাহ্ এই মহৎ প্রচেষ্টা খুবই উপকারী হবে। আল্লাহ্ তাআলা এ বইয়ের প্রকাশনার সাথে বিভিন্ন পর্যায়ে জড়িতদেরকে উত্তম প্রতিদান দিন-- এ দোআই করছি । আমীন!

ইতি
মুহাম্মদ রাবে নদভী
নদওয়াতুল উলামা
লখনৌ, হিন্দুস্তান

অনুবাদকের আরয

আলহামদু লিল্লাহ্। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের দরবারে লাখো কোটি হাম্দ ও শোকর যিনি তাঁর এই অধম বান্দাকে বহু কাঙ্ক্ষিত একটি কাজ সম্পন্ন করার তৌফীক দিলেন। বর্তমান শতাব্দীর অন্যতম প্রখ্যাত আলিম, লেখক, চিন্তাবিদ ও খ্যাতনামা বুযুর্গ আল্লামা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী (র) লিখিত 'মা যা খাসিরাল আলামু বি-ইনহিতাতি'ল-মুসলিমীন'-এর উর্দূ অনুবাদ 'ইনসানী দুনিয়া পর মুসলমানূঁ কে উরূজ ও যাওয়াল কা আছর' নামক গ্রন্থের বাংলা তরজমা 'মুসলমানদের পতনে বিশ্ব কী হারালো?' পাঠকের হাতে তুলে দিতে পারা এক বিরল সৌভাগ্য বলেই মনে করি। এজন্য আমি পরম করুণাময়ের দরবারে যতই শুকরিয়া আদায় করি না কেন তা নেহাৎ অকিঞ্চিতকরই হবে।

মূল আরবী বইটি আরব বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টিকারী একটি পুস্তক। এ পর্যন্ত অনুমোদিত ও অননুমোদিত মিলিয়ে সত্তরোর্দ্ধ সংস্করণ কেবল আরব বিশ্বেই প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়া পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় এর অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে এবং সবগুলোর একাধিক সংস্করণও বেরিয়েছে। বইটি সম্পর্কে এতটুকু বলাই যথেষ্ট যে, কেবল আরব বিশ্বের নন বরং মুসলিম বিশ্বের খ্যাতিমান লেখক ও সাহিত্যিক, ইসলামের অমর শহীদ মিসরের সাইয়েদ কুতুব (র) এর ভূমিকা লিখেছেন। এমন একটি বই-এর তরজমা করার সৌভাগ্য জুটবে এমনটি ভাবতে পারাও অধমের পক্ষে কল্পনাতীত ছিল। অথচ সেই কল্পনাই আজ বাস্তবে রূপ নেয়ায় মনটি আমার আনন্দে আপ্লুত,– পরম প্রশান্তিতে মন-মস্তিষ্ক ভরপুর। কী ভাবে ও কোন ভাষায় আমি এর শুকরিয়া আদায় করতে পারি?

বইটির অনেক আগেই তরজমা হবার কথা ছিল। পরিচিত ও শুভাকাঙ্ক্ষী মহল থেকে অধমের বরাবর অনেক বারই এজন্য তাকীদ এসেছিল। আমিও চাচ্ছিলাম আমার পরম শ্রদ্ধেয় শায়খ-এর এ বইটি, যে বইটি তাঁকে আরব বিশ্বে ব্যাপক খ্যাতি ও পরিচিতি দিয়েছে, তা বাংলা ভাষায় অনুদিত ও প্রকাশিত হোক। এসময় আমার পরম সুহৃদ বন্ধুবর হাফেজ মাওলানা আবু তাহের মেছবাহ এবইটির তরজমার ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করেন। এর আগে তিনি আল্লামা আবুল হাসান আলী নদভী (র)-র 'আরকানে আরবা'আ' তরজমা করে এক্ষেত্রে তাঁর যোগ্যতা প্রমাণ করেন। তদুপরি 'প্রাচ্যের উপহার' নামক পুস্তকের অন্তর্গত 'বাংলার উপহার' ও 'পাকিস্তানী ভাইদের উদ্দেশে' নামক দু'টি অংশের

অনুবাদের ক্ষেত্রেও তিনি অত্যন্ত সাফল্যের পরিচয় দেন। কাজেই তাঁর আগ্রহের কারণে আমি এর থেকে বিরত থাকতে বাধ্য হই। তদুপরি সে সময় আমি 'নবীয়ে রহমত' নামক মুহতারাম শায়খ (র)-এর আরেকটি বই তরজমা করতে থাকায় এ বিষয়ে আর তেমন আগ্রহ দেখাইনি। তবে বরকত লাভের জন্য বই-এর প্রথম দু'টো অধ্যায় তরজমার ব্যাপারে আমার আগ্রহের কথা তাঁকে কয়েকবার জানাই। কিন্তু তিনি সম্পূর্ণ বইটিই এককভাবে তরজমার আগ্রহ ব্যক্ত করায় আমি এর থেকে পুনরায় বিরত হই। কিন্তু তারপরও যখনই দেখা হয়েছে তিনি কাজ শুরু করেছেন কিনা কিংবা কাজ কতটুকু এগোল সে সম্পর্কে জানতে চেষ্টা করেছি এবং এজন্য প্রয়োজনীয় তাকীদ দিয়েছি। কিন্তু এরপরও আকাঙ্ক্ষিত অগ্রগতি না হওয়ায় আমি কি করব, আমাকে কী করা উচিত সে সম্পর্কে ভাবছিলাম। প্রধানত নিজের হাতে গড়া 'মাদরাসাতুল মদীনা' নিয়ে অত্যধিক ব্যস্ত সময় কাটাতে হওয়ায়, তদুপরি অতি জরুরী কিছু কাজ হাতে থাকায় এবং এসব কাজ করতে গিয়ে কোন কোন সময় অসুস্থ হয়ে পড়ায় তিনি একাজের জন্য প্রয়োজনীয় অখণ্ড মনোযোগ দিতে পারছিলেন না। অথচ এ বই-এর প্রতি সুতীব্র আকর্ষণের দরুন এর ওপর তাঁর দাবি হাত ছাড়া করতেও তিনি রাজী হতে পারছিলেন না। এ রকম টানা পোড়েন অবস্থার মাঝে আরও কিছুদিন কেটে যায়।

ইতিমধ্যে 'নবীয়ে রহমত' প্রকাশিত হয়েছে। আমার হাতে তখন কোন কাজ নেই। আমি আবারও তাকীদ দিলাম। কিন্তু লাভ হলো না। অথচ আমি এর বেশি কিছু করতেও পারছিলাম না। না পারার পেছনে কারণ ছিল হযরত নদভী (র)-র প্রতি তাঁর অগাধ শ্রদ্ধা ও ভালবাসা, তাঁর প্রতি আমার ব্যক্তিগত আকর্ষণ, সর্বোপরি জনাব হাফেজ মাওলানা আবু তাহের মেছবাহ আমার একমাত্র পুত্রের অত্যন্ত শফীক উস্তাদ।

মুহতারাম শায়খ (র)-এর বরকতময় সান্নিধ্যে রমযান কাটাবার জন্য ১৯৯৮ সালে আমি ভারতের রায়বেরেলীতে যাই। ১লা শাওয়াল। ঈদুল ফিতরের বিকেল। মুহতারাম শায়খ (র)-কে ঘিরে আমরা বাংলাদেশী কাফেলার লোকেরা বসেছি। এ কাফেলায় আছেন মাওলানা আবদুর রায্যাক নদভী, মাওলানা যুলফিকার আলী নদভী, মাওলানা ওবায়দুল কাদের নদভীসহ আরও কয়েকজন যাদের নাম এই মূহূর্তে মনে পড়ছে না। হয়রত শায়খ (র)-এর সঙ্গে আমরা কথা বলছি। এ সময় তিনি আমাকে লক্ষ্য করে এ পর্যন্ত কি কি বই বাংলায় তরজমা হয়েছে জানতে চাইলেন। এক পর্যায়ে তিনি 'মা যা খাসিরা'ল আলামু বি-ইনহিতাতি'ল- মুসলিমীন' তরজমা হয়েছে কিনা জানতে চান। আমি মাথা নিচু করে মাওলানা আবদুর রায্যাকের দিকে চাইলাম, কি জবাব দেব এই আশায়।

তিনি গোটা ব্যাপারটা জানতেন। ইঙ্গিতে আমাকে তরজমার ব্যাপারে রাজী হবার জন্য বললেন। তার এই ইঙ্গিতের প্রেক্ষিতে আমি কিছুটা সাহস সঞ্চয় করে দো'আ করার জন্য দরখাস্ত করলাম যাতে সফর থেকে দেশে ফিরে গিয়ে এর কাজ শুরু করতে পারি। এরপর হযরত 'বহুত আহম কিতাব, বহুত মুফীদ কিতাব, ইসকা তরজমা হোনা চাহিয়ে' বহুত বড়া খলা হায় (খুবই গুরুত্বপূর্ণ বই, উপকারী বই, এর তরজমা হওয়া দরকার, বিরাট শূন্যতা রয়েছে) ইত্যাদি বলে আমাকে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করলেন। এরপর এ সম্পর্কে আরও কিছু দিক-নিদের্শনাও দিলেন। আর সেই উৎসাহ ও দিক-নির্দেশনা অবশেষে আমাকে এই দুরূহ কাজে হাত দিতে কেবল অনুপ্রাণিতই করেনি—এর সমাপ্তিতেও প্রেরণা জুগিয়েছে।

বই-এর মূল লেখকের ভূমিকা তরজমা করেছেন স্নেহভাজন মাওলানা আবদুর রায্যাক নদভী এবং সাইয়েদ কুতুব শহীদ (র) লিখিত পুস্তক পরিচিতি সম্পর্কিত অংশটুকু তরজমা করেছেন আরেক স্নেহভাজন মাওলানা ইয়াহ্ইয়া ইউসুফ নদভী। দীনি ভাই ছাড়াও তারা আমার পীর-ভাইও বটেন। শায়খ (র)-এর প্রতি পরম শ্রদ্ধা এবং অধমের প্রতি ভালবাসার তাকীদেই তারা এ কাজে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। আল্লাহ্ই এর জাযা দেবেন। সম্পাদনার দুরূহ দায়িত্বই কেবল নয়, উর্দু ও ফার্সী কবিতাংশের বাংলা তরজমা করে অধমকে চিরকৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন পরম শ্রদ্ধাভাজন বিশিষ্ট লেখক, অনুবাদক ও গবেষক মাওলানা আবদুল্লাহ বিন সাঈদ জালালাবাদী। এতে প্রশংসার কিছু থাকলে তা সম্পূর্ণটাই তাঁর আর ত্রুটি-বিচ্যুতির দায়-দায়িত্ব আমি আমার ঘাড়ে তুলে নিচ্ছি। এরপর পরবর্তী সংস্করণে আল্লাহ্ পাক যদি সেই কাফ্ফারা আদায়ের সুযোগ দেন তবে সেটা হবে তাঁরই অপার মেহেরবানী।

পরিশেষে ইসলামিক ফাউন্ডেশনে আমার এককালীন সহকর্মী পরম শ্রদ্ধেয় ভাই আজিজুল ইসলামকেও আমার কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি যিনি একটি প্রুফ দেখার পাশাপাশি বেশ কিছু ভাষাগত ত্রুটি-বিচ্যুতি সংশোধন করে দিয়েছেন। প্রকাশনার দায়িত্ব নেয়ায় মুহাম্মদ ব্রাদার্সের স্বত্বাধিকারী বন্ধুবর মুহাম্মদ আবদুর রউফ ভাইয়ের কাছে অশেষ কৃতজ্ঞতার পাশে আবদ্ধ রইলাম। এছাড়া মুদ্রণের ব্যাপারে দৌড়াদৌড়ির জন্য স্নেহধন্য জাকিরকেও আমার কৃতজ্ঞতা জানাই। তরজমার ব্যাপারে তাকীদ দিয়ে এবং অগ্রগতির ব্যাপারে নিয়মিত খোঁজ-খবর

নিয়ে আমাকে অনুগৃহীত করেছেন বন্ধুবর মাওলানা ইসহাক ওবায়দী, মাওলানা সালমান, মাওলানা আবদুর রহীম ইসলামাবাদী, মাওলানা উবায়দুর রহমান খান নদভী প্রমুখ। অধিকন্তু আমার জীবন-সঙ্গিনী বেগম জেবুন্নেছাসহ আমার ছেলেমেয়েদের সকলের প্রতি একাজে- বিশেষ করে নির্ঘন্ট তৈরির কাজে প্রয়োজনীয় সহযোগিতার জন্য কৃতজ্ঞতা ও দোআ জানিয়ে এখানেই শেষ করছি।

মুহতারাম শায়খ আল্লামা নদভী (র)-র যেই অপরিমেয় স্নেহ ও ভালবাসা লাভের সৌভাগ্য জুটেছে তা অধমের জীবনকে ধন্য ও গৌরবান্বিত করেছে। আমার আর কিছু চাইবার নেই। তবু এ মুহূর্তে কেবল একটি কথাই মনে হচ্ছে, যদি মুহতারাম শায়খ (র)-এর জীবদ্দশায় তাঁর হাতে অনূদিত এ বইটি তুলে দিতে পারতাম। মেহেরবান মালিক! তুমি আমার মুহতারাম শায়খ আল্লামা নদভী (র)-কে জান্নাতুল ফিরদাউস নসীব কর এবং আমাদেরকেও তাঁর নিবিড় সান্নিধ্যে একটুখানি স্থান দিও। হে আল্লাহ! এ দোআ ও মুনাজাত তুমি কবুল কর।

আল্লাহ রাব্বু'ল- আলামীনের রেযামন্দী ও রসূল আকরাম (সা)-এর শাফাআত লাভ, অতঃপর মুহতারাম শায়খ (র)-এর দোআ প্রাপ্তি এবং বাংলার মুসলিম তরুণদের সুপ্ত দায়িত্বানুভূতি জাগিয়ে তোলার সুতীব্র তাকীদ থেকেই একাজে হাত দিয়েছিলাম। এক্ষণে উল্লিখিত লক্ষ্য হাসিলে অধমের এ প্রয়াস যদি বিন্দুমাত্রও সফলতা লাভ করে এবং মুসলিম তরুণদের হৃদয়ে সামান্যতম দায়িত্ব অনুভূতিও সৃষ্টি হয় তাহলে আমাদের এ শ্রম সার্থক হবে। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন আমাদের সকলের শ্রমকে তাঁর অপার মেহেরবানীতে কবুল করুন। আমীন!

আহকার

আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী

রহমতপুর, ঢাকা

৯ সফর, ১৪২৩ হিজরী

১০ বৈশাখ, ১৪০৯ বাং

একাদশতম সংস্করণের ভূমিকা

আলহামদু লিল্লাহ! বিশ্বে মুসলমানদের উত্থান ও পতনের প্রভাব' শীর্ষক এ বইটির একাদশতম সংস্করণ প্রকাশিত হলো। উপর্যুপরি অনেকগুলো সংস্করণ প্রকাশিত হবার ফলে বইটি জ্ঞানী-গুণী মহলে ও বিদগ্ধ পাঠক সমাজে যেই গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে সে সম্পর্কে এই দীন লেখকের কোন পূর্ব ধারণা ছিল না।

বইটির ইংরেজী সংস্করণ 'Islam and the World' নামে কয়েক বছর আগে প্রকাশিত হয় এবং পাঠকপ্রিয়তা লাভ করে। পাঠক জেনে খুশি হবেন যে, এর প্রকাশক যখন বইটি প্রকাশের ব্যাপারে সংস্থার এ বিষয়ক অভিজ্ঞ উপদেষ্টাদের মতামত কামনা করেন তখন লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যপ্রাচ্য বিভাগের চেয়ারম্যান ড. বাকিংহাম নিম্নোক্ত রূপ মত ব্যক্ত করেনঃ বইটি ব্রিটেন থেকে প্রকাশিত হওয়া উচিত। কেননা বর্তমান শতাব্দীতে মুসলিম পুনর্জাগরণের যেই প্রয়াস সর্বোত্তম উপায়ে হয়েছে এটি তার নমুনা ও ঐতিহাসিক দলীল। সংস্থার অপর উপদেষ্টা বিজ্ঞ ও খ্যাতনামা প্রাচ্যবিদ এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সভাপতি অধ্যাপক মন্টগোমারী ওয়াট বইটি অধ্যয়নের পর তাঁর সুচিন্তিত অভিমতে প্রকাশের যোগ্য বলে রায় দেন।

ইরানের 'কুম' শহরে অবস্থিত বিখ্যাত প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান 'জলসাত ইলমী ইসলাম শেনাসী' এর ফারসী অনুবাদ প্রকাশ করেছে। বইটি গভীর আগ্রহে পঠিত হচ্ছে বলে আমরা জেনেছি। তুরস্কে ইতিমধ্যেই এর কয়েকটি তুর্কী সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে ও গভীর আগ্রহে পঠিত হচ্ছে। ফরাসী ভাষায়ও এটি অনুবাদের অনুমোদন চাওয়া হয়েছে। লেখক এর অনুমোদন দিয়েছেন। এ ছাড়া দক্ষিণ এশিয়ার আরও কয়েকটি ভাষায় বইটির অনুবাদ হয়েছে।

বেশ কিছুদিন যাবত বইটি দুষ্প্রাপ্য হবার কারণে ব্যাপক পাঠক চাহিদার প্রেক্ষিতে বর্তমান সংস্করণ প্রকাশ করা হলো। আশা করি, পূর্বের মতই বইটি আগ্রহের সঙ্গে পঠিত হবে।

৭ই মুহার্রাম, ১৪১৩ হিজরী
৯ই জুলাই, ১৯৯২ইং

আবুল হাসান আলী নদভী
নদওয়াতুল উলামা, লাখনৌ।

মুসলমানদের পতনে

বিশ্ব কী হারালো?

(ISLAM AND THE WORLD)

পূর্বকথা

আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের যাবতীয় প্রশংসা এবং আমাদের সর্দার মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম, তাঁর পরিবারবর্গ ও পরবর্তী বংশধর, এবং তাঁর সকল সাহাবীর ওপর দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক।

বক্ষ্যমান বইটির ব্যাপারে প্রাথমিক ধারণা একটি প্রবন্ধের চেয়ে বেশি কিছু ছিল না। প্রথম দিকে মনে করেছিলাম যে, মুসলমানদের অধঃপতন এবং দুনিয়ার নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব থেকে সরে যাবার কারণে মানব জাতির কী ক্ষতি হয়েছে তা মোটামুটিভাবে চিহ্নিত করব এবং দেখাতে চেষ্টা করব পৃথিবীর মানচিত্রে ও তাবৎ জাতিগোষ্ঠীর মাঝে তাদের অবস্থানগত মর্যাদা কী। এর পেছনে এর বেশি আর কোন উদ্দেশ্য ছিল না যে, মুসলমানদের মনে এই ক্ষমাহীন অপরাধ ও গাফিলতি সম্পর্কে যেন অনুশোচনা জাগে যা তারা মানব জাতির ক্ষেত্রে করেছে। অতঃপর এর প্রতিকার ও সংশোধনকল্পে তারা যেন সযত্ন প্রয়াসী হয়, তাদের মধ্যে যেন এর প্রেরণা সৃষ্টি হয়। সেই সাথে দুনিয়াবাসী তাদের সেই দুর্ভাগ্য সম্পর্কেও যেন অবহিত হতে পারে, যেই দুর্ভাগ্যের সম্মুখীন মুসলিম নেতৃত্ব থেকে মাহরূম হবার কারণে তাদেরকে হতে হয়েছে। তারা যেন অনুভব করতে পারে যে, এই অবস্থার মধ্যে বড় রকমের কোন কল্যাণকর পরিবর্তন ততক্ষণ পর্যন্ত হতে পারে না, হওয়া সম্ভব নয় যতক্ষণ পর্যন্ত না দুনিয়ার নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব বস্তুপূজারী ও খোদাভীরুহীন মানুষের হাত থেকে বের করে সেই সব আল্লাহভীরু মানুষের হাতে তুলে দেয়া হবে যারা আল্লাহর পয়গম্বর ও নবী-রসূলদের ওপর ঈমান রাখে, তাঁদের দেয়া হেদায়েত (পথ-নির্দেশনা) ও শিক্ষামালা থেকে আলো ও দিক-নির্দেশনা গ্রহণ করে থাকে এবং যাদের কাছে আখেরী নবীর দীন ও শরীয়ত এবং দীন ও দুনিয়ার পথ-প্রদর্শন ও নেতৃত্ব দানের নিমিত্ত একটি পূর্ণাঙ্গ সংবিধান বর্তমান।

উল্লিখিত উদ্দেশ্যে ও লক্ষ্যে সাধারণ মানব ইতিহাস ছাড়াও ইসলামী ইতিহাস সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা করে দেখানো হয়েছে যে, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের আবির্ভাব কেমন জাহিলী পরিবেশে হয়েছিল, মানবতা তখন অধঃপতনের কোন স্তরে পৌঁছে গিয়েছিল? তাঁর দাওয়াত ও প্রশিক্ষণ কেমনতরো উম্মাহ সৃষ্টি করেছিল। সেই উম্মাহ্র বোধ-বিশ্বাস, আখলাক-চরিত্র, শিক্ষা ও জীবন-চরিত কেমন পূত-পবিত্র ছিল? তাঁরা কিভাবে পৃথিবীর ক্ষমতার চাবিকাঠি ও নেতৃত্বের বাগডোর নিজেদের হাতে তুলে নিয়েছিল? তাঁদের নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব দুনিয়ার সভ্যতা-সংস্কৃতি ও জীবন-যিন্দেগী,

মানুষের রুচি-প্রকৃতি ও প্রবণতার মাঝে কী প্রভাব ফেলেছিল, কী ভাবে তাঁরা পৃথিবীর গতিধারা জগত জোড়া আল্লাহ্ বিস্মৃতি ও সামগ্রিক জাহেলিয়াত থেকে আল্লাহ্র ইবাদত-বন্দেগী ও ইসলামের দিকে মোড় নিল এরপর কেমন করে সেই উম্মাহ্র মধ্যে অধঃপতন দেখা দিল ও তাকে দুনিয়ার নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের আসন থেকে সরে যেতে হলো এবং কিভাবে এই নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব দুর্বল ও অলস, আল্লাহ্র পরিচয় সম্পর্কে জ্ঞাত একটি জাতির হাত থেকে বেরিয়ে আল্লাহর পরিচয় সম্পর্কে অজ্ঞ, শক্তিশালী ও বস্তুপূজারী য়ূরোপের হাতে গিয়ে পড়ল, এরপর স্বয়ং য়ূরোপেই এই বস্তুপূজা ও ধর্মদ্রোহিতা কিভাবে দেখা দিল ও তা বিকশিত হলো, পাশ্চাত্য সভ্যতার মূল মেযাজ কি? এর মূল প্রকৃতি কি কি উপাদানে তৈরি, য়ূরোপের নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব পৃথিবীর ওপর কী প্রভাব ফেলে এবং সমাজ জীবনকে তা কিভাবে প্রভাবিত করে, দুনিয়ার গতিধারা কোন দিকে এবং এক্ষেত্রে মুসলমানদের দায়িত্ব ও কর্তব্য কী এবং সে কিভাবে এই দায়িত্ব পালন করতে পারে, দিকভ্রান্ত মানবতাকে সন্ধান দিতে পারে তার সঠিক পথ ও প্রকৃত গন্তব্যস্থলের।

লেখার কালেই লেখকের কাছে একথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, বিষয়টি একটি প্রবন্ধের নয় বরং একটি বিরাট বিস্তৃত গ্রন্থের এবং এ ধরনের একটি গ্রন্থ রচনা সময়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজন। স্বয়ং মুসলমানদের ধারণাই এ ব্যাপারে পরিষ্কার নয়। তারা নিজেদের জীবনের সঙ্গেই কোন সম্পর্ক ও সংশ্লিষ্টতা অনুভব করে না এবং দুনিয়ার ব্যাপারে তাদের কোন যিম্মাদারী আছে বলেই মনে করে না। বহুলোক এমন আছেন যারা মুসলমানদের অধঃপতনকে একটি জাতীয় দুর্ঘটনা ও স্থানীয় ঘটনার বেশি মনে করেন না এবং এ ব্যাপারে তাদের আদৌ কোন অনুভূতিই নেই যে, এটা কত বড় সর্বব্যাপী দুর্ঘটনা ছিল এবং মানবতার জন্য কত বড় দুর্ভাগ্য।

আসল কথা হলো, এই বাস্তব সত্যকে এড়িয়ে ও উপেক্ষা করে আমরা যেমন ইসলামের ইতিহাস বুঝতে পারব না, তেমনি বুঝতে পারব না মানব জাতির ইতিহাসকেও। এই যুগকে যথাযথ ও সন্দেহাতীতভাবে নিরুপণও করতে পারব না, যে যুগ এই মুহূর্তে দুনিয়ার বুকে বিরাজ করছে। তেমনি এই সর্বগ্রাসী বিপ্লবের সঠিক কার্যকারণও আমরা নির্ধারণ করতে পারব না যা দুনিয়ার ইতিহাসে আত্মপ্রকাশ করেছে। যে বিপ্লব ইসলামী বিপ্লবের পর সর্ববৃহৎ বিপ্লব। পার্থক্য কেবল এতটুকু যে, প্রথম বিপ্লব ছিল মন্দ থেকে ভালোর দিকে, অকল্যাণ থেকে কল্যাণের দিকে, অমঙ্গল থেকে মঙ্গলের দিকে। পক্ষান্তরে এই বিপ্লব ভাল থেকে মন্দের দিকে, কল্যাণ ও মঙ্গল থেকে অকল্যাণ ও অমঙ্গলের দিকে। প্রথম বিপ্লব

ছিল মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের আবির্ভাব ও ইসলামী দাওয়াতে উত্থানের ফসল আর দ্বিতীয় বিপ্লব উম্মতে মুহাম্মাদিয়ার পতন এবং ইসলামী দাওয়াতের ক্ষেত্রে গাফিলতি ও শৈথিল্য প্রদর্শনের পরিণতি। আজ মুসলমানদের মধ্যে নিজেদের ওপর আস্থা, ইসলামী রূহ তথা ইসলামী প্রাণ-সত্তার দিকে প্রত্যাবর্তনের আবেগ ও কর্মস্পৃহা সৃষ্টির জন্য প্রয়োজন, তাদেরকে তাদের হৃত মর্যাদার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া এবং পরিষ্কারভাবে বলা যে, তারা দুনিয়াকে নতুন করে গড়বার গুরুত্বপূর্ণ ও পবিত্র কর্মে অত্যন্ত কার্যকর ও সক্রিয় উপাদান (Factor) হিসাবে ভূমিকা পালনকারী শক্তি, চলমান কোন মেশিনের যন্ত্র কিংবা কোন নাট্যমঞ্চের কুশলী অভিনেতা (Actor) নন।

যেই দেশ ও পরিবেশে লেখকের জন্ম, যেখানে লেখক লালিত-পালিত ও বর্ধিত এবং যেখানে এ ধরনের একটি গ্রন্থ রচনার খেয়াল জেগেছিল তার দাবি ছিল, এই গ্রন্থ সে দেশের ভাষায় লিখিত হবে (অর্থাৎ উর্দূতে)। কিন্তু এক বিশেষ ধারণার বশে উর্দূর পরিবর্তে আমাকে আরবী ভাষায় লিখতে হয়েছে, উর্দূর বিপরীতে আরবীকে অগ্রাধিকার দিতে হয়েছে।

আরবী ভাষা নির্বাচন ও অগ্রাধিকার প্রদানের কারণ লেখকের এই অনুভূতি যে, আরব দেশগুলো আজ হীনমন্যতাবোধে আক্রান্ত এবং আত্মবিস্মৃতির সব চাইতে বেশি শিকার। দুনিয়া যদিও এককালে তাদের থেকেই নতুন জীবন ও নবতর ঈমান লাভ করেছিল, অথচ আজ সেখানকার পরিবেশই সবচেয়ে বেশি নির্বাক নিস্তব্ধ এবং তাদেরই সমুদ্র সর্বাধিক শান্ত ও তরঙ্গহীন। প্রাচ্যের কবি আল্লামা ইকবাল আজ থেকে অনেক বছর আগে এসব দেশের দিকে তাকিয়ে যা বলেছিলেন তা মোটেই অযথা বলেন নি;

শুনি না আমি সেই আযান মিসর ও ফিলিস্তীনে,
পাহাড় ও পর্বতকে দিয়েছিল যা জীবনের পয়গাম।
যে সিজদায় প্রকম্পিত হতো ধরণীর অন্তরাত্মা,
মিম্বর ও মেহরাব আজ অধীর প্রতীক্ষায় তার।

য়ূরোপের নৈকট্য, বিশেষ রাজনৈতিক অবস্থা এবং সেসব দামাল সন্তানদের সংখ্যাল্পতার দরুন, সৌভাগ্যবশত ভারতবর্ষের মাটিতে যাঁদের অব্যাহতভাবে জন্ম হয়েছে, আরবের পবিত্র ভূখণ্ড যাঁদের অস্তিত্ব থেকে দীর্ঘকাল যাবত মাহরূম ছিল, আরব বিশ্বকে য়ূরোপের চাতুর্য ও কুটকৌশলের সহজ শিকারে পরিণত করে। শায়খ হাসান আল-বান্দা মরহুম ও তাঁর আন্দোলন এবং আল-ইখওয়ানুল মুসলেমূন (মুসলিম ব্রাদারহুড)-এর আগে সমগ্র মধ্যপ্রাচ্যে কোন শক্তিশালী ইসলামী আন্দোলন কিংবা কোনরূপ কর্মতৎপরতা ছিল না। আরব বিশ্বের

কোথাও অস্থিরতা ও অটুট মনোবলের চিহ্ন দৃষ্টিগোচর হতো না। সেখানকার লোকেরা হয়তো যুগের সঙ্গে সন্ধি করে নিয়েছিল কিংবা হতাশ হয়ে হাত-পা গুটিয়ে বসে পড়েছিল অথবা স্রোতের অনুকূলে গা ভাসিয়ে দিয়েছিল। আরব বিশ্বের অবস্থা পর্যবেক্ষণকারী এবং তার গৌরবময় অতীত ও দুঃখজনক বর্তমানের মাঝে তুলনাকারী অত্যন্ত আক্ষেপ ও ব্যথা নিয়ে বলছিলেন ঃ

হেজাযের এ কাফেলায় একজন হুসায়নও নেই।

যদিও দিজলা ও ফোরাত আজও তরঙ্গ বিক্ষুব্ধ।

এই কষ্টকর ও বেদনাময় অনুভূতিই কলমের গতি উর্দূ থেকে আরবীর দিকে ফিরিয়ে দেয়।

আরবরা তাদের ইতিহাস ও ভৌগোলিক অবস্থানের কারণেই আজ আন্তর্জাতিক ও বিশ্বনেতৃত্ব গ্রহণের অধিকারী এবং গোটা সভ্য জগতের ওপর প্রভাব বিস্তারের ক্ষমতা রাখে। লোহিত সাগর ও ভূমধ্য সাগরের মাঝেই তাদের অবস্থান। অবস্থান তাদের দূর প্রাচ্যের মধ্যভাগে। বিশ্বব্যাপী নতুন বিপ্লব ও ইসলামী পুনর্জাগরণের জন্য আরব জাহান ও মধ্যপ্রাচ্যের চাইতে অধিক উপযোগী ভূখণ্ড আর কোনটিই হতে পারে না। এসব কারণেই একজন হিন্দী বংশোদ্ভূত হয়েও লেখক আরবী ভাষাকেই এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের জন্য নির্বাচন করেছেন এবং এ গ্রন্থ সর্বপ্রথম আরবীতেই লেখা হয় এবং ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين নাম রাখা হয়।

এ সময়েই (১৯৪৭ সালে) হেজাযের প্রথম সফরের সুযোগ ঘটে। সেখানে প্রথম বারের মত লেখক আরব দেশ ও সেদেশের বাসিন্দাদের খুব কাছে থেকে দেখার সুযোগ পান যাদের জন্য এ বই লেখা হয়েছিল। হেজায অবস্থান ও আরব জাহানের লোকদের সঙ্গে পরিচয় লেখকের ধারণাকে আরও শক্তি জোগায় এবং এ বইয়ের যথা সম্ভব সত্বর প্রকাশের প্রয়োজনীয়তাকে আরও তীব্রতর করে তোলে। মক্কা মুআজ্জমায় অবস্থানকালে লেখক গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ের আবশ্যকতা আরও তীব্রভাবে অনুভব করেন এবং জাহিলী যুগের সামগ্রিক চিত্র আরও স্পষ্টতর করে অংকন ও বিস্তারিতভাবে তুলে ধরা দরকার বোধ করেন যে, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের আবির্ভাবের সময় দুনিয়ার অবস্থা কি ছিল এবং কোন ধর্মীয়, নৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও

অর্থনৈতিক পরিবেশের মধ্যে তিনি ইসলামের দাওয়াত পেশ করেছিলেন। ইসলামী বিপ্লবের শ্রেষ্ঠত্ব এবং তার বিস্ময়কর ও কৃতিত্বপূর্ণ অবদান ততক্ষণ পর্যন্ত বোঝা যাবে না যতক্ষণ না জাহিলিয়াত যুগের সমগ্র পরিবেশ ও তার চিত্র সামনে আসে। এ জন্যই প্রয়োজন মনে করেছি জাহেলিয়াতে পরিপূর্ণ এ্যালবাম পেশ করার। এসময় দেখতে পেলাম জাহিলী যুগ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য-উপকরণ খুবই দুষ্প্রাপ্য। কিছু বিক্ষিপ্ত তথ্য পাওয়া যায় বটে, কিন্তু সেগুলো বিভিন্ন পুস্তকের হাজারো পৃষ্ঠার মধ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। সে সব তথ্য-উপাত্ত একত্র করা এবং ঐ সব বিক্ষিপ্ত ও বিস্রস্ত অংশের সাহায্যে জাহেলিয়াতের পরিপূর্ণ এ্যালবাম তৈরি করা যাতে সে যুগের সমগ্র জীবনে সামনে এসে যায়– সীরাতুন নবীর একটি বিরাট বড় খেদমত। মক্কা মুআজ্জমায় অবস্থানকালে লেখক প্রাচীন ও আধুনিক কালের লিখিত গ্রন্থাবলীর এমন এক ভাণ্ডার পেয়ে যান এই এ্যালবাম তৈরিতে যা বিরাট সাহায্য করেছে। হিন্দুস্তানেও অধ্যয়ন ও গবেষণার ধারা অব্যাহত থাকে এবং এই অধ্যায় পূর্ণতা পায় ও পুস্তকের অন্তর্ভুক্ত হয়। এতে করে পুস্তকটি আরও সমৃদ্ধ হয়। এরই সাথে সাথে এই ধারণাও সৃষ্টি হয় যে, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সালামের আর্বিভাবের প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া এবং ইসলামী দাওয়াতের অনান্য বৈশিষ্ট্যগুলোও বিস্তারিতভাবে তুলে ধরি। সেই সাথে এই দাওয়াতের মেযাজ ও এর কর্মপন্থা কি, আম্বিয়া আলায়হিমু'স-সালাম স্ব-স্ব যুগের বিগড়ে যাওয়া পৃথিবীর কিভাবে সংস্কার ও সংশোধন করতেন, তাঁদের দাওয়াত ও চেষ্টা-সাধনার ধরন অপরাপর সংস্কারক ও নেতৃবৃন্দের থেকে কতটা ভিন্ন, তাঁদের দাওয়াতের প্রতিক্রিয়াই বা কি হতো কিংবা কিভাবেই বা লোকে একে অভ্যর্থনা জানাত, জাহেলিয়াত কিভাবে তার মুকাবিলায় এসে দাঁড়াত এবং এর মুকাবিলায় কি কি ও কোন্ ধরনের অস্ত্র ব্যবহার করত, আর আম্বিয়া আলায়হিমু'স-সালাম তাঁদের অনুসারীদের কি ভাবে প্রশিক্ষণ দান করতেন, তাদেরকে গড়ে তুলতেন, এরপর তাঁদের দাওয়াত কিভাবে বিজয় লাভ করত এবং কিভাবেই-বা এর প্রভাব-প্রতিক্রিয়া ও পরিণতি জাহির হতো তাও খোলাখুলি তুলে ধরি। এটা এ বইয়ের একটি অপরিহার্য অধ্যায় যা ছাড়া এ বই অসম্পূর্ণ থেকে যেত।

লেখক চাচ্ছিলেন, বইটি যেহেতু আরবী ভাষায় লেখা বিধায় এটি মিসরের কোন অভিজাত প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান থেকে প্রকাশিত হোক এবং যথাযোগ্য পরিচিতি পাক যাতে করে যেই উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সামনে নিয়ে এটি লেখা হয়েছিল তা সফল হয়। দীর্ঘ অপেক্ষার পর لجنة التأليف والترجمة والنشر নামক প্রতিষ্ঠানকে এতদুদ্দেশ্যে নির্বাচিত করা হয়। প্রতিষ্ঠানটি মিসরের একটি মর্যাদাবান ও অভিজাত প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান হিসেবে সমগ্র মধ্যপ্রাচ্যে খ্যাত।

বইয়ের ভূমিকা লেখার জন্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সভাপতি ড. আহমদ-আমীন, সাবেক প্রধান, ভাষা বিভাগ, মিসর 'ভার্সিটি-কে অনুরোধ জ্ঞাপন করা হয়। ড. আহমদ আমীন ইতোমধ্যেই দুহা'ল ইসলাম ও ফজরুল ইসলাম' নামক দু'টো বই লিখে ব্যাপক খ্যাতি ও পরিচিতি লাভ করেছিলেন। তাঁর অর্ন্তদৃষ্টি ও সুস্থ চিন্তা-চেতনা লেখককে সে সময় বেশ প্রভাবিতও করেছিল। পুস্তকের পাণ্ডুলিপি ড. আহমদ আমীনের খেদমতে পাঠিয়ে দেয়া হয় এবং এ সম্পর্কে একটি রিভিউ রিপোর্ট পেশের জন্যও অনুরোধ জানানো হয়। তিনি প্রকাশনা কমিটি বরাবর তাঁর পেশকৃত রিভিউ রিপোর্টে পুস্তকটি প্রকাশের পক্ষে জোরালো সুপারিশ করেন এবং কৃত অনুরোধের প্রেক্ষিতে একটি ভূমিকাও লেখেন।

কিন্তু বইটি প্রকাশের পর দেখা গেল, ভূমিকা লেখক হিসেবে ড. আহমদ আমীনকে নির্বাচন করে লেখক ভুল করেছেন। কেননা কোন বইয়ের ভূমিকা লেখার জন্য লেখকের সুস্থ চিন্তা-চেতনা, সূক্ষ্ম দৃষ্টি ও ব্যাপক পাণ্ডিত্যই যথেষ্ট নয়। এজন্য প্রয়োজন ভূমিকা লেখক মূল বইয়ের পেশকৃত বক্তব্য ও বিষয়বস্তুর প্রতি সহানুভূতিশীল ও একমত হবেন এবং লেখকের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের উৎসাহী সমর্থক হবেন, লেখকের বক্তব্যের ব্যাপারে পূর্ণ প্রত্যয়ী ও এর সাফল্যের ব্যাপারে আন্তরিকভাবেই আকাঙ্ক্ষী হবেন। ভূমিকা লেখকের মধ্যে এসব বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে কমতি ছিল। তিনি ছিলেন কেবলই একজন চিন্তাশীল লেখক এবং একজন সফল ঐতিহাসিক। ইসলামের পুনর্জাগরণও যে সম্ভব এবং সে যে পুনরায় সমগ্র বিশ্বের নেতৃত্ব দিতে সক্ষম সে ব্যাপারে খুব একটা আশাবাদী নন। একেও তিনি একটি তত্ত্বগত ও ঐতিহাসিক বিষয়ের মতই ভাবতে পারেন, কিন্তু এর প্রতি নিজের অন্তরের গভীরে বিশেষ কোন আবেগ ও আশা-ভরসা পোষণ করেন না। মূলত গ্রন্থের মূল স্পিরিটের সঙ্গে ভূমিকা লেখকের বিশেষ কোন সম্বন্ধ ছিল না।

ফল হলো এই, তাঁর লিখিত ভূমিকা হলো নিষ্প্রাণ, প্রভাবশূন্য ও আবেদনহীন দায়সারা গোছের। মিসর, ফিলিস্তীন ও হেজায ভূমিতে সর্বত্রই এটা অনুভূত হয়েছে যে, ভূমিকা বইয়ের মূল্য ও মর্যাদা বাড়িয়ে দেবার পরিবর্তে তার মূল স্পিরিটকেই আহত করেছে এবং বইটাকে হাল্কা করে দিয়েছে। কিন্তু তখন যা হবার তা হয়ে গিয়েছে। তীর ধনুক থেকে বেরিয়ে গেছে। কিন্তু এতদসত্ত্বেও বইটি আলোচ্য প্রতিষ্ঠান থেকে প্রকাশিত হওয়ায় সব দিক থেকেই উপকার হয়েছে। কেননা, আলোচ্য প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বইটি সেসব মহলে পৌঁছে গেছে যেখানে নির্ভেজাল ধর্মীয় বই ও ইসলামের দাওয়াত সম্বলিত পুস্তক-পুস্তিকা খুব সহজে গৃহীত হয় না।

১৯৫১ সনে যখন মধ্যপ্রাচ্যে ভ্রমণের সুযোগ হলো-তখন এটা দেখে বড় আশ্চর্য লাগল এবং আনন্দও অনুভব করলাম যে, বইটি সে সব দেশে বড় আগ্রহের সাথে পঠিত হচ্ছে এবং অত্যন্ত উষ্ণ আবেগের সাথে বইটিকে স্বাগতম জানানো হয়েছে যা প্রকাশ পাবার দু-তিন মাসের মধ্যেই সমগ্র আরব বিশ্বে পৌছে গিয়েছিল। ইসলামী দলগুলো অত্যন্ত আগ্রহের সাথে গ্রহণ করেছে। ইসলামী চিন্তায় উদ্বুদ্ধ বিভিন্ন শ্রেণীর লোক নিজেদের পক্ষ থেকে এ বই-এর প্রচার-প্রসারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। মিসরের ইখওয়ানুল মুসলিমূনের প্রশিক্ষণী সিলেবাসের অন্তর্ভূক্ত করা হয়। স্টাডি সার্কেল ও ট্রেনিং প্রশিক্ষণী গোষ্ঠী থেকে নিয়ে জেল খানা পর্যন্ত এর প্রচার ও প্রসারের কাজ করা হয়। আদালতের বিতর্কে ও পার্লামেন্টের বক্তৃতায়ও এ বই থেকে উদ্ধৃতি প্রদান করা হয়েছে। আধুনিক ও প্রাচীনপন্থী উভয় শ্রেণীই একে সম্মানের দৃষ্টিতে দেখেছে। বিষয়টি যেমন গ্রন্থকারের জন্য মর্যাদা ও কৃতজ্ঞতার ব্যাপার তেমনি আরবদের প্রশস্ত অন্তর, সৎ সাহস ও সত্য প্রেমের সুস্পষ্ট প্রমাণও বটে। বইটিকে তারা যেভাবে গ্রহণ করেছেন এবং এর দূরপ্রান্তের একজন লেখককে যেভাবে উৎসাহিত করেছেন ও সাহস যুগিয়েছেন স্বদেশেও যা আশা করা যেত না।

মিসরে অবস্থানের সময়ই বই-এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের সুযোগ এসে যায়। এ সময় গ্রন্থকারের একনিষ্ঠ বন্ধু ও গ্রন্থের বিশেষ একজন ভক্ত মুহাম্মাদ ইউসুফ মূসা, সাবেক উস্তাদ, জামিউল আযহার এবং প্রফেসর, ইসলামিক ল,কায়রো ইউনির্ভারসিটি) স্বীয় কমিটি 'জামা আতুল আযহার লিন্নাশরি ওয়া তা'লীফ- এর পক্ষ থেকে দ্বিতীয়বার বইটি প্রকাশের আগ্রহ প্রকাশ করেন। লেখকের ইঙ্গিতে তারা আহমাদ আমীনের কাছ থেকে এর অনুমতিও নিয়ে নেন। ফলে পূর্ব ভুলের প্রতিকারের সুযোগ সৃষ্টি হয়। অধিকন্ত এমন একজন ব্যক্তির দ্বারা গ্রন্থের ভূমিকা লেখানোর সুযোগ আসে যিনি গ্রন্থের লক্ষ্য ও স্পিরিটের সাথে পরিপূর্ণ প্রত্যয় রাখেন এবং লক্ষ্যের দিকে শক্তিশালী আহ্বানকারী। এ কাজের সবচে' যোগ্য ব্যক্তি ছিলেন সায়্যিদ কুতুব (র)। কারণ সায়্যিদ কুতুব (র) ছিলেন আধুনিক মিসরে ইসলামী চিন্তা ও ইসলামী দাওয়াতের সবচেয়ে শক্তিশালী পতাকাবাহী। তাঁর কলম বিগত কয়েক বছর যাবত যুব সমাজের মধ্যে ইসলামী চিন্তা-চেতনা ও আত্মমর্যাদা সৃষ্টির কাজে উৎসর্গীত ছিল। তাঁর ব্যক্তিত্বে সুদূরপ্রসারী দৃষ্টি, বিশ্বকে অধ্যয়ন, আধুনিক সাহিত্যের শক্তিশালী কলম ও রীতিমত একজন নিষ্ঠাবান দাঈর আবেগ ও নিষ্ঠা এবং একজন নুতন মুসলমানের জোশ-জযবার সমাবেশ ঘটেছিল। তিনি তাঁর অবস্থানগত কারণে মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করার পরও একজন নওমুসলিমই ছিলেন। পরিবেশ তাঁকে

ইসলাম থেকে অনেক দূরে ঠেলে দিয়েছিল। কিন্তু আল-কুরআনের অধ্যয়ন ও গবেষণা, পাশ্চাত্য সভ্যতার ব্যর্থতা ও দেওলিয়াপনা তাঁকে ইসলামের দিকে ফিরিয়ে আনে। তাই তিনি নতুন আবেগ-উচ্ছাস, নতুন দৃঢ়তা ও প্রত্যয় নিয়ে ইসলামের দিকে প্রত্যাবর্তন করেন। তিনি দারুল উলুম মিসর (বর্তমান কায়রো ভার্সিটির অংশ)-এর স্কলার। সাহিত্য সমালোচনার মধ্য দিয়ে তাঁর সাহিত্য জীবন শুরু হয়। তিনি খুব দ্রুত সুধী সমাজে স্বীয় অবস্থান সৃষ্টি করতে সক্ষম হন। তাঁর النقل الادبى (সাহিত্য সমালোচনা) التصوير الفنى فى القر ان (আল-কুরআনের শিল্প-সৌন্দর্য্য) مشاهد القيامةفى القران الكريم (আল-কুরআনে মহা প্রলয়ের দৃশ্য) যা এ যুগের স্মরণীয় ও সাহিত্য সমাজে বরণীয় সফল গ্রন্থসমূহের অন্যতম। দীর্ঘ দিন যাবৎ শিক্ষা বিভাগের সাথে জড়িত ছিলেন। এ বিষয়ে উচ্চ পর্যায়ে পড়াশোনার জন্য তাঁকে বেশ কিছু কাল আমেরিকাতেও অবস্থান করতে হয়। অবস্থানকালে পাশ্চাত্য সভ্যতার অন্ধকার দিকগুলো তাঁর সামনে দিবালোকের মত ফুটে ওঠে। পাশ্চাত্য সভ্যতা ও এর জীবন দর্শনের ব্যর্থতার করুণ দৃশ্য তিনি স্বচক্ষে দেখার সুযোগ লাভ করেন। এতে তাঁর বিশ্বাস ও প্রত্যয় এবং ইসলামের সাথে সম্পর্ক আরও বৃদ্ধি পায় ও সুদৃঢ় হয়। তাঁর মাঝে ইসলামী দাওয়াতের আবেগ ও উচ্ছাস আরও বর্ধিত হয়। আমেরিকা থেকে ফিরে আসার পর তিনি ইসলামের আবেগ-উদ্বেলিত দাঈ ও পাশ্চাত্য সভ্যতার বিচক্ষণ সমালোচকে পরিণত হন। সর্বদা আধুনিক ইসলামী সাহিত্য সৃষ্টিতে নিজকে ব্যস্ত রাখেন। তাঁর চিন্তার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো, তিনি ইসলামকে সমগ্র মানবতার জন্য একটি চিরন্তন ও বিশ্বজনীন পয়গাম মানেন, যা ছাড়া পৃথিবীতে মুক্তি ও শান্তি আসতে পারে না। তাঁর লেখনীর বৈশিষ্ট্য হলো এই যে, তিনি অপারগতা ও আত্মরক্ষার পক্ষে নন বরং তিনি পাশ্চাত্য সভ্যতার মূলে কঠোর আঘাত হানেন এবং প্রতিপক্ষকে অগ্রসর হয়ে আক্রমণ করেন। তিনি ইসলামের ভেতর কোন দূর্বলতা ও অসম্পূর্ণতা অনুভব করেন না। তিনি ইসলামকে একটি পরিপূর্ণ ও সর্বাঙ্গীন জীবন-বিধান হিসেবে পূর্ণ বিশ্বাস ও প্রত্যয়ের সাথে উপস্থাপন করেন। তাই তাঁর লেখা পাঠকদের মাঝে ইসলামের ওপর পরিপূর্ণ নির্ভরশীলতা, প্রত্যয় ও নবজীবন দান করে এবং পাশ্চাত্য চিন্তাধারা ও সমাজ ব্যবস্থার জৌলুসকে উপেক্ষা করার শক্তি জোগায়। যুব সমাজ তাঁর গ্রন্থসমূহ ও প্রবন্ধমালা পাঠে অত্যন্ত প্রভাবিত হয়ে থাকে। তাঁর গ্রন্থ العدالةالاجتماعيةفي الاسلام (ইসলামের সামাজিক সুবিচার) (বাংলায় অনুদিত) (যদিও তাঁর কোন কোন বক্তব্যের সাথে মতপার্থক্য আছে) এ ধরনের প্রচেষ্টার সফল উদাহরণ এবং আধুনিক ইসলামী আরবী সাহিত্যের মাঝে বিশিষ্ট মর্যাদার দাবিদার।

জনাব সায়্যিদ কুতুব বইটি অত্যন্ত আগ্রহ ভরে পাঠ করেন। তাঁর সাপ্তাহিক আলোচনা সভায় বইয়ের সারসংক্ষেপ পেশ ও তার ওপর আলোচনা-পর্যালোচনাও হতো যাতে লেখকেরও অংশ গ্রহণ করার সুযোগ হয়েছিল। ভূমিকা লেখার গোযারিশ করা হলে তিনি সানন্দে গ্রহণ করেন এবং এমন অপূর্ব সুন্দর ও পাণ্ডিত্যপূণ ভূমিকা লিখেন যার ভেতর তিনি গোটা বই-এর নির্যাসকে একত্র করে ফেলেন। এ ভূমিকা যা বর্তমানে বই-এর জন্য শোভা ও সৌন্দর্য, বই-এ এক নতুন অধ্যায়ের সংযোজন করে যা গোটা বই-এর সুন্দর সারসংক্ষেপ। সায়্যিদ কুতুবের পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভূমিকা ছাড়াও মরহুম ডঃ মুহাম্মদ ইউসুফ মুসাও মেহেরবানী করে একটি ভূমিকা লেখেন যার ভেতর তিনি বই সম্পর্কে তাঁর অন্তরের অভিব্যক্তি ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ ধারণা ব্যক্ত করেন। এ ছাড়া লেখকের অকৃত্রিম বন্ধু শায়খ আহমদ শেরবাসী (উস্তাদ, জামিউল আযহার) লেখকের অজান্তেই নিজের বিশেষ ভঙ্গিতে গ্রন্থকারের পরিচয় ও সংক্ষেপে লেখকের জীবন-বৃত্তান্ত লেখেন। এ দু'টো ভূমিকা অনুবাদ করার প্রয়োজন মনে করা হয়নি।

১৯৪৬ সনে একথা ভেবে যে- না জানি কবে আসল আরবী গ্রন্থ প্রকাশিত হয়, লেখক গ্রন্থখানিকে উর্দূ ভাষায় অনুবাদের ব্যবস্থা করেন। এ অনুবাদ গ্রন্থ 'মুসলমানূঁকে তানাযযুল ছে দুনিয়া কো কিয়া নুকসান পহুঁচা' নামে প্রকাশিত হয়। প্রথম সংস্করণে বইটির অংগ-সজ্জা, কাগজ ও ছাপা ইত্যাদি বইয়ের বিষয়বস্তু, গুরুত্ব ও মর্যাদার সাথে সংগতিপূর্ণ ছিল না। বইটির প্রাথমিক দু'টি অধ্যায় [মুহাম্মদ (স)-এর আবির্ভাবের আগে ও মুহাম্মদ (সা)-এর আবির্ভাবের পরে] যা ৪৭-এর পর সংযোজন করা হয়েছে এবং গুরুত্বপূর্ণ অনেক সংযোজন যা মূল আরবী গ্রন্থ প্রকাশের পূর্বপর্যন্ত ছিল না। এ পর্যন্ত মিসর থেকে গ্রন্থের দু'টি সংস্করণ বের হয়ে গিয়েছে এবং তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশের পথে এবং সংযোজনের ফলে বই-এর কলেবর দ্বিগুণ হয়ে গিয়েছে। অতঃপর উর্দূতে বইটির নতুন সংস্করণ প্রকাশ করার ইচ্ছা জন্ম নেয়। এ সময় সামাজিক ও রাজনৈতিক নানাবিধ কারণে এর অনুবাদ করার আমার ফুরসত হচ্ছিলো না। তাই এসবের অনুবাদের দায়িত্ব আমার প্রিয় সহকর্মীদের ওপর অর্পণ করি। আল্লাহ্‌র শোকর যে তারা সে খেদমত অত্যন্ত সুচারুরূপে আঞ্জাম দেন। এসব খেদমতের মাঝে সবচে বড় অংশ আবদুল্লাহ ফুলওয়ারী নদভী (ভাষা ও সাহিত্যের শিক্ষক, নদওয়াতুল উলামা) এবং মাওলানা মুহাম্মাদ রাবে নদভী, শিক্ষক (ভাষা ও সাহিত্য, নদওয়াতুল উলামা) কে অর্পণ করা হয়। কিছু অংশ স্নেহের ভ্রাতুষ্পুত্র মাওলানা মুহাম্মাদ আল-হাসানীর কলমেও আনজাম পেয়েছে। আমি উক্ত

প্রিয়ভাজনদের কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ এবং তাদের জন্য দ'আ করছি। কারণ তাদের প্রচেষ্টাই বইটি আলোর মুখ দেখার উপযুক্ত হয়েছে। এখন বইটি "ইনসানী দুনিয়া পর মুসলমানূঁকে উরূজ ও যাওয়াল কা আছর" (বিশ্বে মুসলমানদের উত্থান পতনের প্রভাব) নামে উর্দূ ভাষায় প্রকাশিত হচ্ছে।

গ্রন্থকার বই-এর ক্ষেত্রে কোন নতুন আবিষ্কার, বিশেষ গবেষণা ও ইজতিহাদের দাবি করেন না আর না নিজের ব্যাপারে কোন অতি উচ্চ ধারণা পোষণ করেন। এ বইটি একটি নিষ্ঠাপূর্ণ ও নিরপেক্ষ ঐতিহাসিক পর্যালোচনা মাত্র এবং একটি স্বাভাবিক প্রশ্নের জ্ঞানগর্ভ জবাব। হতে পারে এ প্রশ্ন অনেকের মস্তিষ্কেই এসেছে এবং বিভিন্নভাবে তার উত্তর প্রদান করা হয়েছে। লেখক শুধু এতটুকু করেছেন যে, উক্ত প্রশ্নটি সকলের সামনে উত্থাপন করেছেন এবং একে একটি স্বতন্ত্র বিষয় বানিয়ে এ সম্পর্কিত ঐতিহাসিক উপাদানসমূহ একত্র করে দিয়েছেন। এতে যদি কোন অন্তরে সামান্যতম অনুভূতি ও চেতনা সৃষ্টি হয়, কোন হৃদয়ে নুতন ব্যথা ও বেদনার উদ্রেক করে, তবে গ্রন্থকার তাঁর প্রচেষ্টায় সফল। প্রত্যেক কল্যাণময় বিপ্লব ও নতুন সমাজ গড়ার জন্য অন্তরকে জাগ্রত করা এবং মানসিক প্রস্তুতি গ্রহণ অত্যন্ত প্রয়োজন। তাই সঠিক লক্ষ্যে ইতিহাসকে বিন্যাস এবং এমন লেখনী ও রচনাবলীর প্রয়োজন যা যুক্তি ও প্রমাণ সর্বদিক থেকে মন-মস্তিষ্ক, অন্তর ও আত্মাকে পরিতৃপ্ত করতে সক্ষম। অপর দিকে তা পাঠকের অন্তরে প্রত্যয় ও দৃঢ় বিশ্বাস জন্ম দেবে এবং কর্মের আবেগ সৃষ্টি করবে। অতিরন ও বিনয় উভয় থেকে মুক্ত হয়ে এ কথা বলার সাহস করা যায় যে, বইটি স্বীয় বিষয় ও উপাদানের দিক থেকে এ ধারার একটি গুরুত্বপূর্ণ ও উপকারী গ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে এবং এ গ্রন্থ থেকে দল-মত নির্বিশেষে সকল চিন্তার অধিকারী মুসলমান উপকৃত হতে পারেন।

وماتوفيقى الابالله عليه توكلت واليه انيب

১৫ রবিউছ-ছানী, ১৩৭৩ হি. আবুল হাসান আলী নদভী

بسم الله الرحمن الرحيم

মিসরের খ্যাতিমান সাহিত্যিক ইসলামী চিন্তাবিদ অমর শহীদ সাইয়েদ কুতুব লিখিত ভূমিকা

আজ এমন একজন ব্যক্তির ভীষণ প্রয়োজন, যিনি মুসলিম উম্মাহ্‌র সেই আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে আনবেন, যা তাদেরকে উজ্জীবিত চেতনায় শুধু সামনে চলার পথ-নির্দেশ করবে।

যিনি তাদেরকে বলবেন, 'তোমাদের একটি গর্বিত অতীত ছিল।' বলবেন, 'তোমাদের সামনে স্বপ্নভরা, আশাভরা একটি ভবিষ্যতও অপেক্ষা করছে।'

যিনি তাদেরকে সাবধান করে বলবেন– স্বীয় দ্বীন সম্পর্কে তাদের সীমাহীন অজ্ঞতার কথা, হতাশাব্যঞ্জক গাফিলতির কথা। যিনি তাদের চোখে চোখ রেখে পরিষ্কার করে বলবেন– এই দীন কোন 'উত্তরাধিকার' নয় বরং তা অর্জন করতে হয়। হাসিল করতে হয় শাণিত বিশ্বাস দিয়ে, জাগ্রত চেতনা দিয়ে।

আমি আনন্দিত। আমি পুলকিত। আমি আমার প্রতীক্ষিত সেই মহান ব্যক্তির দেখা পেয়েছি। তিনি হলেন বর্তমান বিশ্বের অন্যতম 'রাহ্‌নুমা' ও মুরুব্বী হযরত মাওলানা আবুল হাসান আলী নদভী। তাঁর অমর রচনা ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين (মুসলমানদের পতনে বিশ্ব কী হারালো?)-র মাধ্যমে তিনি অবিকল সেই কথাগুলোই মুসলিম উম্মাহ্‌কে বলেছেন যা একটু আগে আমি উল্লেখ করলাম। সত্যি বলতে কি, এই বিষয়ের ওপর আমি আমার এই সংক্ষিপ্ত জীবনে 'আগে-পরে' যত বই পড়েছি, নিঃসন্দেহে এ বই তার মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের দাবি রাখে।

ইসলামের আকীদা কোন ঠুনকো আকীদা নয়। এই আকীদা উন্নতি ও চির উৎকর্ষের আকীদা।

এই দীনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো, তা মুমিনের হৃদয়-মনে অহংকার নয়– সম্মান ও মর্যাদাবোধের সৃষ্টি করে। সৃষ্টি করে আরো এই চেতনা যে, অন্য কিছুতে নয় একমাত্র ইসলামী চেতনাবোধ ও বিশ্বাসের ভিতর দাঁড়িয়েই তাদেরকে স্বস্তি অনুভব করতে হবে। শান্তির ঠিকানা খুঁজতে হবে। তাদের ওপর রয়েছে গোটা বিশ্বের মানুষকে মুক্তির পথের ঠিকানা ও সন্ধান বাৎলে দেওয়ার দায়িত্ব। তাদেরকে অন্ধকারাচ্ছন্ন পৃথিবী থেকে উদ্ধার করে আলোকময় পৃথিবীর পথ দেখানোর দায়িত্ব, যে আলো এসেছে সরাসরি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে। ইরশাদ হচ্ছে ঃ

كنتم خير امة اخرجت للناس تأ مرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله

" তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মত। মানবতার কল্যাণের জন্যেই তোমাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে। তোমরা মানুষকে কল্যাণের পথে ডাকবে আর অকল্যাণ থেকে দূরে রাখবে আর ঈমান রাখবে শুধুমাত্র আল্লাহর ওপর।"

وكذالك جعلنا كم امة وسطالتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا

"এই ভাবে আমি তোমাদেরকে এক মধ্যপন্থী উম্মতরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছি যাতে তোমরা সাক্ষীস্বরূপ হতে পার মানবজাতির জন্যে এবং রাসূল সাক্ষীস্বরূপ হবেন তোমাদের জন্যে।"

হাঁ, এই গ্রন্থে পাঠকের উদ্দেশ্যে সে সব কথাই তিনি বলেছেন। পাঠকের হৃদয়-মনে তা প্রোথিত করার হৃদয়গ্রাহী উপস্থাপনা বেছে নিয়েছেন। এই গ্রন্থের গতিময়, প্রাণময় ও আবেগময় ভাষা ও উপস্থাপনায় পাঠকের মন আলোড়িত হয় ঠিকই কিন্তু বল্গাহারা হয় না। কোন অপ্রীতিকর সাম্প্রদায়িকতাও এখানে পাঠকের মনকে কলুষিত করে না বরং তথ্য ও তত্ত্বভিত্তিক যুক্তির মাধ্যমে এ গ্রন্থের উদ্দেশ্য ও আবেদনকে অত্যন্ত বর্ণিল ভংগীতে চমৎকার উপস্থাপনায় ও অত্যন্ত হৃদয়-নন্দিত করে পাঠকের আবেগ-অনুভূতি ও সেই বিচার-বুদ্ধির কাছে পরিবেশন করা হয়েছে। কোন অস্পষ্টতা নেই, কোন প্রচ্ছন্নতা নেই, নেই কথায় কথায় কোন দ্বন্দ্বও। তাই কোন চাপাচাপি ছাড়াই অথচ ঠিক লেখকের ইচ্ছে মতই পাঠককে সিদ্ধান্ত নিতে একটুও বেগ পেতে হয় না। এটাই এ গ্রন্থের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

ইসলামপূর্ব যুগে এই পৃথিবীর অবস্থা কেমন ছিল, তিনি তাঁরও একটি চিত্র এঁকেছেন। সুসংহত চিত্র। কোথাও বাড়াবাড়ি নেই। কোথাও লুকোচুরি নেই। উত্তর-দক্ষিণ ও পূর্ব-পশ্চিম সব দিকের চিত্রই রয়েছে এতে। হিন্দুস্তান থেকে চীন, চীন থেকে রোম ও রোম থেকে পারস্যসহ মোটামুটি সমগ্র দুনিয়ার সামাজিক, বুদ্ধিবৃত্তিক ও বিভিন্ন ধর্মভিত্তিক সে চিত্র।

এই চিত্রে উন্মোচন করা হয়েছে য়াহূদী ও খ্রিস্ট ধর্মের স্বরূপ। যদিও তারা আসমানী ধর্মের অনুসরণের দাবিদার। এই চিত্রে ছিল প্রতিমাপূজারী হিন্দু ও বৌদ্ধদের কথাও। অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত হলেও এই চিত্রে তাদেরও একটি পরিপূর্ণ অবস্থা বিবৃত হয়েছে। আর মূল গ্রন্থের সূচনা এখান থেকেই।

এই চিত্রাংকন এক সুসংহত চিত্রাংকন। লেখক এখানে নিজস্ব চিন্তা-চেতনা ও ধ্যান-ধারণা চাপিয়ে দেবার চেষ্টা করেন নি। কোন গোঁড়ামী ও জিদকে কেন্দ্র করেও তাঁর লেখনী ও আলোচনা আবর্তিত হয়নি। তিনি বরং সকল প্রকার গণ্ডীমুক্ত হয়ে নতুন-পুরনোর সমন্বয় ঘটিয়ে পূর্বযুগ এবং বর্তমান যুগের অনেক গবেষক ও ঐতিহাসিকের মতামতও অত্যন্ত ইনসাফের সাথে উল্লেখ করেছেন। অথচ এদের অনেকেই ছিলেন ইসলাম বিদ্বেষী। ইসলামী ইতিহাসকে বিকৃত করার অভ্যাস মিশে ছিল এদের কারো কারো অস্থি-মজ্জায়।

তিনি এমন এক দুনিয়ার চিত্র তুলে ধরেছেন যখন পৃথিবীতে ছেয়ে গিয়েছিল জাহেলিয়াতের অন্ধকার। মানুষের বিবেক যখন সত্যের পক্ষে সাড়া দিত না।

মানুষের মন তখন নিষ্ঠুরতায় কেঁপে উঠত না। নির্বাসিত নীতি ও নৈতিকতা নীরবে শুধু কাঁদত। জুলুম-নিপীড়নের ভয়াবহতায় বারবার দুলে উঠত বনী আদমের এই আবাস। নিরন্তর ভেসে আসত এখানে-ওখানে নির্যাতিত মানবতার বুকফাঁটা আর্তনাদ। আসমানী ধর্ম তখনও ছিল কিন্তু ছিল বিকৃত ও প্রভাবহীন। তাতে ছিল না আত্মার কোন খোরাক, জীবনের কোন বার্তা। বিশেষত খ্রিষ্ট ধর্ম।

.... এরপর লেখক ইসলামী যুগের চিত্রাংকন শুরু করেছেন। জাহেলিয়াতের তিমির ভেদ করে হেসে উঠল পৃথিবী। এই চিত্রের সিঁড়ি বেয়ে বেয়ে পাঠক যতই ওপরে উঠবেন, ততই দেখবেন ইসলামের আলো-রশ্মি। এখানে চিত্রিত হয়েছে মানবাত্মার মহামুক্তির কথা। এ মুক্তি সংশয় ও কুসংস্কার থেকে। গোলামী ও দাসত্ব থেকে। নৈতিক অবক্ষয় ও চারিত্রিক ধ্বস থেকে।

এখানে মানবতার মুক্তি নিশ্চিত হয়েছে ইসলামী অনুশাসনের ছায়াতলে ইসলামের অনুপম আদর্শের পরশে। এখানে কোথাও নেই দুর্বলের ওপর সবলের সীমালংঘন ও বাড়াবাড়ি। এখানে কোথাও নেই গোত্রে- গোত্রে ও জাতিতে-জাতিতে হানাহানি ও মারামারি।

এই চিত্রে আরো ফুটে উঠেছে জাহেলিয়াতের চির অমানিশা থেকে মুক্ত হয়ে একটি ইসলামী কল্যাণ রাষ্ট্র স্থাপিত হওয়ার বর্ণিল ছবি। একের পর এক। যার ভিত্তি সততা, পবিত্রতা, আল্লাহ ভীতি ও আমানতদারী।

--- যার ভিত্তি আল্লাহ্‌র প্রতি অবিচল আস্থা ও বিশ্বাস এবং নিঃশর্ত আনুগত্য ও স্বতস্ফূর্ত আত্মসমর্পণ।

.... যার ভিত্তি ন্যায়-বিচার ও সত্যের গলাগলি আর অন্যায়-অবিচার ও মিথ্যার সাথে পাঞ্জা লড়ালড়ি।

..... যার ভিত্তি নিরন্তর নিষ্ঠাপূর্ণ কাজের ভিতর দিয়ে পরকালমুখী করে সাজিয়ে চলা।

...... যার ভিত্তি জীবন-প্রবাহের বিস্তৃত পরিসরে সবাইকে সবার অধিকার বুঝিয়ে দেয়া, এবং অধিকার নিয়ে বেঁচে থাকার স্বাধীনতা নিশ্চিত করা।

এ সবই বাস্তবতার রূপ নিয়ে মানুষের জীবনকে স্পর্শ করেছিল তখন যখন সর্বত্র নেতৃত্ব ছিল ইসলামের। কর্তৃত্ব ছিল ইসলামের। যখন সব কিছুই আবর্তিত হতো ইসলামকে কেন্দ্র করে। ইসলামী অনুশাসনকে মাথায় রেখে। যখন একেবারেই অকল্পনীয় ছিল ইসলামবিহীন নেতৃত্ব কর্তৃত্ব।

সেদিন ভালো করে প্রমাণিত হয়েছিল জীবন-ব্যবস্থা হিসাবে ইসলামই উপযুক্ত।

আকীদা হিসাবে ইসলামই শ্রেষ্ঠ।

আদর্শ হিসাবে ইসলামই চির অনুসরণীয়।

এরপর লেখকের কলমে বড় বেদনাময় চিত্র ফুটে ওঠে। সে চিত্র মুসলিম উম্মাহ্‌র দুর্দিনের চিত্র। নেতৃত্ব থেকে তাদের দূরে নিক্ষিপ্ত হওয়ার চিত্র। তাদের অধঃপতনের করুণ চিত্র। যে অধঃপতন একদিকে ছিল যেমন আত্মিক, অন্যদিকে তেমনি বাহ্যিক। এখানে লেখক মুসলমানদের এই আত্মিক ও বাহ্যিক অধঃপতনের কারণগুলো বর্ণনা করেছেন। ধর্মীয় অনুশাসনের মৌলিকত্ব থেকে দূরে সরে আসার ও নেতৃত্বহারা হওয়ার কারণে কী দুর্যোগ ও দুঃসময় নেমে এসেছিল তাদের ওপর এবং পাশাপাশি প্রায় প্রতিযোগিতামূলকভাবে পূর্বের সেই জাহেলিয়াতের দিকে ছুটে যাওয়ার কারণে কী সর্বনাশা ঝড় বয়ে গিয়েছিল তাদের ওপর দিয়ে। সে চিত্রও লেখক তুলে ধরেছেন।

দূর্ভাগ্যক্রমে এই সময়টাতেই অন্যান্য জাতিগোষ্ঠী পার্থিব জ্ঞান-বিজ্ঞানে নতুন নতুন আবিষ্কারের মাধ্যমে উন্নতির শীর্ষচূড়ায় উপনীত হয়।

লেখক অত্যন্ত আমানতদারী ও সততার সাথে এই চিত্র তুলে ধরেছেন, যেখানে নেই উস্কানীমূলক কোন কথা। নেই আবেগোদ্দীপক কোন উপস্থাপনা। যা কিছু ঘটেছে এবং যেখানে ঘটেছে তা-ই তিনি অবিকল তুলে ধরেছেন কোন প্রকার অতিশয়োক্তি ও রংমিশ্রণ ছাড়াই।

হাঁ, এই চিত্র পাঠকের মনে বড় রেখাপাত করে। তার মনকে বড় গভীরভাবে ছুঁয়ে যায়। পাঠক এসব পড়তে পড়তে গভীরভাবে অনুভব করতে থাকেন যে, অবশ্যই চলমান জাহেলী নেতৃত্বের অবসান হতে হবে। দিশেহারা মানব কাফেলাকে এই জাহেলিয়াতের অন্ধকার থেকে উদ্ধার করে ইসলামী নেতৃত্বের আলোকোজ্জ্বল ভুবনে নিয়ে আসতে হবে।

পাঠক আরো অনুভব করেন যে, দিশেহারা মানব কাফেলাকে সঠিক পথের দিশা দেওয়ার জন্যে ইসলামী নেতৃত্বের কী অপরিসীম প্রয়োজন এবং এই নেতৃত্বের অনুপস্থিতি মানুষের জন্যে কী ভয়ংকর ও বেদনায়ক পরিণতি ডেকে আনতে পারে।

সত্যি কথা হলো, মুসলমানদের নেতৃত্বের আসন থেকে দূরে সরে আসার কারণে যে ভয়াবহ পরিণতি নেমে আসে, তা শুধু মুসলমানদের জন্যেই নেমে আসে না বরং তা গোটা মানবতাকেই গ্রাস করে ফেলে। পৃথিবীর ইতিহাস যার নজীর পেশ করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে।

আরেকটু সামনে গিয়ে পাঠকের মনে নিজের অজান্তেই সৃষ্টি হয় অনুশোচনা ও আক্ষেপের অনুভূতি। স্রষ্টা প্রদত্ত দানের জন্যে সৃষ্টি হয় কৃতজ্ঞতাবোধ। সৃষ্টি হয় হারিয়ে যাওয়া মুসলিম নেতৃত্ব পুনরুদ্ধারের সংকল্পবোধও।

এই গ্রন্থের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো, নেতৃত্ব হারানোর ফলে মুসলিম উম্মাহর ওপর যে অধঃপতন নেমে এসেছে, লেখক সেই অধঃপতনকে 'জাহিলিয়াত' শব্দের মাধ্যমে ব্যক্ত করেছেন। লেখকের এই ব্যতিক্রমী উপস্থাপনা সব যুগের জাহেলিয়াতের স্বরূপ উন্মোচিত করেছে অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে। তিনি প্রমাণ করেছেন যে, যুগের পরিবর্তনে জাহেলিয়াতের মধ্যে পোশাকী পরিবর্তন এলেও মৌলিকভাবে জাহেলিয়াত একই। ইসলাম-পূর্ব জাহেলিয়াত আর বিংশ শতাব্দির জাহেলিয়াত একই পরিণতির দিকে মানুষকে ঠেলে দেয়। যেখানেই জাহেলিয়াতের অনুপ্রবেশ ঘটবে, সেখানেই নীতি-নৈতিকতা ও ন্যায়-অন্যায় বোধ বিলুপ্ত হবে। সুতরাং জাহেলিয়াতের কোন স্থান-কাল-পাত্র নেই বরং যখনই উম্মতের মধ্যে বিবেক-বুদ্ধি ও চিন্তা-চেতনা ও নৈতিক অবক্ষয় ও চারিত্রিক ধ্বস দেখা দেবে, তখনই বুঝতে হবে জাহেলিয়াত তাদের মধ্যে জেঁকে বসেছে। যখনই উম্মাহ ইসলামী অনুশাসনকে এড়িয়ে বল্গাহারা জীবনে তৃপ্তি খুঁজে ফিরবে, তখনই বুঝতে হবে জাহেলিয়াতের বেড়াজালে তারা আটকা পড়েছে।

এই জাহেলিয়াতেরই করুণ পরিণতি ভোগ করছে আজ বিশ্ব মানবতা, যেমনটি ভোগ করেছিলো প্রাক-ইসলামী যুগের সেই বর্বর দিনগুলোতে।

লেখক গ্রন্থের শেষ অধ্যায়ে বলেন ঃ

"মুসলিম বিশ্বের পয়গাম আল্লাহ ও তাঁর রসূল এবং তাঁর নেতৃত্বের ওপর বিশ্বাস স্থাপনের দাওয়াত দেয়। এই দাওয়াত কবুলের বিনিময় হিসাবে.এই বিশ্ব ঘনঘোর অন্ধকার থেকে বেরিয়ে আলোর দিকে, মানুষের গোলামী ও দাসত্ব থেকে মুক্তি পেয়ে আল্লাহ্‌র ইবাদত-বন্দেগীর দিকে, দুনিয়ার সংকীর্ণতা থেকে বেরিয়ে উন্মুক্ত বিশ্বের প্রশস্ততা ও বিস্তৃতির দিকে এবং নানা ধর্মের জুলুম-নিপীড়ন থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে ইসলামের ন্যায় ও সুবিচারের ছায়াতলে স্থান জুটবে। এ পয়গামের গুরুত্ব তুলনায় অনেক বেশি সহজ। আজ জাহেলিয়াত জনসমক্ষে অবমানিত। এর অবগুণ্ঠিত চেহারা আজ সবার সামনে উদ্ভাসিত। দুনিয়া আজ তার থেকে নিজের অসহায়ত্ব প্রকাশ করছে। অতএব জাহেলী

নেতৃত্ব পরিত্যাগ করে ইসলামী নেতৃত্বের দিকে আসার এটাই প্রকৃষ্ট সময়। তবে এজন্য একটাই শর্ত আর তা হলো, মুসলিম বিশ্বকে এজন্য মেরুদণ্ড সোজা করে দাঁড়াতে হবে এবং এই পয়গামকে অটুট মনোবল, দৃঢ় সংকল্প, নিষ্ঠা, হিম্মত ও সাহসিকতার সঙ্গে আপন করে নিতে হবে এবং এ বিশ্বাসে এগিয়ে যেতে হবে যে, দুনিয়ার মুক্তি ও পরিত্রাণ এর মাঝেই নিহিত এবং দুনিয়াকে ধ্বংস ও অধঃপতনের হাত থেকে কেবল এই পয়গামই নাজাত দিতে পারে।"

পরিশেষে এই গ্রন্থের আরেকটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো, তাতে ইসলামী চেতনা ও ভাবধারা গভীরভাবে অনুধাবন করার জন্যে খুব স্পষ্ট করে তা আলোচনা করা হয়েছে। তাই আমরা বলতে পারি, এই গ্রন্থ নিছক ধর্মীয় ও সমাজ জীবনের ওপর একটি গবেষণা গ্রন্থই নয়, বরং ইসলামী দৃষ্টিকোণের প্রতিফলন ঘটিয়ে কীভাবে ইতিহাস লিখতে হবে তার একটি চমৎকার নমুনাও বটে। আর এ কাজ বড় জরুরী কাজ। কেননা আমরা অত্যন্ত বেদনার সাথে লক্ষ করে এসেছি যে, ইতিহাস লেখার দায়িত্ব যেন শুধু য়ূরোপীয় ঐতিহাসিকদেরকেই দেওয়া হয়েছে। আমরা যেন ইতিহাস লিখতেই জানিনা। অথচ এই য়ূরোপীয়রা ইতিহাস লিখতে গিয়ে শুধু তাদেরই সভ্যতা-সংস্কৃতির জয়গান গেয়েছে। তাদের বস্তাপচা দর্শন ও স্বধর্ম-স্বজাতির পক্ষে বেসুরো জয়কীর্তন করেছে। আমরা জানিনা, এই একপেশে ইতিহাস লিখতে গিয়ে তারা নিজেদের বিবেকের চোখ রাঙানীর সম্মুখীন হয়েছে কিনা। হলেও নিঃসন্দেহে তারা বিবেকের ডাকে সাড়া দেয়নি। নইলে তাদের ইতিহাস এত বিভ্রান্তিকর, এতো বিকৃত ও এত ত্রুটিপূর্ণ হতো না।

অবশ্য এতে দুঃখ পেলেও আমাদের অবাক হওয়ার কিছু নেই। কেননা পাশ্চাত্যের ঐতিহাসিকরা মানব জীবনের সত্যিকার মুল্যবোধ (যার দিকে ইসলাম দিক-নির্দেশ করেছে) সম্পর্কে ভীষণ গাফিলতি প্রদর্শন করে থাকে। অথচ এই বিষয়টি এড়িয়ে গিয়ে সত্যিকারের মানবেতিহাস রচনা এবং বিভিন্ন ঘটনাবলীর সঠিক ও ইনসাফপূর্ণ চিত্রাংকন ও তার ফলাফল নির্ণয় কিছুতেই সম্ভব নয়।

পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকদের আরেকটি ব্যাধি হলো, তারা য়ূরোপকেই সব কিছুর কেন্দ্রভূমি মনে করে। তাই অন্য দেশের এবং অন্য সমাজের সভ্যতা-সংস্কৃতিকে (সে যত ভালোই হোক) তারা শুধু এ জন্যে এড়িয়ে যায় কিংবা স্বীকৃতি দিতে গড়িমসি করে যে, তার উৎপত্তিস্থল য়ূরোপ নয়। অপরদিকে কোথাও কোথাও ঠেকায় পড়ে যদি স্বীকৃতি দেয়ও তবু তা পরিবেশন করা হয় বিকৃতভাবে, গুরুত্বহীনভাবে।

য়ূরোপীয়রা মানব-জীবনের যে দিকগুলো ইতিহাস রচনাকালে এড়িয়ে গেছে

য়ূরোপীয়রা মানব-জীবনের যে দিকগুলো ইতিহাস রচনাকালে এড়িয়ে গেছে তা এই গ্রন্থে গুরুত্ব সহকারে স্থান পেয়েছে। এতে উল্লিখিত হয়েছে ইতিহাসের জন্যে অপরিহার্য ও অতি প্রয়োজনীয় আরো অনেক কিছু। এখানে দ্ব্যর্থহীনভাবে মানবতার মাহাত্ম্যের স্বীকৃতির কথাও আলোচিত হয়েছে।

পাঠকের মনের কোণে প্রশ্ন আসতে পারে, এই গ্রন্থের লেখক, যিনি রুহানিয়াত ও আধ্যাত্মিকতার একজন শ্রেষ্ঠ বাহক, যিনি বিশ্ব নেতৃত্ব ইসলামের হাতে তুলে দেওয়ার জন্যে ব্যাকুল, এই তিনি যখন নেতৃত্ব লাভের এবং নেতৃত্বদানের যোগ্যতা নিয়ে আলোচনা করবেন, তখন কি রুহানী শক্তি অর্জনের পাশাপাশি আধুনিক যুদ্ধবিদ্যা ও প্রযুক্তিগত উৎকর্ষতা অর্জনের ব্যাপারেও আলোচনা করবেন? চলমান বিশ্বের আধুনিক চ্যালেঞ্জ মুকাবিলার জন্যে পরিপূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণের কথাটুকুও কি তিনি বলবেন?

বড় আনন্দের বিষয় যে, লেখক পাঠকের এই মনোভাবও বুঝতে পেরেছেন এবং অত্যন্ত গুরুত্বসহকারে তিনি সংশ্লিষ্ট বিষয়টিও তাঁর গ্রন্থে আলোচনা করেছেন।

নিঃসন্দেহে এই গ্রন্থ মানব জীবনের ওপর ইতিবাচক প্রভাব বিস্তারকারী সব বিষয়ের একটি বিরল সমষ্টি। এক সুসংহত শব্দচিত্র। লেখক তাঁর এই সুসংহত ও সুবিন্যস্ত পংক্তিমালায় ইতিহাসকে বড় সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছেন। সেই সাথে মুসলিম উম্মাহকে দিয়েছেন সঠিক দিক-নির্দেশনা।

গ্রন্থের এই বৈশিষ্ট্যের ওপর ভিত্তি করে বলা যায়, এই গ্রন্থ 'ইতিহাস কীভাবে রচিত হওয়া উচিত' তার একটি প্রকৃষ্ট ও হৃদয়গ্রাহী উদাহরণ। য়ূরোপীয় ঐতিহাসিকদের স্টাইল থেকে মুখ ফিরিয়ে (যাতে রয়েছে অসংগতি ও অসাম স্যতা, রয়েছে বিকৃতি ও সত্য-বিচ্যুতি, রয়েছে জ্ঞান-গবেষণার হাজারো দৈন্য) ইতিহাসমুখী আলোচনায় গবেষণায় কীভাবে কলম ধরতে হবে সে দিকনির্দেশনাও এখানে রয়েছে।

এই গ্রন্থ সম্পর্কে আমার নিজস্ব অনুভূতি প্রকাশের সুযোগ পেয়ে নিজেকে বড় ধন্য মনে করছি। আরেকটি আনন্দের বিষয় হলো, আমার মাতৃভাষা আরবীতেই আমি বইটি পড়ার সৌভাগ্য লাভ করেছি যে ভাষা লেখকের প্রাণপ্রিয় ভাষা।

মিসরে এই গ্রন্থের আজ দ্বিতীয় সংস্করণ বের হতে যাচ্ছে। আল্লাহ কবুল করুন।

إِنَّ فِي ذَالِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ...

(সূরা কাফ)

মুসলমানদের পতনে

বিশ্ব কী হারালো?

(ISLAM AND THE WORLD)

সূচীপত্র

দ্বিতীয় অধ্যায়

তৃতীয় অধ্যায়

চতুর্থ অধ্যায়

৫ম অধ্যায়

ষষ্ঠ অধ্যায়

সপ্তম অধ্যায়

অষ্টম অধ্যায়

মুসলমানদের পতনে

বিশ্ব কী হারালো?

(ISLAM AND THE WORLD)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

প্রথম অধ্যায়

রসূল আকরাম (সা)-এর আবির্ভাবের পূর্বে

খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দী ও সমকালীন বিশ্ব

এ ব্যাপারে কারো কোন দ্বিমত নেই যে, খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দী ছিল মানব ইতিহাসের সর্বাধিক অন্ধকারময় ও অধঃপতিত যুগ। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে মানবতা যেভাবে অধঃপতন ও অবনতির দিকে ধাবিত হচ্ছিল এ সময় সে তার চূড়ান্ত সীমায় গিয়ে উপনীত হয়েছিল। গোটা বিশ্বে এমন কোন শক্তি ছিল না যা এই পতনোন্মুখ মানবতাকে হাত ধরে তাকে ধ্বংসের অতল গহ্বর থেকে রক্ষা করতে পারে। অধঃপতনের গতি প্রতিদিনই দ্রুত থেকে দ্রুততর হচ্ছিল। এই শতাব্দীতে মানুষ আল্লাহ্‌কে ভুলে গিয়ে অবশেষে একদিন নিজেকেও ভুলে বসেছিল। পরিণতি সম্পর্কে ভাবলেশহীন ও বেখবর মানুষ ভাল-মন্দের মধ্যে পার্থক্য করবার শক্তি থেকেও সম্পূর্ণ মাহরূম হয়ে গিয়েছিল। পয়গম্বরগণের দাওয়াতের আওয়াজ বহুকাল চাপা পড়ে গিয়েছিল। যেসব প্রদীপ এসব পয়গম্বর ও নবী-রসূল জ্বালিয়ে গিয়েছিলেন বাতাসের প্রচণ্ড তুফান তা হয় একেবারে নিভিয়ে দিয়েছিল অথবা তা এই ঘনঘোর অন্ধকারে এমন নিভু নিভু হয়ে গিয়েছিল যদ্দ্বারা কেবল কয়েকজন আল্লাহ্‌ভক্তের দিলই রৌশন ও অলোকিত ছিল যা শহর তো দূরের কথা কয়েকটা গোটা বাড়িও আলোকিত করতে পারে না। দীনদার লোকেরা দীনের আমানত নিজেদের বুকের ভেতর আগলে রেখে জীবন ক্ষেত্র থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মঠ, গির্জা ও প্রান্তরের এক কোণে গিয়ে ঠাঁই নিয়েছিল এবং জীবন সংগ্রাম, এর দাবি ও রাজনীতি এবং আধ্যাত্মিকতা ও বস্তুবাদের দ্বন্দ্বে পরাজিত হয়ে নেতৃত্বের দায়িত্ব থেকে হাত গুটিয়ে বসেছিল। আর যারা জীবনের এই তুফানে অবশিষ্ট রয়ে গিয়েছিল তারা রাজা-বাদশাহ ও দুনিয়াদার লোকদের সাথে স্বার্থের ভাগাভাগি করে নিয়েছিল এবং তাদের অবৈধ কামনা-বাসনা ও জুলুম-নিপীড়নমূলক রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনায় তাদের সহযোগী, বাতিল তথা অসৎ পন্থায় লোকের সম্পদ গ্রাস এবং তাদের শক্তি ও সম্পদ থেকে নাজায়েয ফায়দা লুটবার ক্ষেত্রে তাদের অংশীদারে পরিণত হয়েছিল।

রোমক ও পারসিকরা তখন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের নেতৃত্ব ও দুনিয়ার কর্তৃত্বের ইজারাদারে পরিণত হয়েছিল। তারা ছিল দুনিয়ার জন্য উত্তম ও আদর্শ নমুনা হবার পরিবর্তে সর্বপ্রকার মন্দ ও ফেতনা-ফাসাদের পতাকাবাহী এবং যাবতীয় অপকর্মের গুরু ঠাকুর। বিভিন্ন সামাজিক ও চারিত্রিক রোগ-ব্যাধির আখড়ায় পরিণত হয়েছিল এসব জাতিগোষ্ঠী বহুকাল থেকে। এদের লোক আরাম-আয়েশ ও বিলাসী জীবন এবং কৃত্রিম সভ্যতা-সংস্কৃতির সমুদ্রে ছিল আপাদমস্তক নিমজ্জিত। রাজা-বাদশাহ ও ক্ষমতাসীন ব্যক্তিবর্গ অলস ঘুমে বিভোর এবং ক্ষমতার নেশায় বুঁদ ছিল। বিলাস জীবনের স্বাদ উপভোগ ও কামনা-বাসনার পরিতৃপ্তি ছাড়া দুনিয়ার বুকে তাদের আর কোন চিন্তা কিংবা লক্ষ্য ছিল না। জীবনের চাহিদা ও স্বাদ ভোগের লোভ তাদের এতটাই বেড়ে গিয়েছিল যে, কোন কিছুতেই ও কোনভাবেই তা পরিতৃপ্ত হতো না। মধ্যবিত্ত শ্রেণী (প্রতিটি যুগের নিয়ম মাফিক) উপরিউক্ত উচ্চবিত্ত শ্রেণীর পদাংক অনুকরণ করে চলতে চেষ্টা করত এবং এই অনুকরণকে সবচে' গর্বের বস্তু মনে করত। থাকল সাধারণ মানুষ! তা তারা তো জীবনের বোঝা, হুকুমতের দাবি ও করভারের চাপে এতটাই নিষ্পেষিত এবং দাসত্ব ও আইনের শেকলে এতটাই আবদ্ধ হয়েছিল যে, তাদের জীবন জীব-জানোয়ারের চাইতে আদৌ ভিন্নতর ছিল না। অপরের আরাম-আয়েশের জন্য পরিশ্রম ও হাড়ভাঙা খাটুনি এবং অন্যের আয়েশ ও বিলাসের জন্য নির্বাক পশুর মত সব সময় জোতা থাকা এবং পশুর মতই উদর পূর্তি ভিন্ন তাদের আর কোন হিস্যা ছিল না। কখনো যদি তারা এই শুষ্ক ও বিস্বাদ জীবন এবং এর একঘেয়ে চক্করে পড়ে অতিষ্ঠ হয়ে উঠত তখন নেশাকর বস্তু ও সস্তা আমোদ-প্রমোদ ও খেল-তামাশা দ্বারা নিজেদের মনকে ভোলাতে চাইত এবং কখনো যদি জীবনের এই যন্ত্রণা থেকে আরাম ও স্বস্তির শ্বাস গ্রহণের মওকা মিলত তখন অভুক্ত ও লোভাতুর মানুষের মত ধর্ম ও সর্বপ্রকার নীতি-নৈতিকতার বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে চোখ বন্ধ করে পাশবিক আনন্দের মাঝে ঝাঁপিয়ে পড়ত।

দুনিয়ার নানা অংশে ও বিভিন্ন ভূখণ্ডে এমন সব ধর্মীয় শৈথিল্য, আত্মবিস্মৃতি, সামাজিক অনাচার ও বিশৃংখলা ও নৈতিক অধঃপতন দৃশ্যমান হয়ে উঠেছিল যে, মনে হচ্ছিল এসব দেশ অধঃপতন ও অধঃগতি এবং ধ্বংস ও অরাজকতার ক্ষেত্রে একে অপরকে ছাড়িয়ে যাবার প্রতিযোগিতায় মাততে চায় এবং এটা ফয়সালা করা কঠিন হয়ে পড়ে যে, এগুলোর মধ্যে কোন্‌টি অন্যের চাইতে এগিয়ে আছে।

এক নজরে বিভিন্ন ধর্ম ও জাতিগোষ্ঠী

এ যুগে বড় বড় ধর্ম বাচ্চাদের খেলার পুতুল এবং ভণ্ড মুনাফিকদের অনুশীলন ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছিল। এসব ধর্মের আকার-আকৃতি ও প্রকৃতি

এতটাই বিকৃত হয়ে গিয়েছিল যে, যদি কোনভাবে ও কোনক্রমে ঐসব ধর্মের পিতৃপুরুষগণ দুনিয়ার বুকে পুনরাগমনপূর্বক তাঁদের রেখে যাওয়া ধর্মের অবস্থা দেখতে পেতেন তবে এটা অবধারিত যে, তাঁরা নিজেরাও তাঁদের ধর্ম চিনতে পারতেন না।

সভ্যতা ও সংস্কৃতির লালন ক্ষেত্রগুলোতে আত্মম্ভরিতা, নৈরাজ্য ও নৈতিক অবক্ষয়ের রাজত্ব চলছিল। সরকারী প্রশাসনে ছিল সীমাহীন বিশৃঙ্খলা। শাসন কর্তৃত্বে সমাসীন ব্যক্তিবর্গের কঠোরতা প্রদর্শন এবং জনগণের চারিত্রিক অধঃপতনের পরিণতি হলো এই যে, গোটা জাতিই নিজেদের অভ্যন্তরীণ সমস্যার আবর্তে জড়িয়ে গেল। দুনিয়ার সামনে পেশ করবার মত তাদের কাছে কোন পয়গাম ছিল না, ছিল না মানবতার জন্য কোন দাওয়াত। বস্তুত এই সব জাতিগোষ্ঠী ও ধর্ম ভেতরে ভেতরে ফোকলা হয়ে গিয়েছিল। তাদের জীবনের সূত্র শুকিয়ে গিয়েছিল। তাদের কাছে না ছিল ধর্মের দিক-নির্দেশনা আর না ছিল রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনা পরিচালনার সুদৃঢ় ও যুক্তিযুক্ত কোন নীতিমালা।

খ্রিস্ট ধর্ম ঃ ষষ্ঠ শতাব্দীতে

খ্রিস্ট ধর্মে এতটা বিস্তৃতি ও ব্যাপকতা কখনো ছিল না যার আলোকে জীবনের গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাগুলোর সমাধান করা যেত কিংবা এর ওপর ভিত্তি করে সংস্কৃতি গড়ে তোলা যেতে পারত অথবা তার দিক-নির্দেশনাধীনে কোন সালতানাত চলতে পারত। যা ছিল তা হযরত ঈসা মসীহ (আ) প্রদত্ত শিক্ষামালার একটা হালকা খসড়া চিত্রমাত্র যার ওপর তওহীদ তথা একত্ববাদের সহজ সরল বিশ্বাসের কিছুটা প্রলেপ ছিল। খ্রিস্ট ধর্মের এই বৈশিষ্ট্যও ততদিন পর্যন্ত কায়েম ছিল যতদিন এই ধর্ম সেন্ট পলের হস্তক্ষেপ থেকে মুক্ত ছিল। সেন্ট পল এসে তো এই ছিটেফোঁটা অবশেষটুকুও মিটিয়ে দিলেন। নিভিয়ে দিলেন এর ক্ষীণ আলোক-রশ্মিটুকুও। কেননা যেই পৌত্তলিক আবহে ও পরিবেশে তিনি লালিত-পালিত হয়েছিলেন এবং যেই সব জাহিলী অশ্লীলতা ও বাজে কথন থেকে বের হয়ে এসেছিলেন খ্রিস্ট ধর্মের মধ্যে তিনি সেই সব জিহালত (মূর্খতা, অজ্ঞতা ও পথভ্রষ্টতা) ও বাজে জিনিসের মিশ্রণ ঘটান। এরপর এল কনস্টানটাইনের শাসনামল। তিনি তাঁর শাসনামলে খ্রিস্ট ধর্মের অবশিষ্ট মৌলিকত্বটুকুও খুইয়ে দিলেন।

মোটকথা, খ্রি. ৪র্থ শতাব্দীতেই খ্রিস্ট ধর্ম একটি জগাখিচুড়িতে পরিণত হয় যার ভেতর গ্রীক পৌরাণিক কাহিনী, রোমান পৌত্তলিকতা, মিসরীয় নব্য-প্লেটোবাদ (Neo-Platonism) ও বৈরাগ্যবাদের যোগ ছিল। হযরত ঈসা মসীহ (আ)-র সহজ সরল শিক্ষামালার উপাদান এই জগাখিচুড়ির ভেতর এইভাবে হারিয়ে গিয়েছিল যেভাবে বারিবিন্দু বিশাল সমুদ্র বক্ষে পতিত হয়ে

আপন অস্তিত্ব হারিয়ে বসে। শেষ পর্যন্ত খ্রিস্ট ধর্ম কতিপয় নিষ্প্রাণ প্রথা ও নিরানন্দ আকীদা-বিশ্বাসে পরিণত হয়ে যায় যা না পারত আত্মার মাঝে উত্তাপ সঞ্চার করতে আর না পারত জ্ঞান-বুদ্ধির বৃদ্ধির কারণ হতে। আবেগ-উদ্দীপনাকে তা সচল ও সক্রিয় করে তুলতে পারত না। তার মধ্যে এ যোগ্যতাও ছিল না যে, জীবনের গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা সংকটে মানব কাফেলার নেতৃত্ব দেবে। এর ওপর ধর্মের বিকৃতি ও মনগড়া ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ছিল এর অতিরিক্ত যার পরিণতি হলো এই যে, খ্রিস্ট ধর্ম জ্ঞান-গবেষণা ও চিন্তা-চেতনার দ্বার উন্মুক্ত করার পরিবের্ত সে নিজেই এ পথে বাঁধার বিন্ধ্যাচল হয়ে দাঁড়িয়ে গেল এবং শতাব্দীর অব্যাহত অধঃপতনের দরুন কেবলই পৌত্তলিকতার ধর্মে পরিণত হলো। ইংরেজী ভাষায় কুরআন করীমের অন্যতম বিখ্যাত অনুবাদক জর্জ সেল (Sale) খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর খ্রিস্টানদের সম্পর্কে বলেনঃ

"The worship of saints and images, in particular, was then arrived at such a scandalous pitch that it even surpassed whatever is now practised among the Romanists."

খ্রিস্টানরা সাধু-সন্ত ও হযরত ঈসা মসীহ (আ)-র মূর্তির পূজার ক্ষেত্রে এতটা বাড়াবাড়ি করেছিল যে, এ যুগের রোমান ক্যাথলিকরাও সেই সীমায় পৌছুতে পারেনি।[১]

রোম সাম্রাজ্যে ধর্মীয় গৃহযুদ্ধ

অতঃপর স্বয়ং ধর্ম নিয়েই কালাম শাস্ত্রীয় বাহাছ তথা তর্ক-বিতর্কের ঝড় শুরু হয়ে যায় এবং নিষ্ফল মতানৈক্য ও মতবৈষম্যের হাঙ্গামা খ্রিস্টান সম্প্রদায়কে জড়িয়ে ফেলে। এই দ্বন্দ্বে তাদের মেধা ও প্রতিভার অপচয় ঘটে এবং তাদের কর্মশক্তি স্থবির হয়ে পড়ে। অধিকাংশ ঘরোয়া বিবাদই বিরাট আকারের রক্তাক্ত সংঘর্ষের রূপ নেয়। শিক্ষাঙ্গন, গির্জা ও মানুষের বাড়িঘর প্রতিদ্বন্দ্বী শিবিরে পরিণত হয় এবং গোটা দেশই হয়ে পড়ে গৃহযুদ্ধের শিকার। তাদের বিতর্কের বিষয় ছিল এই ঃ হযরত ঈসা মসীহ (আ)-র ফিতরত তথা প্রকৃতি কি এবং এর মধ্যে খোদায়ী ও মানবীয় অংশের আনুপাতিক হার কত? রোম ও সিরিয়ার মালকানী (Malkite) খ্রিস্টানদের আকীদা ছিল এই যে, হযরত মসীহ (আ)-র প্রকৃতি হলো মিশ্রিত। তন্মধ্যে একটি অংশ হলো খোদায়ী এবং আরেকটি অংশ হলো মানবীয়। কিন্তু মিসরের মনোফিসীয় (Monophysites) খ্রিস্টানদের জিদ ছিল যে, মসীহ (আ)-র প্রকৃতি নির্ভেজাল খোদায়ী। এর মধ্যে তাঁর মানবীয়

1. Sale's translation,.P. 62.(1896)

প্রকৃতি এমনভাবে বিলীন হয়ে গেছে যেভাবে সির্কার একটি ফোঁটা সমুদ্রে পতিত হয়ে নিজের অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলে। প্রথমোক্ত মত ছিল সরকারী মত। বায়যান্টাইন সম্রাটরা ও শাসক মহল একে ব্যাপকতর করতে এবং গোটা সাম্রাজ্যের একমাত্র ধর্মে পরিণত করতে সর্বশক্তি নিয়োগ করে এবং এই মতের বিরোধীদেরকে এমন কঠিন শাস্তি দেয় যা ভাবতে গেলেও লোম খাড়া হয়ে যায়। কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও মতানৈক্য ও ধর্মীয় সংঘাত-সংঘর্ষ বেড়েই চলে। উভয় দলই একে অপরকে এমন ধর্মবহির্ভূত ও বেদীন মনে করত যে, দেখে মনে হতো, এরা বুঝি বা পরস্পরবিরোধী দুই স্বতন্ত্র ধর্মের অনুসারী।[১] সাইরাসের দশ বছরের শাসনকালের (৬১৩-৪১ খ্রি) ইতিহাস পাশবিক শাস্তি ও লোমহর্ষক নির্যাতনের কাহিনীতে ভরপুর।[২]

সামাজিক বিশৃঙ্খলা ও অর্থনৈতিক অরাজকতা

রোম সাম্রাজ্যের পূর্বাঞ্চলে সামাজিক বিশৃঙ্খলা চূড়ান্ত পর্যায়ে গিয়ে উপনীত হয়েছিল। রাজ্যের প্রজাসাধারণ অসংখ্য বিপদের শিকার হওয়া সত্ত্বেও গোঁদের ওপর বিষ ফোঁড়ার মত তাদের ওপর দ্বিগুণ-চতুর্গুণ ট্যাক্স বৃদ্ধি করা হয়েছিল। ফলে রাষ্ট্রের অধিবাসীরা ছিল সরকারের প্রতি চরম অসন্তুষ্ট এবং এ ধরনের সীমাহীন জুলুম-নিপীড়নের দরুন তারা স্বদেশী শাসনের মুকাবিলায় বিদেশী শাসনকেই অগ্রাধিকার দিত। ইজারাদারী (Monopolies) ওজোর-যবরদস্তি-পূর্বক ধন-সম্পদ ছিনতাই ছিল যেন বোঝার ওপর শাকের আঁটি। এ সমস্ত কারণে বিরাট আকারে বিক্ষোভ ও হৈ-হাঙ্গামা দেখা দেয়। ৫৩২ খ্রিস্টাব্দের হাঙ্গামায় একমাত্র রাজধানীতেই ত্রিশ হাজার মানুষের জীবনাবসান ঘটে।[৩] তখনকার সময় ও সুযোগের দাবি ছিল ব্যয় নির্বাহের ক্ষেত্রে মিতব্যয়িতার নীতি অনুসরণ। কিন্তু লোকে অপচয়-অপব্যয়ে এমনি অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল যে, কোনক্রমেই তা থেকে বিরত হতে রাজি হচ্ছিল না। তারা নৈতিক অধঃপতনের চূড়ান্ত ধাপে উপনীত হয়েছিল। সবার মধ্যে কেবল একটা ধান্ধাই বিরাজ করছিল এবং সকলকে একই ভূতে পেয়ে বসেছিল যেনতেন প্রকারে সম্পদ আহরণ করতে হবে এবং সেই সম্পদ নিত্য-নতুন ফ্যাশন, আরাম-আয়েশ ও ভোগবিলাস এবং আপন আপন প্রবৃত্তিজাত কামনা-বাসনা চরিতার্থ করবার পেছনে ব্যয় করতে হবে। মানবতা, ভদ্রতা ও সৌজন্যের ভিত্তি স্বস্থান থেকে সরে গিয়েছিল। সভ্যতা ও নৈতিকতা বিদায় নিয়েছিল। পরিস্থিতি এত দূর গড়িয়েছিল যে, লোকে পারিবারিক ও

1. Alfied J. Butler, Arabs conquest of Egypt and last thirty years of the Roman Dominion, p. 29-30.

2. প্রাগুক্ত, ১৮৩-৮৯;

3. Encyclopaedia Britannica. Art. Justin.

বৈবাহিক জীবনের ওপর চিরকুমার জীবনকে প্রাধান্য দিত যাতে সে স্বাধীন ও বল্গাহীন জীবন যাপনের সুযোগ পায়।[১] ন্যায় ও সুবিচারের অবস্থা ছিল এই যে, সেল-এর ভাষায় ঃ যেভাবে বিবিধ দ্রব্য ও বস্তুসামগ্রী বাজারে ক্রয়-বিক্রয় হয়ে থাকে এবং সে সবের মূল্য নির্ণীত ও নির্ধারিত হয় ঠিক সেভাবেই ন্যায় ও সুবিচারও ক্রয়-বিক্রয় হতো। ঘুষ ও আমানতের খেয়ানত তথা গচ্ছিত দ্রব্য আত্মসাতকে স্বয়ং জাতির পক্ষ থেকে উৎসাহিত করা হতো।[২] ঐতিহাসিক গীবন বলেন: খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে সাম্রাজ্যের অবনতি ও অধঃপতন চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত হয়েছিল।[৩] এর উদাহরণ হলো শাখা-প্রশাখায় পল্লবিত ও পত্রপুষ্পে সজ্জিত সেই ফলবান বৃক্ষ যার ছায়াতলে পৃথিবীর তাবৎ জাতিগোষ্ঠী এককালে আশ্রয় নিত। আর এখন সেই বৃক্ষের কেবল কাণ্ডটাই দাঁড়িয়ে আছে এবং শুকোতে শুকোতে শেষ দশায় এসে পৌঁছেছে।[৪] Historian's History of the World-এর লেখক বলেন :

"That it (Byzantine Empire) had nevertheless suffered very severely in the general decline caused by over-taxation, and by reduced commerce, neglected agriculture and diminished population, is attested by the magnificent ruins of cities which had already fallen to decay, and which never regained their ancient prosperity."

"বড় বড় শহরে দ্রুততার সাথে ধ্বংস ও অধঃপতন নেমে এল। এরপর সেসব শহর সেই ধ্বংসের ধাক্কা আর সামলে উঠতে পারেনি, পারেনি তাদের হৃত মর্যাদা পুনরুদ্ধার ও পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে। সেগুলো সাক্ষ্য দেয় যে, বায়যান্টাইন হুকুমত সে সময় চরম অধঃপতিত অবস্থায় ছিল আর এই অধঃপতন অতিরিক্ত করের চাপ, ব্যবসা-বাণিজ্যের মন্দা, কৃষিক্ষেত্রে স্থবিরতা ও ঔদাসীন্য এবং শহরগুলোতে জনসংখ্যার ক্রমিক হ্রাসের ফলেই ঘটেছিল।"[৫]

য়ুরোপের উত্তর ও পশ্চিমের জাতিগোষ্ঠী

সেসব পশ্চিমা জাতিগোষ্ঠী যারা উত্তর ও পশ্চিমে বসবাস করত তারা ছিল অজ্ঞতা ও মূর্খতার শিকার, ছিল রক্তাক্ত যুদ্ধ-বিগ্রহ ও মারামারি-হানাহানিতে ক্ষতবিক্ষত। তারা যুদ্ধবিগ্রহ ও অজ্ঞতা-মূর্খতা থেকে সৃষ্ট ঘোর অন্ধকারে হাত-পা ছুঁড়ছিল। জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সভ্যতা-সংস্কৃতি দ্বারা আলোকিত করে তুলতে তখনো

1. The History of the Decline and Fall of the Roman Empire. ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩২৭.
2. Sale's translation. p, 72.
3. Gibbon , The Decline and Fall of the Roman Empire. Vol. V. p. 31.
4. 3. Ibid, Vol. V. p. 31.
5. Historion's History of the World. vol. vii-p.175.

ও সব দেশের ভাগ্যাকাশে মুসলিম স্পেনের অভ্যুদয় ঘটেনি। তাছাড়া বিপদ-আপদ ও দুর্যোগ-দুর্বিপাকও তাদের চোখ খুলতে সাহায্য করেনি। মোটকথা ,এই সব জাতিগোষ্ঠী মানব সভ্যতার কাফেলা থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল। তারা যেমন বিশ্বজগত সম্পর্কে অজ্ঞ ও বেখবর ছিল তেমনি পৃথিবীর লোকও তাদের সম্পর্কে তেমন কিছুই জানত না। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের দেশগুলোতে যেসব বিপ্লবাত্মক ঘটনা ও পরিবর্তন সংঘটিত হচ্ছিল সেসবের সঙ্গে এসব জাতিগোষ্ঠীর দূরতম সম্পর্কও ছিল না। আকীদা-বিশ্বাসের দিক দিয়ে এসব জাতিগোষ্ঠীর অবস্থান ছিল নবীন অভিজ্ঞতাহীন খ্রিস্ট ধর্ম ও প্রাচীন মূর্তি পূজার মাঝামাঝি। এইচ.জি. ওয়েলস (H.G. Wells) বলেন ঃ তাদের কাছে না দীনের কোন পয়গাম ছিল আর না রাজনীতির ময়দানে তাদের কোন উচ্চ আসন ছিল। তৎকালে পশ্চিম য়ুরোপে ঐক্য-সংহতি ও আইন-শৃঙ্খলার কোন চিহ্নমাত্র মাত্র ছিল না।[১]

রবার্ট ব্রিফল্ট বলেনঃ "From the fifth to the tenth century Europe lay sunk in a night of barbarism which grew darker and darker. It was a barbarism far more awful and horrible than that of the primitive savage, for it was the decomposing body of what had once been a great civilization. The features and impress of that civilization were all but completely effaced. Where its development had been fullest, e.g., in Italy and Gaul, all was ruin, squalor, dissolution."

"খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতাব্দী থেকে নিয়ে ১০ম শতাব্দী পর্যন্ত য়ূরোপে গভীর অন্ধকার ছেয়ে ছিল এবং তা ক্রমশ অধিক গভীর ও ভয়াবহ হয়েই চলেছিল। তখনকার ভয়-ভীতি ও বর্বরতা ছিল প্রাচীনকালের ভয়-ভীতি ও বর্বরতার চেয়েও কয়েক গুণ বেশি। কেননা এর উদাহরণ ছিল এক বিরাট সভ্যতার লাশের যে লাশ পচে ও গলে গিয়েছিল। সেই সভ্যতার চিহ্নাদি লোপ পাচ্ছিল এবং তার ওপর ধ্বংসের মোহর লেগেছিল। সে সমস্ত দেশ যেখানে এই সভ্যতা ও সংস্কৃতি চরম উৎকর্ষ লাভ করেছিল যেমন ইটালী, ফ্রান্স, সেখানে ধ্বংসের তাণ্ডব, অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলারই রাজত্ব চলছিল।"[২]

য়াহূদী জাতিগোষ্ঠী

য়ূরোপ, এশিয়া ও আফ্রিকায় বসতি স্থাপনকারী য়াহূদী নামক জাতিগোষ্ঠী দুনিয়ার তাবৎ জাতিগোষ্ঠীর ভেতর এদিক দিয়েও অনন্য ছিল যে, তাদের নিকট দীন (ধর্ম)-এর এক বিরাট বড় পুঁজি ছিল এবং তাদের মধ্যে ধর্মীয়

1. A shorf History of the World vol. vii-p.170.
2. Robert Brifault, The Making of Humanitv. v. p. 164.

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও পরিভাষাসমূহ অনুধাবনের সর্বাধিক যোগ্যতা ছিল। কিন্তু এই য়াহূদীরা ধর্ম, সভ্যতা-সংস্কৃতি ও রাজনীতির ক্ষেত্রে সেই মর্যাদার অধিকারী ছিল না যাতে তারা অন্যদের ওপর প্রভাব ফেলতে পারে, বরং অন্যেরা তাদেরকে শাসন করবে, সর্বদা তারা অন্যের জুলুম-নিপীড়ন সইবে, নানা রকম শাস্তি ও নির্যাতন ভোগ করবে, বিবিধ প্রকারের কঠোরতা ও ভয়-ভীতির শিকার হবে, এটাই ছিল তাদের ভাগ্যলিপি। দীর্ঘকাল ধরে গোলামি জীবন যাপন এবং নানা ধরনের কঠোরতা ও শাস্তি ভোগের দরুন তাদের মধ্যে এক বিশেষ ধরনের মানসিকতা সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল। জাতিগত অহমিকা, গোত্রীয় ও বংশগত অহংকার, ধন-সম্পদের প্রতি সীমাতিরিক্ত লোভ-লালসা, অব্যাহত সুদী কারবারের দরুন বিশেষ ধরনের চরিত্র ও মানসিকতা, জাতিগত অভ্যাস ও স্বভাব সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল এবং এক্ষেত্রে তাদের কোন জুড়ি ছিল না। দুর্বল ও বিজিত অবস্থায় লাঞ্ছিত ও অপদস্ত হওয়া ও বিজয়ী জাতিকে খোশামোদ-তোষামোদ করা আর বিজয়ী হতেই বিজিত জাতির সঙ্গে অত্যন্ত নিষ্ঠুর আচরণ এবং সাধারণ অবস্থায় প্রতারণা, শঠতা, মোনাফেকী, সংকীর্ণ মনোবৃত্তি ও স্বার্থপরতা, বিনা পয়সায় অপরের শ্রমের ফসল ভোগ, হারামখোরী, সত্যের পথে লোকদের বাধা প্রদান তাদের জাতীয় বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কুরআনুল করীম ষষ্ঠ ও সপ্তম শতাব্দীতে তাদের এই অবস্থার খুবই খোলাখুলি ও পূর্ণাঙ্গ ছবি এঁকেছে এবং বলেছে যে, নৈতিক অবনতি, মানবিক অধঃপতন ও সামাজিক অনাচার-অরাজকতার মধ্যে তারা কোন্ স্তরে অবস্থান করছিল এবং কোন্ ও কী কারণে তারা চিরদিনের জন্য বিশ্বের নেতৃত্ব ও পৃথিবীর তাবৎ জাতিগোষ্ঠীর ওপর কর্তৃত্ব করবার অধিকার হারাল।

খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষ ভাগে য়াহূদী ও খ্রিস্টানদের পারস্পরিক ঘৃণা ও শত্রুতা এমন এক পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছিল যে, এদের এক পক্ষ অপর পক্ষকে লাঞ্ছিত, অপমানিত ও হেনস্তা করতে, প্রতিপক্ষ থেকে আপন জাতিগোষ্ঠীর প্রতিশোধ নিতে এবং বিজিত পক্ষের সঙ্গে অমানবিক আচরণ করতে কোন রকম কসুর করত না। ৬১০ খ্রিস্টাব্দে য়াহূদীরা এন্টিয়কে খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। সম্রাট ফোকাস এই বিদ্রোহ দমনের উদ্দেশে বিখ্যাত সমর অধিনায়ক বোনোসূস (Bonosus)-কে প্রেরণ করেন। তিনি গোটা য়াহূদী বসতিকে এভাবে উচ্ছেদ করেন যে, হাজার হাজার য়াহূদীকে তলোয়ারের মুখে নিক্ষেপ করে, শত শত লোককে নদীবক্ষে ডুবিয়ে ও আগুনে পুড়িয়ে এবং আরও বহু লোককে হিংস্র পশুর মুখে নিক্ষেপ করে শেষ করেন। ৬১৫ খ্রিস্টাব্দে ইরানীরা যখন শাম দেশ (সিরিয়া, লেবানন, জর্দান ও ফিলিস্তীনসহ বিস্তীর্ণ ভূভাগ। এখন থেকে আমরা শাম-এর পরিবর্তে সিরিয়া ব্যবহার করব। -আনুবাদক) জয় করে তখন

য়াহূদীদের পরামর্শ ও প্ররোচনায় সম্রাট খসরূও খ্রিস্টানদের ওপর বর্বরোচিত অত্যাচার চালান এবং অধিকাংশ খ্রিস্টানকে হত্যা করেন। ইরানীদের ওপর বিজয় লাভের পর সম্রাট হেরাক্লিয়াস আহত ও নিপীড়িত খ্রিস্টানদের পরামর্শে ৬৩০ খ্রিস্টাব্দে য়াহূদীদের থেকে ভীষণ প্রতিশোধ গ্রহণ করেন এবং তাদেরকে এমনভাবে কচুকাটা করেন যে, গোটা রোমক সাম্রাজ্যে কেবল সেই সব য়াহূদীই প্রাণরক্ষায় সমর্থ হয়েছিল যারা দেশ থেকে পালাতে কিংবা কোথাও আত্মগোপন করতে সক্ষম হয়েছিল।[১] খ্রিস্টীয় সপ্তম শতাব্দীর বিরাজমান এই দুই মহান ধর্মের অনুসারীদের এই নৃশংসতা, বর্বরতা ও রক্তপিয়াসী মানসিকতার কাছে কি এ আশা করা যেত যে, তাদের শাসনামলে তারা মানবতার রক্ষক হিসেবে নিজেদেরকে প্রমাণ করবেন এবং সত্য, সুবিচার, শান্তি ও সমঝোতার পয়গাম দুনিয়াবাসীকে শোনাবেন?

ইরান ও সেখানকার ধ্বংসাত্মক আন্দোলনসমূহ

সভ্য দুনিয়ার কর্তৃত্ব ও নেতৃত্বের ব্যাপারে ইরান ছিল রোম সাম্রাজ্যের অংশীদার। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সে ছিল মানবতার শত্রুগোষ্ঠীর তৎপরতার পুরনো লীলাভূমি। সেখানে নৈতিক চরিত্রের ভিত্তি বহুকাল থেকেই নড়বড়ে অবস্থায় চলে আসছিল। যে সব আত্মীয়ের সঙ্গে দাম্পত্য সম্পর্ক স্থাপনকে পৃথিবীর সভ্য ও ভারসাম্যপূর্ণ এলাকার বাসিন্দাগণ সর্বদাই অননুমোদিত ও বেআইনী মনে করে এসেছে এবং প্রকৃতিগতভাবে ঘৃণা করে থাকে– ইরানীরা সেসব সম্পর্ককে ঘৃণ্য ও অবৈধ বলে স্বীকার করত না। সম্রাট ২য় ইয়াযদাগির্দ, যিনি ৫ম শতাব্দীর মাঝামাঝি রাজত্ব করেছিলেন, আপন কন্যাকে বিবাহ করেন, অতঃপর তাকে হত্যা করেন।[২] খ্রি. ষষ্ঠ শতাব্দীর শাসক বাহরাম চূবীন আপন বোনের সঙ্গে দাম্পত্য সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন।[৩] অধ্যাপক আর্থার ক্রিস্টিনসেন-এর বর্ণনা মুতাবিক ইরানে এ জাতীয় সম্পর্ককে কোন রকম অবৈধ কাজ বলে মনে করা হতো না, বরং একে ইবাদত ও পুণ্য কর্ম মনে করা হতো। বিখ্যাত চীনা পর্যটক হিউয়েন সাঙ বর্ণনা করেন যে, ইরানী আইনে ও সমাজে দাম্পত্য সম্পর্ক স্থাপনের জন্য কোন প্রকার সম্পর্কের বাছ-বিচার ছিল না।[৪]

খ্রি. ৩য় শতাব্দীতে দুনিয়ার বুকে মানীর আবির্ভাব ঘটে। তার আন্দোলন ছিল বস্তুতপক্ষে দেশের ক্রমবর্ধমান তীব্র যৌনপ্রবণতার বিরুদ্ধে এক অস্বাভাবিক ও প্রচণ্ড প্রতিক্রিয়া এবং আলো ও আঁধারের মনগড়া দ্বন্দ্বের (যা ছিল ইরানের প্রাচীন

১. বিস্তারিত জানতে চাইলে দ্র. কিতাব আল-খুতাতু'ল মাকরীযিয়্যা; ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩৯২ এবং The Arabs conquest of Egypt. p. 133-34.
২. Historion's History of the World. vol. viii-p.84.
৩. তাবারী, ৩ খণ্ড, ১৩৮; ৪. সাসানী আমলে ইরান, ৪৩০ পৃ.।

দর্শন) ফলশ্রুতিস্বরূপ। অনন্তর মানী চিরকুমার জীবন অবলম্বনের আহ্বান জানান যাতে দুনিয়া থেকে যাবতীয় মন্দ ও অন্যায়-অনাচারের জীবাণু নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। তিনি এই দার্শনিক ঘোষণা দিয়েছিলেন যে, আলো ও আঁধারের মিশ্রণই যাবতীয় অনাসৃষ্টির কারণ। এর হাত থেকে মুক্তি পাওয়া দরকার। এরই ভিত্তিতে তিনি বিয়েকে হারাম ও নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন যাতে করে মানুষ যথাসত্বর নিঃশেষ হয়ে যায় এবং এভাবে মানব জাতির অবলুপ্তির মাধ্যমে আলো অন্ধকারের ওপর চিরস্থায়ী বিজয় লাভ করে। বাহ্রাম ২৭৬ খ্রিস্টাব্দে মানীকে এই বলে হত্যা করেন যে, এই লোকটি বিশ্বের ধ্বংসের আহ্বান জানাচ্ছে। এজন্য দুনিয়া খতম হবার আগে এবং তার উদ্দেশ্য পূর্ণ হবার পূর্বে তার নিজেরই ধ্বংস হয়ে যাওয়া উচিত। কিন্তু মানী ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা নিহত হওয়া সত্ত্বেও তার প্রচারিত শিক্ষা বহু দিন যাবত বেঁচে ছিল এবং মুসলিম বিজয়ের পরেও এর প্রভাব অবশিষ্ট ছিল।

ইরানের পতিত ও অনাবাদী প্রকৃতি আরেকবার মানীর প্রকৃতি বিরোধী শিক্ষামালার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। এই বিদ্রোহ মাযদাক (জন্ম ৪৮৭ খ্রি.) -এর দাওয়াতরূপে আবির্ভূত হয়। মাযদাক ঘোষণা করলেন যে, তামাম মানবগোষ্ঠী অভিন্নভাবে জন্মগ্রহণ করেছে। তাদের ভেতর কোন পার্থক্য নেই। অতএব প্রত্যেকেরই অপরের মালিকানায় সমঅধিকার রয়েছে। আর যেহেতু সম্পদ ও নারীই এমন দুটো উপাদান যার নিরাপত্তা ও রক্ষণাবেক্ষণ মানুষ যত্নের সাথে করে থাকে তাই এই দুটো ক্ষেত্রে সাম্য ও সমশরীকানা সর্বাধিক প্রয়োজন। শাহরাস্তানীর ভাষায় ঃ মাযদাক মহিলাদেরকে সকলের জন্য বৈধ সাব্যস্ত করেন এবং বিত্ত-সম্পদ ও নারী আগুন, পানি ও ঘাসের মত সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত ও ব্যবহারযোগ্য ঘোষণা দেন।[১]

যুবক ও ভোগলিপ্সু বিলাসপ্রিয় লোকেরা এই ঘোষণায় যেন হাতে স্বর্গ পেল। ফলে এই ঘোষণা সত্বরই আন্দোলনে পরিণত হলো। তারা এই আন্দোলনকে সোৎসাহে অভিনন্দন জানাল। মজার ব্যাপার এই যে, ইরান সম্রাট কুবায স্বয়ং এর নেতৃত্ব গ্রহণ করেন এবং এর প্রচার ও প্রসারে বিরাট তৎপরতার পরিচয় দেন। ফল দাঁড়াল এই যে, এই আন্দোলন সর্বত্র দাবানলের মত ছড়িয়ে পড়ল। সমগ্র ইরান এই যৌন অনাচার ও অরাজকতার প্লাবনে নিমজ্জিত হলো। ঐতিহাসিক তাবারানীর ভাষায় ঃ

"ভবঘুরে, মস্তান ও বখাটে প্রকৃতির লোকেরা একে দুর্লভ সুযোগ মনে করল এবং মাযদাক ও মাযদাকীদের উৎসাহী সাথী ও সমর্থকে পরিণত হলো। সাধারণ

১. আল-মিলাল ওয়ান-নিহাল, শাহরাস্তানীকৃত; ২য় খণ্ড, ৮৬।

নাগরিকগণ এই আকস্মিক দুর্যোগের শিকার ছিল। এই আন্দোলন এতটা শক্তি সঞ্চয় করে যে, যে চাইত, যার ঘরে চাইত ঘরের মাল-মাত্তা ও মহিলাদেরকে ভোগ-দখল করত। বাড়ির মালিক কিছুই করতে পারত না। মাযদাকীরা সম্রাট কুবাযকে প্ররোচিত করে এবং তাকে প্রয়োজনে পদচ্যুত করার হুমকি প্রদর্শন করে যাতে করে সম্রাট এই আহবানে নিজেও সাড়া দেন। ফল দাঁড়াল এই যে, দেখতে না দেখতেই এমন অবস্থা হলো যে, বাপ তার সন্তানকে যেমন চিনতে পারত না, তেমনি সন্তান চিনতে পারত না তার বাপকে। কারোরই কারোর মালিকানাধীন জিনিসের ওপর নিয়ন্ত্রণ ছিল না, দখল ছিল না।[১]

ঐতিহাসিক তাবারীর বর্ণনা, "এই আন্দোলনের পূর্বে সম্রাট কুবায ইরানের সর্বোত্তম শাসকদের অন্যতম ছিলেন। কিন্তু মাযদাকের আনুগত্যের দরুন রাষ্ট্রীয় সীমায় ও সীমান্তে অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়ে।"[২]

ইরানের সম্রাটপূজা

ইরানের রাজা-বাদশাহগণ যাদের উপাধি ছিল কিসরা (খুসরাও), দাবি করত যে, তাদের শিরা-উপশিরায় খোদায়ী রক্ত প্রবাহিত। ইরানের জনগণও তাদেরকে সেই নজরেই দেখত যেন তাদের সম্রাটই তাদের খোদা। তাদের বিশ্বাস ছিল যে, তাদের ঐসব সম্রাটের প্রকৃতিতে একটি পবিত্র আসমানী বস্তু রয়েছে। অনন্তর এসব লোক তাদের সম্রাটকে সিজদা করত এবং তাদের ওপর উলূহিয়াত তথা ঈশ্বরত্ব আরোপ করে তাদের জয়গান গাইত। তারা তাদেরকে আইনের কোন প্রকার সমালোচনার, এমন কি মানবত্বের ঊর্ধ্বে বলে জ্ঞান করত। ভক্তির আতিশয্যে সম্রাটের নাম তারা মুখে আনত না। কেউ তাদের দরবার কিংবা মজলিসে বসতেও সাহস করত না। ইরানের জনগণের বিশ্বাস ছিল যে, ঐসব সম্রাটের প্রত্যেক মানুষের ওপর জন্মগত অধিকার রয়েছে, কিন্তু অন্য কারো সম্রাটের ওপর অধিকার নেই। কোন সম্রাট তার সম্পদের থেকে কাউকে কিছু দিলে কিংবা দস্তরখান থেকে এক টুকরো কাউকে প্রদান করলে এটা একান্ত তার দয়া ও বদান্যতা; কারুর কিছু দাবি করার অধিকার নেই। নির্দেশ পালন ছাড়া জনগণের আর কোন অধিকার নেই। দেশ ও জাতির ওপর শাসন দণ্ড পরিচালনার জন্য একটি বিশেষ পরিবারের (কায়ানী পরিবার) একচেটিয়া অধিকার ছিল। ইরানের জনগণ মনে করত যে, কেবল ঐ পরিবারের লোকেরাই সিংহাসনের উত্তরাধিকারী এবং সাম্রাজ্যের কেবল তারাই মালিক হতে পারেন। আর এই অধিকার উত্তরাধিকারসূত্রে পিতা থেকে পুত্রে পর্যায়ক্রমে হস্তান্তরিত হতে থাকবে। এতে কারোর হস্তক্ষেপ করার কোন অধিকার নেই। অনন্তর জনগণ সমকালীন

১. তারীখে তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৮৮। ২. .প্রাগুক্ত।

সম্রাটের ওপর ঈমান রাখত এবং হুকুমতকে শাহী খান্দানের মৌরছী অধিকার মনে করত, যে অধিকারে নাক গলাবার ক্ষমতা কারোর ছিল না। যদি ঐ পরিবারে কোন প্রবীণ ও বয়স্ক লোক না পাওয়া যেত তাহলে অপ্রাপ্তবয়স্ক কোন শিশুকেই নিজেদের সম্রাট হিসেবে মেনে নিত। যদি পুরুষ না পাওয়া যেত তবে কোন মহিলাকেই রাজমুকুট পরিধান করানো হতো। অনন্তর শায়রূয়ার পর তার সাত বছর বয়স্ক পুত্র আর্দেশীরকে সম্রাট হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয় এবং একইভাবে খুসরাও (খসরু)-কে ও পারভেযের পুত্র ফররুখযাদ খুসরাও (খসরু)-কেও শিশুকালেই লোকেরা সম্রাট ঘোষণা দেয়। কিসরা কন্যা পুরান দখ্তও সিংহাসনে উপবেশন করেছিল। অপর কন্যা আযরমীদখ্তও সাম্রাজ্য পরিচালনা করেছিল।[১] কারোর কল্পনায়ও আসেনি যে, কোন সিপাহ্সালার কিংবা বড় সর্দার অথবা অপর কোন যোগ্য ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে (যেমন রুস্তম ও জাবান ছিলেন) সাম্রাজ্য পরিচালনার দায়িত্ব সোপর্দ করা যেতে পারে। যেহেতু শাহী পরিবারের সাথে তাদের সম্পর্ক ছিল না সেহেতু তাদের সম্পর্কে ভাবার প্রশ্নই ওঠেনি।

ধর্মীয় খান্দান এবং নেতৃস্থানীয় সর্দার ও সামন্ত প্রভুদের সম্পর্কে তাদের বিশ্বাস ছিল এই যে, এই সব লোক সাধারণ লোকের তুলনায় অনেক উচ্চ স্তরের। তাদের ব্যক্তিত্ব ও তাদের মন-মস্তিষ্ক অপরাপর মানুষের থেকে পৃথক। এইসব লোককে ইরানের লোকেরা সীমাহীন ক্ষমতা দিয়ে রেখেছিল। উঁচু-নীচুর পার্থক্য, শ্রেণী বৈষম্য ও বিভিন্ন পেশার বিভক্তি ইরানী সমাজ ও জীবন যাপন পদ্ধতির অনড় বিধান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত ছিল যার ভেতর পরিবর্তন ছিল অসম্ভব। অধ্যাপক আর্থার ক্রিস্টিনসেনের ভাষায় ঃ

সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে অনতিক্রম্য ব্যবধান ও দূরত্ব ছিল।[২] হুকুমতের পক্ষ থেকে সাধারণ জনগণের প্রতি এই নিষেধাজ্ঞা আরোপিত ছিল যে, তারা কোন আমীর-উমারার স্থাবর কিংবা অস্থাবর সম্পত্তি খরিদ করতে পারবে না।[৩] সাসানী রাজনীতির এই অপরিবর্তনীয় নীতি ছিল যে, কখনো কোন লোক জন্মসূত্রেপ্রাপ্ত মান-সম্মানের চাইতে বড় কোন কিছুর প্রত্যাশী হবে না।[৪] কোন লোকের পক্ষে তার জন্মগত পেশা পরিত্যাগ করে অন্য কোন পেশা গ্রহণ করা বৈধ ছিল না।[৫] পারস্য সম্রাটগণ হুকুমতের কোন কাজ কিংবা দায়িত্ব কোন নীচ শ্রেণী কিংবা বংশের লোকদের সোপর্দ করতেন না।[৬] সাধারণ গণমানুষের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে সুস্পষ্ট বৈষম্য ও ভেদ-রেখা ছিল। সমাজে সকলের একটি সুনির্ধারিত স্থান ছিল।[৭]

১. তারীখে তাবারী, ২য় খণ্ড ও তারীখে ইরান, ম্যাকারিয়াস ইরানীকৃত;
২-৭. সাসানী আমলে ইরান, পৃ. যথাক্রমে,৫৯০, ৪২০, ৪১৮, ৪২২, ৪২২ ও ৪২১;

ইরানীদের জাত্যাভিমান

ইরানের লোকেরা তাদের ইরানী জাতীয়তাকে সম্মান-সম্ভ্রম ও পবিত্রতার দৃষ্টিতে দেখত। নিজেদের সম্পর্কে তারা এই ভেবে বসেছিল যে, পৃথিবীর সকল জাতিগোষ্ঠী ও বংশ-গোত্রের ওপর এই জাতি ও বংশের মর্যাদাগত শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে এবং আল্লাহ্ তা'আলা তাদের এমন সব বিশেষ যোগ্যতা ও প্রকৃতিগত সামর্থ্য দান করেছেন যে ক্ষেত্রে তাদের কোন জুড়ি নেই। এরা তাদের চতুষ্পার্শ্বের জাতিগোষ্ঠীকে খুবই অবজ্ঞা ও ঘৃণার চোখে দেখত এবং তাদেরকে অবজ্ঞামূলক ও বিদ্রূপাত্মক নামে অভিহিত করত।

আগুন পূজা এবং মানব জীবনে এর প্রভাব

আগুন যেহেতু না পারে তার পূজারীদেরকে পথ প্রদর্শন করতে, আর না পারে দিক-নির্দেশনা দিতে, আর তার ভেতর এই শক্তিও নেই যে, সে তার পূজারীদের জীবন সমস্যার সমাধান দেবে, এ ব্যাপারে তার ভূমিকা পালন করবে এবং অপরাধী, পাপী ও হাঙ্গামাবাজদের প্রতিরোধ করবে। ফলে অগ্নিপূজকদের ধর্ম কতিপয় প্রথা-পদ্ধতি ও আচার-অনুষ্ঠানে পর্যবসিত হলো। ওসব অনুষ্ঠান বিশেষ বিশেষ কতকগুলো সময় ও বিশেষ বিশেষ কতক জায়গায় পালন করা হতো। উপাসনাগৃহের বাইরে নিজেদের ঘরে ও বাজারে, প্রভাবাধীন গণ্ডির ভেতর এবং রাজনৈতিক ও সামাজিক বিষয়াদিতে তারা ছিল একেবারেই স্বাধীন ও বল্গাহীন। তাদের মন যা চাইত তাই করত। তারা তাদের খেয়াল-খুশি মত কিংবা উপযোগিতা ও সময়ের দাবি মাফিক কাজ করত। প্রতিটি যুগে ও প্রতিটি দেশে সাধারণভাবে কাফির ও মুশরিকদের অবস্থা ছিল এরকমই।

মোটকথা, ইরানের লোকেরা এমন একটি পরিপূর্ণ ও সামগ্রিক দীন থেকে বঞ্চিত ছিল যা তাদের সংস্কার-সংশোধন করতে, তাদের নৈতিক চরিত্রকে পরিশুদ্ধ ও পরিশীলিত করতে, তাদের প্রবৃত্তিজাত কামনা-বাসনাকে সংযত এবং সুকুমার বৃত্তিসমূহকে উৎসাহিত ও উজ্জীবিত করতে পারত, যে দীন খানদানের জীবন ব্যবস্থা আর রাষ্ট্রের সংবিধানরূপে শাসকদের যবরদস্তি ও প্রশাসনের কর্মকর্তাদের জুলুম ও বাড়াবাড়ির প্রতিরোধ করতে, অত্যাচারী জালিমদের নিবৃত্ত করতে এবং মজলুমের অনুকূলে ন্যায় ও ইনসাফ করতে সমর্থ হতো। কিন্তু অগ্নিপূজারী ইরানীদের ভাগ্যে এমন একটি দীন জোটেনি যা ওপরেই উক্ত হয়েছে। আর তাই ইরানের অগ্নিপূজক এবং দুনিয়ার অপরাপর ধর্মহীন ও বল্গাহীন উচ্ছৃংখল লোকের ভেতর নৈতিক চরিত্র ও কর্মের দিক দিয়ে কোন পার্থক্য ছিল না।

বৌদ্ধ মতবাদ এবং এর পরিবর্তন ও বিকৃতি

বৌদ্ধ মতবাদ তার সহজ সারল্য ও আপন বৈশিষ্ট্য অনেক আগেই খুইয়ে ফেলেছিল। বৌদ্ধ ধর্ম ভারতবর্ষের ব্রাহ্মণ্য ধর্মকে এবং তার অবতার ও দেবতাসমূহকে আত্তীকরণ করে নিজের অস্তিত্বকেই হারিয়ে ফেলেছিল। গুস্তাভ-লী-বন তমদ্দুন-ই হিন্দ বা Indian Civilisation নামক গ্রন্থে এমত মতই প্রকাশ করেছেন। ব্রাহ্মণ্যবাদ তাকে হজম করে আত্তীকরণ করে ফেলেছিল। যা-ই হোক, দীর্ঘ কাল থেকে পরস্পরের প্রতিপক্ষ হিসেবে চলে আসা এই দুটো ধর্ম একাকার হয়ে গিয়েছিল। বৌদ্ধমতবাদ মূর্তি পূজার ধর্মের রূপ পরিগ্রহ করে। যেসব দেশেই এই ধর্মের অনুসারীরা গেছে সেখানেই তারা মূর্তি সাথে নিয়ে গেছে এবং যেখানেই যেত সেখানেই যে কাজটি তারা সর্বপ্রথম করত তা হলো গৌতম বুদ্ধের মূর্তি স্থাপন এবং তার প্রতিকৃতি ও প্রতিমূর্তি তৈরিকরণ। তাদের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক জীবন ঐসব প্রতিমূর্তি ও প্রতিকৃতি দ্বারা ঢাকা দেখতে পাওয়া যায়।[১]

এসব প্রতিমূর্তি ও প্রতিকৃতি বেশির ভাগ বৌদ্ধ মতবাদের উৎকর্ষের যুগেই নির্মিত হয়েছিল। অধ্যাপক ঈশ্বর টোপা তদীয় 'ভারতীয় সংস্কৃতি' (হিন্দুস্তানী তমদ্দুন) নামক গ্রন্থে বলেন ঃ

"বৌদ্ধ মতবাদ (ধর্ম)-এর ছত্রছায়ায় এমন রাজত্ব কায়েম হয় যার ভেতর অবতারের ছড়াছড়ি এবং মূর্তিপূজার অবাধ রাজত্ব ও কর্তৃত্ব দেখা যেতে লাগল। সংঘসমূহের পরিবেশ পরিবর্তিত হয়ে তার ভেতর ধর্মের নামে নিত্য-নতুন প্রথা-পদ্ধতি একের পর এক দৃষ্টিগোচর হতে থাকল।"[২]

পণ্ডিত জওয়াহের লাল নেহরু তাঁর The Discovery of India গ্রন্থে বৌদ্ধ মতবাদের বিকৃতি ও ক্রমাবনতির বর্ণনা দিতে গিয়ে লিখেছেন ঃ

"ব্রাহ্মণ্যবাদ বুদ্ধকে অবতার বানিয়েছিল। বৌদ্ধ মতবাদও তাই করল। সংঘ খুবই সম্পদশালী হয়ে ওঠে এবং গোষ্ঠীর বিশেষ স্বার্থসিদ্ধির আখড়ায় পরিণত হয়। সংঘের ভেতর নিয়ম-শৃঙ্খলার কোন বালাই ছিল না। উপাসনা পদ্ধতির মধ্যে যাদু ও নানারূপ অলীক কল্পনার অনুপ্রবেশ ঘটে এবং ভারতবর্ষে সহস্র বর্ষব্যাপী নিয়ম মাফিক চালু থাকার পর বৌদ্ধ মতবাদের অবনতি শুরু হয়।" এই সময় তার যে রোগাক্রান্ত অবস্থা বিরাজ করছিল তার বর্ণনা দিতে গিয়ে Mrs. Rhys Davids বলেন ঃ

---

১ .বৌদ্ধ ধর্মের প্রাচীন রাজধানী তক্ষশীলার যাদুঘর পরিদর্শনকারী একজন দর্শক ঐসব মূর্তি ও প্রতিমূর্তি (পরবর্তী পৃষ্ঠা দ্র.)

২. ঈশ্বর টোপাকৃত হিন্দুস্তানী তমদ্দুন (উর্দু)'।

"এসব রোগাক্রান্ত কল্পনাপ্রবণতার গভীর ছায়ার নীচে পড়ে গৌতম বুদ্ধের নৈতিক শিক্ষা দৃষ্টির আড়ালে হারিয়ে যায়, একটি দৃষ্টিভঙ্গি ও আদর্শের জন্ম ঘটে এবং তা বিস্তার লাভ করে। এরপর তদস্থলে আরেকটি ধারণা জন্ম নেয়। অতঃপর পদে পদে এক একটি নতুন দৃষ্টিভঙ্গি জন্ম নিতে থাকে, এমন কি গোটা পরিবেশের মধ্যে মস্তিষ্কপ্রসূত এই ধূম্রজাল ছেয়ে যায় এবং বৌদ্ধ ধর্মের উদ্‌গাতার সহজ সরল ও সমুন্নত নৈতিক শিক্ষা ঐসব কাল্পনিক সূক্ষ্ম জটাজালের নিচে চাপা পড়ে যায়।[১] সামগ্রিকভাবে বৌদ্ধ মতবাদ ও ব্রাহ্মণ্যবাদ ছিল পতনোন্মুখ এবং এগুলোর মধ্যে অনেক নীচ জাতীয় প্রথার অনুপ্রবেশ ঘটেছিল। ফলে এ দু'টির মধ্যে পার্থক্য করা বেশ কঠিন হয়ে পড়ে। বৌদ্ধ মতবাদ ব্রাহ্মণ্যবাদের সঙ্গে একীভূত হয়ে গিয়েছিল।"[২]

মোদ্দাকথা, চীনসহ বৌদ্ধ মতবাদের অনুসারীদের কাছে বিশ্বের জন্য দেবার মত কোন পয়গাম ছিল না যার আলোকে গোটা বিশ্ব তার সমস্যাবলীর সমাধান খুঁজতে পারে এবং আল্লাহপ্রদত্ত সহজ-সরল রাস্তা পেতে পারে। চীনারা সভ্য দুনিয়ার একেবারে পূর্ব প্রান্তে নিজেদের তাত্ত্বিক ও ধর্মীয় উত্তরাধিকারকে আঁকড়ে ধরে ছিল যাদের মধ্যে না ছিল নিজেদের বাড়তি কিছু পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা আর না ছিল অন্যদের ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধতর করার কোনরূপ যোগ্যতা।

মধ্যএশিয়ার বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী

পূর্ব ও মধ্য এশিয়ার অপরাপর জাতিগোষ্ঠী (যেমন মুগল, তুর্ক, জাপানী প্রভৃতি) বিকৃত বৌদ্ধ মতবাদ ও বর্বরতাপূর্ণ মূর্তিপূজার মাঝে অবস্থান করছিল। তাদের কাছে না ছিল জ্ঞানগত কোন সম্পদ আর না ছিল কোন উন্নত রাজনৈতিক

(পূর্ব পৃষ্ঠার পর) পরিদর্শনের পর বিস্ময়াভিভূত হয়ে পড়েন যা বৌদ্ধ ধর্মের মাটির নিচে চাপাপড়া শহর সমূহ খননের পর আবিষ্কৃত হয়েছে। এ থেকে জানা যায় যে, এই ধর্ম ও সভ্যতা নির্ভেজাল মূর্তি পূজার ধর্ম ও সভ্যতায় পরিণত হয়ে গিয়েছিল। গুস্তাভ লী বোঁ ভারতবর্ষে বৌদ্ধ প্রাসাদ, দালান-কোঠা ও স্মৃতিস্তম্ভসমূহ দৃষ্টে এমত সিদ্ধান্তেই উপনীত হয়েছেন। তিনি তদীয় ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতি নামক গ্রন্থে বলেন ঃ

আসল বৌদ্ধ ধর্ম সম্পর্কে অবহিত হওয়া ও উপলব্ধি করবার জন্য এই ধর্মের গ্রন্থাদি নয়, বরং স্মারক চিহ্নসমূহ অধ্যয়ন করা আবশ্যক। স্মারক চিহ্নসমূহ থেকে যেই শিক্ষা আমরা পাই তা পুস্তক থেকে প্রাপ্ত যা য়ূরোপীয় লেখকগণ শেখানো শিক্ষা থেকে একেবারেই পৃথক। এসব স্মারক চিহ্ন প্রমাণ দেয় যে, যে ধর্মকে য়ূরোপীয় পণ্ডিতগণ ইলহাদী তথা খোদাদ্রোহী ধর্ম বলেন বাস্তবে তা মূর্তিপূজা ও বহু উপাস্যের ধর্মের শিরোমণি। (তমদ্দুনে হিন্দ. পৃ. ২৬৫)

১. Discovery of India, P. 201, 203.

২. প্রাগুক্ত;

ব্যবস্থা ও নীতিমালা। আসলে এসব জাতিগোষ্ঠী একটি মধ্যবর্তীকাল অতিক্রম করছিল । তারা মূর্খতাসর্বস্ব মূর্তিপূজা থেকে বেরিয়ে সবেমাত্র সভ্যতার দিকে অগ্রসর হচ্ছিল এবং কয়েকটি জাতিগোষ্ঠী এমনও ছিল যারা সে সময় পর্যন্ত নগর সভ্যতা ও নগর জীবনের একেবারেই প্রাথমিক পর্যায়ে অবস্থান করছিল।

ভারতবর্ষ ঃ ধর্মীয়, সামাজিক ও নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে

ভারতবর্ষের ঐতিহাসিকগণ এ বিষয়ে একমত যে, খ্রিস্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দী থেকে যেই যুগ শুরু হলো তা ধর্মীয়, সামাজিক ও নৈতিক দিক দিয়ে এই দেশের ইতিহাসের, (যা কোনকালে জ্ঞান-বিজ্ঞান, সভ্যতা-সংস্কৃতি ও নৈতিক আন্দোলনের কেন্দ্র ছিল) সর্বাপেক্ষা অধঃপতিত ও অন্ধকারতম যুগ ছিল। পার্শ্ববর্তী দেশগুলোতে বিরাজমান সামাজিক ও নৈতিক অবক্ষয় থেকে এই দেশটি কারোর চেয়ে পিছিয়ে ছিল না। এছাড়া এই দেশটির কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য ছিল অনন্য। এই বৈশিষ্ট্যগুলোর সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য হলোঃ ১. দেবদেবীর সংখ্যাধিক্য; ২ . যৌন উচ্ছৃংখলা; ৩. জাতিভেদ ও শ্রেণী বৈষম্য।

খ্রিস্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে মূর্তিপূজার ছিল রমরমা অবস্থা। বেদে দেবতাদের সংখ্যা ছিল মাত্র ৩৩, ঐ শতাব্দীতে এই সংখ্যা ক্রমান্বয়ে ৩৩ কোটিতে উন্নীত হয়। এই যুগে পসন্দনীয় বস্তু, আকর্ষণীয় জিনিস, প্রয়োজন পূরণে সক্ষম বস্তু মাত্রই পূজ্য দেবতায় পরিণত হয়। ফলে তাদের পূজ্য মূর্তি. প্রতিকৃতি, দেবতা ও দেবদেবীর সংখ্যার কোন ইয়ত্তা ছিল না। এসব দেবতা ও পূজ্য বস্তুর মধ্যে খনিজ দ্রব্য, জড় বস্তু, বৃক্ষাদি, উদ্ভিদরাজি, পাহাড়-পর্বত, নদ-নদী, জীব-জন্তু, এমন কি যৌনাঙ্গও শামিল ছিল। আর এভাবে এই প্রাচীন ধর্ম গল্পলোকের কল্পকাহিনী, আকীদা-বিশ্বাস ও পূজা-অর্চনার একটি দেব-উপাখ্যানে পরিণত হয়। ড. Gustave le Bon তাঁর Les Civilisations de la Inde নামক গ্রন্থে লিখছেনঃ

"The Hindu, of all people, stands most unavoidably in the need of visible objects for religious worship, and although at different times religious reformers have tried to prove monotheism in the Hindu faith, it has been an unavailing effort. From the Vedic Age to the present day, the Hindu has been worshipping all sorts of things. Whatever he cannot understand or control is worthy of being adored as divine in his eyes. All attempts of Brahmans and other Hindu reformers in the direction of monotheism or in limiting the number of gods to three have been utterly unsuccessful. The

Hindus listened to them, and sometimes even accepted their teachings in principle, but in practice the three gods went on multiplying till they began to see a god in every article and phenomenon of nature."

"দুনিয়ার তাবৎ জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে হিন্দু এমন একটি জাতি যাদের পূজায় বাহ্যিক একটা না একটা অবয়ব থাকতেই হবে। যদিও বিভিন্ন যুগে ধর্মীয় সংস্কারকগণ হিন্দু ধর্মে একত্ববাদ রয়েছে বলে প্রমাণ করতে চেয়েছেন, কিন্তু তাদের এই প্রয়াস একেবারেই নিষ্ফল। হিন্দুদের নিকট বৈদিক যুগেই হোক আর বর্তমানকালেই হোক, প্রতিটি বস্তুই অবোধ্য ও অপ্রতিরোধ্য আরাধ্য উপাস্য। ব্রাহ্মণ ও দার্শনিক পণ্ডিতদের কেবল একত্ববাদ প্রতিষ্ঠার সকল প্রয়াসই নয়, বরং তাদের সেই সমস্ত প্রয়াসও যা তারা দেবদেবীর সংখ্যা কমিয়ে তিনে আনার জন্যে চালিয়েছে তা পণ্ডশ্রমে পর্যবসিত হয়েছে। সাধারণ মানুষ তাদের শেখানো কথা শুনেছে এবং কবুল করেছে, কিন্তু কার্যত এতে করে তাদের দেবতার সংখ্যা হ্রাস পায় নি, বরং তা বৃদ্ধিই পেয়েছে এবং প্রতিটি রঙ, রূপ, বর্ণ ও গন্ধের মধ্যে তারা তাদের অবতার দেখতে পেয়েছে।"[১]

খ্রি. ৬ষ্ঠ ও ৭ম শতাব্দীতে মূর্তি নির্মাণ শৈলীর বিরাট অগ্রগতি ঘটে। এই যুগে এই শিল্প উন্নতির চরম শীর্ষে উপনীত হয়। গোটা দেশ জুড়েই ছিল মূর্তিপূজার রমরমা অবস্থা। শেষ অবধি বৌদ্ধ মতবাদ ও জৈন ধর্ম সাধারণ জনগণের চাহিদার সামনে মস্তক অবনত করতে ও তাদের সুরে সুর মেলাতে বাধ্য হয় এবং নিজেদের অস্তিত্ব ও গ্রহণযোগ্যতা বজায় রাখতে তাদের কাছে নতি স্বীকার করতে হয়। মূর্তিপূজার এই চরমোৎকর্ষ এবং মূর্তি ও প্রতিকৃতির আধিক্যের পরিমাপ প্রখ্যাত চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ (যিনি ৬৩০ থেকে ৬৪৪ খ্রিস্টাব্দের মধ্যবর্তী সময়ে ভারতবর্ষ ভ্রমণ করেছিলেন)-এর বর্ণনা থেকেই করা যাবে যেখানে তিনি রাজা হর্ষবর্ধনের (৬০৬-৭ খ্রি.) উৎসবের বর্ণনা দিতে গিয়ে লিখেছেন ঃ

সম্রাট হর্ষবর্ধন কনৌজে ধর্মীয় পণ্ডিতদের একটি সম্মেলন আহ্বান করেন। পঞ্চাশ হাত উঁচু স্তম্ভের ওপর গৌতম বুদ্ধের স্বর্ণ নির্মিত মূর্তি স্থাপন করা হয়। এর চেয়ে ক্ষুদ্রকায় আরেকটি মূর্তির বিরাট ধুমধামের সাথে শোভাযাত্রা বের করা হয় যার মধ্যে সম্রাট হর্ষবর্ধন সকর দেবতার পোশাকে ছত্রদণ্ড বহন করেন এবং তাঁর মিত্র রাজা কামরূপ অধিপতি কুমারা পাখা দুলিয়ে মাছি তাড়ানোর দায়িত্ব পালন করেন।[২]

---

১. তমদ্দুন-ই হিন্দ পৃ. ৪৪০-৪১

২. হিউয়েন সাঙ-এর সফরনামা।

হিউয়েন সাঙ সম্রাট হর্ষবর্ধনের পরিবার-পরিজন ও দরবারীদের সম্পর্কে লিখেছেন যে, তাদের কেউ ছিল শিব পূজারী , আবার কেউ কেউ বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষিত হয়। কেউ বা সূর্য দেবতার পূজা করত, কেউ করত বিষ্ণু পূজা। কে কোন্ দেবতা বা দেবীর পূজা করবে, নাকি সবক'টি দেবদেবীর পূজা করবে, এ ব্যাপারে তাদের পূর্ণ স্বাধীনতা ছিল।[১]

যৌন অরাজকতা

যৌন আবেগ ও যৌনপ্রবণতাকে উস্কানি দানকারী উপাদান ধর্মীয়রূপে যতটা ভারতবর্ষের প্রাচীন ধর্ম ও সংস্কৃতিতে দেখতে পাওয়া যায় ততটা পৃথিবীর আর কোন দেশে পাওয়া যায় না। দেশের পবিত্র গ্রন্থসমূহ ও ধর্মীয় মহলগুলো গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী এবং সৃষ্টি ও জন্মের কার্যকারণ বিশ্লেষণ, দেবতা ও দেব-দেবীদের সঙ্গম, সহবাস এবং কোন কোন সম্ভ্রান্ত পরিবারের এমন সব ঘটনা ও বর্ণনা বিবৃত করেছে যা শুনলে লজ্জায় মাথা নীচু ও কপাল ঘর্মাক্ত হয়ে পড়ে। বড়ই নিষ্ঠা ও ভক্তিসুলভ আবেগের সাথে উল্লিখিত কাহিনীগুলো পুনরাবৃত্তিকারীর সহজ সরল ধর্মপরায়ণ লোকদের ওপর যে প্রভাব পড়ে তা সহজেই অনুমেয়। তাদের মনের অজান্তেই তাদের স্নায়ু ও আবেগের ওপর এসব বর্ণিত কাহিনীর যে প্রভাব পড়ে থাকবে তা বলাই বাহুল্য। এতদ্ভিন্ন বড় দেবতা শিবের লিঙ্গের পূজা হতো এবং শিশু-যুবা ও নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলেই এতে অংশ গ্রহণ করত। ডক্টর গুস্তাভ-লীবন-এর গুরুত্ব ও এরই সাথে ভারতবাসীদের এর প্রতি আকর্ষণ সম্পর্কে উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন ঃ মূর্তি ও বাহ্যিক প্রতীকের প্রতি হিন্দুদের আকর্ষণ ও অনুরাগ সীমাহীন। তাদের ধর্ম যা-ই হোক, তার অনুষ্ঠানাদি তারা অত্যন্ত যত্ন ও নিষ্ঠার সাথে পালন করে। তাদের মন্দিরগুলো আরাধ্য সামগ্রী দ্বারা পরিপূর্ণ থাকে। এসবের মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য হলো 'লিঙ্গ' ও 'যোনী' যা প্রজননেরই ইঙ্গিতবহ। অশোক স্তম্ভকেও সাধারণ হিন্দুরা লিঙ্গের প্রতীক বলে মনে করে থাকে। ঊর্ধ্বমুখী শঙ্কু আকৃতির বস্তু মাত্রই তাদের কাছে সম্মানার্হ।[২]

কতক ঐতিহাসিক বর্ণনা করেন যে, একটি ধর্মীয় সম্প্রদায়ের পুরুষেরা উলঙ্গ মহিলাদের এবং মহিলারা উলঙ্গ ও নগ্ন পুরুষদের পূজা করত।[৩] মন্দিরের রক্ষী ও পুরোহিতরা ছিল যাবতীয় অনাচার ও অপকর্মের হোতা এবং বহু উপাসনালয় ছিল যৌন অপরাধের আখড়া। রাজপ্রাসাদ ও শাহী দরবারগুলোতে দেদারসে মদ পান চলত এবং পানোন্মত্ত অবস্থায় নৈতিকতার সীমা লংঘিত হতো।

১. হিউয়েন সাঙ-এর সফরনামা; ২. তমদ্দুন-ই হিন্দ, পৃ. ৪৪১;
৩. দয়ানন্দ সরস্বতী, সত্যার্থ প্রকাশ, পৃ. ৩৪৪।

এরূপ দৈহিক ভোগ-বিলাস ও ইন্দ্রিয় পূজার পাশাপাশি আত্মহনন, যোগ সাধনা ও তপস্যার ধারাও অব্যাহত ছিল যার মধ্যে সীমাতিরিক্ত বাড়াবাড়ির আশ্রয় গ্রহণ করা হতো। দেশ ও রাষ্ট্র এই দুই চরম প্রান্তিকতার মাঝখানে ছিল ভারসাম্যহীন ও দোদুল্যমান। গুটি কয়েক লোক আত্মহনন ও আধ্যাত্মিক উন্নতির সাধনায় মগ্ন ছিল আর সাধারণ মানুষ ইন্দ্রিয় পূজা ও ভোগবাদী স্রোতধারায় ভেসে চলছিল।

শ্রেণীভেদ প্রথা

পৃথিবীর কোন জাতির ইতিহাসে এত সুস্পষ্ট শ্রেণী বৈষম্য, পেশা ও জীবনের কর্মের এমনতরো অনড় ও অটল বিভক্তি কমই দেখা গেছে, যেমনটা ভারতবর্ষের প্রাচীন ধর্মীয় ও সামাজিক বিধি-বিধানের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়। জাতপাতের ভেদ বৈষম্য এবং একই পেশার যাঁতাকলে বন্দী হবার সূচনা বৈদিক যুগের শেষ দিকে শুরু হয়। আর্যরা তাদের বংশ ও বংশীয় বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ন রাখতে, এদেশে বিজেতা হিসেবে তাদের অবস্থানগত মর্যাদা কায়েম রাখতে এবং নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব ও আধিপত্য অব্যাহত রাখার স্বার্থে শ্রেণীভেদ প্রথা ও জাতিগত বৈশিষ্ট্য অপরিহার্য জ্ঞান করে। ড. Gustave le Bon -এর ভাষায় ঃ

We have seen that, towards the close of the Vedic Age, occupation had started become more or less hereditary, and the germ of the caste system had been sown. The Vedic Aryans were alive to the need of maintaining the purity of their race by not mixing with the conquered peoples and when they advanced towards the east and subjugated vast populations, this need became still more manifest and the law-givers had to pay due regard to it. The Aryans understood the problems of race well; they had come to realize that if a ruling minority did not take proper care of itself, it was rapidly assimilated with the servile population and deprived of its identity.

"বৈদিক যুগের শেষ দিকে আমরা দেখেছি যে, বিভিন্ন পেশা কমবেশি পৈতৃক রূপ পরিগ্রহ করতে যাচ্ছিল এবং বর্ণভিত্তিক বিভাজন শুরু হয়ে গিয়েছিল যদিও তা পরিপূর্ণ রূপ পরিগ্রহ করে নি। বৈদিক আর্যদের এই ধারণা সৃষ্টি হয়েছিল যে, তারা তাদের প্রাচীন বংশধারাকে বিজিত জাতি-গোষ্ঠীর সঙ্গে মিশ্রিত হবার হাত থেকে রক্ষা করবে এবং যেই মুহূর্তে এই স্বল্প সংখ্যক বিজেতা পূর্ব দিকে অগ্রসর হলো এবং তারা এদেশীয় জাতিগোষ্ঠীর এক বিরাট দলকে পরাভূত করল তখন এর প্রয়োজনীয়তা আরও বৃদ্ধি পেল এবং বিধায়কদের এর প্রতি লক্ষ্য রাখা

অপরিহার্য হয়ে দেখা দিল। বংশধারার সমস্যা আর্যরা বেশ ভাল বুঝেছিল। তারা আগেভাগেই জেনেছিল যে, যদি স্বল্প সংখ্যক বিজেতা কোন জাতিগোষ্ঠী নিজেদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা না করে তবে তারা যথাসত্বর বিজিত জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে হারিয়ে যায় এবং তাদের নাম-নিশানাও আর অবশিষ্ট থাকে না।"[১]

কিন্তু একে একটি সুবিন্যস্ত ও বিস্তৃত শাস্ত্রীয় বিধানের রূপ দানের কৃতিত্ব অবশ্যই মনুর। মনুজী যীশু খ্রিস্টের জন্মের তিন শ' বছর আগে ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণ্য সভ্যতার উন্নতির চরম উৎকর্ষের যুগে ভারতীয় সমাজের জন্য এই বিধান প্রণয়ন করেন এবং দেশের তাবৎ জনগণ একে একবাক্যে গ্রহণ করে। সত্বরই এই বিধান দেশীয় আইন ও ধর্মীয় সংবিধানের মর্যাদা লাভ করে। এটাই সেই বিধান যাকে আমরা আজ 'মনুসংহিতা' নামে জানি।

মনু সংহিতায় চারটি শ্রেণীর কথা বলা হয়েছেঃ (১) ব্রাহ্মণ অর্থাৎ ধর্মীয় পুরোহিত শ্রেণী; (২) ক্ষত্রিয় অর্থাৎ লড়াকু বা যোদ্ধা শ্রেণী; (৩) বৈশ্য অর্থাৎ ব্যবসা-বাণিজ্য ও কৃষিকর্মে নিয়োজিত শ্রেণী এবং (৪) শূদ্র, যাদের নির্দিষ্ট কোন পেশা ছিল না, অপর তিন শ্রেণীর সেবা করাই ছিল তাদের কাজ। মনু সংহিতায় বলা হয়েছে ঃ

"পরম স্রষ্টা পৃথিবীটাকে মঙ্গলার্থে আপন মুখ, বাহু, উরু ও পদযুগল থেকে যথাক্রমে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রকে সৃষ্টি করেছেন।"[২]

"এই পৃথিবীর হেফাজতের জন্য তিনি এদের মধ্য থেকে প্রত্যেকের জন্য পৃথক পৃথক দায়িত্ব নির্ধারণ করেছেন।"[৩]

"ব্রাহ্মণের জন্য বেদের শিক্ষাদান এবং স্বয়ং নিজেদের ও অন্যের জন্য দেবতাদের উদ্দেশে নৈবেদ্য দেওয়া এবং অর্ঘ্য দেওয়া-নেওয়ার কর্তব্য নিরূপণ করেন।"[৪]

ক্ষত্রিয়দেরকে তিনি বিধান দেন, "তারা সৃষ্টিকুলকে রক্ষা করবে, অর্ঘ প্রদান করবে, বেদ পড়বে, কামনা-বাসনার শিকার হবে না।"[৫]

বৈশ্যদের ক্ষেত্রে তিনি এই বিধান দেন, "তারা গবাদি পশুর সেবা করবে, অর্ঘ্য দেবে, ভেট প্রদান করবে, বেদ পাঠ করবে, ব্যবসায়িক লেনদেন ও কৃষিকাজ করবে।"[৬]

"শূদ্রদের জন্য পরম স্রষ্টা কেবল একটাই দায়িত্ব ও কর্তব্য নির্ধারণ করেছেন আর তা হলো তারা উপরোল্লিখিত তিন শ্রেণীর সেবা করবে।"[৭]

---

১. তমদ্দুনে হিন্দ পৃ. ৩১১;

২-৫. মনু সংহিতা, ১ম অধ্যায়, পৃ. যথাক্রমে ৩১, ৮৭, ৮৮, ৮৯;

৬-৭. মনু সংহিতা, ১ম অধ্যায়, পৃ. যথাক্রমে ৯০, ৯১।

এই সংহিতা তথা শাস্ত্রীয় বিধান ব্রাহ্মণদেরকে অপরাপর শ্রেণী সম্প্রদায়ের মুকাবিলায় এতটা শ্রেষ্ঠত্ব ও পবিত্রতা দান করেছিল যে, তারা দেবতাদের সমপর্যায়ে উপনীত হয়। মনু সংহিতায় বলা হয়েছে ঃ

"যখন কোন ব্রাহ্মণ সন্তান জন্মগ্রহণ করে তখন সে হয় পৃথিবীর সবচেয়ে উন্নত সৃষ্টি। তারা সমগ্র সৃষ্টিজগতের সম্রাট। আর তাদের কাজ হলো শাস্ত্রের রক্ষণাবেক্ষণ।"[১]

"এই পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা ব্রাহ্মণদের সম্পদ। যেহেতু সৃষ্টি জগতের মধ্যে তারাই বড় তাই সব কিছুই তাদের।"[২]

"ব্রাহ্মণ প্রয়োজনবোধে তার শূদ্র দাসদের সহায়-সম্পদ যবর দখল করতে পারবে। এরূপ ছিনিয়ে নেবার জন্য তার ওপর কোন অপরাধ বর্তাবে না। কেননা দাস সহায়-সম্পদের মালিক হতে পারে না। তার সকল সহায়-সম্পদ তার মালিকের সম্পদ হিসেবে পরিগণিত হবে।"[৩]

"ঋগ্বেদ যে ব্রাহ্মণের মুখস্থ সে সকল পাপ থেকে মুক্ত চাই সে ত্রিভুবনের সর্বনাশ সাধন করুক, চাই সে কারোর খাবারই কেড়ে খাক।"[৪]

"রাজার যতই প্রয়োজন দেখা দিক, এমন কি তিনি যদি মরণদশায়ও পতিত হন তবুও কোন ব্রাহ্মণ থেকে তার রাজস্ব গ্রহণ সমীচীন নয়। তেমনি রাষ্ট্রের কোন ব্রাহ্মণকে তিনি ক্ষুৎ পিপাসায় মরতে দেবেন না।"[৫]

"মৃত্যুদণ্ডের পরিবর্তে একজন ব্রাহ্মণের শাস্তি হবে কেবল মস্তক মুণ্ডন। একই অপরাধ অন্য কেউ করলে তার শাস্তি হবে মৃত্যুদণ্ড।"[৬]

উক্ত বিধানে ক্ষত্রিয় যদিও বৈশ্য ও শূদ্রের তুলনায় উন্নততর শ্রেণী হিসেবে স্বীকৃত, কিন্তু ব্রাহ্মণের মুকাবিলায় তার অবস্থান নীচে।"

মনু বলেন ঃ

"দশ বছর বয়স্ক একজন ব্রাহ্মণ বালকের সঙ্গে শত বছরের ক্ষত্রিয়ের সম্পর্ক পিতা-পুত্রের ন্যায়। এক্ষেত্রে ব্রাহ্মণ বালকের অবস্থান হবে পিতার।[৭]

হতভাগ্য শূদ্র

অবশিষ্ট রইল অস্পৃশ্য শূদ্র। ভারতীয় সমাজে তারা ছিল এই নাগরিক ও ধর্মীয় বিধানের দৃষ্টিকোণ থেকে পশু থেকে নিম্নস্তরের, এমন কি কুকুরের চেয়েও ঘৃণিত। মনু সংহিতায় বলা হয়েছেঃ

১-৭. মনুসংহিতা, যথাক্রমে ৯৯,১০০, সপ্তম অধ্যায় ৪১৭, ৯ম অধ্যায় ২৬২, ৮ম অধ্যায় ১৩৩, ৭ম অধ্যায় ৩৭৯; ২য় অধ্যায়, ১৩৫ পৃ.।

"ব্রাহ্মণের সেবা করা শূদ্রের জন্য খুবই প্রশংসাযোগ্য বিষয়। এ ছাড়া আর কোন কিছুর বিনিময়েই সে অন্য কোন পুরস্কার পেতে পারে না।"[১]

"শূদ্র যদি সুযোগ পায় তবুও তার ধন-সম্পদ সঞ্চয় করা উচিত নয়। কেননা ধন-সম্পদ সঞ্চয় করে সে ব্রাহ্মণের মনে দুঃখ দেয়।"[২]

"যদি কোন শূদ্র উচ্চ বর্ণের কারোর ওপর হাত ওঠায় কিংবা মারার জন্য লাঠি তোলে, তবে শাস্তি হিসেবে তার হাত কেটে ফেলা হবে। আর ক্রোধের বশবর্তী হয়ে যদি কাউকে লাথি মারে তাহলে তার পা কেটে ফেলা হবে।"[৩]

"শূদ্র যদি উচ্চ বর্ণের কোন লোকের সঙ্গে একই জায়গায় বসতে চায় তা হলে রাজার উচিত তার নিতম্বে গরম লোহার ছেঁকা দেওয়া এবং তাকে দেশান্তরিত করা।"[৪]

"যদি কোন শূদ্র কোন ব্রাহ্মণের গায়ে হাত তোলে কিংবা গালি দেয় তবে তার জিভ টেনে ছিঁড়ে ফেলা হবে। আর যদি সে এই দাবি করে যে, সে তাকে (ব্রাহ্মণকে) পড়াতে পারে তবে তাকে ফুটন্ত তেল পান করতে দেওয়া হবে।"[৫]

"কুকুর, বিড়াল, ব্যাঙ, টিকটিকি, কাক, পেঁচক মারলে যে প্রায়শ্চিত্ত একজন শূদ্রকে মারলেও সেই একই প্রায়শ্চিত্ত।"[৬]

ভারতীয় সমাজে নারীর অবস্থান ও মর্যাদা

ব্রাহ্মনী যুগে নারীর সেই মর্যাদা ছিল না যা বৈদিক যুগে ছিল। মনুর সংহিতায় (গুস্তাভ-লী বন-এর মতে) নারী সর্বদাই দুর্বল ও অবিশ্বাসী বিবেচিত হয়েছে এবং নারী ঘৃণা ও অবজ্ঞার সঙ্গেই উল্লিখিত হয়েছে।[৭]

স্বামী মারা গেলে স্ত্রী জীবন্মৃতের ন্যায় হয়ে যেত এবং জীবিত থাকতেই মৃতের দশায় উপনীত হতো। সে আর দ্বিতীয় বিয়ে করতে পারত না। তার ভাগ্যে জুটত তীব্র ভর্ৎসনা, লাঞ্ছনা-গঞ্জনা, ঘৃণা ও অবজ্ঞা। বিধবা হবার পর তাকে তার মৃত স্বামীর ঘরের চাকরানী এবং দেবরের সেবা দাসী হয়ে থাকতে হতো। অধিকাংশ বিধবাকে স্বামীর চিতায় সহমরণে যেতে হতো। ড. গুস্তাভ লী বন বলেন, "বিধবাদের তাদের স্বামীর লাশের সঙ্গে জ্বলন্ত চিতায় সহমরণে যেতে হবে, এ রকম বিধান মনুসংহিতায় নেই। মনে হয় এই প্রথার (সতীদাহ প্রথা) ভারতবর্ষে ব্যাপক প্রচলন ঘটেছিল। কেননা গ্রীক ঘটনাপঞ্জী লেখকগণ এর উল্লেখ করেছেন।"[৮]

১. মনু সংহিতা, ১০ম অধ্যায় ১২৯:

২-৬. মনু সংহিতা, ৭ম অধ্যায় ২৮০, ৭ম অধ্যায় ২৮১; প্রাগুক্ত।

৭. তমদ্দুন-ই হিন্দ, ২৩৬ পৃ: । ৮. প্রাগুক্ত, ২৩৮ পৃ.।

মোটকথা, এই সবুজ শ্যামল দেশ যা প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর ছিল, সত্যিকার আসমানী ধর্মের শিক্ষামালা থেকে সুদীর্ঘ কাল থেকে বঞ্চিত থাকায় এবং ধর্মের নির্ভরযোগ্য উৎসের বিলুপ্তির দরুন কষ্ট-কল্পনা ও বিকৃতির শিকার এবং রসম-রেওয়াজ ও প্রথা পদ্ধতির পূজারীতে পরিণত হয়েছিল। সে সময়কার পৃথিবী তো অজ্ঞতা, মূর্খতা, কল্পনা-পূজা, নীচু স্তরের মূর্তিপূজা, প্রবৃত্তি পূজা ও শ্রেণীগত বৈষম্যের ব্যাপারে ছিল অগ্রগামী এবং পৃথিবীর নৈতিক ও আধ্যাত্মিক নেতৃত্ব দেবার পরিবর্তে নিজেই ছিল অভ্যন্তরীণ নৈরাজ্য ও নৈতিক বিশৃঙ্খলার মাঝে নিমজ্জিত।

আরব

জাহিলী যুগে আরব কিছু কিছু আপন প্রাকৃতিক ও স্বভাবজাত যোগ্যতা এবং কতকগুলো গুণে ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে ছিল অনন্য। ভাষার অলংকার, বাক-চাতুর্যে ও ছন্দ প্রকরণে তাদের কোন জুড়ি ছিল না। স্বাধীনতা ও আত্মমর্যাদাবোধকে তারা নিজেদের জীবনের চাইতেও বেশি ভালবাসত। শৌর্যবীর্য ও বীরত্ব প্রদর্শনে এবং অশ্বারোহণেও তাদের কোন বিকল্প ছিল না। তারা বিশ্বাসে দৃঢ়, স্পষ্টভাষী, সাহসী, তীক্ষ্ম স্মৃতিশক্তির অধিকারী, সাম্যবাদী, লৌকিকতামুক্ত ও কষ্ট সহিষ্ণু, প্রবল ইচ্ছাশক্তির অধিকারী, সত্যবাদী, প্রতিজ্ঞা রক্ষায় অনড় এবং বিশ্বস্ততা রক্ষায় ও আমানতদারীতে ছিল প্রবাদতুল্য।

কিন্তু আম্বিয়ায়ে কিরাম (আ) ও তাঁদের শিক্ষামালা থেকে দূরে অবস্থান, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে একই উপদ্বীপে আবদ্ধ থাকা এবং বাপ-দাদার ধর্ম ও জাতীয় ঐতিহ্য ও প্রথা-পদ্ধতি শক্তভাবে আঁকড়ে থাকার দরুন তারা ধর্মীয় ও নৈতিক দিক দিয়ে খুবই নিচে নেমে গিয়েছিল। ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে তারা অধঃপতনের চূড়ান্ত সীমায় উপনীত হয়েছিল। প্রকাশ্য মূর্তি পূজায় লিপ্ত ছিল তারা এবং এ ব্যাপারে তারাই ছিল নাটের গুরু। নৈতিক ও সামাজিক ব্যাধি তাদের সমাজকে ঘুণের ন্যায় কুরে কুরে খাচ্ছিল। মোটকথা, ধর্মাশ্রিত জীবনের অধিকাংশ সৌন্দর্য থেকেই তারা ছিল মাহরূম এবং জাহিলী জীবনের নিকৃষ্টতম বৈশিষ্ট্য ও দোষত্রুটিতে নিমজ্জিত।

ইসলাম পূর্ব (জাহিলী) যুগের মূর্তি

অজ্ঞতা ও মূর্খতার উন্নতির সাথে সাথে গায়রুল্লাহ্র পূজার আকীদাও ব্যাপক ও জনপ্রিয় এবং আল্লাহ্ তা'আলার ওয়াহদানিয়াত (একত্ববাদ) ও রবূবিয়াত (পালনবাদ)-এর ধারণা দুর্বল এবং বিশিষ্ট লোকদের মধ্যে সীমিত হয়ে যায়, এমন কি ক্রমান্বয়ে সমগ্র জাতিগোষ্ঠী মূর্তি ও পুতুলের (যেগুলো কোন এককালে সুপারিশকারী ও মাধ্যম কিংবা মনোযোগের কেন্দ্র বানাবার জন্য অবলম্বন করা

হয়েছিল) পরিষ্কার ও খোলাখুলি পূজায় লিপ্ত হয়ে যায় এবং আল্লাহ্ তা'আলা থেকে (যাঁকে সৃষ্টি জগতের স্রষ্টা ও সকল প্রতিপালনের প্রতিপালক হিসেবে তখনও স্বীকার করা হতো[১]) কার্যত ও অন্তর-মন থেকে সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে অন্যান্য উপাস্য দেবদেবী ও মূর্তির সঙ্গে কায়েম হয়ে গিয়েছিল এবং বন্দেগী ও দাসত্বের প্রকাশের পন্থা ও আমলসমূহ (সিজদা, কুরবানী, শপথ, দো'আ ও সাহায্য প্রার্থনা) সেগুলোর সঙ্গেই সম্পৃক্ত হয়ে গিয়েছিল এবং দেশে প্রকাশ্য মূর্তিপূজা, আল্লাহ্র সঙ্গে সম্পর্কহীনতা ও সুস্পষ্ট শিরক-এর রাজত্ব চলছিল।[২]

আরবের প্রতিটি গোত্রে, প্রতিটি শহরে ও প্রতি জনপদের একটি বিশেষ মূর্তি ছিল, বরং বলা যায় প্রতিটি পরিবারের নিজস্ব মূর্তি ছিল। ঐতিহাসিক কালবী বলেন, "মক্কা মুকাররমার প্রতিটি ঘরেই তাদের একটি নিজস্ব মূর্তি ছিল। মক্কায় কেউ ভ্রমণের ইচ্ছা করলে রওয়ানা হবার সময় ঘরে তার সর্বশেষ কাজ হতো বরকত হাসিলের জন্য গৃহে রক্ষিত মূর্তি স্পর্শ করা এবং সফর থেকে ঘরে ফিরেই তার সর্বপ্রথম কাজ হতো বরকত হিসেবে মূর্তির পা ভক্তিভরে স্পর্শ করা।"[৩] মূর্তি সম্পর্কে খুবই বাড়াবাড়ি করা হতো এবং এর ভেতর তারা ডুবে থাকত। কেউ বানাত মূর্তি আর কেউ বানাত মূর্তির ঘর। আর যে এর কোনটাই বানাতে পারত না, সে হারাম শরীফের সামনে একটি পাথর গেঁড়ে দিত অথবা হারাম শরীফ ভিন্ন অন্য কোথাও যেখানে সে ভাল মনে করত পাথর পুঁতে তার চারপাশে এমন শান-শওকতের সঙ্গে তওয়াফ করত যেরূপ শান-শওকতের সঙ্গে বায়তুল্লাহ্র চারপাশে তওয়াফ করা হয়। এই সব পাথরকে তারা 'আনসাব' বলত।[৪] খোদ কা'বা শরীফের ভেতর (যেই কা'বা শরীফকে কেবল আল্লাহ্র ইবাদতের নিমিত্ত নির্মাণ করা হয়েছিল) এবং এর প্রাঙ্গণে ৩৬০টি মূর্তি রক্ষিত ছিল।[৫] মূর্তি ও দেবদেবীর পূজা করতে করতে এরা এত দূর পৌঁছে গিয়েছিল যে, পাথর জাতীয় কিছু একটা পেলেই তারা পূজা শুরু করে দিত।

ইমাম বুখারী (র) তাঁর 'সহীহ্' গ্রন্থে আবূ রাজা' আল-উতারেদী থেকে বর্ণনা করেন, "আমরা পাথর পূজা করতাম। যদি ঐ পাথরের চেয়ে ভাল ও

---

১. ولئن سألتهم من خلق السموات والارض ليقولنّ الله যদি তাদের জিজ্ঞেস করা হয় আসমান ও যমীন কে সৃষ্টি করেছে তবে অবধারিতভাবেই তারা বলবে, 'আল্লাহ'।

২. জাহিলী যুগের আরবদের আকীদা-বিশ্বাস ও শেরেকী আকীদার ক্রমোন্নতি সম্পর্কে জানতে চাইলে সিরীয় মনীষী মুহাম্মদ ইযযত দরূযাহ্ লিখিত وبيئة النبى صلى الله عليه وسلم من القران 'কুরআনের আলোকে নবী করীম (সা)-এর দেশ ও পরিবেশ' গ্রন্থ দেখুন।

৩. কিতাবুল আসনাম, ৩৩পৃ.। ৪. প্রাগুক্ত।

৫. সহীহ বুখারী (র), কিতাবুল মাগাযী, মক্কা বিজয় শীর্ষক অধ্যায়।

উন্নত মানের পাথর পাওয়া যেত তাহলে পুরনো পাথরটাকে ছুঁড়ে ফেলা হতো এবং নতুনটাকে গ্রহণ করা হতো। আর যদি পাথর না পাওয়া যেত তাহলে মাটির একটা ঢিবি বানানো হতো এবং সেখানে ছাগল এনে দুধ দোহন করা হতো। এরপর তার তওয়াফ করা হতো।"[১] ইবনুল কালবী বলেন যে, কোন লোক ভ্রমণকালে কোন নতুন জায়গায় অবতরণ করলে সেখান থেকে চারটি পাথর উঠিয়ে আনত। এরপর তার ভেতর থেকে সর্বোত্তমটাকে 'উপাস্য দেবতা' হিসেবে গ্রহণ করা হতো আর বাকি তিনটাকে হাঁড়ি বসাবার জন্য রাখা হতো। এরপর সেখান থেকে প্রস্থানের সময় ওগুলো ওখানেই ফেলে যেত।[২]

উপাস্য দেবদেবীর আধিক্য

সর্বকালে সর্বযুগে ও সরদেশে কাফির-মুশরিকদের যেই অবস্থা আরবদের অবস্থাও তার থেকে ব্যতিক্রম ছিল না। তাদের উপাস্য দেব দেবী ছিল বহু। এসবের ভেতর ফেরেশতা, জিন্ন ও নক্ষত্রপুঞ্জ সবই শামিল ছিল। ফেরেশতাদের সম্পর্কে তাদের বিশ্বাস ছিল এই যে, তারা আল্লাহ্‌র কন্যা সন্তান। এজন্য তারা ফেরেশতাদের নিকট সুপারিশ কামনা করত, তাদের পূজা করত এবং তাদেরকে ওসীলা হিসেবে গ্রহণ করত। জিনদেরকে তারা আল্লাহ্‌র শরীক জ্ঞান করত, তাদের শক্তি ও প্রভাবের ব্যাপারে বিশ্বাস করত এবং তাদের পূজা করত।[৩]

ঐতিহাসিক কালবী বর্ণনা করেন যে, খুযা'আ গোত্রের একটি শাখা ছিল বনূ মলীহ। তারা জিনদের পূজা করত।[৪] সা'এদ বর্ণনা করেন যে, হিময়ার গোত্র সূর্যের পূজা করত। কিনানা গোত্র চাঁদের পূজারী ছিল। বনূ তামীম ওয়াবরানের, লাখ্‌ম ও জুযাম বৃহস্পতির, তাঈ গোত্র সুহায়ল-এর, বনূ কায়স শে'রা নক্ষত্রের এবং বনূ আসাদ বুধ গ্রহের পূজা করত।[৫]

নৈতিক ও সামাজিক ব্যাধি

তাদের ভেতর বহু নৈতিক ব্যাধি বাসা বেঁধেছিল এবং তার কারণও সুস্পষ্ট। তাদের মদ পান এতই সাধারণ বিষয়ে পরিণত হয়েছিল যে, এর আলোচনা তাদের সাহিত্য ও কাব্যের একটি বিরাট অংশ জুড়ে বসে ছিল। আরবী ভাষায় মদের যেই বিপুল সংখ্যক নাম পাওয়া যায় এবং এসব নামের ভেতর যেই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পার্থক্যের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে তা থেকেই এর গ্রহণযোগ্যতা ও

১. সহীহ বুখারী, কিতাবুল মাগাযী, বনী হানীফা প্রতিনিধি দল শীর্ষক অধ্যায়।
২. কিতাবুল আসনাম; ৩. প্রাগুক্ত, পৃ: ৪৪। ৪. প্রাগুক্ত;৩৪ পৃ:।
৫. তাবাকাতু'ল-উমাম, ৪৩০ পৃ.।

ব্যাপকতার পরিমাপ করা যায়।[১] মদের দোকান ছিল প্রকাশ্য রাস্তার ওপর এবং চেনার সুবিধার্থে এসব দোকানের ওপর পতাকা উড়ত।[২] জাহিলী যুগে জুয়া ছিল গর্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের বিষয় এবং এতে অংশ গ্রহণ না করা ছিল কাপুরুষতা ও নিস্তেজতার পরিচায়ক।[৩] প্রসিদ্ধ তাবিঈ হযরত কাতাদা বলেন যে, জাহিলী যুগে একজন তার ঘরবাড়ি জুয়ার বাজি হিসেবে ধরত। এরপর জুয়ায় তা হারিয়ে ব্যথা-ভারাক্রান্ত দৃষ্টিতে প্রতিদ্বন্দ্বীর হাতে তা' দেখত। এর ফলে ঘৃণা ও শত্রুতার আগুন জ্বলে উঠত এবং পরিণতি যুদ্ধ-বিগ্রহে গিয়ে গড়াত।[৪]

হেজাযের আরব অধিবাসী ও য়াহূদীরা সূদী লেনদেন করত এবং চক্রবৃদ্ধি হারে সূদের কারবার চালাত। এ ব্যাপারে বড়ই নিষ্ঠুরতা ও হৃদয়হীনতার অভিব্যক্তি ঘটত।[৫] ব্যভিচারকে খুব একটা দূষণীয় মনে করা হতো না এবং আরবদের জীবনে এ ধরনের ঘটনার অভাব ছিল না। এরও আবার রকমারি পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। এজন্য পেশাদারী মহিলাও ছিল এবং স্বতন্ত্র বেশ্যালয় ছিল। শুড়িখানাগুলোতেও এর ব্যবস্থা ছিল।[৬]

নারীর মর্যাদা

জাহিলী সমাজে সাধারণভাবে মহিলাদের প্রতি নির্দয়তা ও নিষ্ঠুরতা ছিল একটি সাধারণ ও বৈধ ব্যাপার। তাদের অধিকারকে পদদলিত করা হতো। তাদের সম্পদকে পুরুষেরা নিজেদের সম্পদ মনে করত। ওয়ারিশ হিসেবে মৃতের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে তারা কোন অংশ পেত না। স্বামী মারা গেলে কিংবা তালাক দিলে পছন্দ মাফিক দ্বিতীয় বিয়েরও অধিকার ছিল না।[৭] অন্যান্য অস্থাবর সম্পত্তি ও জীব-জন্তুর মতই নারীও ওয়ারিশদের মধ্যে বণ্টিত ও হস্তান্তরিত হতো[৮]

পুরুষ তো তার অধিকার কড়ায় গণ্ডায় আদায় করে নিত, কিন্তু মহিলারা তাদের অধিকার নিতে পারত না। এমন অনেক খাদ্যদ্রব্য ছিল যেগুলো কেবল পুরুষদের জন্য নির্দিষ্ট ছিল, মহিলারা তা খেতে পেতো না।[৯]

পুরুষরা যত সংখ্যক ইচ্ছে নারীকে বিয়ে করতে পারত। কন্যা সন্তানের প্রতি ঘৃণা ও অবজ্ঞা এতটা বৃদ্ধি পেয়েছিল যে, তাদের জীবন্ত প্রোথিত করারও রেওয়াজ ছিল। হায়ছাম ইবনে আদী উল্লেখ করেছেন যে, জীবন্ত প্রোথিত করার প্রথা আরবের সকল গোত্রেই প্রচলিত ছিল। একজন একে কার্যকর করত আর

---

১. দ্র. কিতাবুল মুখাস্‌সাস (ইবনে সায়্যিদা),আল-খুমুর ১১শ খণ্ড, ৭২, ৮২। ২. সাব'আ মুআল্লাকা। ৩. দীওয়ান আল-হামাসা, হিজর ইবন খালিদের কাসীদা। ৪. তফসীরে তাবারী দ্র.انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء -এর তফসীর। ৫. তফসীরে তাবারী, ৪র্থ খণ্ড, ৫৯-৬৯। ৬. দ্র.আল-ইকদুল ফারীদ. কিতাব আখবারু যিয়াদ (ইব্‌ন আব্‌দি রাব্বিহি)। ৭. সূরা বাকারার ২৩২ আয়াত। ৮. সূরা নিসা, ১৯, আয়াত। ৯. সূরা আল-আনআম, ১৪০ আয়াত।

দশজন ছেড়ে দিত। ইসলামের আবির্ভাবের পূর্ব পর্যন্ত এই প্রথা চালু ছিল।[১] কেউ লোকলজ্জা ও অপমানের কারণে, কেউবা খরচ জোগাতে অসমর্থতা ও দারিদ্র্যের ভয়ে নিজেদের সন্তানদেরকে হত্যা করত। আরবের কোন কোন শরীফ ও নেতৃস্থানীয় লোক এ সময় এ ধরনের শিশুদেরকে টাকা-পয়সার বিনিময়ে কিনে নিয়ে তাদের জীবন রক্ষা করত।[২] সা'সা'আ ইবনে নাজিয়া বর্ণনা করেন যে, ইসলামের আবির্ভাবের সময় পর্যন্ত আমি জীবন্ত প্রোথিত হতে যাচ্ছে, এ ধরনের তিন শ' কন্যা সন্তানের জীবন অর্থের বিনিময়ে বাঁচিয়ে ছিলাম।[৩] কোন কোন সময় কোন সফর কিংবা কাজে জড়িয়ে পড়ায় সময়াভাবে কন্যা বড় হয়ে গেলে এবং প্রোথিত করার অবকাশ না পেলে গোঁয়ার পিতা ধোঁকা দিয়ে কোন নির্জন স্থানে নিয়ে গিয়ে অত্যন্ত নির্দয়ভাবে তাকে জীবন্ত কবর দিত। ইসলাম গ্রহণের পর অনেকে তাদের বিগত জীবনের এ ধরনের বেদনাদায়ক ও মর্মস্পর্শী ঘটনার বিবরণ দিয়েছেন।[৪]

অন্ধ গোত্রপ্রীতি ও খান্দানী বৈশিষ্ট্য

অন্ধ গোষ্ঠীপ্রীতি আরবদের মাঝে কঠোরভাবে চলে আসছিল। এই গোষ্ঠীপ্রীতির বুনিয়াদ ছিল জাহিলী মেযাজ— যার মর্মকথা এই বিখ্যাত বাক্য থেকে প্রকাশ পায় ঃ انصر اخاك ظالما اومظلوما 'তোমার ভাইকে সাহায্য কর, চাই সে জালেম হোক অথবা মজলুম।' অনন্তর তারা তাদের ভাই ও মিত্রকে সর্বাবস্থায় সাহায্য করাকে জরুরী বিবেচনা করত, চাই তা তারা ন্যায় ও সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকুক অথবা অন্যায় ও অসত্যের ওপর।

আরব সমাজ জীবন বিভিন্ন শ্রেণী ও পৃথক পৃথক সত্তাবিশিষ্ট বংশ ও খান্দানের সমষ্টি ছিল। এক খান্দান অপর খান্দানের তুলনায় নিজেদেরকে উন্নত ও শ্রেষ্ঠ ভাবত। কোন কোন খান্দান অন্য কোন খান্দান কিংবা আম্ জনতার সাথে বহুবিধ আচার-অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করা পসন্দ করত না, এমন কি হজ্জের কিছু কিছু ক্রিয়াকর্মে কুরায়শরা সাধারণ হাজীদের থেকে পৃথক থাকত এবং নিজেদের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য বজায় রাখত। সাধারণ হজ্জযাত্রীদের সঙ্গে আরাফাত ময়দানে অবস্থান করাকে তারা লজ্জার বিষয় বলে মনে করত। আসা-যাওয়ার ক্ষেত্রে তারা আগে ভাগে যেত।[৫] একটা শ্রেণী ছিল যারা জন্মগতভাবে প্রভু। একটা শ্রেণী ছিল নীচু স্তরের যাদের বেগার খাটানো হতো এবং তাদের দিয়ে (বিনা বেতনে ও বিনা পারিশ্রমিকে) কাজ করানো হতো। আর কিছু লোক ছিল সাধারণ পর্যায়ের আর কিছু লোক বাজার-ঘাটের।

---

১. ময়দানী; ২. দ্র. বুলূগুল আরব ফী আহওয়ালিল আরব, আল্লামা আলূসীকৃত। ৩. কিতাবুল আগানী;
৪. দ্র. সুনান দারমী, ১ম খণ্ড, পৃ৮। ৫. সূরা আল-বাকারা, ১৯৯ আয়াত।

যুদ্ধবিগ্রহপ্রিয় স্বভাব

আরবরা প্রকৃতিগতভাবেই যুদ্ধপ্রিয় জাতি। তাদের মরুচারী অসংস্কৃত জীবনের এটাই ছিল চাহিদা ও দাবি। যুদ্ধ তাদের জীবনের একটি অনিবার্য প্রয়োজনের চাইতেও বেশি ক্রীড়া-কৌতুক ও চিত্তবিনোদনের উপকরণে পরিণত হয়েছিল যা ছাড়া তাদের বেঁচে থাকাটাই ছিল কঠিন। তাদেরই জনৈক কবি গর্বভরে বলেন ঃ

واحيانا على بكر اخينا – اذا مالم نجد الا اخانا –

'আমরা যদি প্রতিপক্ষ হিসেবে কোন কবিলা না পাই তাহলে আমাদের আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্তির জন্য আমরা আমাদের মিত্র গোত্রের ওপরই অগত্যা ঝাঁপিয়ে পড়ি।'[১]

একজন আরব কবি এভাবে তাঁর অভিলাষ ব্যক্ত করেন যে, আমার ঘোড়া আরোহণের উপযুক্ত হলে আল্লাহ তা'আলা যেন যুদ্ধের আগুন জ্বালিয়ে দেন যাতে করে আমি আমার ঘোড়ার ও তরবারির নৈপুণ্য প্রদর্শনের সুযোগ পাই।[২]

যুদ্ধ ও রক্তপাত তাদের কাছে ছিল নেহাত মামুলী ব্যাপার। যুদ্ধের আগুন জ্বালানোর জন্য মামুলী কোন ঘটনাই যথেষ্ট ছিল। ওয়াইল-এর বংশধর বকর ও তাগলিব গোত্রের মধ্যে চল্লিশ বছর যাবত যুদ্ধ চলেছিল যেখানে পানির মত বেদেরেগ রক্ত প্রবাহিত হয়েছিল। মুহালহিল নামক জনৈক আরব সর্দার উল্লিখিত যুদ্ধের চিত্র এভাবে এঁকেছেনঃ

"দু'টো খান্দানই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। মা হারিয়েছে তার সন্তান আর সন্তান হয়েছে পিতৃহীন ইয়াতীম। চোখের পানি শুকায় না, লাশও আর দাফন করা হয় না।"[৩] গোটা আরব উপদ্বীপ ছিল যেন শিকারীর পাতা জাল। কেউ জানত না যে, কোথায় তাকে লুট করা হবে। আর কেউ বলতে পারত না কখন তাকে ধোঁকা দিয়ে হত্যা করা হবে। কাফেলার মাঝে থেকে লোক ছোঁ মেরে উঠিয়ে নেওয়া হতো, এমন কি তৎকালীন সুবিশাল রাষ্ট্রসমূহেরও তাদের কাফেলা ও দূতের নিরাপত্তার জন্য মজবুত চৌকি পাহারা এবং গোত্রের প্রধানদের জামানতের প্রয়োজন পড়ত।[৪]

একটা সাধারণ পর্যালোচনা

R.V.C. Bodley নামক ইংরেজ জীবন-চরিতকার তাঁর The Messenger নামক গ্রন্থে ইসলামের আবির্ভাবের সময় তৎকালীন পৃথিবীর সাধারণ পর্যালোচনা করতে গিয়ে সে সময়কার উল্লেখযোগ্য দেশ ও জাতিগোষ্ঠীর নিম্নোক্ত রূপ আলোচনা করেছেন ঃ

---

১. দীওয়ানে হামাসা; ২. দীওয়ানে হামাসা। ৩. দ্র. আয়্যামু'ল-আরব নামক পুস্তক।
৪. দ্র. তারীখে তাবারী, ২য় খণ্ড, ১৩৩ পৃ.।

"The Arabs did not command any respect in the sixth century world. As a matter of fact, no one counted very much. It was a moribund period when the great empires of Eastern Europe and Western Asia had already been destroyed or were at the end of their imperial careers.

"It was a world still dazed by the eloquence of Greece, by the grandeur of Persia, by the majesty of Rome, with nothing yet to take their places, not even a religion.

"The Jews were wandering all over the world, with no central guidance. They were tolerated or persecuted according to circumstances. They had no country to call their own, and their future was as uncertain as it is today.

"Outside the sphere of influence of Pope Gregory the Great, the Christians were propounding all kinds of complicated interpretations of their once simple creed and were busy cutting one another's throat in the process.

"In Persia, a last flicker of empire-building remained. Khusrau II was extending the frontiers of his domain. By inflicting defeat on Rome he had already occupied Cappadocia, Egypt and Syria. In 620 A.C. (after Christ), when Muhammad was about to emerge as a guide for humanity, he had sacked Jerusalem and stolen the Holy Cross and restored the might and grandeur of Darius I. It looked almost like a new lease of life for the splendour of the Middle East. Yet the Byzantine Romans still had a little of their old vitality. When Khusrau brought his army to the walls of Constantinople, they made a final effort to survive.

"Further away in the east, the march of events was leaving few landmarks. India still consisted of many unimportant petty states which struggled mutually for political and military supremacy.

"The Chinese, as usual, were fighting among themselves. The Sui dynasty came into power to be replaced by the Tang which ruled for three centuries.

"In Japan, an Empress occupied the throne for the first time. Buddhism was beginning to take root and to influence Japanese ideas and ideals.

"Europe was gradually merging into the Frankish Empire, which would eventually comprise France, Northern Italy, most

of the countries east of the Rhine as far as the present Russo-Polish border. Clovis was dead and Dagobert, the last great Merovingian ruler, was soon to be crowned.

"Spain and England were unimportant petty States.

"Spain was under the control of Visigoths, who had lately been driven out of France which they had occupied as far in the north as Loire. They were persecuting the Jews, who would, consequently, do much to facilitate the Muslim invasion which was to follow a century later.

"The British Isles were divided into independent principalities. One hundred and fifty years had passed since the departure of the Romans, who had been replaced by an influx of Nordic people. England herself was made up of seven separate kingdoms."

"প্রাচীন ঐতিহ্য সত্ত্বেও ঈসায়ী ৬ষ্ঠ শতকে তখনকার বিশ্বে আরবদের কোন গুরুত্ব ছিল না। আসলে তখন কারুরই কোন গুরুত্ব ছিল না। এটা ছিল এক মরণোন্মুখ মুহূর্ত যখন পূর্ব য়ুরোপ ও পশ্চিম এশিয়ার দুই বিশাল সাম্রাজ্য ধ্বংসপ্রাপ্ত কিংবা মুমূর্ষু প্রায়। এ ছিল এমন এক জগত যা এখনও গ্রীসের বাকচাতুর্য, ইরানের শ্রেষ্ঠত্ব এবং রোমের জাঁকজমক ও দাপটে বিস্ময়াভিভূত ছিল এবং এমন কোন বিষয় বা বস্তু কিংবা এমন কোন ধর্মও ছিল না যা তাদের ভেতর কোন একটির স্থান দখল করতে পারত।

"য়াহূদীরা সারা পৃথিবীতেই মার খেয়ে ও গলা ধাক্কা খেয়ে ফিরছিল। তাদের কোন কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব ছিল না। অবস্থা মাফিক তাদের বরদাশ্‌ত করা হতো কিংবা নির্যাতন-নিপীড়ন করা হতো। কোন দেশই তাদের একান্তভাবে নিজেদের ছিল না এবং তাদের ভবিষ্যতও তেমনি অনিশ্চিত ছিল যেমনটি আজ।

"মহামতি পোপ গ্রেগরী (Gregory the Great)-র প্রভাব বহির্ভূত এলাকার খ্রিস্টানরা নিজেদের সহজ সরল ধর্মবিশ্বাসের সর্বপ্রকার জটিল অর্থ অন্বেষণ এবং এ নিয়ে একে অন্যের গলায় ছুরি চালাতে ব্যস্ত ছিল।

"ইরানে সামাজ্য নির্মাণের কেবল একটি আলোক-রশ্মি থেকে গিয়েছিল, দ্বিতীয় খসরু তার সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি সাধনে ও সীমা সম্প্রসারণে ব্যস্ত ছিলেন। তিনি রোম সাম্রাজ্যকে পর্যুদস্ত করে কাপাডোসিয়া, মিসর ও সিরিয়া দখল করেন। ৬২০ খ্রিস্টাব্দে (যখন মুহাম্মদ সা. নেতা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে যাচ্ছিলেন) বায়তুল মুকাদ্দাস ধ্বংস করে পবিত্র ক্রুশ কাষ্ঠ চুরি করে নিয়ে গিয়েছিলেন এবং সম্রাট ১ম দারিউসের শান-শওকত পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

মনে হচ্ছিল যেন মধ্যপ্রাচ্যের শৌর্যবীর্য জীবনের এক নতুন কিস্তি পেয়েছে, কিন্তু কেবল এটাই ছিল না। বায়যানটাইন রোমকরা তখনও নিজেদের অতীত কর্মক্ষমতা হারিয়ে ফেলেনি। পারস্য সম্রাট খসরূ যখন তার সেনাবাহিনী কনস্টান্টিনোপলের প্রাচীরের পাদদেশে এনে দাঁড় করান তখন তারা তাদের শেষ প্রয়াস চালায়।

"দূর প্রাচ্যে উল্লেখযোগ্য বা রেখাপাত করার মত তেমন কিছু ঘটেনি। ভারতবর্ষ তখনও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ও গুরুত্বহীন কতকগুলো দেশীয় রাজ্যের সমষ্টি যারা রাজনৈতিক ও সামরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও একে অপরের ওপর প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে লিপ্ত ছিল।

"চীনারা ছিল তাদের চিরাচরিত পারস্পরিক সংঘর্ষে লিপ্ত। সুঈ বংশ ক্ষমতায় আসল এবং গেল এবং তাদের স্থান দখল করল তাঙ রাজ বংশ যারা তিন শতাব্দীকাল শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকে।

"জাপানে প্রথমবারের মত একজন মহিলা সিংহাসনে বসেন। বৌদ্ধ মতবাদ আসন গেড়ে বসতে শুরু করেছিল এবং জাপানী ধ্যান-ধারণা ও লক্ষ্যের ওপর প্রভাব ফেলে চলেছিল।

"স্পেন ও ইংল্যান্ড ছিল গুরুত্বহীন ক্ষুদ্র দেশ। স্পেন ভিসিগথদের শাসনাধীন ছিল যাদের কিছু কাল পূর্বেই ফ্রান্স থেকে, যার ওপর তারা loire পর্যন্ত দখল কায়েম করে রেখেছিল, বের করে দেওয়া হয়েছিল। তারা য়াহূদীদের ওপর জুলুম-নিপীড়ন চালাচ্ছিল যা এক শ' বছর পরের মুসলিম আক্রমণের রাস্তাকে সুগম করছিল।

"বৃটেন উপদ্বীপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্যে বিভক্ত ছিল। রোমকদের বিদায়ের দেড় শ' বছর অতিক্রান্ত হবার পর নরডিক (Nordic) জাতি তাদের স্থান দখল করে। খোদ ইংল্যান্ড সাতটি ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যের সমষ্টি ছিল।"[১]

জাহিলী যুগের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা

ইসলামপূর্ব যুগের ধর্মীয়, আধ্যাত্মিক, নৈতিক ও সামাজিক অবস্থা পর্যালোচনা করবার পর এর রাজনৈতিক ও সামাজিক চিত্রের ওপর বিশেষ দৃষ্টি নিক্ষেপ করা সমীচীন মনে করছি এজন্য যে, ধর্মীয়, নৈতিক ও সামাজিক উন্নতি ও অবনতিতে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা এবং সেই যুগের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ধ্যান-ধারণা, চিন্তা-চেতনা ও নিয়ম-বিধির একটা বিরাট ভূমিকা রয়েছে এবং তা জাতীয় জীবনের বিনির্মাণ ও পুনর্গঠনে একটি গুরুত্বপূর্ণ ও কার্যকর উপাদানও বটে।

১. The Messenger: The Life of Muhammad, P. 18-19।

নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্র

ইসলাম-পূর্ব জাহিলী যুগটি ছিল নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্রের যুগ। এই রাজতন্ত্র অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ছিল নির্দিষ্ট বংশ বা পরিবারভিত্তিক যেমনটি ছিল ইরানে। সেখানে সাসানী পরিবারের বদ্ধমূল বিশ্বাস ছিল যে, হুকুমতের ওপর তাদের অধিকার মৌরসী এবং তা খোদায়ী সমর্থনপুষ্ট। সার্বিক প্রয়াসের দ্বারা প্রজা সাধারণের মনেও এই বিশ্বাস বদ্ধমূল করে দেওয়া হয়েছিল। ফলে তারাও নির্বিবাদে তা মেনে নিয়েছিল এবং হুকূমত সম্পর্কে তাদের এই বিশ্বাস বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল যা কখনই ফাটল ধরত না।

কখনো বা এই রাজতন্ত্র কেবল রাজা-বাদশাহদের মহত্ত্বের ওপর প্রতিষ্ঠিত হতো। চীনারা তাদের সম্রাটকে 'ঈশ্বর-পুত্র বা স্বর্গ-পুত্র' বলত। কেননা তারা বিশ্বাস করত যে, আসমান হল নর আর যমীন হলো নারী। আর এদের উভয়ের মিলনে সৃষ্টিকুলের উদ্ভব ঘটেছে এবং সম্রাট ১ম খাতা হচ্ছেন আসমান ও যমীনের মিলনের প্রথম ফসল। আর এই বিশ্বাসের ভিত্তিতেই সমকালীন সম্রাটকে জাতির একক পিতা জ্ঞান করা হতো। সুতরাং তার যা ইচ্ছা তাই করার অধিকার ছিল। লোকে সম্রাটকে বলত, 'আপনিই আমাদের মা-বাপ।' সম্রাট লীয়ান কিংবা তাই সুঙের মৃত্যু হলে চীনের লোকেরা গভীর শোক প্রকাশ করে, এমন কি তারা সীমাতিরিক্ত মাতম করে। কেউ কেউ এজন্যে লৌহ পোশাক পরিধান করে, কেউ কেউ সূঁচের সাহায্যে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে আপন চেহারা রক্তাক্ত করে ফেলে। কেউ বা মস্তক মুণ্ডন করে, কেউ কেউ কফিনে ঠুকে ঠুকে নিজেদের কর্ণদ্বয় রক্তাক্ত করে ফেলে। সার্বভৌম ক্ষমতা বা শাসন ক্ষমতাকে কখনো বা কোন বিশেষ গ্রুপ, দল বা নির্দিষ্ট দেশের অধিকার মনে করা হতো, যেমন রোমান সাম্রাজ্যে মনে করা হতো। সেখানে রোমকরা নিজেদেরকে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী আর অন্যদেরকে দাস মনে করত। আর এই বিশ্বাস ছিল তাদের মজ্জাগত। এক্ষেত্রে তাদের অধীনস্থদের অবস্থানগত মর্যাদা ছিল রক্তবাহী শিরা-উপশিরার ন্যায় যেগুলোর মাধ্যমে রক্ত সঞ্চালিত হয়ে হৃৎপিণ্ডে পৌঁছে। রোমকরা যে কোন আইন ও যে কারুর অধিকারকে উপেক্ষা করতে পারত এবং যে কোন নাগরিকের সম্মান ও সম্ভ্রম বিনষ্ট করতে পারত। তারা সর্বপ্রকার জুলুমকেই বৈধ মনে করত। রোমকদের সমবিশ্বাসী ও স্ব-ধর্মী হয়েও এবং রাষ্ট্রের প্রতি নির্ভেজাল আনুগত্য ও বিশ্বস্ততা প্রদর্শন করেও কোন ব্যক্তি কিংবা জাতিগোষ্ঠী রোমকদের জুলুম-নিপীড়নের হাত থেকে বাঁচতে পারত না। কোন জাতিগোষ্ঠীর বৈধ বা আইনগত মর্যাদা কিংবা অভ্যন্তরীণ স্বায়ত্তশাসনের অধিকার ছিল না এবং তাদের এ সুযোগও ছিল না যে, নিজ দেশে

---

১. চীনের ইতিহাস, জেম্স কারকর্ণকৃত।

নিজেদের অপরিহার্য মৌলিক অধিকার থেকে উপকৃত হবে এই সব শাসিত জাতিগোষ্ঠী ও বিজিত দেশের উদাহরণ ছিল সেই উটনীর মত যার ওপর প্রয়োজনের সময় আরোহণ করা হয়, আবার দুধও দোহন করা হয়, কিন্তু ঘাস-পাতা দেওয়া হয় কেবল ততটুকুই যাতে সে কোন রকম শিরদাড়া সোজা রাখতে পারে এবং পালান দুধে ভর্তি থাকে। রবার্ট ব্রিফল্ট (Robert Brifault) রোমক সাম্রাজ্য সম্পর্কে বলেনঃ

"The intrinsic cause that doomed and condemned the Roman Empire was not any growing corruption, but the corruption, the evil, the inadaptation to fact in its very origin and being. No system of human organization that is false in its very principle, in its very foundation, can save itself by any amount of cleverness and efficiency in the means by which that falsehood is carried out and maintained, by any amount of superficial adjustment and tinkering. It is doomed root and branch as long as the root remains what it was. The Roman Empire was, as we have seen, a device for the enrichment of a small class of people by the exploitation of mankind. That business enterprise was carried out with all honesty, all the fairness and justice compatible with its very nature, and with admirable judgment and ability. But all those virtues could not save the fundamental falsehood, the fundamental wrong from its consequence."

“রোমক সাম্রাজ্যের ধ্বংস ও পতনের কারণ কেবল সেখানকার ক্রমবর্ধমান অন্যায় ও দুর্নীতির সয়লাবই ছিল না, বরং এর মৌলিক কারণ ছিল ফেতনা-ফাসাদ, অন্যায়-অরাজকতা ও বাস্তবতাকে এড়িয়ে যাওয়া ও উপেক্ষা করার প্রবণতা যা এই সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা ও লালন-পালনের পয়লা দিন থেকেই বিদ্যমান ছিল। আর এই খারাবীটা সাম্রাজ্যের ভেতর গভীরভাবে শেকড় গেড়ে বসেছিল। কোন মানব সমাজ ও মনুষ্য দলের বিনির্মাণ যখন এ ধরনের দুর্বল ভিত্তির ওপর করা হয় তখন কেবল মেধা ও কর্মতৎপরতা এর পতন রোধ করতে পারে না। যেহেতু মন্দের ওপরই এই সাম্রাজ্যের বুনিয়াদ ছিল সেজন্য এর অবসান ও অধঃপতনও ছিল অনিবার্য। কেননা আমরা জানি যে, রোমক সাম্রাজ্য কেবল একটি ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর আরাম-আয়েশ ও বিলাস-ব্যসনের মাধ্যম ছিল। প্রজাসাধারণ থেকে অবৈধ স্বার্থ হাসিল এবং তাদের রক্ত চুষে রাজতন্ত্রের প্রতিপালনই ছিল এই হুকূমতের কাজ। নিঃসন্দেহে রোমান সাম্রাজ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য ইনসাফ, আমানতদারী ও বিশ্বস্ততার সাথেই চলছিল এবং এই

বিষয়টাকে হুকূমতের মৌলিক বৈশিষ্ট্যের অন্তর্গত বলে মনে করা হতো। আর একথাও অনস্বীকার্য যে, হুকূমত তার শক্তি-সামর্থ্য ও যোগ্যতার ক্ষেত্রে, অধিকন্তু তার প্রশংসনীয় বিচার-ব্যবস্থার ক্ষেত্রে ছিল অনন্য। কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও এই সব গুণ হুকূমতকে না পারত ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাতে আর না পারত বুনিয়াদী গলদগুলোর কঠোর কঠিন পরিণতি থেকে রক্ষা করতে।"[১]

রোমক শাসনাধীন মিসর ও সিরিয়া

ড. আলফ্রেড বাটলার রোমানদের অধীনে মিসর সম্পর্কে বলেন ঃ

"The whole machinery of rule in Egypt was directed to the sole purpose of wringing profit out of the ruled for the benefit of the rulers. There was no idea of governing for the advantage of the governed, of raising people in the social scale, of developing the moral or even the material resources of the country. It was an alien domination founded on force and making little pretence of sympathy with the subject race."

"মিসরে রোমান সরকারের সামনে কেবল একটাই লক্ষ্য ছিল আর তা হলো সম্ভাব্য যে কোন উপায়ে প্রজাবর্গকে নির্মমভাবে শোষণ করে শাসকবর্গের স্বার্থ চরিতার্থ করতে সহায়তা করা। প্রজাদের কিভাবে কল্যাণ হবে, তাদের সুখ-শান্তি ও প্রাচুর্য নিশ্চিত হবে, তাদের জীবনমান উন্নত হবে, এ ধরনের কোন চিন্তাই তাদের মনে ঠাঁই পেত না। প্রজাদের চরিত্র উন্নয়ন দূরের কথা, দেশের বস্তুগত উন্নয়ন বা শ্রীবৃদ্ধির চিন্তাও তাদের মাথায় ছিল না। মিসরের বুকে তাদের হুকূমত ছিল সেই বিদেশী হুকূমতের মতোই যারা কেবল নিজেদের বাহুবল ও শক্তির ওপরই নির্ভর করে এবং প্রজাদের প্রতি মমত্ব ও সহানুভূতি প্রকাশের আদৌ কোন গরজ তারা বোধ করে না।"[২]

একজন সিরীয় আরব ঐতিহাসিক রোমান শাসনাধীন সিরিয়া সম্পর্কে বলেনঃ

"প্রথম দিকে সিরীয়দের সঙ্গে রোমকদের সম্পর্ক বেশ ভাল ও ইনসাফপূর্ণ ছিল। আচার-আচরণ ছিল উত্তম। যদিও রোমক সাম্রাজ্যে অভ্যন্তরীণ বিশৃংখলা চলছিল কিন্তু তাদের হুকূমত যখন বার্ধক্যে উপনীত হলো তখন নিকৃষ্টতম গোলামির রূপ পরিগ্রহ করে এবং তারা তাদের অধীনস্থ প্রজাদের সঙ্গে নিকৃষ্টতম মনিবসুলভ আচরণ করে। রোমকরা সরাসরি সিরিয়াকে তাদের সাম্রাজ্যভুক্ত

১. Robert Brifault, The Making of Humanity. p- 159.

২. Arabs conquest of Egypt and the last Thirty years of the Roman Dominion, p-42.

করেনি এবং সিরিয়ার অধিবাসীরাও কখনোই রোমকদের ন্যায় নাগরিক অধিকার পায়নি, আর না তাদের এ ভূখণ্ডটি রোমক সাম্রাজ্যের মর্যাদা পেয়েছে। সিরীয়রা সর্বদাই বিদেশী লোকের ন্যায় থেকেছে। সরকারী রাজস্ব আদায় করতে না পেরে অধিকাংশ সময় তারা নিজেদের সন্তান পর্যন্ত বিক্রী করতে বাধ্য হতো। জুলুম-নিপীড়নের কোন সীমা ছিল না। ক্রীতদাস বানাবার ও বেগার শ্রম গ্রহণের সাধারণ রেওয়াজ ছিল। আর এই বেগার শ্রম দ্বারাই রোমক হুকুমত সেই সব প্রতিষ্ঠান ও শিল্প-কারখানা গড়ে তোলে যেগুলোকে রোমকদের গৌরবজনক কীর্তি বলে মনে করা হয়ে থাকে।"[১]

"রোমকরা সাত শ' বছর যাবত সিরিয়ায় রাজত্ব করে। তাদের আগমন ঘটতেই দেশের ভেতর অনৈক্য, বিভেদ, আত্মম্ভরিতা ও অহংকারের ভিত্তি স্থাপিত হয় এবং হত্যার ধারা শুরু হয়ে যায়। গ্রীকরা ৩৬৯ বছর সিরিয়ায় রাজত্ব করে। এই গোটা শাসনামলে মারাত্মক যুদ্ধ-বিগ্রহ সংঘটিত হয়, প্রজাদের ওপর জুলুম-নিপীড়ন চলে এবং গ্রীকদের লোভ-লালসা ও উগ্র কামনা-বাসনার নগ্ন রূপ প্রকাশ পায়। সিরীয়দের ওপর তাদের শাসনামল ছিল নিকৃষ্টতম দুর্বিপাক ও কঠিনতম শাস্তি।"[২]

উল্লিখিত বক্তব্যের সারবত্তা এই যে, বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীদের হাতে রোম ও পারস্যের অধীনস্থ দেশগুলো খুবই দুঃখ-কষ্ট ও বিপদাপদের ভেতর দিয়ে চলছিল এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক সবদিক দিয়েই এসব দেশের প্রাণকেন্দ্র রাজধানীগুলো সীমাহীন দুর্ভোগ পোহাচ্ছিল।

ইরানের রাজস্ব ব্যবস্থা

ইরানের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা না ছিল ন্যায়ভিত্তিক আর না ছিল সুসংহত, বরং অধিকাংশ অবস্থায় তা ছিল অসম ও নিপীড়নমূলক। রাজস্ব আদায়কারী আমলাদের চরিত্র ও মানসিকতা এবং রাষ্ট্রের সামরিক ও রাজনৈতিক অবস্থা মাফিক এই ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটত। 'সাসানী আমলে ইরান' নামক গ্রন্থের লেখক বলেনঃ রাজস্ব নির্ধারণ ও আদায়ের ক্ষেত্রে তহশীলদাররা আত্মসাৎ ও বলপূর্বক কর আদায় করত। রাজস্বের পরিমাণ নিরূপণ ও নির্ধারণের কোন নির্দিষ্ট নিয়ম না থাকায় এবং প্রতি বছর এর বিভিন্ন রকম হার নির্ধারিত হওয়ায় বছরের শুরুতে আয়-ব্যয়ের বাজেট তৈরি করা সম্ভব ছিল না। এছাড়া এসব ব্যাপার নিয়ন্ত্রণে রাখাও ছিল কঠিন। ফলে অনেক সময় রাজকোষ অর্থশূন্য থাকা অবস্থায়ই যুদ্ধ শুরু হয়ে যেত। কিছু অস্বাভাবিক হারে রাজস্ব ধার্য করা

---

১. কুর্দআলী, খুতাতু'শ-শাম, ১০১পৃ.।
২. প্রাগুক্ত, ১০৩ পৃ.।

তখন অপরিহার্য হয়ে পড়ত। আর এর জের গিয়ে পড়ত সব সময় পশ্চিমাঞ্চলের অর্থনৈতিক দিক দিয়ে সমৃদ্ধ প্রদেশগুলোর ওপর, বিশেষ করে ব্যবিলনের ওপর।[১]

পারসিক সাম্রাজ্যে রাজকোষ ও ব্যক্তিগত সম্পদ

জনগণের কল্যাণার্থে রাজকোষ থেকে ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ খুব বেশি ছিল না। পারস্য সম্রাটদের সব সময় এই নিয়ম ছিল যতটা সম্ভব রাজকোষে নগদ অর্থ-কড়ি ও মূল্যবান দ্রব্যাদি সঞ্চিত রাখা।[২] সম্রাট ২য় খসরু ৬০৭-৮ খ্রিস্টাব্দে তদীয় রাজকোষের অর্থ যখন তেসিফোনে (মাদায়েন-এ) নব নির্মিত অট্টালিকায় স্থানান্তরিত করেন সে সময় এতে রক্ষিত কেবল স্বর্ণের পরিমাণই ছিল ৪৬ কোটি ৮০ লক্ষ মিছকাল অর্থাৎ প্রায় ৩৭ কোটি ৫০ লক্ষ ফ্রাংক স্বর্ণমুদ্রা। রাজত্বের ত্রয়োদশ বর্ষের পরে তার রাজকোষে স্বর্ণের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে গিয়ে দাঁড়ায় ৮০ কোটি মিছকালে।[৩] কেবল তাঁর রাজমুকুটেই ১২০ পাউন্ড (প্রায় দেড় মণ) নিখাদ স্বর্ণ ছিল।[৪]

শ্রেণীভেদ

ইরানের জাতীয় জীবনে সম্পদ ও প্রাচুর্য গুটিকয়েক লোকের ভেতর সীমিত ছিল। হাতেগোণা কয়েকজন ছিল খুবই ধনাঢ্য ও সম্পদশালী। অবশিষ্ট সব লোক ছিল অত্যন্ত দরিদ্র ও দুর্দশাগ্রস্ত। ইরানের ইতিহাসে ন্যায়পরায়ণতা ও সুশাসনের জন্য সম্রাট নওশেরওয়াঁর শাসনামল প্রবাদ বাক্যের মত। 'সাসানী আমলে ইরান' নামক গ্রন্থের লেখক তাঁর শাসনামল সম্পর্কে লিখছেন :

"খসরু (নওশেরওয়াঁ)-এর অর্থনৈতিক সংস্কারের মধ্যে অবশ্য প্রজাদের তুলনায় রাজকোষের স্বার্থটাই বেশি প্রাধান্য পেয়েছিল। প্রজাসাধারণ সেই আগের মতই দুঃখ-দারিদ্র্য, অজ্ঞতা ও দুর্দশার মধ্যে জীবনাতিপাত করছিল। বায়যান্টাইন যে দার্শনিকরা পারস্য সম্রাটের দরবারে রাজনৈতিক আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন, এই দৃশ্যে সত্বরই ইরান সম্পর্কে তাঁরা বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েন এবং এর প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলেন। একথাও সত্য যে, তারা এত বড় মাপের

---

১. সাসানী আমলে ইরান, ১৬৩ পৃ. ২. প্রাগুক্ত, ১৬২ পৃ.। ৩. প্রাগুক্ত, ৬১১ পৃ. ৪. প্রাগুক্ত ৬২৭ পৃ. রাজমুকুটটি ছিল স্বর্ণ ও রৌপ্য নির্মিত এবং যমরূদ, ইয়াকূত ও মণি-মুক্তা খচিত ছিল। সম্রাটের মাথার ওপর ছাদের সঙ্গে স্বর্ণের শেকল সহযোগে লটকে থাকত। স্বর্ণের শেকলটি এত সূক্ষ্ম হত যে, একেবারে সিংহাসনের কাছাকাছি গিয়ে গভীরভাবে লক্ষ্য না করলে তা চোখেই পড়ত না। দর্শক দূর থেকে দেখতে পেত রাজমুকুট সম্রাটের মস্তকেই শোভা পাচ্ছে। আসলে মুকুটটি এত ভারী ছিল যে, কারুর পক্ষেই তা মাথায় ধারণ করা সম্ভব ছিল না। কেননা এর ওজন ছিল ৯১½ কিলোগ্রাম (দ্র. সাসানী আমলে ইরান, ৫৩১ পৃ.)।

দার্শনিক ছিলেন না যে, একটি ভিন্ন জাতির আচার-অভ্যাস ও প্রথা নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে দেখবেন এবং যেসব বিষয় একজন দার্শনিক-সম্রাটের সাম্রাজ্যে দেখতে ইচ্ছুক ছিলেন তা তাদের চোখে পড়বে না। যেহেতু জাতিগোষ্ঠীর ইতিহাস সম্পর্কে পড়াশোনায় তাঁদের আগ্রহ ছিল না এবং তাঁদের মানসিকতাও এমন ছিল না যেমনটি এ বিষয়ক একজন পাঠকের হয়ে থাকে। সেহেতু ইরানীদের কিছু কিছু প্রথা, যেমন নিষিদ্ধ মহিলা (আপন কন্যা, বোনদের) বিয়ে করার প্রথা অথবা মৃতদেহগুলোকে সকলে খাওয়ার জন্য উন্মুক্ত স্থানে রেখে দেবার ধর্মীয় রসম তাদেরকে ক্ষিপ্ত করে তোলে। কেবল এসব রসমই ছিল না যার দরুন ইরানে অবস্থান তাঁদের কাছে ভাল লাগেনি, বরং জাতিভেদ প্রথা, সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মাঝে অনতিক্রম্য ব্যবধান ও বিরাজমান দুর্দশা-দুরবস্থা যার ভেতর নিম্ন শ্রেণীর মানুষগুলো জীবন যাপন করছিল এসব মানুষের কাছে অসহনীয় ছিল। এসব দৃশ্য দেখেশুনেই তাঁরা ত্যক্ত-বিরক্ত হয়ে ওঠেন। আরও দেখতে পান, সমাজের সবল ও শক্তিশালী লোকেরা দুর্বল লোকদের ওপর নিপীড়ন চালাচ্ছে এবং তাদের সঙ্গে নির্মম ও নির্দয় আচরণ করছে।"[১]

এ অবস্থা কেবল ইরানেই ছিল না। তার সমসাময়িক ও প্রতিদ্বন্দ্বী বায়যান্টাইন সাম্রাজ্যেও মারাত্মক ধরনের শ্রেণী বৈষম্য বিরাজ করছিল। রবার্ট ব্রিফল্ট বলেন:

"When a social structure visibly threatens to topple down, ruler's try to prevent it from falling by preventing it from moving. The whole Roman society was fixed in a system of castes; no one was to change his avocation, the son must continue in the calling of his father."

"এটাই নিয়ম যে, যখনই কোন সামাজিক প্রতিষ্ঠান ধ্বংসোন্মুখ হয় তখন এর চালক তার গতি ও অগ্রসরমানতাকে থামিয়ে দেয়া ছাড়া আর কোন উপায় খুঁজে পান না। এজন্যই রোমান সমাজ (তাদের পতন যুগে) কঠিন ধরনের নিপীড়নমূলক শ্রেণীভেদের লৌহশৃঙ্খলে আষ্টেপৃষ্ঠে বন্দী হয়ে পড়েছিল। সমাজের কারোর এমন ক্ষমতা ছিল না যে, তার পেশা পাল্টাবে। সন্তানের জন্য তার পৈতৃক পেশা অবলম্বন করা ছিল বাধ্যতামূলক।"[২]

উভয় সাম্রাজ্যে বড় বড় পদ প্রভাব-প্রতিপত্তির মালিক অভিজাতদের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। শাসক মহলের সাথে তাদেরই দহরম মহরম ছিল।

---

১. সাসানী আমলে ইরান, অগাথিয়াস-এর বরাতে, ৩০-৩৭ পৃ.।২. The Making of Humanity. p. 160.

ইরানের কৃষককুল

নিত্য নতুন করভারে জনগণের কোমর ভেঙে গিয়েছিল। বহু কৃষকই কৃষিকাজ ও ক্ষেত-খামার ছেড়ে দিয়েছিল। এসব করের হাত থেকে পরিত্রাণ লাভ এবং বাধ্যতামূলক সামরিক বাহিনীতে যোগদানের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পাবার আশায়, যার প্রতি তাদের আদৌ কোন আগ্রহ ছিল না, তারা খানকাহ ও উপাসনালয়ে গিয়ে আশ্রয় নিত। কেননা যেই লক্ষ্যে ও উদ্দেশে যুদ্ধ সংঘটিত হতো সেসব লক্ষ্য ও উদ্দেশের ব্যাপারে তাদের আদৌ আকর্ষণ ছিল না। ফলে বেকারত্ব ও অপরাধপ্রবণতা বৃদ্ধি পায় এবং অবৈধ পন্থায় টাকা-পয়সা উপার্জনের ব্যাধি সর্বত্র বিস্তার লাভ করে। 'সাসানী আমলে ইরান' নামক গ্রন্থের লেখক রাষ্ট্রের খাদ্য উৎপাদন ও আমদানী রাজস্বের প্রধান মাধ্যম ইরানের কৃষককুল সম্পর্কে লেখেন:

"কৃষকদের অবস্থা ছিল খুবই করুণ। তাদের ভাগ্য ছিল তাদের জমির সঙ্গে বাঁধা। বেগার শ্রমসহ সর্বপ্রকার শ্রমের কাজই তাদের থেকে গ্রহণ করা হতো। ঐতিহাসিক আম্মিয়ান মার্সেলিনিউস বলেন, 'বিশাল সৈন্যবাহিনীর পেছনে ঐসব হতভাগ্য কৃষককে পদব্রজে চলতে হতো। চিরস্থায়ী গোলামিই ছিল যেন ঐসব কৃষকের বিধিলিপি। এজন্য তাদের কোন প্রকার বেতন কিংবা পারিশ্রমিক দিয়ে উৎসাহিত করা হতো না'।[১] জমিদারদের সাথে কৃষকদের সম্পর্ক ছিল অনেকটা সেইরূপই যেরূপ সম্পর্ক থাকে মনিবের সঙ্গে ক্রীতদাসের।"[২]

শাসকদের আচরণ

আমলা ও প্রশাসনিক কর্মকর্তাবৃন্দ সাধারণ জনগণ ও রাজ্যের প্রজাবৃন্দের সঙ্গে এমন রূঢ় ও নির্মম আচরণ করত যা ছিল বর্ণনাতীত। এ ব্যাপারে তারা ছিল নিদারুণ অসহায়। ঐসব কর্মকর্তা ও আমলা জনগণের জান-মালের যেমন কোন পরওয়াই করত না, তেমনি পরওয়া করত না তাদের ইয্যত-আব্রুর। লোকে অভিযোগ করত কিন্তু যাদের হাতে ক্ষমতার বাগডোর ছিল তারা এসবের প্রতি আদৌ কর্ণপাত করত না। লোকেরা শেষাবধি ধরেই নিয়েছিল যে, এই আঁধারপুরীই তাদের ভাগ্যের লিখন। এর হাত থেকে মুক্তির আর কোন পথ নেই। কোন কোন সময় তারা এ ধরনের জীবন যাপনের চেয়ে মৃত্যুকেই শ্রেয় জ্ঞান করত।

---

১. সাসানী আমলে ইরান, ৪২৪ পৃ:।

২. প্রাগুক্ত।

কৃত্রিম সমাজ ও ভোগ-বিলাসপূর্ণ জীবন

রোম ও পারস্যে উভয় স্থানেই সাধারণভাবে লোকের কাঁধে ভোগ-বিলাসিতার এক ভূত চেপে বসেছিল। কৃত্রিম সভ্যতা ও প্রতারণাপূর্ণ জীবনের এক সর্বগ্রাসী প্লাবন জেঁকে বসেছিল—যার ভেতর তারা আপাদমস্তক নিমজ্জিত ছিল। রোম ও পারস্যের সম্রাট এবং তাদের আমীর-উমারা ও অমাত্যবর্গ অলস ঘুমে ছিল বিভোর। মজা ওড়াও, ফুর্তি কর, এ ছাড়া আর কোন চিন্তা-ভাবনা তাদের মস্তিষ্কে ঠাঁই পেত না। ভোগ-বিলাসিতার এমন এক স্বর্গরাজ্য তারা কায়েম করেছিল যেখানে কল্পনার পাখাও গিয়ে পৌঁছুতে পারবে না। চাকচিক্য ও জৌলুসপূর্ণ জীবন, ভোগ-বিলাস ও আরাম-আয়েশের প্রাচুর্যে ছিল ভরপুর এবং এসব এত সূক্ষ্ম ও কারুকার্যময় ছিল যে, তাতে বুদ্ধিবিভ্রম ঘটা আদৌ বিচিত্র ছিল না।[১] পার্সী ঐতিহাসিক শাহীন ম্যাকারিয়স-এর বর্ণনা মুতাবিক, পারস্য সম্রাট খসরু পারভেযের মহলে বারো হাজার রমণী ছিল, পঞ্চাশ হাজার ছিল উৎকৃষ্ট জাতের ঘোড়া, অগণিত মহল, নগদ অর্থ, হীরা জওয়াহেরাত ও নানাবিধ ভোগ-বিলাস সামগ্রী যার পরিমাপ করাও ছিল কঠিন। তার মহল আপন শান-শওকতে ও জৌলুস বৈচিত্র্যে ছিল তুলনাহীন।[২] ঐতিহাসিক ম্যাকারিয়স বলেন ঃ ইতিহাসে এর দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যায় না যে, কোন বাদশাহ পারস্য সম্রাটদের মত বিলাসিতার স্রোতে এভাবে গা ভাসিয়েছেন যাদের কাছে উপহার-উপঢৌকন ও রাজস্বের অর্থ মধ্যপ্রাচ্য ও দূর প্রাচ্যের শহরসমূহ থেকে আসত।[৩] মুসলিম বিজয়ের পর যখন ইরানীরা ইরাক থেকে উৎখাত হয় তখন তারা যেসব মহামূল্যবান দ্রব্য-সামগ্রী পেছনে ফেলে গিয়েছিল তার মূল্য নির্ণয় করাও কঠিন। পরিত্যক্ত সামগ্রীর মধ্যে মূল্যবান জড়োয়া সেট, স্বর্ণ ও রৌপ্য পাত্র, রূপচর্চা সামগ্রী ও সুগন্ধি দ্রব্য প্রধান। তাবারীর বর্ণনা মুতাবিক আরবরা মাদায়েন জয়ের পর এমন সব তাঁবু পেয়েছিল যেগুলো মোহরাংকিত সাজপূর্ণ ছিল। আরবরা বলেন, আমরা মনে করেছিলাম এর ভেতর বুঝি খাবারসামগ্রী আছে। খোলার পর জানতে পারলাম ওগুলো স্বর্ণ ও রৌপ্য পাত্র।[৪]

ঐতিহাসিকগণ একটি কার্পেটের বর্ণনা দিয়েছেন যার ওপর বসে রাজসভাসদ ও অমাত্যবর্গ বসন্ত মৌসুমে মদ পান করত।

এ প্রসঙ্গে তাঁরা লিখেছেন:

'এর আয়তন ছিল ষাট বর্গ গজ। প্রায় এক একর জমির ওপর তা বিছানো যেতো। এর যমীন ছিল স্বর্ণের যার জায়গায় জায়গায় হীরা-জওয়াহেরাত ও

১. বিস্তারিত দ্র. সাসানী আমলে ইরান, ৯ম অধ্যায়। ২. তারীখে ইরান, শাহীন ম্যাকারিয়সকৃত, মিসর সং ১৮৯৮, পৃ. ৯০। ৩. প্রাগুক্ত, ২১১ পৃ. ৪. তারীখে তাবারী।

মণি-মুক্তার পুষ্প অংকিত ছিল। পুষ্প উদ্যান ছিল যার ভেতর ফুলযুক্ত ও ফলবান বৃক্ষ অবস্থিত ছিল। বৃক্ষের শাখা ছিল স্বর্ণের আর পাতা ছিল রেশমের। ফুলের কলি ছিল স্বর্ণ-রৌপ্যের আর ফল ছিল হীরা-জওয়াহেরাতের। এর চতুষ্পার্শ্ব ছিল হীরার ঝালরযুক্ত আর মাঝখানে বানানো হয়েছিল বীথিকা ও আঁকাবাঁকা নহর। আর এর সবই ছিল হীরা-জওয়াহেরাতের। হেমন্তকালে সাসানী বংশের রাজমুকুটধারিগণ এই হৈমন্তিক নিরসতাবিহীন উদ্যানে বসে শরাব পান করত এবং বিত্ত-সম্পদের এক বিস্ময়কর মনোহর দৃশ্য দৃষ্টিগোচর হতো যা ইতিপূর্বে কেউ কখনো কোথাও দেখেনি।[১]

রোমান শাসনামলে সিরিয়া ও এর কেন্দ্রীয় শহরগুলোরও ঐ একই অবস্থা ছিল। এই উভয় হুকুমত বিলাসপ্রিয়তা ও সূক্ষ্ম শিল্পকলার ক্ষেত্রে একে অন্যকে ছাড়িয়ে যাবার প্রতিযোগিতায় ছিল লিপ্ত। রোমক সম্রাটগণ, তাদের সিরীয় নেতৃবর্গ ও প্রশাসকবৃন্দ খোলাখুলি ও প্রকাশ্যভাবে এর পৃষ্ঠপোষকতা করে। তাদের আলীশান মহল, দীওয়ানখানা, মদ্য পান ও নৃত্যগীতের মাহফিলগুলো বিলাস উপকরণ, সম্পদ ও প্রাচুর্যের আসবাব দ্বারা পরিপূর্ণ ছিল। ইতিহাস ও কিংবদন্তী থেকে জানা যায় যে, এই সব লোক বিলাসপ্রিয়তা ও আয়েশী বেশভূষার ক্ষেত্রে বহু দূর এগিয়ে গিয়েছিল। হযরত হাসসান ইবন ছাবিত (রা) যিনি ইসলাম গ্রহণের পূর্বে সিরিয়ার গাসসানী আমীর-উমারার দরবারে গিয়েছিলেন, জাবালা ইবনুল আয়হামের এ জাতীয় মজলিসের ছবি এঁকেছেন এভাবে ঃ

"আমি দশজন দাসী দেখলাম, যাদের পাঁচজনই ছিল রোমের। তারা এক প্রকার বাদ্যযন্ত্রের সাহায্যে গান গাইছিল। আর বাকি পাঁচজন হীরার। তারা স্থানীয় সুরে গাইছিল যাদেরকে আরব সর্দার ইয়াস ইবন কুবায়সা উপঢৌকনস্বরূপ পাঠিয়েছিল। এ ছাড়া আরব এলাকা, মক্কা প্রভৃতি থেকেও গায়ক-গায়িকাদের দল যেত। জাবালা যখন শরাব পানের জন্য বসত, তখন তার বসার ফরাশের ওপর নানা রকমের ফুল-চামেলী, জুঁই প্রভৃতি বিছিয়ে দেওয়া হতো এবং স্বর্ণ ও রৌপ্য নির্মিত পাত্রে মিশ্‌ক ও আম্বর পরিবেশিত হতো। রৌপ্যের তশতরীতে বিশুদ্ধ ও নির্ভেজাল কস্তুরী নিয়ে আসা হতো। শীতকালে সুগন্ধ চন্দন কাঠ জ্বালানো হতো। আর গ্রীষ্মকাল হলে বরফ বিছানো হতো এবং তার ও তার সাথীদের জন্য গ্রীষ্মের বিশেষ পোশাক নিয়ে আসা হতো যা দিয়ে তারা শরীর ঢাকত। শীতকালে মূল্যবান পশমী ও চর্মবস্ত্রাদি হাজির করা হতো।[২]

---

১. তারীখে ইসলাম, মওলভী আবদুল হালীম শররকৃত, ১ম খণ্ড, ৩৫৪ পৃ. তারীখে তাবারী থেকে গৃহীত।
২. তারীখে তাবারী , ৪র্থ খণ্ড, ১৭৮ পৃ.।

বিভিন্ন প্রদেশ ও রাজ্যের গভর্নর, শাহযাদা, আমীর-উমারা ও উচ্চবিত্ত অভিজাত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেরা বাদশাহ্‌র পদাংক অনুসরণ করে চলত এবং পানাহার, পোশাক-পরিচ্ছদ ও জীবনযাত্রায় তাদের অনুকরণ করতে চেষ্টা করত। জীবনমান খুবই উঁচু এবং সমাজ খুবই জটিল হয়ে গিয়েছিল। মানুষ তার নিজের জন্য, নিজ বসন-ভূষণের কোন একটি অংশের জন্য এত বেশি পরিমাণে খরচ করত যা একটি গোটা গ্রাম, মহল্লা কিংবা একটা গোটা বস্তির ভরণ-পোষণ ও লজ্জা নিবারণের ব্যয় নির্বাহের জন্য যথেষ্ট হতো। আর এমনটি করা সমাজ নিন্দা ও অবমাননার ভয়ে প্রত্যেক বিশিষ্ট ও শরীফ লোকের জন্য অবশ্য করণীয় ছিল, এমন কি এও জীবনের এক অপরিহার্য ও অপরিবর্তনীয় প্রয়োজনে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। শা'বী বলেন, ইরানের লোকেরা তাদের মাথায় যেই টুপি পরিধান করত তা হতো তাদের গোত্রীয় ও অবস্থানগত মর্যাদা মাফিক। গোত্রের শীর্ষস্থানীয় অভিজাত ও মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিটির টুপি হতো এক লক্ষ দিরহাম মূল্যের। এদেরই অন্যতম ছিলেন হরমুয। হীরা-জওয়াহেরাত-খচিত তাঁর শিরোপার মূল্য ছিল এক লক্ষ দিরহাম।[১] আভিজাত্যের মাপকাঠি ছিল এই যে, তিনি ইরানের সাতটি শীর্ষস্থানীয় খান্দানের কোন একটির সদস্য হবেন। পারস্য সম্রাট কর্তৃক নিযুক্ত হীরার গভর্নর ছিলেন আযাদিয়া (যাদওয়ায়হ্)। সামাজিক অবস্থানগত মর্যাদার দিক দিয়ে তার অবস্থান ছিল দ্বিতীয় পর্যায়ের। এজন্য তার শিরোপার মূল্য ছিল ৫০ হাজার দিরহাম।[২] রুস্তমের মাথায় যে শিরোপা স্থান পেত তা সত্তর হাজার দিরহাম মূল্যে বিক্রী হয়েছিল আর এর প্রকৃত মূল্য ছিল এক লক্ষ দিরহাম।[৩]

লোকে এই চরমপন্থী সমাজ ও এর ধ্বংসাত্মক ঠাঁটবাটে এভাবে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল এবং এই সংস্কৃতি তাদের শিরা-উপশিরায় ও অস্থিমজ্জায় এমনভাবে মিশে গিয়েছিল যে, এই কৃত্রিম লৌকিকতা ও আচার-অনুষ্ঠান তাদের দ্বিতীয় স্বভাবে পরিণত হয়ে গিয়েছিল এবং এর থেকে সরে আসা তাদের জন্য অসম্ভবপ্রায় হয়ে গিয়েছিল। নাযুক থেকে নাযুকতর মুহূর্তেও এবং কঠিনতর আপতকালেও সহজ সরল জীবন যাপন ও সাধারণ পর্যায়ে নেমে আসা তাদের পক্ষে ছিল অসম্ভব। মুসলমানদের হাতে মাদায়েনের পতনের মুহূর্তে পারস্যের শেষ সম্রাট ইয়াযদাগির্দকে কী অসহায় অবস্থায় রাজধানী ছেড়ে পালাতে হয়েছিল তা সহজেই অনুমেয়। কিন্তু এরূপ তাড়াহুড়া ও পেরেশান অবস্থায়ও তিনি তাঁর সাথে যে পরিমাণ দ্রব্যসম্ভার নিয়ে গিয়েছিলেন তা থেকেই উক্তরূপ মানসিকতা ও

১. তারীখে তাবারী, ৪র্থ খণ্ড,, ৬ পৃ.।

২. প্রাগুক্ত, ১১ পৃ। ৩. প্রাগুক্ত, ১৩৪ পৃ.।

সাংস্কৃতিক মাপকাঠি সম্পর্কে পরিমাপ করা যাবে। 'সাসানী আমলে ইরান' নামক গ্রন্থের লেখক বলেন ঃ

"ইয়াযদাগির্দ তাঁর সাথে এক হাজার বাবুর্চি, এক হাজার গায়ক, এক হাজার চিতা বাঘের রক্ষক, এক হাজার বাদ্যবাদক, এক হাজার বাজ পক্ষীপালক এবং আরও বহু লোক নিয়েছিলেন। আর এ সংখ্যাও তাঁর মতে তাঁর মর্যাদার তুলনায় খুবই কম ছিল।"[১]

পরাজয়ের পর হরমুযান যখন প্রথমবারের মত মদীনায় আগমন করল এবং হযরত ওমর (রা)-এর মজলিসে হাজির হলো তখন সে পানি চায়। একটা মোটা পেয়ালায় পানি আনা হলে সে বলেছিল ঃ আমি পিপাসায় মারা যাই সেও ভাল, কিন্তু এই বিশ্রী পেয়ালায় পানি পান করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। এরপর অনেক খোঁজাখুঁজি করে অন্য পাত্রে পানি আনা হলে সে তা পান করে।[২]

এই দু'টো ঘটনা থেকেই পরিমাপ করা যাবে যে, ইরানীদের অভ্যাস কতটা বিকৃত, কৃত্রিম জীবন ও লৌকিকতায় তারা কতটা অভ্যস্ত এবং প্রকৃতিসম্মত সহজ সরল জীবনযাত্রা থেকে কতটা দূরে সরে গিয়েছিল!

অর্থের প্রাচুর্য ও বিত্তের ছড়াছড়ি

এরূপ বিলাসিতা ও অপচয়পূর্ণ জীবনের অনিবার্য পরিণতি ছিল এই যে, সাধারণ জনগণের ওপর এত বিবিধ প্রকার কর ধার্য করা হবে যার ভার বহন করা হবে তাদের সাধ্যাতীত। এমন সব আইন নিত্যই প্রণীত হবে যার দৃষ্টিকোণ থেকে কৃষক, ব্যবসায়ী, শিল্পী ও কারিগরদের উপার্জিত সম্পদ নানাভাবে শোষণ করা যায়। পরিণতি এতদূর গিয়ে পৌঁছে যে, নিত্য দিনের এই বর্ধিত ও বিপুল অংকের করভারে প্রজাদের কোমর ভেঙে যায় এবং হুকুমতের নিত্য নতুন চাহিদা মেটাতে গিয়ে তাদের শিরদাঁড়া বেঁকে যায়। 'সাসানী আমলে ইরান' গ্রন্থের লেখক বলেন:

"নিয়মিত কর ছাড়াও প্রজাবৃন্দের কাছ থেকে নযরানা গ্রহণের প্রথা আইনের নামে চালু ছিল। এই আইন অনুসারে ঈদ, নওরোয ও মেহেরগান উপলক্ষে লোকের কাছ থেকে যবরদস্তিমূলকভাবে উপঢৌকন আদায় করা হতো। শাহী ভাণ্ডারের আমদানী উৎসের ভেতর আমাদের ধারণায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উৎস ছিল জায়গীর থেকে প্রাপ্ত রাজস্ব আয় এবং সেই সব উপায় বা মাধ্যম যা সম্রাটের বিশেষ অধিকার হিসেবে নির্ধারিত ছিল। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়

---

১. সাসানী আমলে ইরান, ৬৮১ পৃষ্ঠা;
২. তাবারীর ইতিহাস, ৪র্থ, ১৬১ পৃ.।

যে, আর্মেনিয়ায় অবস্থিত ফারিঙ্গী এলাকার স্বর্ণ-খনির যাবতীয় আয় সম্রাটের ব্যক্তিগত আয় হিসেবে গণ্য ছিল।"[১]

সিরীয় ঐতিহাসিক রোমক হুকুমতের কর্মপন্থা এবং এর আমদানি-রফতানি সম্পর্কে লিখতে গিয়ে বলেন:

"সিরীয় প্রজাদের ওপর হুকুমতের পক্ষ থেকে নির্ধারিত কর আদায় করা বাধ্যতামূলক ছিল এবং তাদের উৎপাদিত দ্রব্য ও আয়-উপার্জনের এক-দশমাংশ ও মূলধনের ট্যাক্স দিতে হতো। মাথাপ্রতি একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদান করা বাধ্যতামূলক ছিল। এছাড়াও রোমকদের আয়-আমদানির অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ উৎসও ছিল, যেমন নগর শুল্ক, বাণিজ্য শুল্ক ও অন্যবিধ রাজস্ব। এ ছাড়া যেসব জমি গম চাষের উপযোগী ও পশু চারণ ভূমি সেগুলো চুক্তির ভিত্তিতে ইজারা দেওয়া হতো আর এসব ইজারাদার (ঠিকাদার)-কে 'আশশারীন' বলা হতো। এসব লোক সরকার থেকে টোল আদায়ের অধিকার খরিদ করত এবং প্রজাদের থেকে ধার্যকৃত অর্থ আদায় করত। প্রতি প্রদেশে এই সব ইজারাদারের কয়েকটি কোম্পানী থাকত। আর এই সব কোম্পানীতে কিছু মুনশী ও তহশীলদার নিয়োগপ্রাপ্ত হতো যারা নিজেদেরকে অফিসার ও মালিক পক্ষের প্রতিনিধিরূপে জনগণের সামনে পেশ করত এবং নির্ধারিত হারের অতিরিক্ত কর আদায় করত। তারা সাধারণ মানুষকে আরাম ও আয়েশী জীবন যাপনের উৎস থেকে মাহরূম করত এবং প্রায়ই তাদেরকে ক্রীতদাসের ন্যায় বিক্রিও করে দিত।"[২]

রোমকদের রাজনৈতিক নীতি-পদ্ধতি সম্পর্কে কেউ নিম্নোক্তভাবে বর্ণনা দিয়েছেন ঃ

"উত্তম রাখাল সেই যে তার ভেড়ার লোম কাটে বটে, কিন্তু চেঁছে ফেলে না। ঘটনা এই যে, দুই শতাব্দী অতিক্রান্ত হয়ে গেছে রোম সম্রাট তাঁর সাম্রাজ্যের বাসিন্দাদের লোম কাটছেন (চেঁছে ফেলতে চেষ্টা করেন নি)। তিনি তাদের থেকে বিরাট অংকের অর্থ আদায় করছেন, কিন্তু একই সঙ্গে তাদেরকে বহিঃশত্রুর হাত থেকে রক্ষাও করছেন।"[৩]

জনগণের দুঃখ-দুর্দশা

রোম ও পারস্য উভয় সাম্রাজ্যের অধিবাসীরা দু'টো পৃথক শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল। এই দুই শ্রেণীর ভেতর সুস্পষ্ট পার্থক্য ছিল। এক শ্রেণীতে ছিলেন

১.সাসানী আমলে ইরান, ১৬১ পৃ.।
২. খুতাতু'শ-শাম, মুহাম্মদ কুর্দ আলীকৃত, ৫ম খণ্ড, ৪৭ পৃ.। ৩. প্রাগুক্ত।

রাজা-বাদশাহ, শাহযাদাবৃন্দ, দরবারের সঙ্গে যুক্ত সভাসদ, তাদের পরিবারবর্গ, আত্মীয়-বান্ধব ও তাদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট জায়গীরদার ও বিত্তশালী সম্প্রদায়। এ সমস্ত লোক চিরশ্যামল সবুজ বসন্ত উদ্যানে পুষ্প শয্যায় জীবন যাপন করত। তাদের ঘরের লোক ও শিশুরা সোনা-চাঁদি নিয়ে খেলা করত এবং দুধ ও গোলাপ জলের মধ্যে গোসল করত। তাদের ঘোড়ার নালগুলোও তারা জওয়াহেরাত দ্বারা মুড়িয়ে রাখত এবং দরজা ও দেওয়ালগুলোকেও রেশম ও কিংখাব দ্বারা সজ্জিত করত।

দ্বিতীয় শ্রেণী ছিল কৃষক, শ্রমিক, শিল্পী ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী বণিকদের যাদের জীবন ছিল আপাদমস্তক দুঃখ-কষ্টে পরিপূর্ণ। এরা জীবনের বোঝা, নিত্য-নৈমিত্তিক ট্যাক্স ও উপহার-উপঢৌকনের ভারে নিষ্পেষিত হচ্ছিল। তাদের শরীরের প্রতিটি গ্রন্থি-উপগ্রন্থি নানারূপ দাবির সঙ্গে আষ্টে-পৃষ্ঠে বাঁধা ছিল। আর তারা এই জাল ছিন্ন করার জন্য যেই পরিমাণ চেষ্টা করত এবং যেই পরিমাণ হাত-পা ছোঁড়াছুঁড়ি করত সেই জাল ঢিলা হবার পরিবর্তে আরও বেশি কষে যেত। এই কঠিন ও কষ্টপূর্ণ জীবনের ওপর আরেকটি মুসীবত ছিল এই যে, তারা অনেক ব্যাপারেই উচ্চ শ্রেণীর অনুকরণ করতে গিয়ে আরো বেশি পেরেশানীর শিকার হতো জীবন যাত্রার অপরিহার্য প্রয়োজন মেটানোর ক্ষেত্রে তাদের যেটুকুর সম্মুখীন হতে হতো না। ফলে তাদের জীবন ছিল অহরহ বিস্বাদ এবং আপাদমস্তক যন্ত্রণাপূর্ণ। তাদের মস্তিষ্ক সর্বদাই পেরেশান ও বিশৃংখল থাকত। প্রকৃত শান্তি-সুখ ও চিত্তের প্রশান্তি তাদের কখনোই জুটতো না।

লাগামহীন বিত্তবান ও আত্মবিস্মৃত দরিদ্র

পুঁজিবাদের অবাধ্যতা ও আল্লাহ্-বিস্মৃতি এবং দারিদ্রের অসহায়ত্ব ও আত্মবিস্মৃতির দুই চরম প্রান্তিকতার মাঝে আম্বিয়া আলায়হিমুস সালামের দাওয়াত ও তা'লীম দোদুল্যমান ছিল। মহৎ চরিত্র ও জীবনের উন্নত মূলনীতি গোটা সভ্য দুনিয়ায় পরিত্যক্ত ও অকার্যকর মনে করা হচ্ছিল। ধনী ও বিত্তবানদের নিজেদের ক্রীড়া-কৌতুকের নেশা ও বিলাস-ব্যসনের দরুন ফুরসৎই ছিল না যে তারা দীন-ধর্ম কিংবা পরকাল সম্পর্কে কিছু ভাববে। কৃষক ও শ্রমিক শ্রেণীর জীবন-যন্ত্রণা নিত্যকার চিন্তা-ভাবনা ও জীবনের বর্ধিত দাবি তাদের এই অবকাশই দিত না যে, তারা প্রতিদিনের খোরাক ও প্রয়োজনাদি ছাড়া আর কোন দিকে মনোনিবেশ করবে। মোটকথা, জীবন ও জীবনের দাবি ধনী-দরিদ্র সকলকেই ব্যতিব্যস্ত করে রেখেছিল এবং এরই ভেতর সবাই পেরেশান ছিল। জীবনের চাকা তার পূর্ণ শক্তিতে ঘুরছিল যদ্দরুন তাদের এতটুকু অবকাশ ছিল

না যে, তারা দীন-ধর্মের দিকে মনোসংযোগ করবে এবং হৃদয় ও আত্মা সম্পর্কে, মানবতার উন্নততর মূল্যবোধ সম্পর্কেও একটু চিন্তা-ভাবনা করবে।

হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ (র) [মৃ. ১১৭৬ হি.] তদীয় বিখ্যাত গ্রন্থ 'হুজ্জাতুল্লাহি'ল-বালিগা'-য় ইসলাম-পূর্ব যুগের এমত অবস্থারই পরিপূর্ণ ছবি এঁকেছেন এভাবে ঃ

"শতাব্দীর পর শতাব্দী থেকে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করতে করতে এবং দুনিয়ার স্বাদ ও আমোদ-আহ্লাদের ভেতর লিপ্ত থেকে পরকালীন জীবন একেবারেই বিস্মৃত হবার এবং শয়তানের পরোপুরি খপ্পরে পড়ে যাবার দরুন ইরানী ও রোমীয়দের জীবনের সারল্য ও উপকরণের ভেতর বিরাট সূক্ষ্ম দৃষ্টি ও নাযুক ধারণা সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল। তারা বিলাসবহুল জীবন যাত্রার ক্ষেত্রে পরস্পরে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত হয়। দুনিয়ার নানা প্রান্ত থেকে এসব কেন্দ্রে বড় বড় গুণী ও কুশলী শিল্পী এসে জমায়েত হয়েছিল যারা এসব বিলাস উপকরণ ও আরাম-আয়েশের ভেতর কমনীয়তা ও পেলবতা সৃষ্টি করত এবং নিত্য-নতুন সাজগোজ ও প্রসাধনী বের করত। এরপর তাৎক্ষণিকভাবে এর ওপর আমল শুরু হয়ে যেত। কেবল তাই নয়, বরাবর তা বৃদ্ধি পেতে থাকত এবং এ নিয়ে গর্ব করা হতো। জীবনমান এতটা বৃদ্ধি পেয়েছিল যে, আমীর-উমারার ভেতর কারুর এক লক্ষ টাকার কম মূল্যের মেখলা বা কোমর বন্ধনী বা শিরোভূষণ পরিধান রীতিমত অমর্যাদাকর ছিল। যদি কারুর কাছে আলীশান মহল, ফোয়ারা, হাম্মাম, বাগ-বাগিচা, উত্তম খোরাক, তৈরি পশু, সুদর্শন যুবক ও দাস-দাসী না থাকত, খাবারের ভেতর লৌকিকতা এবং পোশাক-পরিচ্ছদের ভেতর শোভা-সমৃদ্ধি না থাকত তাহলে সতীর্থদের মধ্যে তার কোন সম্মান হতো না। এর ফিরিস্তি অনেক দীর্ঘ। নিজ দেশের রাজা-বাদশাহদের[১] অবস্থা সম্পর্কে যা দেখছ ও জান এর থেকেই তোমরা তা অনুমান করতে পারবে।

"এই সব লৌকিকতা তাদের জীবন ও সমাজ-সামাজিকতার অংশে পরিণত হয়ে গিয়েছিল এবং তাদের দিলের ভেতর এমনভাবে বসে গিয়েছিল যা কোনভাবেই বের হবার নয়। এর ফলে এমনই এক দুরারোগ্য ব্যাধি সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল যা তাদের গোটা নাগরিক জীবন এবং তাদের সমগ্র সাংস্কৃতিক রীতিনীতির ভেতর অনুপ্রবেশ করেছিল। এ ছিল এক বিরাট মুসীবত যার হাত থেকে বিশিষ্ট ও সাধারণ, ধনী-গরীব কেউই মুক্ত ছিল না। প্রত্যেক নাগরিকের ওপর এই কৃত্রিম লৌকিকতাপূর্ণ ও আমীরানা জীবনযাত্রা এমনই জেঁকে বসেছিল যা তাদের জীবনকে দুর্বহ ও দুর্বিষহ করে তুলেছিল এবং তাদের মাথার ওপর

---

১. দিল্লীর মুগল সম্রাটদের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

দুশ্চিন্তা ও দুর্ভাবনার এক বিরাট পাহাড় সব সময় ঝুলত। ব্যাপার ছিল এই যে, এই সব লৌকিকতা বিরাট অংকের অর্থ ব্যয় ব্যতিরেকে হাসিল করা যেত না। আর এই সব অর্থ ও অপরিমেয় সম্পদ কৃষককুল, ব্যবসায়ী বণিক ও অপরাপর পেশাজীবী লোকদের ওপর খাজনা-ট্যাক্স না বসিয়ে ও বিবিধ প্রকার কর বৃদ্ধি না করে, তাদের জীবনকে দুর্বিষহ করে না তুলে সংগ্রহ করা সম্ভব ছিল না। যদি তারা এসব দাবি পূরণ করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করত তাহলে তাদের ওপর লোক-লশকর, পাইক-পেয়াদা ও বরকন্দাজ নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ত এবং তাদের শাস্তি দেওয়া হতো। আর দাবি পূরণ করলে তাদেরকে গাধা ও কলুর বলদ বানানো হতো যাদের দিয়ে ক্ষেতে পানি দেওয়াসহ ক্ষেত মজুরের কাজ নেওয়া হতো। আর কেবল শ্রম দেবার জন্যই তাদের লালন-পোষণ করা হতো। কঠোর-কঠিন শ্রমের হাত থেকে তারা কখনোই মুক্তি পেত না। এই কঠোর শ্রমপূর্ণ ও পশু জীবনের ফল হতো এই যে, তারা কোনদিনই মাথা তুলবার এবং পরকালীন সৌভাগ্য লাভের চিন্তা বা ধারণা করবারও অবকাশ পেত না। অনেক সময় গোটা দেশে এমন একজন লোকও পাওয়া যেত না যার কাছে আপন দীন বা ধর্মের কোন চিন্তা-ভাবনা বা গুরুত্ব থাকত।"[১]

বিশ্বব্যাপী অন্ধকার

মোদ্দা কথা, এই ঈসায়ী ৭ম শতাব্দীতে সমগ্র পৃথিবীতে এমন কোন জাতিগোষ্ঠী দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল না যাদেরকে সুরুচিসম্পন্ন বলা যায়। সে যুগে না ছিল কোন উচ্চতর মূল্যবোধের ধারক-বাহক কোন সমাজ, না ছিল এমন কোন হুকুমত যার বুনিয়াদ ন্যায়নীতি ও প্রেমপ্রীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত। এমন প্রতিভাবান কোন নেতৃত্ব ছিল না এবং এমন কোন ধর্ম ছিল না যা সহীহ্শুদ্ধ এবং যা আম্বিয়া-ই কিরাম-এর দিকে সহীহভাবে সম্বন্ধযুক্ত আর তাঁদের শিক্ষামালা ও সমূহ বৈশিষ্ট্যের ধারক-বাহক। এই ঘনঘোর অন্ধকার মাঝে কোথাও কোন ইবাদতগাহ ও খানকাহ্র মাঝে কখনো যদিও বা যৎসামান্য আলোক-রশ্মি চোখে পড়ত তার অবস্থাও ছিল এমন যেন বর্ষাঘন অন্ধকার রাত্রে জোনাকির আলো। সহীহ্ ইলম ও বিশুদ্ধ আমল এত দুর্লভ ও দুষ্পাপ্য ছিল এবং আল্লাহ্র সোজা-সরল রাস্তার সন্ধান দানকারীর সাক্ষাৎ কদাচিৎ মিলত যে, ইরানের বুলন্দ

---

১. হুজ্জাতুল্লাহি'ল-বালিগা, باب اقامة الارتفاقات واصلاح الرسوم দ্র.

২. হযরত সালমান ফারসী (রা.)-র কাহিনী ধারাবাহিক সূত্রে বর্ণিত হওয়ায় এবং বর্ণনাকারীদের বিশ্বস্ততার নিরীখে উৎরে যাবার দরুন তা ইতিহাসের এক অমূল্য সম্পদ ও দলীল হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। ইমাম আহমদ-এর মুসনাদ এবং হাকেমের মুস্তাদরাকে এর বিস্তৃত বিবরণ মিলবে।

হিম্মত, অস্থির ও চঞ্চল প্রকৃতির যুবক সালমান ফারসী যিনি আপন জাতিগোষ্ঠী ও বংশীয় ধর্ম (অগ্নি পূজা) থেকে অতৃপ্ত ও নিরাশ হয়ে সত্যের সন্ধানে ইরান থেকে শুরু করে সিরিয়ার শেষ সীমান্ত অবধি দীর্ঘ ও বিস্তৃত ভূভাগ চষে ফিরে মাত্র চারজন মানুষ এমন পেয়েছিলেন যাঁদের থেকে তাঁর অতৃপ্ত আত্মা তৃপ্ত এবং অশান্ত হৃদয় প্রশান্তি লাভ করেছিল এবং যাঁরা তাঁদের নবী-রসূলদের কথিত ও প্রদর্শিত পথের ওপর কায়েম ছিলেন।[২]

বিশ্বব্যাপী এই অন্ধকার ও অরাজকতার যেই চিত্র কুরআন মজীদ এঁকেছে এর থেকে সুন্দর চিত্র আঁকা আদৌ সম্ভব নয়।

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ اَيْدِى النَّاسِ لِيُذِيْقَهُمْ بَعْضَ الَّذِىْ عَمِلُوْا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ-

"মানুষের কৃতকর্মের দরুন জলে-স্থলে ফাসাদ (বিপর্যয়) ছড়িয়ে পড়ে যার ফলে ওদেরকে ওদের কোন কোন কর্মের শাস্তি তিনি আস্বাদন করান যাতে ওরা ফিরে আসে।" (আল-কুর-আন ৩০:৪১)

দ্বিতীয় অধ্যায়

নবী করীম (সা)-এর আবির্ভাবের পর

নবী করীম (সা)-এর আবির্ভাব

মানবতা যখন মরণ যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছিল, দুনিয়া তার যাবতীয় সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে ধ্বংসের ভীতিপ্রদ ও গভীর গর্তে নিক্ষিপ্ত হতে চলেছিল ঠিক তখনই আল্লাহ তা'আলা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে ওহী ও রিসালতসহ প্রেরণ করেন যাতে করে তিনি এই মুমূর্ষু মানবতাকে নব জীবন দান করেন এবং লোকদেরকে অন্ধকার থেকে বের করে আলোর দিকে নিয়ে আসেন।

الٓرٰ قف كِتَابٌ اَنْزَلْنَاهُ اِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ

رَبِّهِمْ اِلٰى صِرَاطِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ - بِاِذْنِ

"আলিফ-লাম-রা; এই কিতাব, এটা তোমার প্রতি অবতীর্ণ করেছি যাতে করে তুমি মানব জাতিকে তাদের প্রতিপালকের নির্দেশক্রমে বের করে আনতে পার অন্ধকার থেকে আলোকে, তাঁর পথে যিনি পরাক্রমশালী, প্রশংসার্হ।" (আল-কুরআন, ১৪:১)

তিনি মানব জাতিকে কেবল এক আল্লাহ্‌র বন্দেগীর দিকে আহ্বান জানান এবং দুনিয়ার যাবতীয় বন্দেগী ও দাসত্বের হাত থেকে মুক্তি দেন। জীবনের প্রকৃত নেয়ামতরাজি (যে সব থেকে মানুষ নিজেকে মাহরূম করে দিয়েছিল) পুনর্বার তাকে দান করেন এবং সেই লৌহ শৃঙ্খল ও বেড়ি থেকে মুক্ত করেছিলেন যা তারা অপ্রয়োজনে নিজের ওপর ফেলে রেখেছিল।

يَاْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهٰهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبٰتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبٰٓئِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ اِصْرَهُمْ وَالْاَغْلٰلَ الَّتِىْ كَانَتْ عَلَيْهِمْ

"যে তাদের সৎ কাজের নির্দেশ দেয় ও অসৎ কাজে বাধা দেয়, যে তাদের জন্য পবিত্র বস্তু বৈধ করে ও অপবিত্র বস্তু অবৈধ করে এবং যে মুক্ত করে তাদেরকে তাদের গুরুভার থেকে ও শৃংখল থেকে যা তাদের ওপর ছিল।" (আল-কুর-'আন, ৭ঃ১৫৭)

তাঁর আবির্ভাব মানব জাতিকে নবজীবন, নতুন আলোক-রশ্মি, নবতর শক্তি, নতুন উত্তাপ, নতুন ঈমান, নবতর প্রত্যয়, নতুন বংশধারা, নতুন কৃষ্টি-সংস্কৃতি, নতুন সমাজ দান করে। তাঁর আগমনে দুনিয়ায় নতুন ইতিহাস এবং মানব জাতির কর্মের নবজীবনের সূত্রপাত হয়। কেননা আত্মবিস্মৃতি ও আত্মহত্যার ভেতর যেই যুগ অতিক্রান্ত হয়েছে তা ধর্তব্য নয়। চক্ষুষ্মান ও অন্ধ এবং জীবিত ও মৃতকে এক পাল্লায় রাখা চলে না।

وَمَا يَسْتَوِى الْاَعْمٰى وَالْبَصِيْرُ- وَلَا الظُّلُمٰتُ وَلَا النُّوْرُ- وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُوْرُ وَمَا يَسْتَوِى الْاَحْيَآءُ وَلَا الْاَمْوَاتُ ط

"সমান নয় অন্ধ ও চক্ষুষ্মান, অন্ধকার ও আলো, ছায়া ও রৌদ্র এবং সমান নয় জীবিত ও মৃত।" (আল-কুরআন ৩৫ ঃ ১৯-২২)

জাহেলিয়াত ও ইসলামের মাঝে যেই ব্যবধান ছিল এর থেকে বড় কোন ব্যবধান নেই। কিন্তু এই ব্যবধান যেই দ্রুততার সাথে অতিক্রান্ত হয় দুনিয়ার বুকে এরও কোন নজীর নেই। দুনিয়া তাঁরই নেতৃত্বে এই দীর্ঘ সফর কিভাবে অতিক্রম করেছিল এবং জাহেলিয়াত থেকে ইসলামের দিকে কিভাবে উত্তরণ ঘটেছিল পরবর্তী পৃষ্ঠাগুলোয় সেই প্রশ্নেরই জওয়াব সবিস্তার বর্ণিত হয়েছে।

জাহেলিয়াতের সংক্ষিপ্ত চিত্র

পেছনের পৃষ্ঠাগুলোতে পাঠক পরিমাপ করেছেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের আবির্ভাবকালে দুনিয়ার অবস্থা এমন একটি ঘরের মতই ছিল যার ভিত্তি এক প্রবল ভূমিকম্প দুর্বল ও নড়বড়ে করে দিয়েছিল। প্রতিটি বস্তু ছিল স্থানচ্যুত ও সামঞ্জস্যহীন। এই ঘরের সাজ-সরঞ্জাম সব ওলট-পালট হয়ে গিয়েছিল। ভাঙাচোরার হাত থেকে বেঁচে যাওয়াগুলোর আকার-আয়তন পাল্টে গিয়েছিল। এক জায়গার জিনিস আরেক জায়গায় গিয়ে পড়ে ছিল। কোথাও সামানের স্তূপ, আবার কোথাও একেবারে খালি। দর্শক সেখানে এমন সব মানুষ দেখতে পেত যাদের চোখে তাদের নিজেদের অস্তিত্বই ছিল নগণ্য ও মূল্যহীন। তারা গাছপালা, প্রস্তরখণ্ড ও পানির পূজা করতে শুরু করেছিল, এমন কি তারা নিষ্প্রাণ ও জড় বস্তুমাত্রকেই পূজা করতে শুরু করেছিল। তাদের বিকৃতি এ পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছিল যে, দৈনন্দিন জীবনের স্থূল সত্যগুলো বুঝতেও তারা অক্ষম ছিল। তাদের চিন্তাশক্তিও বিশৃংখল ও বিস্রস্ত হয়ে গিয়েছিল। তাদের অনভূতি ভুল পথে চলছিল। স্থূল ও সহজবোধ্য জ্ঞানও তাদের কাছে সূক্ষ্ম ও অবোধগম্য এবং সূক্ষ্ম ও অবোধ্যগুলোও তাদের কাছে স্থূল ও সহজবোধ্যে পরিণত হয়েছিল। নিশ্চিত ও অকাট্য বিষয়ও তাদের কাছে সন্দেহযুক্ত এবং

সন্দেহ ও সংশয়যুক্ত বিষয়ও তাদের কাছে নিশ্চিত ও অকাট্য বিষয়ে পরিণত হয়েছিল। তাদের রুচি বিকৃত হয়ে গিয়েছিল। ফলে তিক্ত ও বিস্বাদ জিনিসও সুস্বাদু এবং সুস্বাদু জিনিসও তাদের কাছে তিক্ত ও বিস্বাদ বলে বোধ হচ্ছিল। তাদের অনুভূতি নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। ফলে বন্ধু ও শুভাকাঙ্ক্ষীর সঙ্গে শত্রুতা এবং শত্রু ও অশুভাকাঙক্ষীর সঙ্গে ছিল তাদের বন্ধুত্ব।

সমাজের অবস্থাও ছিল তথৈবচ। এ যেন গোটা বিশ্বেরই একটি ছোট সংস্করণ! প্রতিটি বস্তুই ভুল আকার-আকৃতিতে ও ভুল স্থানে চোখে পড়বে। এই সমাজে নেকড়ে বাঘকে মেষপালের রাখালী করতে দেওয়া হয়েছিল আর বানরকে দেওয়া হয়েছিল পিঠা ভাগ করতে। এই সমাজে দুরাচারী অপরাধীরা ছিল সৌভাগ্যবান ও পরিতৃপ্ত আর সদাচারী চরিত্রবান লোকেরা ছিল দুঃখ-কষ্টে জর্জরিত ও যন্ত্রণাক্লিষ্ট। সদাচরণ ও সচ্চরিত্রতার চাইতে বড় অপরাধ ও বোকামি আর অসচ্চরিত্র ও অসদাচরণের চাইতে বড় যোগ্যতা ও গুণ এ সমাজে আর কিছুই ছিল না।

এ সমাজের আচার-আচরণ ছিল ধ্বংসাত্মক যা এই দুনিয়াটাকেই ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিচ্ছিল। মদ পান, মস্তানি, চরিত্রহীনতা, উন্মত্ততা, সুদখোরী, লুটপাট, ছিনতাই ও অর্থলিপ্সা চরমে পৌঁছেছিল। নির্দয়তা, নিষ্ঠুরতা কন্যা সন্তানকে জীবন্ত পুঁতে ফেলার পর্যায়ে গিয়ে উপনীত হয়েছিল। শিশুদেরকে তাদের শৈশবেই হত্যা করা হতো। রাজা-বাদশাহরা আল্লাহ্র মালকে হাতের ময়লা এবং আল্লাহর বান্দাদেরকে তাদের ক্রীতদাস মনে করত। সাধু-সন্তরা খোদা সেজে বসেছিল। লোকের মাল না-হক খেত, ওড়াত এবং আল্লাহর বান্দাদেরকে আল্লাহ্র পথ থেকে ফেরানো ছাড়া তাদের আর কোন কাজ ছিল না।

আল্লাহপ্রদত্ত মানবীয় গুণাবলীকে অত্যন্ত নির্দয়ভাবে নষ্ট অথবা অপাত্রে ব্যয় করা হচ্ছিল। এর থেকে কোন উপকার গ্রহণ বা সঠিক স্থানেই তা ব্যবহার করা হচ্ছিল না। শৌর্য-বীর্য জুলুম-যবরদস্তিতে, উদারতা ও বদান্যতা অপব্যয় -অপচয়ে, গায়রত ও আত্মমর্যাদাবোধ জাহেলী অহমিকায়, মেধা প্রতারণা ও অপকৌশলে রূপান্তরিত হয়েছিল। জ্ঞানবুদ্ধির কাজ কেবল এটাই ছিল যে, অপরাধের নিত্য-নতুন কৌশল উদ্ভাবন করবে এবং প্রবৃত্তির পরিতৃপ্তির নতুন নতুন পথ খুঁজে বের করবে।

মানুষ ও মূল্যবান মানবীয় সম্পদ বহুকাল থেকেই নষ্ট হচ্ছিল। মানুষই ছিল এমন এক কাঁচামাল যার ভাগ্যে অভিজ্ঞ কোন কারিগর জোটে নি যিনি তা থেকে সংস্কৃতির বিশুদ্ধ অবকাঠামো তৈরি করতে পারতেন। এ ছিল যেন কাঠের তক্তার স্তূপ যা বৃষ্টিতে ভিজে ও রোদে পুড়ে নষ্ট হচ্ছিল। এমন কেউ ছিল না যিনি এগুলো জোড়া দিয়ে যিন্দেগীর জাহাজ নির্মাণ করতেন।

সংগঠিত ও সুশৃংখল জাতিগোষ্ঠীর স্থলে ভেড়ার কয়েকটি পাল চোখে পড়ত যার কোন রাখাল ছিল না। রাজনীতি ছিল সেই উটের ন্যায় যার নাকে দড়ি নেই অর্থাৎ বল্লাহীন আর শক্তি ছিল এমন এক তলোয়ার যা এক পাঁড়-মাতালের হাতে গিয়ে পড়েছিল যদ্দ্বারা সে স্বয়ং নিজেকে এবং নিজ সন্তান ও ভাইদেরকে আহত ও ক্ষতবিক্ষত করছিল।

আংশিক সংস্কারের ব্যর্থতা

এই খারাপ ও অধঃপতিত জীবনের প্রতিটি শাখা সংস্কারকের সমগ্র জীবনই কামনা করছিল। অরাজকতার প্রতিটি দিক এর হকদার ছিল যে, সে তার (সংস্কারকের) সমগ্র মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হবে এবং তাঁকে একটি মুহূর্তের জন্যও ফুরসৎ দেবে না। সংস্কারক যদি কোন সাধারণ মানুষ হতো, যে ওহী ও নবূওতীর পথ-নির্দেশের পরিবর্তে আপন জ্ঞান-বুদ্ধি দ্বারা কাজ করত তাহলে সে এই জীবনের একই দিকের উপর তার সমগ্র প্রয়াস নিয়োজিত করত এবং গোটা জীবন সমাজের কেবল একটি ব্যাধি নিরাময়ের জন্য উৎসর্গ করে দিত। কিন্তু এর দ্বারা বিরাট কোন লাভ হতো না এজন্য যে, মানুষের মনস্তাত্ত্বিক ব্যাপারটা খুবই জটিল ও নাযুক। এর ভেতর বহু চোরা দরজা রয়েছে এবং আশ্চর্য ধরনের সব ছিদ্র ও ফাঁক রয়েছে। এর আসল দুর্বলতা ও কেন্দ্রীয় সমস্যাটা ধরতে পারা সহজ নয়। যখন সামাজিক মানুষের রুচি বিকৃতি ঘটে যায় তখন তার কেবল একটি দোষ দূর করা কিংবা একটি মাত্র দুর্বলতার পেছনে লাগা ফলপ্রসূ নয়, তেমনি ফলপ্রসূ নয় কোন একটা অভ্যাস সংশোধন করা যতক্ষণ পর্যন্ত এর মোড় মন্দের দিক থেকে ফিরিয়ে ভালোর দিকে এবং খারাপের দিক থেকে ফিরিয়ে সঠিক দিকে না ফেরানো হবে এবং যিন্দেগীর ভেতর যেসব আগাছা জন্মেছে তা উপড়ে না ফেলা হবে, আর এর যমীন ঘাস ও আপন থেকেই উদ্‌গত চারা গাছ মুক্ত না করা হবে যাতে করে নেকী ও কল্যাণের প্রতি প্রেম ও ভালবাসা এবং আল্লাহ্ তা'আলার ভীতির চারা তার অন্তরে রোপণ করা যায়।

মানব সমাজের প্রতিটি দুর্বলতা ও প্রতিটি দোষ-ত্রুটি সংশোধনার্থে সমগ্র জীবনের দাবি জানায়। কোন কোন সময় একটা আস্ত সংস্কারী দলের জীবন এর মুকাবিলায় নিয়োগ করেও এর সংশোধন হয় না। যদি কোন দেশে মদের কুঅভ্যাস জেঁকে বসে আর তা নিয়মিত অভ্যাসে পরিণত হয়ে যায় তাহলে তাদের মদ পান থেকে বিরত রাখা খুব সহজ নয়। মদ পান মানুষ কেন করে? এটা কিসের ফল? এটা এমন এক মানসিকতা ও মেযাজের ফল ফসল যা আনন্দ ফূর্তি ভালবাসে, চাই কি সেই আনন্দ-ফূর্তি বিষাক্তই হোক না কেন। তা আত্ম-বিলুপ্তি ও আত্মবিস্মৃতির দাবি জানায়. চাই কি এর জন্য হাজারো গোনাহই

করতে হোক। এই মানসিকতাকে বক্তৃতা-বিবৃতি ও লেখনী দ্বারা মদের স্বাস্থ্যগত কুফল ও ক্ষয়-ক্ষতির বিস্তারিত বিবরণ লিখে এবং কঠিন থেকে কঠিনতর আইন তৈরি করে ও তা কঠিনভাবে প্রয়োগ করে এবং জরিমানা করে তা প্রতিরোধ করা যায় না। একে কেবল গভীর মানসিক পরিবর্তনের দ্বারাই প্রতিরোধ ও প্রতিহত করা যায়। এছাড়া অপর কোন পন্থা আবিষ্কার করলে হয় অপরাধ অন্য কোন রূপে আবির্ভূত হবে এবং নিজের জন্য অন্য পথ সৃষ্টি করে নেবে।

পয়গম্বর ও রাজনৈতিক নেতার মধ্যে পার্থক্য

আরব দেশে কাজের খুবই বিস্তৃত ক্ষেত্র ছিল। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম যদি কোন জাতীয় কিংবা দেশপ্রেমিক নেতা হতেন এবং তাঁর কর্মপন্থা ও কর্ম পদ্ধতি রাজনৈতিক ও দেশীয় নেতাদের মত হতো তাহলে তাঁর সামনে সর্বোত্তম পন্থা ছিল এই যে, তিনি আরব ভূখণ্ডকে একটি দেশ বলে অভিহিত করে আরব গোত্রগুলোর একটি ঐক্যবদ্ধ প্লাটফরম প্রতিষ্ঠা করতেন এবং আরবদের সংহত ও সুদৃঢ় শক্তির সাহায্যে একটি পাকাপোক্ত ও যুদ্ধংদেহী ব্লক বানাতেন এবং একটি আরব রাষ্ট্র কিংবা প্রজাতন্ত্রের ভিত্তি স্থাপন করতেন সহজেই যার তিনি প্রেসিডেন্ট বা রাষ্ট্রপ্রধান হতে পারতেন। এমতাবস্তায় আবূ জহল, ওৎবা প্রমুখ তাঁর সঙ্গে পূর্ণ সহযোগিতা করত এবং তাঁকে আরবের নেতৃত্ব সমর্পণ করত। কেননা তারা তাঁর সততা ও আমানতদারী প্রত্যক্ষ করেছিল আর তাঁকে মক্কায় সব চাইতে জটিল মতানৈক্যের ক্ষেত্রে সালিশ মেনেছিল। কুরায়শদের প্রতিনিধি হিসেবে তাঁর সামনে আরবের নেতৃত্বের পদ দানের প্রস্তাব দিয়েছিল এবং বলেছিল, আপনি যদি নেতৃত্বের আকাঙ্ক্ষী হয়ে থাকেন তাহলে এ ব্যাপারে আমাদের এতটুকু অমত নেই। আপনি আজীবন আমাদের নেতা থাকবেন। আর যদি এই রাজনৈতিক অবস্থানগত মর্যাদা লাভ করতেন তখন তাঁর জন্য পারসিক কিংবা রোম সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে সেনা অভিযান পরিচালনা খুবই সহজ হয়ে যেত। তিনি আরবের অশ্বারোহীদের সাহায্যে পারস্য ও রোম সাম্রাজ্যের ওপর হামলা করতে পারতেন এবং অনারব শক্তিসমূহকে পদানত করে রোম ও পারস্যের ওপর আরবদের বিজয় ডংকা বাজাতে পারতেন। এটা কত বড় চিত্তাকর্ষক স্বপ্ন ছিল এবং আরবদের জাতিগত ও গ্রোত্রীয় অহমিকার পরিতৃপ্তির জন্য এর ভেতর কতটা খোরাক ছিল। আর এই উভয় সাম্রাজ্যের সঙ্গে একই সঙ্গে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়াকে যদি তিনি রাজনৈতিক দূরদর্শিতার পরিপন্থী মনে করতেন তাহলে ইয়ামন ও আবিসিনিয়ার ওপর আক্রমণ চালিয়ে এ দুটোকে তার নবোত্থিত হুকূমতের অন্তর্ভুক্ত করে নেয়া তেমন কঠিন কিছুই ছিল না।

স্বয়ং আরবেই এত সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা বিদ্যমান ছিল যেগুলো সর্বোচ্চ রাজনৈতিক দূরদর্শিতা ও বিচক্ষণতা, জাতীয় সংগঠন, ব্যবস্থাপনাগত

যোগ্যতা ও সর্বোচ্চ ইচ্ছাশক্তির অপেক্ষা করছিল বছরের পর বছর ধরে। একজন সর্বোচ্চ মানের শক্তিশালী ইচ্ছাশক্তির অধিকারী নেতা আরবের স্থানীয় সংস্কার-সংশোধন ও সংগঠিত করত তাদেরকে দুনিয়ার এক বিরাট বড় শক্তি এবং এক মর্যাদাবান রাষ্ট্রে পরিণত করতে পারতেন।

কিন্তু রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এজন্য আবির্ভূত ও প্রেরিত হন নি যে, একটি বিকৃতি দূর করে তার স্থলে আরেকটি বিকৃতি আনবেন, একটি অন্যায় দূর করে আরেকটি অন্যায়ের জন্ম দেবেন, এক জিনিসকে এক জায়গায় বৈধ এবং অন্য জায়গায় সেটাকেই অবৈধ করবেন, এক জাতির স্বার্থপরতা ও স্বার্থান্ধতার বিরোধিতা করবেন এবং অন্য জাতির স্বার্থপরতা ও স্বার্থান্ধতাকে উৎসাহিত করবেন। তিনি দেশপূজারী লিডার ও একজন রাজনৈতিক নেতা হিসেবে আগমন করেন নি যে, একটি জাতিকে নিশ্চিহ্ন ও উজাড় করে দিতে অপর জাতিগোষ্ঠীকে আবাদ করবেন। অন্য জাতিগোষ্ঠীর সম্পদ ও স্বর্ণ-রৌপ্য দিয়ে আপন জাতি ও আপন সম্প্রদায়ের ভাণ্ডার পূর্ণ করবেন এবং মানুষকে রোম ও পারস্যের গোলামী থেকে মুক্ত করে আদনান বংশের ও কাহতান সন্তানদের গোলামীর জিঞ্জিরে আবদ্ধ করবেন।

তাঁর আবির্ভাবের উদ্দেশ্যই ছিল দুনিয়া ও দুনিয়াবাসীকে জান্নাতের সুখবর শোনানো এবং পরকালীন শাস্তির ভীতি প্রদর্শন। তিনি দাঈ ইলাল্লাহ তথা আল্লাহর দিকে আহ্বানকারী, সিরাজাম মুনীরা তথা প্রদীপ্ত প্রদীপ হয়ে এসেছিলেন গোটা পৃথিবীকে আলোকোজ্জ্বল করে তুলতে। তাঁকে পাঠানো হয়েছিল দুনিয়াকে মানুষের গোলামী থেকে মুক্ত করে কেবল আল্লাহর গোলামীতে ন্যস্ত করতে, মানুষকে বস্তুগত জীবনের কাল কুঠরী থেকে বের করে দুনিয়া ও আখিরাতের বিস্তৃত ও প্রশস্ত অঙ্গনে টেনে নিতে, নানাবিধ ধর্ম ও মতাদর্শের বাড়াবাড়ি ও বে-ইনসাফী থেকে মুক্তি দিয়ে ইসলামের ন্যায় ও সুবিচারের দ্বারা ধন্য ও তৃপ্ত হবার সুযোগ দিতে। তাঁর কাজ ছিল সৎ কাজে উৎসাহ দান, অসৎ কাজ থেকে নিবৃত্তকরণ, পাক-পবিত্র জিনিসকে হালাল এবং নাপাক ও নোংরা জিনিসকে হারাম প্রতিপন্ন করা এবং সেই সব শেকল ও বেড়ি থেকে মুক্তকরণ যা মানুষ তার অজ্ঞতার দরুন কিংবা মযহাব ও হুকূমত জোর-যবরদস্তির করে মানুষের পায়ে পরিয়ে দিয়েছিল।

এজন্যই তাঁর সম্বোধন কেবল একটি জাতিগোষ্ঠী কিংবা কোন একটি দেশের অধিবাসীর উদ্দেশে ছিল না। তাঁর সম্বোধন ছিল তাবৎ মানব জাতির উদ্দেশে, গোটা মানব জাতির বিবেকের প্রতি। আরব জাতি সীমাতিরিক্ত পশ্চাৎপদতা,

এবং রাজনৈতিক ও চারিত্রিক অধঃপতনের দরুন অবশ্যই এর হকদার ছিল যে, তাঁর অভিযান সেখান থেকেই শুরু করা হবে এবং নবুওতী কাজের সূচনাও সেই জাতির ভেতর হবে। উম্মুল কুরা (বিশ্ব কেন্দ্র, মক্কা মু'আজ্জমা) ও আরব উপদ্বীপ তার ভৌগোলিক অবস্থান ও রাজনৈতিক স্বাধীনতার কারণে তাঁর চেষ্টা ও সাধনার জন্য সর্বোত্তম কেন্দ্রও ছিল এবং আরব জাতি তাদের মনস্তাত্ত্বিক ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের দরুন তাঁর পয়গামের সর্বোত্তম বাহক এবং তাঁর দাওয়াতের বোঝা বহনের সর্বাধিক যোগ্যতাসম্পন্ন দূত হতে পারত।

তিনি সেসব সংস্কারকের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না যারা আপন জাতি অথবা যুগের কতকগুলো সামাজিক দুর্বলতা কিংবা চারিত্রিক নষ্টামি দূর করতে সচেষ্ট হন এবং সাময়িকভাবে সেসব রোগ-ব্যাধির অপনোদনে সফলতা লাভ করেন কিংবা ব্যর্থ হয়ে জগৎ সংসার থেকে বিদায় নেন।[১]

মানবতার সমস্যার সঠিক সমাধান

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ তাআলার পথ-নির্দেশনাধীনে দাওয়াত ও সংস্কার সংশোধনের কাজ সহীহ্ রাস্তায় শুরু করেন। তিনি মানব স্বভাবের তালায় সঠিক চাবি লাগান। এ ছিল সেই তালা যা খুলতে সে যুগের সমস্ত সংস্কারক ছিলেন ব্যর্থ। তিনি মানুষকে সর্বপ্রথম আল্লাহর ওপর ঈমান আনার, তাঁর সত্তায় বিশ্বাস স্থাপনের আহ্বান জানালেন এবং বাতিল তথা মিথ্যা উপাস্য দেবদেবীসমূহকে প্রত্যাখ্যান করতে বললেন। সেই সঙ্গে তাগূত (আল্লাহ ব্যতিরেকে সকল সত্তা, সাধারণভাবে যেগুলোর গোলামী ও আনুগত্য করা হয়) অমান্য করতে নির্দেশ দান করেন। লোকের মাঝে দাঁড়িয়ে সজোরে উচ্চ কণ্ঠে তিনি বলেনঃ يا ايها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا

১. গান্ধীজি তার রাজনৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের সূচনা থেকে দুটো শক্তিশালী মুলনীতি তাঁর জীবনের লক্ষ্য হিসেবে স্থির করেছিলেন এবং এ দু'টো মূলনীতির ওপর তাঁর সেই সব শক্তি, মেধাগত ও জ্ঞানগত যোগ্যতা ও সামর্থ্য এবং সর্বপ্রকার উপকরণ ব্যয় করেন যা এ যুগে খুব কম সংখ্যক লোকই করে। প্রথম মুলনীতি ছিল অহিংস নীতি যেদিকে তিনি একটি স্থায়ী ধর্ম ও দর্শন হিসেবে আহ্বান জানান এবং নিজের জীবন উৎসর্গ করেন। কিন্তু যেহেতু এই পন্থা মানসিক পরিবর্তন ও ধর্মের মৌলিক দাওয়াতের পন্থা থেকে পৃথক ছিল, তাই তাঁর আহ্বান সেই গভীর পরিবর্তন ও প্রভাব সৃষ্টি করেনি যা আম্বিয়া আলায়হিস সালাম তাঁদের সম্প্রদায় ও জাতিগোষ্ঠীর ভেতর সৃষ্টি করে যান। তিনি স্বয়ং তাঁর স্বচক্ষেই ভারতবর্ষের বুকে সেই ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা প্রত্যক্ষ করেন যেই দাঙ্গায় তাঁর অহিংস নীতি অত্যন্ত নির্দয়ভাবে পদ-দলিত করা হয় এবং বর্বরতা ও পশু শক্তির নিকৃষ্ট প্রকাশ ঘটে। এই ঘটনা গান্ধীজির জন্য কঠিন হৃদয় বিদারক ও অসহনীয় হয়ে দেখা দেয়। শেষ পর্যন্ত স্বয়ং তাঁকেই হিংসার শিকার হতে হয় যার বিরুদ্ধে তিনি সারাটা জীবন লড়ে ছিলেন। দ্বিতীয় মূলনীতি অস্পৃশ্যতা বা ছুঁৎমার্গের পরিত্যাগ। তাঁর ঐ অভিযান তেমন সফল হয় নি। এসব প্রমাণ দেয় যে, আম্বিয়ায়ে কিরাম (আ)-এর রাস্তাই ছিল সঠিক ও ফলপ্রসূ এবং সেটাই সফল রাস্তা।

"হে লোকসকল! তোমরা বল, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ (আল্লাহ ব্যতিরেকে কোন ইলাহ নেই)–সফলতা লাভ করবে।"

জাহেলিয়াত ইসলামের মুকাবিলায়

জাহেলী সমাজ এই দাওয়াত এবং এর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বুঝতে ভুল করেনি এবং এর ভেতর সে কোন জটিলতাও অনুভব করেনি। যেই শ্রোতাবৃন্দের কানে তাঁর আওয়াজ পৌঁছেছে তখনই তারা বেশ ভালই বুঝেছে যে, এই আহ্বান এমন এক তীর যা জাহেলিয়াতের টার্গেটে আঘাত হানবে এবং তা এফোঁড়-ওফোঁড় করে দেবে। বিপদের এই অনুভূতি থেকে জাহেলিয়াতের সমুদ্রে তরঙ্গের সৃষ্টি হলো এবং তা ফুঁসে উঠল। জাহিলিয়াতের বীর পুরুষরা জাহিলিয়াতের শেষ যুদ্ধের জন্যে অস্ত্র সজ্জিত হয়ে কোমর বেঁধে নেমে পড়ল।

وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ اَنِ امْشُوْا وَاصْبِرُوْا عَلٰى اٰلِهَتِكُمْ ج اِنَّ هٰذَا لَشَيْءٌ يُّرَادُ -

'ওদের প্রধানেরা সরে পড়ে এই বলে, 'তোমরা চলে যাও এবং তোমাদের দেবতাগুলোর পূজায় তোমরা অবিচলিত থাক। নিশ্চয়ই এই ব্যাপারটি উদ্দেশ্যমূলক।' (আল-কুরআন, ৩৮ ঃ ৬)।

এই জীবনের প্রত্যেক সদস্য পরিষ্কার অনুভব করে যে, জাহেলী সভ্যতার প্রাসাদ-সৌধ টলটলায়মান এবং জীবনের গোটা ব্যবস্থাপনাই বিপদের সম্মুখীন। এই সময় শক্তি ও চাপ প্রয়োগ এবং জুলুম ও বাড়াবাড়ির সেই সব লোমহর্ষক ঘটনাবলী সংঘটিত হয় যে সব ঘটনা ইসলামের ইতিহাসে সংরক্ষিত। এটা ছিল এ কথার আলামত যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম জাহেলিয়াতের ওপর আঘাত হানার জন্য সঠিক টার্গেট নির্বাচন করে ছিলেন এবং তাঁর তীরও সঠিক লক্ষ্যে আঘাত হেনেছিল। তিনি জাহেলিয়াতের শাহরগের ওপর আঘাত হানেন যদ্দ্বারা জাহেলিয়াত টলমলিয়ে ওঠে এবং সমগ্র আরব জাহেলিয়াতের সম্ভবত সর্ববৃহৎ দুর্গ যুদ্ধের জন্য ময়দানে অবতীর্ণ হয়। রসূলুল্লাহ (স) তাঁর দাওয়াতের ওপর পাহাড়ের ন্যায় দৃঢ় থাকেন। বিরোধিতার তুফান শুরু হয়। ফেতনার ঝড় বন্যার বেগে আছড়ে পড়ে এবং চলেও যায়। কিন্তু তিনি আপন স্থানে থেকে এক বিন্দুও নড়েন নি। তিনি তাঁর চাচাকে পরিষ্কার বলে দেন ঃ

"চাচাজান! আমার ডান হাতে যদি সূর্য এবং বাম হাতে চাঁদও এনে দেওয়া হয় তবুও এ কাজ আমি পরিত্যাগ করতে পারি না যতক্ষণ না আল্লাহ্ তাআলা এতে আমাকে সফলতা দান করেন কিংবা আমিই শেষ হয়ে যাই।"[১]

তিনি মক্কায় তেরো বছর অবস্থান করেন। অবিরত তৌহীদ, রিসালত ও আখিরাতের ওপর বিশ্বাস স্থাপনের আহ্বান সুস্পষ্টভাবে জানাতে থাকেন। তিনি এজন্য এতটুকু এদিক-ওদিকের পথ অবলম্বন করেন নি কিংবা বিরোধীদের এতটুকু ছাড় দেন নি আর সময়োপযোগিতার দোহাই দিয়ে তিনি তাঁর আহ্বানের ক্ষেত্রে কোনরূপ আপোসকামিতাকেও প্রশ্রয় দেন নি। এই আহ্বান তথা এই দাওয়াতকেই তিনি সকল রোগের দাওয়াই ও সকল প্রকার বদ্ধ তালার চাবি মনে করেন এবং এক মুহূর্তের জন্যও তিনি এ সম্পর্কে সামান্যতম দ্বিধা-দ্বন্দ্ব কিংবা টানাপোড়েনের শিকার হন নি।

প্রথম দিককার মুসলমান

কুরায়শরা এই দাওয়াত ও আহ্বানের মুকাবিলায় হাঁটু গেড়ে বসে এবং জাহেলিয়াতের পতাকাতলে সমবেত হয়ে তাঁর বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। তারা তাঁর বিরুদ্ধে সমগ্র দেশে আগুন জ্বালিয়ে দেয় এবং ইসলামের রাস্তা আটকে দিয়ে দাঁড়িয়ে যায়। এ সময় তাঁর ওপর ঈমান আনয়ন তথা বিশ্বাস স্থাপন সেইসব সিংহদিল পুরুষ সিংহেরই কাজ ছিল যাঁরা মৃত্যু ভয়ে ভীত নন, যাঁরা আপন ঈমান ও আকীদার নিমিত্ত অগ্নিকুণ্ডের মাঝে ঝাঁপিয়ে পড়তে এবং জ্বলন্ত অঙ্গারের ওপর শুয়ে পড়তে সম্পূর্ণ প্রস্তুত। যাঁরা দুনিয়ার সর্বপ্রকার লোভ-লালসা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন এবং সারা দুনিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেছেন। কুরায়শদের কতিপয় যুবক সামনে অগ্রসর হলো। এ তড়িঘড়ির ফয়সালা ছিল না এবং যুবকসুলভ ঝোঁকের মাথায় গৃহীত পদক্ষেপও ছিল না। তাঁরা মনে করতেন যে, তাঁরা তাঁদের জীবনকে বিপদের মুখে নিক্ষেপ করেছেন এবং জীবনের দরজা নিজেদের জন্য বন্ধ করে দিচ্ছেন। পার্থিব কোন প্রলোভন এর পেছনে ক্রিয়াশীল ছিল না, বরং এই ফয়সালা ছিল কেবল বিপদের দরজা খোলার সমার্থক এবং এর ফলে সর্বপ্রকার পার্থিব স্বার্থ ও আরাম-আয়েশের দরজা বন্ধ হতো। এখানে ছিল কেবল ইয়াকীন ও প্রত্যয়ের এক শক্তি এবং পরকালীন জীবনের লোভ। তাঁরা ঈমানের দিকে আহ্বানকারীদের এই বলে আহ্বান করতে শুনতে পেয়েছিলেন। তোমরা তোমাদের প্রভু প্রতিপালকের ওপর ঈমান আন। এই আহ্বান শুনতেই

১. আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৩য় খণ্ড, ৪৩।

বিশাল পৃথিবী তাঁদের জন্য সংকীর্ণ ও সংকুচিত হয়ে গেল। স্বভাব-তবিয়ত পিষ্ট হতে থাকল। রাতের ঘুম গেল উবে। নরম-কোমল বিছানা কণ্টক শয্যার ন্যায় খচখচ করে বিঁধতে লাগল। তাঁরা দেখল যে, আল্লাহ ও তাঁর রসূলের ওপর ঈমান আনা এবং নিজের ঈমানের সাথী হওয়া তাঁদের জন্য অপরিহার্য হয়ে গেছে। তাঁরা তাঁদের দিল ও দিমাগের তথা মন-মস্তিষ্কের ফয়সালা এবং আপন বিশ্বাসের বিরোধিতা করে সন্তুষ্ট থাকতে পারত না। প্রকৃত সত্য কোনটি তা তাঁদের সামনে দিবালোকের ন্যায় প্রকাশিত ও উদ্ভাসিত হয়ে গিয়েছিল। এখন আর তাঁরা সেই সত্য এড়িয়ে যেতে পারত না। পশু জীবন থেকে তাঁদের মন উঠে গিয়েছিল, বিতৃষ্ণায় ভরে গিয়েছিল তাঁদের মন। তাঁরা আর তাতে নিজেদের মনকে ফাসাতে পারত না। একটি কাঁটা যা তাদের মনে খচখচ করে বিঁধছিল। তাঁরা সেটাকে আর পুষতে পারত না। শেষ পর্যন্ত তাঁরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত পৌঁছুতে এবং ইসলাম গ্রহণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। রসূলুল্লাহ (সা) তাদেরই মহল্লায় ছিলেন। মাত্র কয়েক গজ দূরে। কিন্তু কুরায়শরা তাঁকে এতটা দূরে ঠেলে দিয়েছিল এবং রাস্তা এতটা বিপদ ও ঝুঁকিপূর্ণ বানিয়ে দিয়েছিল যে, তাঁর পর্যন্ত পৌঁছা দূরদরাজ ও অত্যন্ত বিপজ্জনক সফরেরই নামান্তর ছিল। সিরিয়া ও ইয়ামনে বাণিজ্য কাফেলা নিয়ে যাওয়া এবং আরবের ডাকাতদের হাত থেকে গা বাঁচিয়ে বেরিয়ে যাওয়া এতটা কঠিন ও কষ্টসাধ্য ছিল না যতটা মক্কার ভেতর মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা) পর্যন্ত পৌঁছা এবং তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত করা ছিল কষ্টকর। কিন্তু তাঁরা তাঁর কাছে গেল, তাঁর হাতে হাত মেলাল এবং নিজেদের জীবন তাঁর হাতে তুলে দিল, তাঁকে সোপর্দ করল। তাঁদের জীবনের ভয় ছিল, ভয় ছিল পরীক্ষার সম্মুখীন ও কষ্টের মুখোমুখী হবার। কিন্তু তাঁরা কুরআন শরীফের এই আয়াত শুনেছিল ঃ

أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوْا أَنْ يَقُوْلُوْا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُوْنَ. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكٰذِبِيْنَ -

"মানুষ কি মনে করে যে, আমরা ঈমান এনেছি, এই কথা বললেই ওদেরকে পরীক্ষা না করেই অব্যাহতি দেওয়া হবে? আমি তো এদের পূর্ববর্তীদেরকেও পরীক্ষা করেছিলাম; আল্লাহ অবশ্যই প্রকাশ করে দেবেন কারা সত্যবাদী ও কারা মিথ্যাবাদী। (আল-কুরআন, ২৯ ঃ ২-৩)

তাঁরা আল্লাহ্ তা'আলার এই নির্দেশ ও শুনেছিল ঃ

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوْا حَتّٰى يَقُوْلَ الرَّسُوْلُ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗ مَتٰى نَصْرُ اللّٰهِ ط أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ ـ

"তোমরা কি ধারণা কর যে, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে, যদিও এখনও তোমাদের কাছে তোমাদের পূর্ববর্তীদের অবস্থা আসে নি? অর্থ সংকট ও দুঃখ-ক্লেশ তাদেরকে স্পর্শ করেছিল এবং তারা ভীত ও কম্পিত হয়েছিল, এমন কি রসূল ও তাঁর সঙ্গে ঈমানদাররা বলে উঠেছিল, 'আল্লাহ্র সাহায্য কখন আসবে'? হ্যাঁ, হ্যাঁ,আল্লাহ্র সাহায্য নিকটেই।" (আল-কুরআন, ২:২১৪)

শেষ পর্যন্ত কুরায়শদের কাছ থেকে যা আশংকা করা গিয়েছিল তাই সামনে এসে দেখা দিল। কুরায়শরা তাদের তূণীরের সব তীরই ঐ অসহায়দের প্রতি নিক্ষেপ করেছিল এবং সে সবগুলোর পরীক্ষাই তাঁদের ওপর চালায়। কিন্তু তাঁদের ঈমানী দৃঢ়তা ও প্রত্যয়ের মজবুতী এতে আরও বৃদ্ধিই পায়। "আর তারা বলতে থাকে, এই ওয়াদাই তো আল্লাহ এবং তাঁর রসূল আমাদের সঙ্গে করেছিলেন এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূল সত্যিই বলেছিলেন—আর এতে তাদের ঈমান ও আনুগত্য বৃদ্ধিই পেল।" এসব পরীক্ষার ফলে তাঁদের বিশ্বাস অধিকতর দৃঢ়, তাঁদের প্রত্যয় আরও মজবুত, তাঁদের ধর্মীয় চেতনা ও অনুভূতি আরও উন্নত হয় এবং তাঁদের ঈমানে অধিকতর স্বাদ ও মিষ্টতা সৃষ্টি হয়। তাঁদের স্বভাব-চরিত্রে আরও পরিচ্ছন্নতা ও ঔজ্জ্বল্য সৃষ্টি হয় এবং তাঁরা এই অগ্নিকুণ্ড থেকে খাঁটি সোনা হয়ে বেরিয়ে আসেন।

সাহাবায়ে কিরাম (রা)-এর ঈমানী প্রশিক্ষণ

এরই সাথে সাথে রসূলুল্লাহ (সা) তাঁদের কুরআন পাকের রূহানী খোরাক সরবরাহ করে যাচ্ছিলেন এবং ঈমানের মাধ্যমে তাঁদের প্রশিক্ষণ দিচ্ছিলেন। তিনি তাঁদের দৈহিক পাক-পবিত্রতা ও অন্তরের ভয়-ভক্তি মিশ্রিত বিনয় শেখাতেন, তার শরীরী প্রকাশ ঘটাতেন এবং আল্লাহ রাব্বুল আলামীনকে সর্বত্র হাজির-নাজির জ্ঞানে প্রত্যহ পাঁচবার তাঁরই সমীপে মাথা ঝোঁকাতেন। তাঁদের মধ্যে উত্তরোত্তর রূহানিয়াত তথা আধ্যাত্মিকতার সমুন্নতি, দিলের পরিচ্ছন্নতা ও স্বচ্ছতা, নৈতিক ও চারিত্রিক পরিশুদ্ধি, প্রবৃত্তি পূজা থেকে মুক্তি লাভ হচ্ছিল। আসমান-যমীনের মালিকের প্রতি ইশ্ক ও অনুরাগ বৃদ্ধি পাচ্ছিল। তিনি

তাঁদেরকে দুখ-কষ্টে ধৈর্য ধারণ, ক্ষমাশীলতা ও আত্মসংযমের শিক্ষা দিতেন। যুদ্ধ-বিগ্রহ তাঁদের অস্থিমজ্জায় মিশে ছিল। তলোয়ারের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল তাঁদের মজ্জাগত। তাঁরা ছিলেন সে সব গোত্র ও সম্প্রদায়ের অন্তর্গত যাঁদের ইতিহাস 'বসূস', 'দাহিস' ও 'গাবিয়া' প্রভৃতি রক্তাক্ত কাহিনী দ্বারা ভরপুর। 'ইয়াওমুল ফিজার'-এর রক্তাক্ত যুদ্ধের স্মৃতিও তখনো অম্লান রয়েছে। কিন্তু রসূলুল্লাহ (সা) তাঁদের সেই সামরিক স্বভাব-প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণে রেখেছিলেন এবং তাঁদের আরবীয় অহংবোধকে ঈমানী শক্তির নিয়ন্ত্রণাধীনে রেখেছিলেন। তিনি তাঁদের বলতেন, তোমাদের হাত সংবরণ কর এবং সালাত কায়েম কর (সূরা নিসা ঃ ৭৭)। তাঁরা রসূল (সা)-এর হুকুমে মোমের মত হয়ে গিয়েছিলেন। সামান্যতম কাপুরুষতা না থাকা সত্ত্বেও তাঁরা তাঁদের হাত গুটিয়ে নিয়েছিলেন। তাঁরা সব কিছুই বরদাশত করছিলেন দুনিয়ার কোন সম্প্রদায় কিংবা জাতিগোষ্ঠী যা বরদাশত করেনি। ইতিহাস এমন একটি ঘটনাও পেশ করেনি যেখানে কোন মুসলমান নিজের পক্ষ থেকে প্রতিরোধ করেছে কিংবা জিঘাংসার আশ্রয় নিয়েছে। পৃথিবীর ইতিহাসে ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার এ এক অনন্য উদাহরণ।

মদীনাতুর রসূলে

কুরায়শরা যখন সীমা অতিক্রম করল তখন আল্লাহ তাঁর রসূল ও তাঁর সাহাবাদেরকে হিজরত তথা দেশত্যাগের অনুমতি দিলেন। তাঁরা ইয়াছরিবে হিজরত করলেন যেখানে ইসলাম ইতিপূর্বেই পৌঁছে গিয়েছিল।

মক্কা থেকে আগত মুহাজিররা ইয়াছরিবের লোকদের (আনসার) সঙ্গে একেবারে মিশে গিয়েছিলেন, অথচ এদের মধ্যে কেবল এই নতুন ধর্ম ছাড়া অন্য কোন যোগসূত্র ছিল না। ইতিহাসে ধর্মের শক্তি ও প্রভাবের এটিই একক ও অসাধারণ দৃষ্টান্ত। ইয়াছরিবের আওস ও খাযরাজ গোত্র বু'আছ যুদ্ধের স্মৃতি তখনও ভোলেনি এবং তাদের খুনপিয়াসী তলোয়ারের রক্ত তখনো শুকোয় নি। এমতাবস্থায় ইসলাম এসে তাঁদের উভয়ের মধ্যে প্রেম ও ভালবাসা সৃষ্টি করল। এই সন্ধি-সমঝোতার জন্য যদি কোন লোক দুনিয়ার তাবৎ সম্পদও ব্যয় করত তবুও তার পক্ষে তা সম্ভব ছিল না। নবী করীম (সা) আনসার ও মুহাজিরদের মধ্যে ভ্রাতৃ-সম্পর্ক স্থাপন করলেন। এই ভ্রাতৃ-সম্পর্ক এমনই মজবুত সম্পর্কের রূপ নেয় যার সামনে রক্তের সম্পর্কও নিষ্প্রভ এবং দুনিয়ার তাবৎ বন্ধুত্বই তাৎপর্যহীন হয়ে যায়। ইতিহাসে এ ধরনের নিঃস্বার্থ প্রীতি ও ভালবাসার দ্বিতীয় নজীর খুঁজে পাওয়া যায় না।

মক্কার মুহাজির ও মদীনার আনসারসম্বলিত এই নবোত্থিত জামাতটি ছিল এক বিশাল ইসলামী উম্মাহর বুনিয়াদ। এই জামাতের আবির্ভাব এমন এক কঠিন সংকট সন্ধিক্ষণে হয় যখন দুনিয়া জীবন-মৃত্যুর মাঝে দোল খাচ্ছিল। এই জামাত এসে তার জীবন-যিন্দেগীর পাল্লাটা ঝুঁকিয়ে দিল এবং সেই সব সমূহ বিপদ দূর করে দিল যা তার সামনে ছিল। এই জামাতের আবির্ভাব পুনরায় মানব জাতির দৃঢ় অস্তিত্বের স্বার্থে অপরিহার্য ছিল। এজন্যই আল্লাহ্ তা'আলা যখন আনসার ও মুহাজিরদের ভ্রাতৃত্ব ও প্রীতির ওপর জোর দিলেন তখন বলেছিলেন, إِلَّا تَفْعَلُوْهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِى الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيْرٌ "যদি তা না কর তাহলে ধরাপৃষ্ঠে বিরাট ফেতনা-ফাসাদ ও বিপর্যয় দেখা দেবে।" (৮ : ৭৩)

সাহাবায়ে কিরাম (রা)-এর ঈমানী পূর্ণতা

এদিকে রসূলুল্লাহ (সা)-এর নেতৃত্বে ও দিক-নির্দেশনায় সাহাবায়ে কিরাম (রা)-এর ঈমানী প্রশিক্ষণ ও পূর্ণতার সিলসিলা অব্যাহত থাকে। কুরআনুল করীম অব্যাহতভাবে তাঁদের হৃদয়ে উত্তাপ সঞ্চার করতে ও শক্তি জোগাতে থাকে। রসূলুল্লাহ (সা)-এর বৈঠক থেকে তাঁদের দৃঢ়তা ও সংহতি, প্রবৃত্তির ওপর নিয়ন্ত্রণ, আল্লাহ্র সন্তুষ্টি ও রেযামন্দীর সত্যিকার কামনা এবং এ পথে নিজেদের মিটিয়ে দেবার অভ্যাস, জান্নাতের প্রতি অনুরাগ, ইল্ম তথা জ্ঞানের প্রতি লোভ ও আকর্ষণ এবং দীনের সমঝ (উপলব্ধি) ও আত্মজিজ্ঞাসার ন্যায় সম্পদ লাভ ঘটে। তাঁরা সুখে-দুঃখে সর্বাবস্থায় রসূলুল্লাহ (সা)-এর আনুগত্য করতেন। যে অবস্থায় থাকুন না কেন, তাঁরা আল্লাহ্র রাস্তায় ঝাঁপিয়ে পড়তেন। এসব লোক রসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে দশ বছরে সাতাশ বার জিহাদের জন্য বেরিয়েছেন এবং তাঁর হুকুমে শতাধিক অভিযানে গমন করেছেন। তাঁদের পক্ষে দুনিয়ার সঙ্গে সম্পর্কহীনতা খুবই সহজসাধ্য বিষয়ে পরিণত হয়েছিল। পরিবার-পরিজনের জন্য দুঃখ-কষ্ট ও বিপদ-আপদ সহ্য করায় তাঁরা অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলেন। কুরআন করীমের আয়াত সেই সব অসংখ্য বিধান (আহ্কাম) নিয়ে আসে যা প্রথম থেকে তাঁদের পরিচিত ছিল না। নিজের সম্পর্কে, ধন-সম্পদ সম্পর্কে, সন্তান-সন্ততি, পরিবার-পরিজন ও খান্দান সম্পর্কে আল্লাহ্র আহকাম নাযিল হয় যা পালন করা খুব সহজসাধ্য ছিল না। কিন্তু আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতিটি কথা মেনে নেয়া তাঁদের অভ্যাসে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। শিরক ও কুফরের গিঁট যখন খুলে গেল তখন আর যেসব গিঁট ছিল সেগুলো হাত লাগাতেই খুলে গেল। আল্লাহ্র রসূল (সা) একবার যখন তাঁদের ঈমানের জন্য মেহনত করলেন, এরপর প্রতিটি

আদেশ-নিষেধ ও প্রতিটি নতুন হুকুমের জন্য স্থায়ী চেষ্টা-সাধনা ও মেহনত করার আর প্রয়োজন রইল না। ইসলাম ও জাহেলিয়াতের প্রথম সংঘর্ষে ইসলাম জাহেলিয়াতের ওপর বিজয় লাভ করে। এরপর প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রতিবার নতুন সংঘর্ষের আর প্রয়োজন অবশিষ্ট রইল না। ঐসব লোক তাঁদের হৃদয়-মনসহ, তাঁদের হাত-পাসহ, নিজেদের রূহ নিয়ে ইসলামের আঁচল তলে এসে গেল। তাঁদের সামনে যখন সত্য প্রকাশিত হয়ে গেল তখন রসূলুল্লাহ (সা)-এর সঙ্গে তাঁদের আর কোন টানাপোড়েন থাকল না, থাকল না কোন সংঘাত। তাঁর সিদ্ধান্তে তাঁদের আর কখনো মানসিক অথবা আত্মিক দ্বিধা-দ্বন্দ্ব দেখা দিত না। কোন বিষয়ে তিনি যেই সিদ্ধান্ত দিতেন, তাতে তাঁদের এতটুকু মতানৈক্যের অবকাশ থাকত না। এঁরা ছিলেন সেই সব লোক যাঁরা আল্লাহ্‌র রসূল (স)-এর সামনে নিজেদের গোপন ত্রুটি-বিচ্যুতির কথা অকপটে স্বীকার করেছেন এবং কখনো হদযোগ্য পদস্খলনে লিপ্ত হলে নিজেদের দেহকে হদ ও শাস্তির জন্য পেশ করে দিয়েছেন। মদ পান নিষিদ্ধ সম্পর্কিত আয়াত নাযিল হয়েছে। উথলে ওঠা পানপাত্র হাতে। আল্লাহর হুকুম তাঁদের ভীত-সন্ত্রস্ত অন্তর, ক্লেদাক্ত ঠোঁট ও পানপাত্রের মাঝে বাধার প্রাচীর হয়ে দাঁড়িয়ে গেল। এরপর আর কি! হাতের সাহস হয়নি ওপরে ওঠার। তৃষ্ণার্ত ঠোঁট যেখানে ছিল সেখানেই শুকিয়ে গেছে। মদের পেয়ালা ভেঙে ফেলা হয়েছে। আর মদীনার অলিগলি ও নালাগুলোতে মদের স্রোত বয়ে গেছে।

শয়তানের আছর যখন তাঁদের অন্তর-মন থেকে দূরীভূত হলো, বরং বলা উচিত যে, যখন তাঁদের নফসের প্রভাব তাঁদের মন-মানস থেকে অপসৃত হলো, নফসানিয়াত নিঃশেষ ও নির্মূল হয়ে গেল তখন ঐসব লোক নিজেদের সঙ্গে সেই রকমই আচরণ করতে লাগলেন, যেমনটি তাঁরা অন্যের সঙ্গে করতেন। দুনিয়ার বুকে অবস্থান করেও পারলৌকিক জগতের মানুষ এবং নগদ সওদার বাজারে আখিরাতের কর্জকে দুনিয়ার নগদ সওদার ওপর অগ্রাধিকার দানকারীতে পরিণত হলেন। তাঁরা বিপদ-আপদে যেমন ঘাবড়িয়ে যেতেন না, তেমনি কোন নেয়ামত বা অনুগ্রহ পেয়েও ফুলে উঠতেন না। দারিদ্র্য তাঁদের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারত না। সম্পদ তাঁদের ভেতর নাফরমানীকে উস্‌কে দিতে পারত না। ব্যবসা-বাণিজ্য তাঁদের গাফিল বা অলস বানাতে পারত না। কোন শক্তিকেই তাঁরা ভয় পেতেন না। প্রতিপক্ষ যত শক্তিশালীই হোক তাতে দমে যেতেন না। আল্লাহ্‌র যমীনে দর্পভরে চলার কল্পনাও তাঁরা করতেন না। ভাঙচুর করা কিংবা ধ্বংসাত্মক কাজে লিপ্ত হওয়ার ধারণাও তাঁদের মনে স্থান পেত না। মানুষের জন্য তাঁরা ছিলেন ন্যায় ও সুবিচারের মানদণ্ড। ইনসাফের ছিলেন তাঁরা পতাকাবাহী।

আল্লাহ তা'আলার সাক্ষী ছিলেন আর সাক্ষ্য স্বয়ং তাঁদের নিজেদের বিরুদ্ধে গেলেও, এমন কি পিতামাতা ও আত্মীয়-বান্ধবের বিপক্ষে হলেও তাঁরা বিন্দুমাত্র পরওয়া করতেন না। ফলে আল্লাহ তা'আলা তাঁর গোটা যমীনকেই তাঁদের পদতলে নিক্ষেপ করলেন এবং সমগ্র পৃথিবী তাঁদের করতলে সমর্পণ করলেন। তাঁরা তখন গোটা পৃথিবীরই মুহাফিজ ও আল্লাহ্‌র দীনের দাঈ (আহ্বায়ক)-তে পরিণত হলেন। আল্লাহ্‌র রসূল (সা) তাঁদেরকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত বানালেন এবং নিজে পূর্ণ তৃপ্তি ও প্রশান্তির সঙ্গে রিসালত ও উম্মতের দিক থেকে নিশ্চিন্ত হয়ে তাঁর রফীকে আ'লা তথা পরম বন্ধুর ডাকে সাড়া দিলেন।

ইতিহাসের আশ্চর্যতম বিপ্লব ও এর কারণ

মুসলমানদের স্বভাব-চরিত্রে এই যে বিরাট বিপ্লব যা রসূলুল্লাহ (সা)-এর বরকতময় হাতে সাধিত হলো এবং মুসলমানদের দ্বারা মানব সমাজে সংঘটিত হলো–ইতিহাসের বুকে এ ছিল এক অভূতপূর্ব ঘটনা। এই বিপ্লবের প্রতিটি বস্তুই ছিল একক ও অনন্য। এর দ্রুততা, এর গভীরতা, এর বিশালতা ও সর্বজনীনতা, এর বিস্তৃতি ও মানবীয় উপলব্ধির কাছাকাছি হওয়া– এসবই ছিল সেই বিস্ময়কর ঘটনার অনন্যদিকসমূহ। এই বিপ্লব অপরাপর অলৌকিক ঘটনার ন্যায় কোন জটিল বিষয় ও দুর্বোধ্য হেঁয়ালী ছিল না। জ্ঞানগত পন্থায় এই বিপ্লব সম্পর্কে গবেষণা করুন। মানব ইতিহাসে ও মানব সমাজে এর প্রভাব সম্পর্কে অধ্যয়ন করুন।

ঈমান ও এর প্রভাব

আরব-অনারব নির্বিশেষে সকলেই অত্যন্ত বিকৃত জীবন যাপন করছিল। এমন প্রতিটি সত্তা যা তার সেবার জন্য পয়দা করা হয়েছিল, অস্তিত্ব লাভ করেছিল কেবল তার জন্য এবং যা ছিল তারই অধীন, যেভাবে চাইবে ব্যবহার করবে, আদেশ-নিষেধ, শাস্তি দান কিংবা পুরস্কার প্রদানের একবিন্দু ক্ষমতা নেই যার– সে সবের তারা পূজা-অর্চনা করতে শুরু করেছিল। তারা একেবারেই ভাসাভাসা ও বিক্ষিপ্ত একটি ধর্মে বিশ্বাসী ছিল, জীবন-যিন্দেগীতে যার কোন প্রভাব বিংবা তাদের স্বভাব-চরিত্রে, হৃদয়-মনে ও আত্মার ওপর যার কোন ক্ষমতা ছিল না।

চরিত্র ও সমাজ এই ধর্ম দ্বারা আদৌ প্রভাবিত ছিল না। আল্লাহ তা'আলার অস্তিত্ব তাদের দৃষ্টিতে এমন ছিল যেমন একজন শিল্পী কিংবা কারিগর তার কাজ

শেষ করে সরে পড়েছে এবং নির্জনতা বেছে নিয়েছে। তাদের ধারণায়, আল্লাহ তা'আলা তাঁর সাম্রাজ্য সেই সব লোকের হাতে তুলে দিয়েছিলেন যাদেরকে তিনি রবূবিয়তের খেলাত দ্বারা ধন্য করেছিলেন। এখন তারাই ক্ষমতাসীন এবং সাম্রাজ্যের সর্বময় ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের মালিক। জীবিকা বণ্টন, রাজ্যের আইন-শৃংখলা রক্ষা ও সার্বিক ব্যবস্থাপনা পরিচালনা তাদের এখতিয়ারাধীনে। মোটের ওপর একটি সুসংহত ও সুশৃংখল হুকুমতের যতগুলো শাখা ও বিভাগ হয়ে থাকে তার সবই তাদের ব্যবস্থাপনাধীন।

আল্লাহ্ তা'আলার ওপর তাদের ঈমান এক ঐতিহাসিক অবহিতির চেয়ে বেশি কিছু ছিল না। আল্লাহকে প্রভু-প্রতিপালক মনে করা, তাঁকে আসমান-যমীনের স্রষ্টা মানা তেমনই ছিল যেমন ইতিহাসের কোন ছাত্রকে জিজ্ঞেস করা হয় যে, এই প্রাচীন ইমারতটি কে নির্মাণ করেছিলেন? ছাত্রটি উত্তরে কোন বাদশাহ্র নাম বলল। বাদশাহ্র নাম বলার দ্বারা তার দিলের ওপর কোনরূপ ভয়-ভীতি যেমন দেখা দেবে না, তেমনি তার মস্তিষ্কের ওপর এর কোন প্রভাবও পড়বে না। এসব লোকের হৃদয় আল্লাহ তা'আলার ভয়, বিনয়মিশ্রিত ভক্তি-শ্রদ্ধা ও দো'আ থেকে শূন্য ছিল। আল্লাহ্র গুণাবলী সম্পর্কে তারা একেবারেই অজ্ঞ-বেখবর ছিল। এজন্য তাদের দিলে তাঁর প্রতি অনুরাগ, তাঁর আজমত ও বড়ত্বের কোন চিত্র ছিল না। আল্লাহ্ তা'আলা সম্পর্কে তাদের খুবই অস্পষ্ট, ভাসা ভাসা ধারণা ছিল যার ভেতর কোন গভীরতা ও শক্তি ছিল না।

গ্রীক দর্শন আল্লাহ্ তা'আলার সত্তার পরিচিতির ধারাবাহিকতায় বেশির ভাগ নেতিবাচক পন্থার আশ্রয় নিয়েছে। সে তাঁর গুণাবলীকে অস্বীকার করেছে এবং এর দীর্ঘ ফিরিস্তি কায়েম করেছে যার মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলার কোন 'হ্যাঁ'বাচক প্রশংসা এবং কোন ইতিবাচক গুণ নেই। তাঁর কুদরতের উল্লেখও এতে নেই, নেই এতে তাঁর রবূবিয়তের কথা কিংবা আলোচনা। তাঁর সীমাহীন অনুদান, তাঁর অপরিমেয় প্রেম-ভালবাসা ও দয়া-দাক্ষিণ্যের কথাও এতে নেই। এই দর্শন 'প্রথম সৃষ্টি' তো প্রমাণ করেছে। কিন্তু তাঁর জ্ঞান ও এখতিয়ার এবং ইচ্ছা ও গুণাবলীকে অস্বীকার করেছে এবং নিজের পক্ষ থেকে এমন সব মূলনীতি তৈরি করেছে যা সেই মহান সত্তাকে খাটোকরণ ও তাঁর সৃষ্টিজগতের ওপর অনুমান নির্ভর করে প্রণীত। আর একথা তো পষ্ট যে, শত শত নেতিবাচক মিলেও একটি ইতিবাচকের সমান হতে পারে না।

আমাদের জানা মতে, আজ পর্যন্ত এমন কোন সুশৃংখল নীতি কিংবা বিধান, এমন কোন সভ্যতা-সংস্কৃতি এবং এমন কোন সমাজ জন্ম নেয়নি যা কেবল

নেতিবাচক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। গ্রীক দর্শনের প্রভাবাধীন মহলে ধর্ম ও মতাদর্শ ভয়-ভীতি মিশ্রিত বিনয় ও শ্রদ্ধা, আকস্মিক দুর্ঘটনা ও বিপদ-আপদ মুহূর্তে আল্লাহ রাব্বুল-আলামীনের দিকে মনোনিবেশ, প্রেম ও ভালবাসার রূহ থেকে একদম শূন্য ছিল। ঠিক তদ্রূপ সেই যুগের বিভিন্ন ধর্মও প্রাণ হারিয়ে ফেলেছিল এবং কতকগুলো নিষ্প্রাণ আচার-অনুষ্ঠান ও প্রাণহীন অনুকরণসর্বস্ব প্রথা-পার্বণেই পর্যবসিত হয়ে গিয়েছিল।

মুসলিম উম্মাহ ও আরব জাতিগোষ্ঠী এই অসুস্থ, অস্পষ্ট ও নিষ্প্রাণ পরিচিতির আবহ থেকে বেরিয়ে এমন এক সুস্পষ্ট ও গভীর আকীদা-বিশ্বাস অবধি গিয়ে পৌঁছে যায় যার নিয়ন্ত্রণ ছিল হৃদয়-মন ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ওপর, যা সমাজকে প্রভাবিত করার মত জীবন-যিন্দেগী ও জীবনের নানা অনুষঙ্গের ওপর জেঁকে বসা। ঐ সব লোক এমন এক পবিত্র সত্তার ওপর ঈমান এনেছিলেন যাঁর রয়েছে সর্বোত্তম নাম, সর্বোচ্চ শান। তাঁরা এমন রাব্বুল আলামীনের ওপর ঈমান এনেছিলেন যিনি অত্যন্ত মেহেরবান ও দয়ালু, কিয়ামত দিবসের নিরংকুশ মালিক-মুখতার ও রাজাধিরাজ।

هُوَ اللّٰهُ الَّذِیْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ج عَالِمُ الْغَیْبِ وَالشَّهَادَةِ ج هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِیْمُ ۔ هُوَ اللّٰهُ الَّذِیْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ج اَلْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلٰمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَیْمِنُ الْعَزِیْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ ط سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا یُشْرِكُوْنَ ۔ هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰى ط یُسَبِّحُ لَهُ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ج وَهُوَ الْعَزِیْزُ الْحَكِیْمُ ۔

"তিনিই আল্লাহ, তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই। তিনি অদৃশ্য ও দৃশ্যের পরিজ্ঞাতা; তিনি দয়াময়, পরম দয়ালু। তিনিই আল্লাহ, তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই। তিনিই অধিপতি, তিনিই পবিত্র, তিনিই শান্তি, তিনিই রক্ষক, তিনিই পরাক্রমশালী, তিনিই প্রবল, তিনিই অতীব মহিমান্বিত; ওরা যাকে শরীক স্থির করে আল্লাহ তা থেকে পবিত্র, মহান। তিনিই আল্লাহ সৃজনকর্তা, উদ্ভাবন কর্তা, রূপদাতা, সকল উত্তম নাম তাঁরই। আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে সমস্তই তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।" (আল-কুরআন, ২৮:২২-২৪)

যিনি এই বিশাল জগত ও বিশ্ব কারখানার স্রষ্টা ও মালিক এবং পরিচালনাকারী, যাঁর কুদরতী কবজায় তামাম বিশ্বজাহানের বাগডোর। যিনি আশ্রয় দেন, আর তাঁর মুকাবিলায় কেউ কাউকে আশ্রয় দিতে পারে না। জান্নাত তাঁর পুরস্কার এবং জাহান্নাম তাঁর শাস্তি। তিনি যাকে ইচ্ছা রিযিকে প্রশস্ততা দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা তার রিযিক সংকুচিত করেন। আসমান-যমীনের সকল গুপ্ত বিষয় তিনি জানেন। চোখের গোপন চাউনি ও দিলের নিভৃত কন্দরে লুকায়িত রহস্য তিনিই সম্যক অবগত। তিনি সৌন্দর্য, পূর্ণতা, ভালবাসা ও দয়ামায়ার আধার।

এই গভীর, বিশাল-বিস্তৃত ও সুস্পষ্ট ঈমানের দ্বারা ঐ সমস্ত লোকের মন-মানসিকতার আশ্চর্য রকমের পরিবর্তন ঘটে। কেউ যখন আল্লাহ্র ওপর ঈমান আনত এবং লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্র সাক্ষ্য দিত অমনি তার জীবনে এক বিরাট বিপ্লব সংঘটিত হতো। তার ভেতর ঈমান অনুপ্রবিষ্ট হতো, য়াকীন তার শিরা-উপশিরায় সঞ্চারিত হতো এবং তার শরীরে রক্ত ও প্রাণ-সঞ্জীবনীর ন্যায় দ্রুত সঞ্চালিত হতো। জাহেলিয়াতের বীজাণুগুলোকে খতম করে দিত এবং জড়ে মূলে উৎখাত করে ছাড়ত। মন-মস্তিষ্ক এর ফয়েয দ্বারা মণ্ডিত হতো এবং সেই লোকটি আর পূর্বের ন্যায় থাকত না। এই লোকের দ্বারা ধৈর্য, শৌর্যবীর্য ও ঈমান-য়াকীনের এমন সব বিস্ময়কর ঘটনা সংঘটিত হতো যে, আক্কেল গুড়ুম হবার মত এবং দর্শন ও নৈতিকতার ইতিহাস বিস্ময়ে বোবা বনে যাবে। ঈমানী কুওত ছাড়া এর আর কোন হেতু বা ব্যাখ্যা হতে পারে না।

আত্মজিজ্ঞাসা ও বিবেকের ভর্ৎসনা

এই ঈমান ছিল নৈতিকতার একটি সফল মাদরাসা ও মানসিক প্রশিক্ষণ যা শিক্ষার্থীকে সর্বোচ্চ মানের ইচ্ছাশক্তি, আত্মসমালোচনা এবং স্বয়ং নিজের প্রতি সুবিচারের শক্তি দান করত। ইতিহাসে এমন কোন শক্তির সন্ধান পাওয়া যায় না যা মনের চাহিদা ও নৈতিক পদস্খলনের ওপর এরূপ সফলতার সঙ্গে জয়লাভ করেছে।

যদি কোন সময় পাশবিক শক্তি ও পশুপ্রবৃত্তির প্রভাবে মানুষের দ্বারা ভুলভ্রান্তি সংঘটিত হয়েছে আর এর সুযোগ তখন ঘটে যখন কোন মনুষ্য চক্ষু তা দেখতে পায় না এবং সংশ্লিষ্ট লোকটিকে আইনের ধারা-উপধারা আটকাতে অক্ষম হয়, এই ঈমানই তখন তীব্র ভর্ৎসনাকারী 'নফসে লাওয়ামায়' পরিণত হয়, দিলের ফাঁস তাঁর পায়ে গিয়ে তাকে চলৎশক্তিহীন করে দেয়, পেরেশানকারী ধ্যান-ধারণা

বন্যার বেগে তার মস্তিষ্কের ওপর আছড়ে পড়ে। গোনাহর স্মরণ ও স্মৃতি এমন পীড়াদায়ক হয়ে ওঠে যে, তার জীবন থেকে শান্তি ও স্বস্তি উবে যায়। এমন কি লোকটি শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয় নিজেকে প্রশাসন ও আইন প্রয়োগকারী কর্তৃপক্ষের কাছে নিজেকে পেশ করতে। সে নিজেই কৃত অপরাধের স্বীকারোক্তি করে এবং কঠিন শাস্তির জন্য নিজেকে পেশ করে। এরপর নির্ধারিত শাস্তি সে সন্তুষ্টচিত্তে মেনে নেয় এবং হাসিমুখে শাস্তি সইতে থাকে যাতে করে সে আল্লাহ্র অসন্তুষ্টির হাত থেকে বাঁচতে পারে এবং আখিরাতের স্থলে দুনিয়াতেই শাস্তিটা ভোগ করে নিতে পারে।

আমাদের সামনে বিশ্বস্ত ঐতিহাসিকগণ এ সম্পর্কে এমন সব বিস্ময়কর ঘটনা তাদের লিখিত ইসলামের ইতিহাসে পেশ করেছেন যার নজীর ইসলামের ধর্মীয় ইতিহাস ছাড়া অন্য কোথাও পাওয়া যাবে না। এসব ঘটনার মধ্যেই মা'ইয ইব্ন মালিক আসলামীর ঘটনা অন্যতম। ঘটনাটি ইমাম মুসলিম তাঁর সহীহ্ গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন। মাইয রসূলুল্লাহ (সা)-এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে বলতে থাকেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি অপরাধ করে ফেলেছি, আমি যেনা করেছি। আমি চাই, আপনি আমাকে পরিশুদ্ধ করে দেবেন। তিনি তাঁকে ফিরিয়ে দিলেন। পরদিন আবার তিনি এলেন এবং বলতে লাগলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি যেনার অপরাধে অপরাধী। আমাকে পরিশুদ্ধ করে দিন। আল্লাহ্র রাসূল (সা) তাঁকে আবারও ফিরিয়ে দিলেন। অতঃপর তাঁর পরিবারের লোকদের থেকে জানতে চাইলেন তাঁর মাথায় কোনরকম ছিট বা গোলমাল আছে কিনা। তারা উত্তরে জানায় যে, তাদের জানামতে মা'ইয অত্যন্ত সমঝদার মানুষ ও বিশিষ্ট ব্যক্তি। এরপর মা'ইয (রা) তৃতীয়বারের মত রসূলুল্লাহ (সা)-এর দরবারে আগমন করেন এবং ঐ একই কথার পুনরাবৃত্তি করে বলেন, হে আল্লাহ্র রসূল! আমা দ্বারা যেনার অপরাধ সংঘটিত হয়েছে। আমাকে আপনি পাক করে দিন। রসূলুল্লাহ (সা) পুনরায় তাঁর মানসিক সুস্থতা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে একই রূপ তথ্য পেলেন। চতুর্থবার স্বীকৃতির পর তাঁর অর্ধেক দেহ মাটিতে পুঁতে পাথর নিক্ষেপের মাধ্যমে হত্যার নির্দেশ দেন।[১]

এর পরবর্তী ঘটনা গামিদিয়া (রা) [নামক মহিলা সাহাবী]-র। তিনি নবী করীম (সা)-এর খেদমতে এসে বলতে থাকেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি যেনা করে ফেলেছি। আমাকে পরিশুদ্ধ করে দিন। তিনি তাঁকে ফিরিয়ে দিলেন।

১. সহীহ মুসলিম, কিতাবুল-হুদূদ।

পরদিন মহিলা আবার আসেন এবং বলতে থাকেন, আপনি আমাকে ফিরিয়ে দিচ্ছেন কেন? সম্ভবত সেভাবে ফিরিয়ে দিচ্ছেন যেভাবে মা'ইযকে ফিরিযে দিতেন। হ্যাঁ, আমি গর্ভবতীও বটে। আল্লাহ্র রসুল তাঁকে বললেন, তুমি এখন ফিরে যাও। সন্তান প্রসবের পর এস। সন্তান প্রসবের পর মহিলাটি পুনরায় আসলেন। শিশু কাপড়ে জড়ানো ছিল। তিনি শিশুটাকে দেখিয়ে বলেন, "এটাই আমার বাচ্চা।" নবী করীম (সা) তাঁকে বলেন, "যাও, ওকে দুধ পান করাও গিয়ে। যখন সে খাবার খাওয়া শুরু করবে তখন এস।" এরপর কোলের শিশুটি যখন দুধপান ত্যাগ করল তখন মহিলা আবার এলেন। শিশুটির হাতে তখন রুটির টুকরা। তিনি বলতে লাগলেন, "হে আল্লাহ্র নবী! এই নিন, বাচ্চা আমার দুধপান ছেড়ে দিয়েছে আর আমি দায়িত্ব থেকে মুক্তি পেয়েছি। সে এখন খাবার খেতে পারে।" আল্লাহ্র নবী শিশুটাকে একজন মুসলমানের হাতে তুলে দিলেন এবং মহিলার ওপর শাস্তি প্রয়োগের নির্দেশ দিলেন। তাঁর বুক পর্যন্ত মাটিতে পুঁতে ফেলা হলো। তিনি নির্দেশ দিতেই সকলে মিলে তাঁকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করল। খালিদ (রা) ইবনু'ল-ওলীদ একটি পাথর নিক্ষেপ করলে রক্তের ছিটা এসে তাঁর মুখমণ্ডলে লাগে। এতে ক্ষুব্ধ হয়ে তিনি মহিলাটিকে কিছু অশোভন কথা বলেন। আল্লাহ্র নবী (সা) একথা শুনতেই খালিদ (রা)-কে লক্ষ্য করে বলেন, "খালিদ! সেই পবিত্র সত্তার কসম যাঁর কুদরতী হাতে আমার জীবন। সে এমন তওবা করেছে যদি এমন তওবা করত রাজস্ব আদায়কারীরা তাহলে তারা সকলেই ক্ষমা পেয়ে যেত।" এরপর রসূলুল্লাহ (সা)-এর নির্দেশে গামিদিয়া (রা)-এর জানাযা ও দাফন কাফন করা হয়।।[১]

আমানত ও দিয়ানত (সততা ও আমানতদারী)

এই ঈমান ছিল মানুষের আমানত, সচ্চরিত্রতা ও মহত্ত্বের প্রহরীস্বরূপ। নির্জনে ও জনসমাবেশে তথা প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে যেখানে দেখার মত কেউ থাকত না, এমন জায়গা যেখানে একজন মানুষের যা খুশি করবার পূর্ণ সুযোগ থাকে, যেখানে কাউকে ভয় করার কিংবা কারোর থেকে ভয় পাবার ছিল না। এই ঈমান প্রবৃত্তির প্ররোচনা ও কামনা-বাসনার ওপর পরিপূর্ণ নিয়ন্ত্রণ রাখত। ইসলামের বিজয়ের ইতিহাসে সততা, আমানতদারী ও ইখলাসের এমন সব ঘটনা বিদ্যমান যে, মানব ইতিহাসে এর নজীর মেলা ভার। এ কেবল সুদৃঢ় ঈমান

১. সহীহ মুসলিম, কিতাবুল-হুদূদ।

ও আল্লাহ্‌র ধ্যান এবং সর্বত্র ও সর্বক্ষণ তাঁর অবগতির চেতনারই ফসল ছিল। ঐতিহাসিক তাবারী বর্ণনা করেন, মুসলমানরা যখন ইরানের রাজধানী মাদায়েনে পৌছল এবং মালে গনীমত তথা যুদ্ধলব্ধ সম্পদ সংগ্রহ করতে লাগল তখন এক ব্যক্তি তার সংগৃহীত ধনরত্ন নিয়ে এল এবং কোষাধ্যক্ষের নিকট সোপর্দ করল। লোকেরা বলল, এমন মূল্যবান সম্পদ তো আমরা কখনো দেখি নি। আমরা যা সংগ্রহ করেছি এর তুলনায় সেগুলোর কোন মূল্যই নেই। এরপর লোকে তাকে জিজ্ঞেস করল, তুমি এর থেকে কিছু রেখে আসনি তো? লোকটি আল্লাহ্‌র কসম খেয়ে বলল, ব্যাপারটা যদি আল্লাহ্‌র সাথে সম্পৃক্ত না হতো তা হলে তোমরা এ সবের বিন্দু-বিসর্গও জানতে পারতে না। লোকেরা বুঝতে পারল, এ কোন মামুলী লোক নন। তারা তার পরিচয় জিজ্ঞেস করল। লোকটি জানাল, আমি বলতে পারব না এজন্য যে, তোমরা আমার প্রশংসা করবে, অথচ প্রশংসা একমাত্র আল্লাহরই প্রাপ্য। তিনি এ কাজের জন্য যদি কোন ছওয়াব দিতে চান আমি কেবল তাতেই রাজী। তিনি চলে গেলে তাঁর পরিচয় জানার জন্য তাঁর পেছনে একজন লোক পাঠানো হয়। জানা গেল, তাঁর নাম আমের, তিনি আবদে কায়স গোত্রের লোক।[১]

সৃষ্টিকুল ও প্রদর্শনীর প্রতি নিস্পৃহতা ও নিঃশংকচিত্ততা

তৌহিদী আকীদা-বিশ্বাস তাঁদের মাথা উঁচু করে দিয়েছিল আর গর্দান করে দিয়েছিল উন্নত। গায়রুল্লাহ্‌র সামনে কিংবা অত্যাচারী বাদশাহর সামনে অথবা আলিম-উলামা, পীর-দরবেশ কিংবা ধর্মীয় ও জাগতিক নেতৃত্বের অধিকারী কোন ব্যক্তিত্বের সামনে তাঁদের এই উন্নত গর্দান ও উচ্চ মস্তক অবনমিত হবে—এর কল্পনাও ছিল অসম্ভব। এই ঈমান ও ঈমানী চেতনা তাঁদের দিল ও দৃষ্টিকে আল্লাহ তা'আলার আজমত ও মাহাত্ম্য দ্বারা পরিপূর্ণ করে দিয়েছিল। সৃষ্টিকুলের সৌন্দর্য ও আকর্ষণ, দুনিয়ার চিত্তভোলা দৃশ্য ও প্রতারণাকারী বস্তুসমূহ ও শান-শওকতের প্রদর্শনী তাঁদের দৃষ্টিতে কোন মূল্যই বহন করত না। তাঁরা যখন রাজা-বাদশাহ, তাদের জাঁকজমক ও প্রভাব-প্রতিপত্তি, তাদের দরবারের সাজসজ্জার দিকে তাকাত এবং দেখতে পেত, এসব রাজা-বাদশাহ এসবেই পরম তুষ্ট, তখন তাঁদের মনে হতো, কতিপয় নিষ্প্রাণ ভাস্কর্য কিংবা মাটির তৈরী মূর্তি যাদেরকে মানুষের পোশাক পরিয়ে সাজানো হয়েছে।

---

১. তারীখে তাবারী, ৪র্থ খণ্ড, ১৬ পৃ.।

আবূ মূসা বলেন, আমরা যখন নাজাশীর কাছে গেলাম তখন তাঁর দরবারের অধিবেশন চলছিল। ডান দিকে ছিল (কুরায়শ দূত) আমর ইবনু'ল-আস এবং বাম দিকে আম্মারাহ। ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ দো-সারিতে উপবিষ্ট। আমর ও আম্মারাহ্ বাদশাহ্কে লক্ষ্য করে বললেন, এরা (অর্থাৎ মুসলমানরা) কাউকে সিজদা করে না। পাদ্রীরা এর প্রেক্ষিতে মুসলমানদের বলল বাদশাহ্কে সিজদা করতে। হযরত জা'ফর (রা) তাৎক্ষণিক জওয়াবে বললেন ঃ আমরা আল্লাহ্ ভিন্ন আর কাউকে সিজদা করি না।[১]

হযরত সা'দ (রা) পারসিক সেনাপতি রুস্তমের কাছে রিবঈ ইবন আমের (রা)-কে তাঁর দূত নিযুক্ত করে পাঠান। রিবঈ ইবন আমের (রা) গিয়ে দেখতে পান, দরবার মূল্যবান গালিচা দ্বারা সজ্জিত এবং স্বয়ং রুস্তম দামী ইয়াকূত ও মণি-মুক্তাখচিত মহামূল্যবান পোশাক পরিধান করে স্বর্ণ সিংহাসনে উপবিষ্ট। তার মস্তকে দামী মুকুট শোভা পাচ্ছে। রিবঈ ইবন আমের (রা) যখন রুস্তমের দরবারে যান তখন তাঁর পরনে ছিল পুরনো সাধারণ পোশাক, সাথে ছোট্ট একটি ঢাল আর ছোট্ট একটি ঘোড়া। তিনি ঘোড়ায় চড়ে গালিচা মাড়িয়েই সামনে অগ্রসর হন। এরপর তিনি ঘোড়া থেকে অবতরণ করেন। তিনি মূল্যবান সোফার সঙ্গে ঘোড়া বেঁধে নিজে রুস্তমের দিকে অগ্রসর হন। সাথে যুদ্ধাস্ত্র, শিরোপরি লৌহ শিরস্ত্রাণ এবং শরীরে বর্ম পরিহিত। উপস্থিত লোকেরা তাঁকে সামরিক পোশাকাদি খুলে ফেলতে বলে। তিনি উত্তরে জানান, আমি তোমাদের কাছে নিজে থেকে আসি নাই। তোমরাই আমাকে ডেকে এনেছ। আমার এ বেশে আগমন যদি তোমাদের পছন্দ না হয় তাহলে আমি এখনই ফিরে যাচ্ছি। রুস্তম তখন তার লোকদের বাধা দিয়ে বললেন, তাঁকে আসতে দাও। তিনি পাতা ফরাশের ওপর বর্শায় ভর দিয়ে অগ্রসর হতে থাকলে বর্শার অগ্রভাগের চাপে স্থানে স্থানে গালিচা ফুটো হয়ে যায়। দরবারীরা জিজ্ঞেস করে, তোমরা এদেশে কিজন্য এসেছ? তিনি উত্তর দেন, "আল্লাহ পাক আমাদের এজন্যই পাঠিয়েছেন যেন আমরা তাঁরই ইচ্ছানুক্রমে তাঁর বান্দাদেরকে বান্দার দাসত্ব থেকে মুক্তি দিয়ে আল্লাহ্র দাসত্বে ন্যস্ত করতে পারি, দুনিয়ার সংকীর্ণতা থেকে বের করে আখিরাতের প্রশস্ততার দিকে এবং ধর্মের নামে কৃত জুলুম ও বাড়াবাড়ি থেকে মুক্ত করে ইসলামের সুবিচারের ছায়াতলে টেনে নিই।"[২]

---

১. আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ইবন কাছীর, খণ্ড. ৩, পৃ. ৬৭।
২. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ইবনে কাছীরকৃত, খ. ৭, পৃ. ৪০।

নজীরবিহীন বীরত্ব ও জীবনের প্রতি নিস্পৃহ

পারলৌকিক জীবনের প্রতি বিশ্বাস মুসলমানদের হৃদয়ে এমন নির্ভীকতা সৃষ্টি করে দিয়েছিল, এক কথায় যা ছিল বিস্ময়কর! তা তাঁদেরকে জান্নাতের প্রতি আশ্চর্য রকমের আগ্রহশীল এবং জীবনের প্রতি বীতস্পৃহ করে দিয়েছিল। জান্নাতের ছবি তাঁদের চোখের সামনে এমনভাবে ভেসে উঠত যে, যেন বাস্তবে তাঁরা তা প্রত্যক্ষ করছে। তাঁরা সেই জান্নাতের দিকে ঝাঁপিয়ে পড়তেন যেমন পত্রবাহক কবুতর ওড়বার সময় কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ মাত্র না করে সোজা মনযিলে গিয়েই দম নেয়।

ওহুদ যুদ্ধে যখন বহু মুসলমানই যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করেছিল তখন আনাস ইবন নযর (রা) অগ্রসর হন। সামনেই তিনি হযরত সা'দ ইবন মুআয (রা)-কে দেখতে পান। তিনি হযরত সা'দ (রা)-কে লক্ষ্য করে বলে ওঠেন, ওহে সা'দ (রা)! আল্লাহ্‌র কসম করে বলছি, আমি ওহুদ পাহাড়ের অপর পাশ থেকে ভেসে আসা জান্নাতের খোশবু পাচ্ছি। আনাস ইবন মালিক (রা) বলেন, (শাহাদত লাভের পর) আমরা তাঁর শরীরে আশিটির বেশি জখম দেখতে পেয়েছি। এসব জখমের কোনটি ছিল তলোয়ারের, কোনটি বল্লমের, আবার কোনটি ছিল তীরের। আমরা তাঁকে এ অবস্থায় দেখি, তাঁর দেহ কাফির মুশরিকদের আঘাতে আঘাতে টুকরো টুকরো হয়ে গিয়েছিল। ফলে তাঁকে চেনার উপায় ছিল না। তাঁর বোন তাঁর একটি অক্ষত আঙুল দেখে তাঁকে চিনতে সক্ষম হন।[১]

বদর যুদ্ধে যখন রসূলুল্লাহ (সা) সাহাবাদের লক্ষ্য করে বললেন, তোমরা সেই জান্নাতের দিকে অগ্রসর হও যার প্রশস্ততা আসমান থেকে যমীন পর্যন্ত। উমায়র ইবন হাম্মাম (রা) নামক জনৈক আনসারী সাহাবী বলে ওঠেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! জান্নাতের প্রশস্ততা যমীন থেকে আসমান পর্যন্ত? তিনি বললেন, হ্যাঁ, কেন? তোমার কি এতে সন্দেহ হচ্ছে? আনসারী বললেন, না, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার আশা, যদি তা আমি পেতাম! তিনি বললেন, হ্যাঁ, তুমি তা পাবে। এরপর এই সাহাবী তাঁর থলে থেকে খেজুর বের করে খেতে লাগলেন। এরপর তিনি বলে উঠলেন, আমি যদি এই খেজুরগুলো খাবার জন্য অপেক্ষা করি তাহলে অনেক সময় লেগে যাবে। এই বলে তিনি বাকি খেজুরগুলো ছুঁড়ে ফেলে দিলেন, যুদ্ধক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং শাহাদত লাভ করলেন।[২]

---

১. বুখারী ও মুসলিম।

২. মুসলিম।

আবূ বকর ইবন আবূ মূসা আশ'আরী বর্ণনা করেন, আমার পিতা ছিলেন শত্রুর মুখোমুখি। তিনি বলছিলেন, রসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, জান্নাতের দরজা তরবারির ছায়াতলে অবস্থিত। তা শুনে এক ব্যক্তি উঠে দাঁড়াল। তার শরীরের কাপড়-চোপড় ছিল জীর্ণশীর্ণ। সে বলল, আবূ মূসা! তুমি কি নিজে আল্লাহ্র রসূল (সা)-কে এই কথা বলতে শুনেছ? তিনি জানালেন, হ্যাঁ, শুনেছি। তখন সেই লোকটি তার সাথীদের কাছে ফিরে গেল এবং তাদের বলল, তোমরা আমার সালাম গ্রহণ করো। এরপর তিনি তলোয়ারের খাপ ভেঙে ফেলে দিয়ে কোষমুক্ত তলোয়ার হাতে দুশমনের মুকাবিলায় ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং শহীদ হয়ে গেলেন।[১]

আমর ইবন জামূহ্র ছিল চার পুত্র। তিনি খোঁড়া ছিলেন বিধায় পা খুঁড়িয়ে চলতেন। রসূলুল্লাহ (সা) যুদ্ধে গমন করলে তাঁর চার পুত্রই এতে যোগদান করতেন এবং রসূলুল্লাহ (সা)-এর সঙ্গী হতেন। তিনি ওহুদ যুদ্ধে রওয়ানা হবার কালে আমর ইবন জামূহ (রা) এতে যোগ দেবার জন্য বায়না ধরে বসেন। পুত্ররা তাদের পিতাকে এই বলে বোঝাতে চেষ্টা করেন, আল্লাহ তা'আলা তো এ ব্যাপারে আপনাকে অব্যাহতি দিয়েছেন। আপনি না গেলেই ভাল হয়। আপনার পক্ষ থেকে আমরাই তো যথেষ্ট। আল্লাহ পাক জিহাদে যোগদানের দায়িত্ব থেকে আপনাকে অব্যাহতি দিয়েছেন। আমর ইবন জামূহ (রা) আল্লাহর রসূলের খেদমতে গিয়ে হাজির হলেন এবং বলতে লাগলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার এসব ছেলে আমাকে আপনার সঙ্গী হতে বাধা দিচ্ছে। আল্লাহর কসম! আমার দিলের বাসনা, আমি আমার এই খোঁড়া পা নিয়েই জান্নাতের বুকে চলাফেরা করি। আল্লাহ্র রসূল (সা) তাঁকে বললেন, আল্লাহ তোমাকে জিহাদে যোগদানের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিয়েছেন। এরপর ছেলেদের লক্ষ্য করে বললেন, তোমরা তাকে যেতে দিচ্ছ না কেন? হয়তো আল্লাহ তা'আলা তাঁকে শাহাদত দান করবেন। এরপর আমর (রা) রসূলুল্লাহ (সা)-এর সঙ্গে জিহাদে গমন করেন এবং শাহাদত লাভ করেন।[২]

শাদ্দাদ ইবন হাদ বলেন, একজন বেদুঈন নবী করীম (সা)-এর খেদমতে এসে ঈমান আনল এবং তাঁর সাথী হলো। তারপর সে বলল, আমি আপনার সঙ্গে হিজরত করব। নবী করীম (সা) একজন সাহাবীকে তার প্রতি খেয়াল রাখতে বললেন। খয়বরের যুদ্ধ এসে হাজির হলে যুদ্ধের পর যুদ্ধলব্ধ সম্পদ

---

১. মুসলিম।

২. যাদুল-মাআদ, ৩য় খণ্ড, ১৩৫ পৃ.।

বণ্টন করেন। উল্লিখিত বেদুঈনকেও বণ্টিত একটি অংশ দেবার জন্য সাহাবাদের হাতে তুলে দেন। বেদুঈন সকলের পশুপাল চরাত। সন্ধ্যায় ফিরে আসার পর যখন তাকে তার অংশ প্রদান করা হলো তখন সে এটা কিসের কি জিজ্ঞেস করল। লোকে বলল, মালে গনীমত ভাগ করার সময় রসূলুল্লাহ (সা) তোমাকেও একটি অংশ দিয়েছেন। সে এটা হাতে নিয়ে সোজা আল্লাহ্‌র রসূল (সা)-এর খেদমতে গিয়ে হাজির হলো এবং জিজ্ঞেস করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এটা কি? তিনি বললেন, তোমার অংশ। সে বলল, আমি তো এর জন্য আপনার সাথী হই নি। আমি তো আপনার সাথী হয়েছিলাম যাতে করে আমার এখানে তীর লাগে, এই বলে সে কণ্ঠনালীর দিকে ইঙ্গিত করল, আর আমি জান্নাতে যেতে পারি। তিনি বললেন, যদি আল্লাহর সঙ্গে তোমার কারবার সত্য হয় তাহলে তিনিও তোমার আকাঙ্ক্ষা পূরণ করবেন। এরপর যুদ্ধ হলো। যুদ্ধ সমাপ্তির পর তিনি ঐ বেদুঈনের পাশ দিয়ে যাবার সময় দেখতে পেলেন সে শহীদ হয়ে পড়ে আছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন যে, একি সেই লোক ? সকলেই বলল, জী হ্যাঁ, সেই বেদুঈনটিই। বললেন, আল্লাহ্‌র সঙ্গে তার কারবার সত্য ছিল, আল্লাহও তার আকাঙ্ক্ষাকে সত্য করে দেখিয়েছেন।[১]

পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ

এরা সকলেই এই ঈমান কবুলের আগে কী বিশৃংখল জীবন যাপন করছিল! তারা না কোন শক্তির সামনে মাথা নত করত, আর না কোন জীবন-বিধানের ধার ধারত। তারা কোন জীবন পদ্ধতির সঙ্গেই জড়িত ছিল না। তারা একমাত্র প্রবৃত্তির অনুগত ছিল। না বুঝেই তারা আমল করত। গোমরাহীর অন্ধকারে তারা হাতড়ে ফিরত। এখন তাঁরা ঈমান ও গোলামির এক সুনির্দিষ্ট বৃত্তের মধ্যে এমনভাবে প্রবেশ করেছিল যে, তাঁদের জন্য এর বাইরে বেরিয়ে আসা কঠিন হয়ে পড়েছিল। তাঁরা আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ও তাঁর ক্ষমতা মাথা পেতে মেনে নিয়েছিল এবং অনুগত প্রজা, ভৃত্য, গোলাম হিসেবে স্বীকার করে নিয়েছিল। পরিপূর্ণরূপে তাঁর সমীপে নিজেদের নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব সঁপে দিয়েছিল। কানূনে ইলাহী তথা খোদায়ী বিধানকে নিঃশর্তে মেনে নিয়েছিল এবং নিজেদের কামনা-বাসনা ও মাতব্বরী ফলানো থেকে পরিপূর্ণরূপে হাত গুটিয়ে নিয়েছিল। তাঁরা এমনভাবে গোলামে পরিণত হয়েছিল যে, তাঁরা না নিজেদেরকে নিজেদের সম্পদেরই

১. যাদুল-মাআদ, ২য় খণ্ড, ১৯ পৃ.।

মালিক মনে করত, আর না মালিক মনে করত নিজের জানের যে মালিকের মর্জি ও অনুমতি ছাড়া সামান্যতম এখতিয়ারও প্রয়োগ করতে পারে না। তাঁদের যুদ্ধ ও সন্ধি-সমঝোতা, শত্রুতা ও বন্ধুত্ব, অনুরাগ ও বিরাগ, দেওয়া ও না দেওয়া, আত্মীয়তা সম্পর্ক স্থাপন ও ছিন্নকরণ সব কিছুকেই আল্লাহ্‌র হুকুমের অধীন করে দেওয়া হয়েছিল। তাঁরা যাই কিছু করত তাঁর হুকুম মাফিক করত। তাঁরা জাহেলিয়াত সম্পর্কে সম্যক অবহিত ছিল। এরই ভেতর তাঁরা ল্যালিত-পালিত ও বয়োপ্রাপ্ত হয়েছিল। এজন্যই তাঁরা ইসলামের মর্ম খুব ভালই বুঝত। তাঁদের বেশ ভালই জানা ছিল, ইসলামের নামই হলো এক জীবন থেকে আরেক জীবনের দিকে স্থানান্তরিত হওয়া। এক দিকে বান্দার রাজত্ব অথবা কেবলই নৈরাজ্য আর অপর দিকে আল্লাহর হুকুমত। গতকালও আল্লাহর সঙ্গে যুদ্ধ-সংঘাত ও সংঘর্ষ ছিল এবং তাঁর আইন, তাঁর কানূন ও তাঁর বিধানের সঙ্গে সংঘাত চলছিল আর আজ (ইসলাম গ্রহণের পর) পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ, আনুগত্য এবং স্থায়ী সন্ধি ও সমঝোতা। কাল পর্যন্ত ছিল আমার আর আমার, আমিত্বের অহংকার আর এখন আল্লাহ্‌র গোলামি ও দাসত্ব। যখনই আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি, এরপর আর আমার, আমিত্ব বা মতামত বলতে কিছু নেই, নেই স্বেচ্ছাচারিতামূলক কোন কাজ বা কর্ম। এখন আর আল্লাহ্‌র হুকুম থেকে মুখ ফেরাবার কিংবা আল্লাহর বিধানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবার কোন সুযোগ নেই। আল্লাহর হুকুমের পর আমার নিজস্ব এখতিয়ার বলতে কিছু অবশিষ্ট নেই। রসূলুল্লাহ (সা)-এর বিরোধিতা এবং তাঁর বিরুদ্ধে দলিল-প্রমাণ খাড়া করা কিংবা তর্ক-বিতর্কের কোন অবকাশ নেই। গায়রুল্লাহর সামনে মোকদ্দমা পেশ করা যাবে না কিংবা নিজস্ব খেয়াল-খুশি মুতাবিক ফয়সালা হতে পারবে না। দীনের মুকাবিলায়, ইসলামের মুকাবিলায় রসম-রেওয়াজের পাবন্দী করা যাবে না। তেমনি ইসলাম গ্রহণের পর নফস পরস্তী তথা আত্মপূজাও অবশিষ্ট থাকতে পারে না। যখনই সে ইসলাম গ্রহণ করল তখনই জাহেলী জীবনের তার সমস্ত বৈশিষ্ট্য, আচার-অভ্যাস ও রসম-রেওয়াজসহ পরিত্যাগ করল এবং ইসলামকে তার সর্বপ্রকার বৈশিষ্ট্য ও আবশ্যকীয় বিষয়াদিসহ গ্রহণ করল। এর ফলে তার জীবনে এতটুকু বিলম্ব ছাড়াই পরিপূর্ণ বিপ্লব সাধিত হলো।

ফুযালা ইবন উমায়র ইবন মিলওয়াহ্ আল্লাহ্‌র রসূল (সা)-কে শহীদ করতে মনস্থ করে। রসূল (সা) তখন কা'বা শরীফ তাওয়াফ করছিলেন। ফুযালা কাছে আসতেই তিনি বললেন, ফুযালা নাকি হে? সে উত্তরে বলল, জী হ্যাঁ, আমি ফুযালা ইয়া রাসূলাল্লাহ! রসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, কী মনে করে এসেছ আর কি

ভাবছ? সে বলল, কৈ না, কিছু মনে করে নয়। আমি আল্লাহ্কে স্মরণ করছিলাম। রসূল (সা) বললেন, আল্লাহর কাছে তওবা কর। এরপর তিনি তাঁর মুবারক হাত তার বুকের ওপর রাখলেন। এতে তাঁর হৃদয়-মন অপূর্ব তৃপ্তি ও প্রশান্তিতে ভরে গেল। ফুযালা (মুসলমান হবার পর) বলতেন, নবী করীম (সা)-এর হাত আমার বুকের ওপর থেকে উঠতেই তাঁকে আমার কাছে এমন প্রিয় মনে হতে লাগল যে, তাঁর চাইতে অধিক প্রিয় আল্লাহ তা'আলা সমগ্র দুনিয়াতে আর কাউকে সৃষ্টিই করেন নি। ফুযালা বলেন, ফেরার পথে পথিমধ্যে এক মহিলার সঙ্গে আমার সাক্ষাত হয় যার সঙ্গে আমার পূর্ব সম্পর্ক ছিল। সে আমাকে দেখে একটু নিরিবিলিতে আলাপ জমাতে চাইল। আমি তাকে বললাম, এখন আর তা হয় না। আল্লাহর আনুগত্য ও ইসলাম গ্রহণের পর এখন আর এর কোন সুযোগ বা অবকাশ নেই।[১]

সঠিক পরিচিতি ও বিশুদ্ধ অভিজ্ঞান

আম্বিয়া 'আলায়হিমুস-সালাম মানুষকে আল্লাহ্র যাত ও সিফাত তথা তাঁর পবিত্র সত্তা ও গুণাবলী ও তাঁর যাবতীয় কাজকর্মের সঠিক ও নিশ্চিত জ্ঞান দান করেছিলেন। এই বিশ্বজগতের সূচনা ও চূড়ান্ত পরিণতি এবং মৃত্যুর পর মানুষ যার মুখোমুখি হবে সে সবের জ্ঞান আম্বিয়া 'আলায়হিমুস-সালামের মাধ্যমে মানব জাতি পর্যন্ত কোনরূপ চেষ্টা-তদবীর ও আয়াস ছাড়াই পৌঁছেছে। আম্বিয়া 'আলায়হিমুস-সালাম এমন সব জ্ঞানের ক্ষেত্রে তাদের পথ দেখিয়েছেন যে সবের মূলনীতি ও মূলভিত্তির প্রাথমিক জ্ঞানও তার ছিল না যার ওপর এই মানুষ তার গবেষণার প্রাসাদ দাঁড় করাতে পারে। আম্বিয়া 'আলায়হিমুস-সালাম মানুষের সময় ও শক্তি বাঁচিয়ে দিয়েছেন, অধিবিদ্যাগত সেই নিষ্ফল ও অর্জনাতীত অনুসন্ধান ও গবেষণার হাত থেকে মুক্তি দিয়েছেন যেক্ষেত্রে না তার ইন্দ্রিয় শক্তি তাকে কোনরূপ সাহায্য করতে পারত আর না দিতে পারত তার দৃষ্টি কোন পথের সন্ধান, আর না তার কাছে এ বিষয়ক কোন মৌলিক জ্ঞানই বিদ্যমান ছিল।

কিন্তু মানুষ এই নেয়ামতের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেনি। সে এক অপ্রয়োজনীয় অভিযানের দায়িত্ব নিজের মাথায় তুলে নিল। যেই হাকীকত তথা মৌলিক সত্য আম্বিয়া 'আলায়হিমুস-সালামের মাধ্যমে সে অনায়াসে ও বিনা প্রয়াসে লাভ করেছিল সে তা নিয়ে আবার গোড়া থেকে গবেষণা শুরু করল এবং

১. যাদুল-মা'আদ, ২য় খণ্ড, ২৩২ পৃ.।

সেই অজানা দ্বীপাঞ্চল ও ভূখণ্ড চষে বেড়াতে লাগল যার কোন পথ-প্রদর্শক তার সাথে ছিল না কিংবা এমন কেউ ছিল না যে এ পথ সম্পর্কে অবহিত। এ ব্যাপারে সে সেই অভিযাত্রীর চাইতেও বেশি দুর্ভাগা ও বাহুল্যপ্রিয় প্রমাণিত হয়েছে যে সে সব জ্ঞাত বিষয় ও গবেষণাতেই সন্তুষ্ট নয় যা ভূগোল ও মানচিত্র আকারে কয়েক প্রজন্মের ও শতাব্দীর পর শতাব্দীর শ্রমের ফসল। সে প্রয়াস চালাচ্ছে পাহাড়ের উচ্চতা ও সমুদ্রের গভীরতা নতুন করে মাপতে। প্রান্তর-ময়দান, দূর-দূরান্ত ও সীমান্তসমূহ তার এই সংক্ষিপ্ত বয়স ও সীমাবদ্ধ উপায়-উপকরণ নিয়ে আরেকবার যুক্ত ও সম্পৃক্ত করতে। এই মানুষটির চেষ্টা ও শ্রমের পরিণতি এছাড়া আর কী হতে পারে যে, অবশেষে সে ক্লান্ত ও অবসন্ন হয়ে বসে পড়বে। তার অটুট সংকল্প ও মনোবল জওয়াব দিয়ে বসবে এবং সেই ব্যক্তি কেবল গুটি কয়েক স্মারক ও অপূর্ণ ইশারা-ইঙ্গিতের কিছু পুঁজি সংগ্রহ করবে। এর চেয়ে বেশি যে সমস্ত লোক খোদায়ী দর্শনের ময়দানে অন্তর্দৃষ্টি ও আলোক-রশ্মি ব্যতিরেকেই পা রেখেছে তাদের জ্ঞানের এই ময়দানে পরস্পরবিরোধী মত, অপূর্ণ জ্ঞান ও তথ্য, আকস্মিক ধ্যান-ধারণা ও তাড়াহুড়ার দর্শন ছাড়া আর কিছু খুঁজে পাবে না। নিজেরাও পথ হারাল আর অন্যদেরও বিভ্রান্ত ও লক্ষ্যভ্রষ্ট করল।

সাহাবায়ে কিরাম (রা) দীন সম্পর্কে অত্যন্ত সৌভাগ্যবান ও তৌফীকপ্রাপ্ত ছিলেন যে, দীন সম্পর্কে তাঁরা রসূলুল্লাহ সো)-এর তা'লীম ও প্রদত্ত তথ্যের ওপর পূর্ণ আস্থা স্থাপন করে আল্লাহ্ তা'আলার পবিত্র সত্তা ও গুণাবলী সম্পর্কে 'আকাশ কুসুম স্বর্গ তৈরির' ব্যর্থ চেষ্টা থেকে বিরত থাকেন। তাঁরা তাঁদের মেধা ও শক্তিকে নিরাপদ ও সুরক্ষিত রাখেন এবং নিজেদের যাবতীয় প্রয়াস, চেষ্টা-সাধনা ও সময়কে পূর্ণ সতর্কতার সাথে দীন ও দুনিয়ার উপকারী ক্ষেত্রে ব্যয় করেন। তাঁরা দীনের মযবূত বৃত্তকে আঁকড়ে থাকেন। ফল দাঁড়াল এই যে, যদি অন্যের কাছে দীন সম্পর্কিত বিষয়াদি ও বিস্তৃত বিবরণ থাকে, তবে তাঁদের কাছে ছিল দীনের মগজ ও এর সারাৎসার।

মানবীয় পুষ্পডালি

আল্লাহ্, তাঁর রসূল ও পারলৌকিক জীবনের ওপর বিশ্বাস ও পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ জীবনের জটিলতাকে দূর করে দিল এবং মানব পরিবারের প্রত্যেক সদস্যকে তার যথার্থ স্থান দান করল। মানব সমাজ একটি কণ্টকমুক্ত ফুলের ডালিতে পরিণত হলো যার প্রতিটি ফুল ও প্রতিটি পত্র তার জন্য সৌন্দর্যবর্ধক ছিল।

মানব জাতির সদস্যবর্গ একটি পরিবারে পরিণত হলো। তারা ছিল সকলেই একই পিতা (আদম)-এর সন্তান আর আদমের উৎপত্তি মাটি থেকে। আরবের কারোর অনারবের ওপর যেমন কোনরূপ শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা ছিল না, তেমনি কোন অনারবেরও কোন আরবের ওপর প্রাধান্য ছিল না। তবে হ্যাঁ, শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা থাকলে তা ছিল কেবল তাকওয়ার ভিত্তিতে, কে কতটা আল্লাহভীরু তার ভিত্তিতে।

রসূলুল্লাহ (সা) বলেন :

"লোক সকল! আল্লাহ তোমাদের থেকে জাহেলিয়াতের মিথ্যা অহমিকার মূলোৎপাটন করে দিয়েছেন এবং তোমাদের বাপ-দাদাদের নিয়ে গর্ব করার প্রথাও খতম করে দিয়েছেন। মানুষ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত ঃ একশ্রেণী যারা সৎ ও আল্লাহকে ভয় করে আর এরাই আল্লাহ তা'আলার দরবারে শরীফ হিসেবে বিবেচিত। আর দ্বিতীয় শ্রেণী হলো তারা যারা বদকার ও বদবখ্‌ত (অসৎ ও হতভাগা), আল্লাহ তা'আলার দরবারে যারা হেয় ও লাঞ্ছিত হিসেবে পরিগণিত।[১]

হযরত আবূযর গিফারী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ নবী করীম (সা) তাঁকে বলেনঃ দেখ, তুমি কারো থেকে উত্তম নও এবং বড়ও নও। তবে হ্যাঁ, যদি তাকওয়ার ক্ষেত্রে এগিয়ে যেতে পার (তাহলে অবশ্যই বড়)।

তিনি যখন রাত্রের শেষভাগে আপন প্রভু-প্রতিপালকের দরবারে হাত তুলে মুনাজাত করতেন তখন বলতেন, "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, সমস্ত মানুষই ভাই ভাই।"[২]

নবী করীম (সা) জাহেলিয়াত-এর পরিপূর্ণরূপে মূলোৎপাটন করেছিলেন এবং এর অনুপ্রবেশের সমস্ত ফাঁকফোকর বন্ধ করে দিয়েছিলেন। তিনি বলেন, "যে ব্যক্তি অন্যায় গোত্রপ্রীতি, সম্প্রদায়প্রীতি ও জাতীয়তাপ্রীতির ঝাণ্ডাবাহী হবে সে আমাদের কেউ নয় এবং যে এ নিয়ে যুদ্ধে লিপ্ত হয় সেও আমাদের কেউ নয় এবং যে এতে মারা যাবে সেও আমাদের কেউ নয় (অর্থাৎ মুসলমান নয়)।"[৩]

জাবির ইবন আবদুল্লাহ বলেন, আমরা এক যুদ্ধে ছিলাম। একজন মুহাজির জনৈক আনসারীকে ভালমন্দ কিছু বলে ফেলেন। এতে আনসারী চিৎকার দিয়ে বলে ওঠেন, 'হে আনসাররা! আমার সাহায্যে এগিয়ে এস।' ওদিকে মুহাজিরও

---

১. ইবনে আবী হাতিম;

২. আবূ দাউদ।

৩. আবূ দাউদ;

চিৎকার দিয়ে ডেকে ওঠেন, 'ওহে মুহাজিররা! আমার সাহায্যে এগিয়ে এস।' ইতিমধ্যে নবী করীম (সা) এসে হাজির হন এবং উভয়কে লক্ষ করে বলেন: "তোমরা এই যূথবন্দীর শ্লোগান পরিত্যাগ কর। কেননা এ নাপাক ও অপবিত্র।"[১]

তিনি জাহিলী যুগের অন্ধ গোত্রপ্রীতিকে নাজায়েয বলে অভিহিত করেন এবং 'তুমি তোমার ভাইকে সাহায্য করবে চাই সে জালিম হোক অথবা মজলুম।' –এই নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত সাহায্য ও পারস্পরিক সহযোগিতার জাহিলী নীতির পরিবর্তন ঘটান যার ওপর তাদের সমগ্র জীবন পরিচালিত হচ্ছিল।

নবী করীম (সা) বলেন ঃ যে তার লোকদের বাতিল ও মিথ্যার ওপর সাহায্য করল সে সেই উটের ন্যায় যে উট কুয়োয় নিক্ষিপ্ত হতে চলেছে আর লোকে তার লেজ ধরে ঠেকাচ্ছে।[২] আরবদের মন-মানসিকতা ও চিন্তা-চেতনার এমন পরিবর্তন ঘটে যে, এখন আর তাদের রুচি ওপরে উল্লিখিত বিখ্যাত প্রবাদ বাক্যটি হজম করতে পারছিল না। এরপর একবার যখন নবী করীম (সা) বললেন, "তোমরা তোমাদের ভাইকে সাহায্য করবে চাই সে জালিম হোক অথবা মজলুম" তখন সাহাবায়ে কিরাম (রা) আর চুপ করে থাকতে পারলেন না। তাঁরা সমস্বরে বলে ওঠেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ্! মজলুমকে তো অবশ্যই সাহায্য করতে হবে, কিন্তু জালিমকে সাহায্য করা হবে কী ভাবে?" তিনি বললেন, "তাকে জুলুম থেকে বিরত রাখবে, নিবৃত্ত করবে, এটাই তাকে সাহায্য করা।"[৩]

ইসলামী সমাজে বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ পরস্পরে সম্প্রীতিশীল, সহায়ক ও শক্তিবর্ধক হয়ে গিয়েছিল। এখন আর তারা পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী নয়। পুরুষেরা নারীর যিম্মাদার ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে নিয়োজিত। আর নারীরা সৎ, বিশ্বস্ত ও আমানতদার। তাদের অধিকার রক্ষার যিম্মাদার পুরুষ এবং পুরুষের অধিকার রক্ষায় তৎপর নারী।

দায়িত্বশীল সমাজ

গোটা সমাজের মধ্যে দায়িত্বানুভূতি সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল। মানব সমাজ এখন আর একটি অসহায়, এখতিয়ারহীন, অবশ অকেজো জামাত ছিল না যে জামাত না নিজ মস্তিষ্কের সাহায্যে কাজ আনজাম দিতে সক্ষম আর না পারে নিজস্ব এখতিয়ারে। তার জ্ঞান-বুদ্ধি ও সাবালকত্ব এবং তার এখতিয়ার স্বীকার করে

১. সহীহ বুখারী; ২. তফসীর ইবনে কাছীর।
৩. বুখারী ও মুসলিম।

নেওয়া হয়েছিল। এই সমাজের প্রত্যেক সদস্য ছিলেন একজন দায়িত্বশীল ও এখতিয়ারের অধিকারী যিনি স্ব-স্ব গণ্ডি ও বৃত্তের মধ্যে দায়িত্বশীল ও এখতিয়ারের মালিক। মানুষ তার নিজ পরিবারের গার্জিয়ান ও দায়িত্বশীল অভিভাবক হতো। নারী তার স্বামীর ঘরের ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে নিয়োজিত এবং সে তার অধীনস্থ লোকদের সম্পর্কে জওয়াবদিহি করতে আদিষ্ট। কর্মচারী তার মনিব বা মালিকের সম্পদের যিম্মাদার এবং সে তার যিম্মাদারীর ব্যাপারে জওয়াবদিহি করতে বাধ্য ছিল। তদ্রূপই ইসলামী সমাজ একটি সচেতন ও ক্ষমতার অধিকারী সমাজ ছিল যার প্রত্যেক সদস্য তার নিজ কাজের জন্য জওয়াবদিহি করতে বাধ্য ছিল।

সমস্ত মুসলমান সত্যের সাহায্যকারীতে পরিণত হয়েছিল। তাদের কাজকর্ম পরামর্শের ভিত্তিতে পরিচালিত হতো। খলীফা যতক্ষণ আল্লাহ্র অনুগত থাকতেন ততক্ষণ মুসলমানরা তাঁর অনুগত থাকত। যদি খলীফা আল্লাহ্র নাফরমানী করতেন তাহলে আর এ আনুগত্য অবশিষ্ট থাকত না। নবী করীম (সা)-এর বাণীঃ لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق -

অর্থাৎ 'স্রষ্টার অবাধ্যতার বিনিময়ে সৃষ্টির আনুগত্য বৈধ নয়' হুকুমতের প্রতীক চিহ্নে পরিণত হলো। যে ধন-সম্পদ ও বায়তুল মালের (তথা সরকারী কোষাগারের) অর্থকড়ি সুলতান, তার অমাত্য ও সভাসদবর্গের সহজ গ্রাস ও আমীর-উমারার ব্যক্তিগত সম্পত্তি মনে করা হতো এখন তা আল্লাহর আমানত মনে করা হচ্ছিল। এসব তাঁরই সন্তুষ্টির জন্য ও সঠিক স্থানে ব্যয় করা হচ্ছিল এবং মুসলমানরা ছিল এসব সম্পদের আমানতদার ও মুতাওয়াল্লী। খলীফার উদাহরণ ছিল য়াতীমের অভিভাবকের ন্যায়। তিনি (খলীফা) আর্থিক সামর্থ্যের অধিকারী হলে সরকারী কোষাগার থেকে বেতন-ভাতা গ্রহণের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করতেন এবং বিরত থাকতেন। আর অভাবী হলে জীবিকা নির্বাহের প্রয়োজনে যতটুকু না হলেই নয় সে পরিমাণ ভাতা গ্রহণ করতেন। আল্লাহ্র সেই সুবিস্তৃত যমীন যাকে রাজা-বাদশাহ, সুলতান ও আমীর-উমারা নিজেদের উপভোগের সামগ্রী ও পৈতৃক সম্পদ ভেবে রেখেছিল, যাকে চাইত দরাজ হস্তে বিলিয়ে দিত এবং যাকে না চাইত হাত গুটিয়ে নিত, কেউ কেউ আবার এক্ষেত্রে কাপড়ের ন্যায় সংযোজন বিয়োজন করে জোড়াতালি দিত এখন আর তা ছিল না। এখন এগুলো ছিল আল্লাহ্র যমীন যার এক বিঘত পরিমাণেরও হিসাব দিতে হতো।

বিবেকবান সমাজ

মানব সমাজ দীর্ঘকাল থেকে নিজেদের এখতিয়ার ও অভিপ্রায় এবং স্বাদ ও রুচি খুইয়ে বসেছিল। তারা এক অভাবী প্রায় সমাজে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। তারা ছিল এক নিরুপায় ও অসহায় জামাত যাদের হাত-পা ছিল বাঁধা। যুদ্ধের সময় হোক, চাই শান্তি ও সন্ধির সময় হোক, তাদের মতামত কী তা কেউ জিজ্ঞেস করত না। সেই সমাজের সদস্যদেরকে আত্মোৎসর্গের, দুঃখ-কষ্ট সহ্যের ও কঠোর পরিশ্রমের মুখোমুখি হতে বাধ্য করা হতো, অথচ এজন্য তাদের কোন সায়ও থাকত না বা এর দ্বারা তাদের কোন উপকারও হতো না। তারা তাদের কর্মকর্তাদের পছন্দ করত না আর কর্মকর্তারাও তাদেরকে পছন্দ করত না। এরপরও তারা তাদের কথামত চলতে বাধ্য ছিল যাদের তারা অপছন্দ করত এবং তাদের জীবন ও সম্পদ উৎসর্গ করতে বাধ্য হতো যাদের তারা ঘৃণা করত। ফল হলো এই যে, তাদের দিলের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নিভে যায়, আবেগ-উদ্দীপনা থিতিয়ে যায় এবং লোকের লোক দেখানো ও প্রতারণা-প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। অবজ্ঞা, ঘৃণা ও লাঞ্ছনা বরদাশ্তে তারা অভ্যস্ত হয়ে যায়।

প্রেম ও ভালবাসার সঠিক স্থান

প্রকৃতিগত ও স্বভাবজাত সেই উপাদান যার মস্তকে মানব ইতিহাসের অধিকাংশ বিস্ময়কর অর্জন ও আশ্চর্যজনক কৃতিত্বের স্বর্ণমুকুট স্থাপন করেছে যাকে মানুষ প্রেম ও ভালবাসা নামে স্মরণ করে থাকে, বহুকাল থেকে চরম উপেক্ষিত ও নিষ্প্রাণ অবস্থায় পড়ে ছিল। বহু শতাব্দী অবধি এমন কেউ ছিল না, যে একে কাজে লাগাতে পারে, এমন কেউ জন্মেনি, যে এর থেকে প্রকৃত ফায়দা হাসিল করতে পারে। ব্যস! সে কেবল চাকচিক্য ও সৌন্দর্যের নশ্বর প্রদর্শনীর বেদীমূলে আত্মাহুতি দিয়ে চলেছিল। বহু কাল থেকে পৃথিবীর বুকে এমন কোন মানুষের জন্ম হয় নি যিনি তাঁর সৌন্দর্য ও কামালিয়াত তথা নিজের মহোত্তম গুণাবলী দ্বারা সমগ্র মানব জাতির ভালবাসার হকদার হবেন এবং আপন শক্তি ও চিত্তাকর্ষক ব্যক্তিত্ব দ্বারা এই ভালবাসা থেকে কাজ নিতে পারেন। আল্লাহ্র রসূল (সা)-এর সত্তার মধ্যে মানবতা তার সেই হারিয়ে যাওয়া সম্পদটি পেয়ে যায়। তিনি ছিলেন সেই মানুষ যাঁকে আল্লাহ্ তা'আলা সামগ্রিক গুণাবলী দান করেছিলেন। সব বৈধ সৌন্দর্য-সৌকর্যের সমাহার বানিয়ে ছিলেন। যারা তাঁকে দেখেছেন তাঁদের ভাষ্য হলো ঃ তাঁকে যারা হঠাৎ করে দেখত- কী এক অজানা ভয়ে তাদের বুক দুরু দুরু করে কাঁপত। আবার যারা তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে

মেলামেশার সুযোগ পেতেন, তাঁরা তাঁর প্রতি আসক্ত হয়ে পড়তেন। তাঁর প্রশংসাকারীরা বলতেনঃ তাঁর মতো তাঁর আগে না আর কাউকে দেখেছি , আর না তাঁর পরেই আর কাউকে দেখেছি। তাঁর আগমনের পর সত্যিকার ও পাক-পবিত্র ভালবাসা বাঁধভাঙা প্লাবনের ন্যায় দু'কূল উপচে পড়ে। মানুষের হৃদয়-মন এভাবে আকর্ষণ করে যেভাবে চুম্বক লোহাকে আকর্ষণ করে অর্থাৎ মানুষের স্বভাব-প্রকৃতি ও হৃদয় আগে থেকেই তাঁর জন্য অধীর প্রতীক্ষায় ছিল। তাঁর উম্মতের সদস্যেরা তাঁর প্রতি এমন অনুরাগ ও আনুগত্য প্রদর্শন করে যার নজীর প্রেম ও ভালবাসার ইতিহাসে খুঁজে পাওয়া যায়নি। তাঁর আনুগত্য ও তাবেদারীর মাঝে নিজেকে সম্পূর্ণ বিলীন করার এবং নিজের ঘরবাড়ি ও ধন-সম্পদ লুটিয়ে দেবার এমন সব ঘটনা দেখতে পাওয়া যায় যা এর আগে আর কখনো দেখা যায়নি আর না ভবিষ্যতে দেখতে পাবার আশা করা যায়।

অনুরাগ ও আত্মোৎসর্গ

হযরত আবূ বকর (রা)-এর ইসলাম গ্রহণের পর মক্কায় একবার তাঁর ওপর শত্রুরা আক্রমণ করে বসে। ওৎবা ইবনে রবী'আ তাঁকে নির্দয়ভাবে প্রহার করেছিল। ফলে তাঁর চেহারা এমনি ফুলে গিয়েছিল যে, তাঁকে দেখে চেনাই মুশকিল হয়ে গিয়েছিল। বনু তামীম তাঁকে কাপড়ে জড়িয়ে তাঁর ঘরে পৌঁছে দেয়। তিনি যে তাতে নির্ঘাত মারা যাবেন এতে কারো মনে কোন সন্দেহ ছিল না। বেলা ডোবার পর তিনি জ্ঞান ফিরে পান। তারপর প্রথমেই তিনি জিজ্ঞেস করেন, রসূলুল্লাহ (সা)-এর খবর কি? তিনি কেমন আছেন ? লোকে তাঁর একথা শুনতেই ক্রোধান্বিত হয়, এই অবস্থাতেও তিনি তাঁরই কথা স্মরণ করছেন, যাঁর কারণে আজ তাঁর এই করুণ হাল! এজন্যে তারা তাঁকে ভর্ৎসনা ও কটুকাটব্য করতে লাগল। তারা হযরত আবূ বকর (রা)-এর মা উম্মুল-খায়রকে ডেকে বলল, দেখুন! তাঁর কিছু খানাপিনার ব্যবস্থা করুন। মা তাঁকে খাবার গ্রহণের জন্য অনেক পীড়াপীড়ি করলেন। কিন্তু তাঁর মুখে সেই একই কথা, বল, আল্লাহ্র রসূল (সা) কেমন আছেন ? উত্তরে তিনি বললেন, আল্লাহ্র কসম! আমি তোমার সাথী সম্পর্কে কিছুই জানি না। তখন তিনি তাঁর মাকে বললেন, আপনি খাত্তাব-কন্যা উম্মু জামীলের কাছে যান এবং তাঁর কুশল জেনে এসে আমাকে জানান। তিনি উম্মু জামীলের কাছে গিয়ে বলেন, আবূ বকর মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহর কুশল জানতে চাচ্ছে। উম্মু জামীল বললেন, আমি আবূ বকরকেও চিনি না আর মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহকেও জানি না। আপনি যদি চান তাহলে

আমি বরং আপনার সাথে গিয়ে আপনার ছেলেকে এক নজর দেখে আসতে পারি। তিনি সম্মতি জানিয়ে বললেন, ঠিক আছে, চলুন। এরপর উভয়ে একত্রে আবূ বকর (রা)-এর ঘরে এসে তাঁকে ঐ অবস্থায় দেখতে পেলেন। উম্মু জামীল আবূ বকর (রা)-এর একেবারে কাছাকাছি গিয়ে তাঁর শারীরিক অবস্থা দেখলেন এবং বললেনঃ আল্লাহ্র কসম! যে সম্প্রদায় আপনার সাথে এরূপ (নিষ্ঠুর ও নির্দয়) আচরণ করেছে তারা দুরাচার ও কাফির। আমি আশা করি আল্লাহ্ তাদের থেকে আপনার প্রতিশোধ গ্রহণ করবেন। হযরত আবূ বকর (রা) তাঁকে বললেন ঃ আগে বলুন, রসূলুল্লাহ (সা)-এর অবস্থা কেমন ? তিনি কেমন আছেন? উম্মু জামীল বললেন, আপনার মা তো শুনতে পাচ্ছেন! তিনি বললেন, তার পক্ষ থেকে ভয় পাবার কিছু নেই। আপনি স্বচ্ছন্দে বলতে পারেন। উম্মু জামীল তখন বললেন, তিনি ভাল আছেন এবং সুস্থ আছেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তিনি এখন কোথায় ? বললেন, তিনি এখন আরকামের বাড়িতে অবস্থান করছেন। আবূ বকর (রা) বললেন, আল্লাহ্র কসম! এখন আর আমি পানাহার করতে পারি না যতক্ষণ না আমি রসূলুল্লাহ (সা)-এর খেদমতে গিয়ে হাজির হই। এরপর তাঁরা উভয়ে কিছুটা অপেক্ষা করলেন। রাত হলো এবং মানুষের চলাফেরা ও আনাগোনা যখন থেমে গেল তখন উম্মু জামীল আবূ বকর (রা)কে নিয়ে আরকামের বাড়ির উদ্দেশে বেরিয়ে পড়লেন এবং রসূলুল্লাহ (সা)-এর খেদমতে গিয়ে উপস্থিত হলেন। তিনি হুযূর আকরাম (সা)-কে দেখামাত্রই যেন জীবন ফিরে পেলেন। এরপর তিনি পানাহার করেন।[১]

জনৈক আনসারী মহিলা, যাঁর বাপ-ভাই ও স্বামী ওহুদ যুদ্ধে রসূলুল্লাহ (সা)-এর সঙ্গে যুদ্ধ করতে গিয়ে শাহাদত লাভ করেছিলেন, নিজ আবাস থেকে বেরিয়ে লোকদের জিজ্ঞেস করতে থাকেন ঃ রসূলুল্লাহ (সা)-এর খবর কি? তিনি কেমন আছেন ? লোকেরা জওয়াবে বলল, আলহামদুলিল্লাহ! তিনি ভাল আছেন, সুস্থ আছেন যেমনটি তুমি চাও। মহিলাটি বলল, আমাকে দেখাও। আমি হুযূর (সা)-কে দেখতে চাই। এরপর মহিলা হুযূর আকরাম (সা)-কে দেখামাত্রই আবেগাপ্লুত কণ্ঠে বলে ওঠেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনাকে দেখার পর আর সব বিপদ-আপদই তুচ্ছ।[২]

হযরত খুবায়ব (রা)-কে শূলে চড়ানো হয়। শূলে চড়াবার পূর্বে তাঁর ঈমানী দৃঢ়তার পরীক্ষা নেবার উদ্দেশে কাফিররা বলেছিল, আমরা তোমাকে মুক্তি দিতে

১. আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ইবনে কাছীর কৃত, ২য় খণ্ড. ৩০ পৃ.।
২. ইবনে ইসহাক ও বায়হাকী।

পারি যদি তুমি এতে রাজী থাক, আমরা তোমাকে মুক্তি দেই আর তোমার স্থলে মুহাম্মদ (সা)-কে ফাঁসি দিই। একথা শুনতেই তিনি বলে ওঠেন, আল্লাহ্‌র কসম! আমি তো এও পছন্দ করি না, তাঁর পায়ে একটা কাঁটা বিঁধুক আর আমি তার বিনিময়ে মুক্তি পাই। খুবায়ব (রা)-এর কথায় তারা সকলেই হেসে ফেলে।[১]

হযরত যায়দ ইবন ছাবিত (রা) বলেন, ওহুদ যুদ্ধের দিন আল্লাহ্‌র রসূল (সা) আমাকে সা'দ ইবনুর রবী'র সন্ধানে পাঠালেন এবং আমাকে বললেন, যদি তুমি তাকে পাও তবে আমার সালাম বলবে এবং বলবে যে, রসূলুল্লাহ (সা) জানতে চেয়েছেন তুমি এখন কেমন বোধ করছ। যায়দ (রা) বলেন, আমি নিহতদের মধ্যে ঘুরতে লাগলাম। এর পর তাঁকে পেতেই গিয়ে দেখলাম, তাঁর অন্তিম মুহূর্ত সমাগত। তাঁর শরীরে তীর, তলোয়ার ও বল্লমের সত্তরটির মত আঘাত। আমি তাঁকে বললামঃ সা'দ! আল্লাহর রসূল (সা) আপনাকে সালাম পাঠিয়েছেন এবং জানতে চেয়েছেন, আপনার অবস্থা এখন কেমন? আপনি কেমন বোধ করছেন? উত্তরে তিনি বললেন, রসূলুল্লাহ (সা)-কে আমার সালাম বলবে এবং আরও বলবে, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি জান্নাতের খোশবু পাচ্ছি। আর আমার সম্প্রদায় আনসারদের বলবে, যদি তোমাদের অনবধানতায় রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কিছু হয়ে যায়, এমতাবস্থায় যদি তোমাদের একটি চোখও অক্ষত থাকে তাহলে আল্লাহ্‌র দরবারে তোমাদের কোন ওযর থাকবে না। এর পরক্ষণেই তাঁর প্রাণ বায়ু বেরিয়ে যায়।[২]

ওহুদ যুদ্ধের দিন সাহাবী হযরত আবূ দুজানা (রা) কাফিরদের নিক্ষিপ্ত তীর-তলোয়ারের হাত থেকে রসূল (সা)-কে বাঁচাতে আপন পৃষ্ঠদেশকে ঢালের ন্যায় পেতে দিয়েছিলেন। নিক্ষিপ্ত তীরগুলো তাঁর পিঠে এসে লাগত আর তিনি এক চুলও নড়াচড়া করতেন না।[৩] মালিক আল-খুদরী (রা) রসূল আকরাম (সা)-এর ক্ষতস্থান থেকে গড়িয়ে পড়া রক্ত চুষে খেয়ে পরিষ্কার করে দিয়েছিলেন। যায়দ (রা) তাঁকে থুথু ফেলতে বলেন। কিন্তু তিনি এতে অস্বীকৃতি জানিয়ে বলেন, আল্লাহ্‌র কসম! আমি কখনোই থুথু ফেলব না।[৪]

আবূ সুফিয়ান যখন মদীনায় এসেছিলেন তখন তিনি তাঁর নিজ কন্যা উম্মুল-মুমিনীন হযরত উম্মু হাবীবা (রা)-এর ঘরে গিয়ে ওঠেন এবং রসূল

---

১. আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৪ খ. ৬৩ পৃ.।
২. যাদু'ল-মা'আদ, ২খ. ১৩৪।
৩. প্রাগুক্ত, ১৩০ পৃ.।
৪. প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড ১৩৬ পৃ.।

আকরাম (সা)-এর বিছানায় বসতে উদ্যত হন। উম্মু হাবীবা (রা) তৎক্ষণাৎ বিছানা উল্টিয়ে দেন। বিস্মিত আবূ সুফিয়ান কন্যাকে বলেন, বেটি! আমি জানি না, তুমি কি আমাকে এই বিছানার উপযুক্ত মনে করনি।নাকি এই বিছানাই আমার উপযোগী নয় মনে করেছ। উম্মু হাবীবা (রা) বলেন , না, তা নয়, বরং এ বিছানা স্বয়ং আল্লাহ্র রসূলের আর আপনি মুশরিক বিধায় অপবিত্র (অতএব আপনি এ বিছানায় বসার উপযুক্ত নন)।[১]

ওরওয়া ইবন মাসঊদ ছাকাফী হুদায়বিয়া থেকে প্রত্যাবর্তনের পর আপন সঙ্গী-সাথীদের বলেছিলেন, লোক সকল! আল্লাহ্র কসম করে বলছি, আমি রাজা-বাদশাহ্দের দরবারে গিয়েছি। পারস্য সম্রাট কিসরা, রোম সম্রাট কায়সার ও আবিসিনিয়া অধিপতি সম্রাট নাজাশীর দরবারেও গিয়েছি, দেখেছি। আল্লাহ্র কসম! মুহাম্মদের সাথীরা মুহাম্মদকে যতটা সম্মান ও সমীহ্ করে, ততটা সম্মান ও সমীহ কোন রাজা-বাদশাহ্র সাথীদেরকে তাদের রাজা-বাদশাহ্দেরকে করতে দেখিনি। আল্লাহ্র কসম করে বলছি, যখন তিনি থুথু ফেলেন তখন তা তাদেরই কারোর হাতের ওপর গিয়ে পড়ে। আর অমনি তাঁরা তা তাঁদের মুখমণ্ডল ও শরীরে মেখে নেয়। যখন তিনি কোন কাজের নির্দেশ দেন অমনি সেই নির্দেশ পালনে সকলে ঝাঁপিয়ে পড়ে। আর তিনি যখন ওযূ করেন তখন সেই গড়িয়ে পড়া পানি সংগ্রহের জন্য কাড়াকাড়ি শুরু হয়ে যায়। তিনি যখন কথা বলেন, তখন তারা নিজেদের স্বর নিচু করে দেয় এবং অতিরিক্ত শ্রদ্ধাবশত তারা কখনই তাঁর চেহারার দিকে গভীর ও পরিপূর্ণ দৃষ্টি নিয়ে তাকায় না।[২]

আনুগত্য ও তাঁবেদারী

আনুগত্য ও তাঁবেদারী প্রেম ও ভালবাসার অনিবার্য ও অপরিহার্য ফসল। সাহাবায়ে কিরাম (রা) যখন প্রেম ও ভালবাসার সম্পদে ধন্য হলেন তখন তাঁরা তাঁদের সকল শক্তি তাঁর আনুগত্যের পেছনে ব্যয় করলেন। আর এর সর্বোত্তম উদাহরণ হযরত সা'দ ইবন মু'আয (রা)-এর সেই বিখ্যাত উক্তি যা তিনি আনসারদের পক্ষ থেকে বদর যুদ্ধের প্রাক্কালে করেছিলেন ঃ

"আমি আনসারদের পক্ষ থেকে খোলা মন নিয়ে বলছি এবং তাদের পক্ষ থেকে জওয়াবও দিচ্ছি। আপনি যেখানে ইচ্ছা অবস্থান করুন, যার সঙ্গে চান সম্পর্ক স্থাপন করুন এবং যার সঙ্গে খুশি সম্পর্ক ছিন্ন করুন, আমাদের ধন-সম্পদ

১. সীরাত ইবনে হিসাম। ২. যাদুল মা'আদ, ২খ. ১২৫ পৃ.।

যা ইচ্ছা ও যতটা ইচ্ছা গ্রহণ করুন এবং যা খুশি বিলিয়ে দিন। আপনি আমাদের থেকে যা গ্রহণ করবেন তা অনেক বেশি প্রিয় ও পছন্দনীয় হবে তা থেকে যা আপনি রেখে যাবেন। যে ব্যাপারে যা কিছু আপনি হুকুম করবেন আমরা তা অবনত মস্তকে মেনে নেব এবং তার প্রতি অনুগত থাকব। আল্লাহ্র কসম! আপনি যদি বার্ক-এ গামাদান পর্যন্ত চলে যান আমরাও আপনার অনুগমন করব এবং আল্লাহ্র কসম করে বলছি, আপনি যদি ঘোড়াসহ সমুদ্রেও ঝাঁপিয়ে পড়েন তাহলে কালবিলম্ব না করে আপনার পেছনে আমরাও তাতে ঝাঁপিয়ে পড়ব।”[১]

তাঁদের আনুগত্যের আরেকটি উদাহরণ নিন! রসূলুল্লাহ (সা) যখন সেই তিনজন সাহাবীর সঙ্গে কথাবার্তা বলতে নিষেধ করে দিলেন যাঁরা তবূক যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন তখনও সাহাবায়ে কিরাম (রা) সেই নির্দেশ মাথা পেতে নিয়েছিলেন। মদীনা উল্লিখিত তিনজনের জন্য একটি নির্জন পুরীতে পরিণত হয় যেখানে তাঁদের সঙ্গে কথা বলার জন্য একটি জনপ্রাণীও ছিল না, ছিল না তাঁদের কথার জওয়াব দেবার মত একজন মানুষও। (তাঁদের একজন) কা'ব (রা) বলেন ঃ

“রসূলুল্লাহ (সা) আমাদের তিনজনের (যথাক্রমে হযরত কা'ব, হেলাল ইবন উমাইয়া ও মারারা ইব্ন রবী'আ) সঙ্গে কথা বলতে সকলকে নিষেধ করে দিয়েছিলেন। লোকেরা আমাদেরকে এরপর থেকে এড়িয়ে চলতে লাগল এবং আমাদের সম্পর্কে তাদের নজরই যেন বদলে গেল, এমন কি গোটা দুনিয়াটাই বিশাল ও বিস্তৃত হওয়া সত্ত্বেও আমার জন্য সংকীর্ণ হয়ে গেল। যে জগৎটাকে আমি জানতাম ও চিনতাম এ যেন সেই জগত নয়, বরং সম্পূর্ণ ভিন্ন এক জগত। এমন কি আমাদের সম্পর্কে লোকের উপেক্ষা যখন আরও বৃদ্ধি পেল তখন একদিন আমি পথে বেরিয়ে পড়লাম এবং আবূ কাতাদার প্রাচীর টপকে তার বাগানে ঢুকে পড়লাম। এই আবূ কাতাদা আর কেউ নয়, আমারই চাচাতো ভাই, ছিল সর্বাধিক প্রিয়জন। আমি তাঁকে দেখা মাত্রই সালাম করলাম, অথচ কী আশ্চর্য! আল্লাহ্র কসম করে বলছি, সে আমার সালামের উত্তরটা পর্যন্ত দিল না। আমি তাকে বললাম যে, আবূ কাতাদা! আমি তোমাকে আল্লাহ্র দোহাই দিয়ে বলছি, তুমি তো জান, আমি আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল (সা)-কে ভালবাসি। সে চুপ করে থাকল। আমি আমার কথার পুনরাবৃত্তি করলাম এবং তাকে আল্লাহ্র দোহাই দিলাম, কিন্তু তারপরও সে চুপ রইল। আমার কথার উত্তর দিল না।

১. যা'দুল মা আদ, পৃ. ১৩০।

আমি আবারও সেই একই কথা বললাম এবং তাকে আল্লাহ্র দোহাই দিলাম। তখন সে কেবল এতটুকু বলল, এ সম্পর্কে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল বেশি জানেন। আমার চোখ অশ্রুসজল হয়ে উঠল। আমি ঘুরে দাঁড়ালাম এবং দেওয়াল টপকে বাইরে বেরিয়ে এলাম।"[১]

তাঁর আনুগত্যের আরেকটি দৃষ্টান্ত এও যে, তিনি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের অসন্তোষ ও উপেক্ষার শিকার ছিলেন। এমতাবস্থায় তাঁর কাছে আল্লাহর রসূলের দূত এল এবং বলল, রসূলুল্লাহ (সা) তোমাকে স্ত্রী থেকে পৃথক থাকার নির্দেশ দিয়েছেন।

তিনি বললেন, আমি কি আমার স্ত্রীকে তালাক দেব? দূত বলল, "না, বরং আলাদা থাকবেন, কাছে যাবেন না।" এরপর তিনি তাঁর স্ত্রীকে বলে দিলেন সে যেন তার পিতৃগৃহে চলে যায় এবং সেখানেই থাকে যতক্ষণ না আল্লাহ তা'আলা তাঁদের ব্যাপারে একটা ফয়সালা করেন।[২]

রসূলুল্লাহ (সা)-এর সঙ্গে তাঁর প্রেম ও ভালবাসার সম্পর্কের অবস্থা ছিল এই যে, সকলের ওপর তিনি তাঁকে (আল্লাহ্র রসূলকে) অগ্রাধিকার দিতেন। ঠিক বয়কট চলাকালেই গাসসান অধিপতি তাঁদের প্রতি সমবেদনা ও সহানুভূতি জ্ঞাপন করে পত্র প্রেরণ করে এবং তাঁকে তার দরবারে আগমনের আহ্বান জানায়। উপেক্ষা ও ভর্ৎসনার এই সময়টা আসলেই খুব কঠিন পরীক্ষার মুহূর্ত ছিল। কিন্তু তদ্সত্ত্বেও তিনি এই আহ্বান প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি বলেন, আমি মদীনার বাজারে ঘোরাফেরা করছিলাম। এমন সময় জনৈক সিরীয় নাবাতীয় যে খাদ্যশস্য বিক্রয়ের উদ্দেশে মাঝে-মধ্যে মদীনায় আগমন করত, উপস্থিত লোকদের কাছে আমার সন্ধান জানতে চায়। লোকেরা আমাকে ইশারায় দেখিয়ে দিলে সে কাছে এসে গাসসান অধিপতির একটি পত্র আমার হাতে তুলে দেয়। আমি লেখাপড়া জানতাম। পত্র পড়লাম। পত্র ছিল নিম্নরূপ :

"আমরা জানতে পেরেছি তোমাদের মনিব তোমাদের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করছেন। আল্লাহ তা'আলা তোমাকে লাঞ্ছনা ও অবমাননার জন্য রাখেন নি এবং তোমাকে নষ্ট করতে চান না। ব্যস! তুমি আমাদের কাছে চলে এস। আমরা তোমার প্রতি খেয়াল রাখব এবং যথোপযুক্ত মর্যাদা দেব।"

---

১. বুখারী ও মুসলিম। ২. বুখারী ও মুসলিম।

চিঠি পড়া মাত্রই আমি বুঝতে পারলাম এও এক পরীক্ষা। এরপর আমি পত্রটা নিকটস্থ একটি জ্বলন্ত চুলায় নিক্ষেপ করলাম।[১]

আনুগত্য ও নির্দেশ পাওয়া মাত্রই তাৎক্ষণিকভাবে তা পালনের আরেকটি উদাহরণ নিন যা মদ পান হারাম ঘোষিত হবার সময় দেখতে পাওয়া গিয়েছিল। হযরত আবূ বুরদা তাঁর পিতার বরাতে বর্ণনা করেন ঃ

"আমরা মজলিসে বসে মদ পান করছিলাম। তারপর আমি রসূলুল্লাহ (সা)-এর খেদমতে হাযির হওয়া ও তাঁকে সালাম দেয়ার নিমিত্ত উঠে পড়লাম। এদিকে ইতিমধ্যেই মদ পান হারাম হবার ঘোষণা সম্পর্কিত আয়াত নাযিল হয়ে গিয়েছিল।

يَٓا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ - اِنَّمَا يُرِيْدُ الشَّيْطٰنُ اَنْ يُّوْقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِى الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَعَنِ الصَّلٰوةِ فَهَلْ اَنْتُمْ مُّنْتَهُوْنَ – المائدة

"হে মু'মিনগণ! মদ, জুয়া, মূর্তিপূজার বেদী ও ভাগ্য নির্ণায়ক শর ঘৃণ্য বস্তু, শয়তানের কাজ। সুতরাং তোমরা তা বর্জন কর যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার। শয়তান তো মদ ও জুয়া দ্বারা তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ ঘটাতে চায় এবং তোমাদের আল্লাহ্র স্মরণে ও সালাতে বাধা দিতে চায়। তবে কি তোমরা নিবৃত্ত হবে না?" (সূরা মায়িদা, ৯০-৯১ আয়াত)

আমি আমার সাথীদের কাছে এলাম এবং আমি এই আয়াত هَلْ اَنْتُمْ مُّنْتَهُوْنَ- পর্যন্ত পড়ে তাদেরকে শুনিয়ে দিলাম। তিনি বলেন যে, সঙ্গী-সাথীদের ভেতর কারো কারো হাতে মদপূর্ণ পেয়ালা ছিল। কিছুটা পান করেছে আর পেয়ালায়ও কিছুটা অবশিষ্ট আছে, এমন কি ঠোঁট মদ স্পর্শ করেছে, এমতাবস্থায়ও তারা তক্ষুণি তা থুক করে ফেলে দিয়েছেন (আর পেয়ালাগুলো দূরে ছুঁড়ে ফেলেছেন)।"[২]

১. বুখারী ও মুসলিম।
২. তফসীর ইবনে জরীর, ৭ম খণ্ড।

রসূলুল্লাহ (সা)-এর আনুগত্য ও নিজের ওপর, পরিবারের সদস্যদের ওপর এবং বংশের লোকজনের ওপর তাঁকে অগ্রাধিকার প্রদানের একটি অনন্য ও অভূতপূর্ব উদাহরণ হলো এই যে, (কুখ্যাত মুনাফিক সর্দার) আবদুল্লাহ ইবন উবাই ইবন সলূলের পুত্র আবদুল্লাহকে একবার রসূলুল্লাহ (সা) ডেকে পাঠান এবং বলেন : শুনেছ, তোমার পিতা কী বলছে ? আবদুল্লাহ বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার পিতামাতা আপনার ওপর কুরবান হোক। তিনি কি বলছেন? আল্লাহ্র রসূল (সা) বললেন : বলছে, যদি মদীনায় ফিরি তো যারা সম্মানিত তারা লাঞ্ছিতদের বের করে দেবে। আবদুল্লাহ বললেন, আল্লাহ্র কসম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি সত্যি কথাই বলেছেন। আল্লাহ্র কসম! আপনি সম্মানিত এবং তিনি লাঞ্ছিত ও অবমানিত। ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি মদীনায় তশরীফ নিন। ইয়াছরিববাসী জানে, সেখানে আমার চেয়ে আমার পিতার সর্বাধিক অনুগত ও বাধ্য আর কেউ নেই। যদি আল্লাহ ও তাঁর রসূল চান, আমি তার মাথাটা (কেটে) নিয়ে আসি তাহলে তার জন্যও আমি প্রস্তুত। রসূলুল্লাহ (সা) এতে অসম্মতি প্রকাশ করে বললেন, না, আমি তা চাই না।

এরপর লোকে মদীনায় পৌঁছুলে আবদুল্লাহ মদীনার প্রবেশমুখে তলোয়ার হাতে তাঁর পিতার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে গেলেন। তাঁর পিতা সে পথে মদীনায় প্রবেশ করতে গিয়ে পুত্র আবদুল্লাহ কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হলেন। তিনি পিতাকে লক্ষ্য করে বললেন ঃ

আপনি বলেছেন যে, মদীনায় গিয়ে যিনি সম্মানিত তিনি লাঞ্ছিতকে বের করে দেবেন? আপনি এখনই জানতে পারবেন, সম্মানিত কে। আল্লাহ্র কসম! আল্লাহ ও তাঁর রসূলের অনুমতি ব্যতিরেকে আপনি মদীনায় থাকতে পারবেন না।

আবদুল্লাহ ইবনে উবাই তখন চিৎকার দিয়ে বলতে লাগল ঃ

ওহে, খাযরাজ বংশীয় লোকেরা! তোমরা দেখ, আমার ছেলে আমাকে আমার ঘরে প্রবেশে বাধা দিচ্ছে। ওহে খাযরাজের লোকেরা! আমার ছেলে আমার ঘরে যেতে আমাকে বাধা দিচ্ছে। আমাকে আমার বাড়ি যেতে দিচ্ছে না।

লোকজন একত্র হতেই তিনি বলে উঠলেন ঃ

আল্লাহ্র কসম! আল্লাহ্র রসূলের অনুমতি ছাড়া তিনি মদীনার ভেতর এক পাও ফেলতে পারবেন না।

লোকে তাঁকে বোঝাতে লাগল। কিন্তু তিনি তাঁর কথায় অনড় ও অটল। তিনি বলেই চললেন ঃ না, আল্লাহ ও তাঁর রসূলের অনুমতি ছাড়া তিনি এক পাও অগ্রসর হতে পারবেন না।

অবশেষে সকলেই নবী করীম (সা)-এর কাছে ছুটে গেলেন এবং তাঁকে ব্যাপারটা বললেন। তিনি তখন বলে পাঠালেন, যাও! আব্দুল্লাহকে গিয়ে বল, সে যেন তার পিতাকে মদীনায় প্রবেশের অনুমতি দেয়।

লোকে ফিরে এসে বলতেই তিনি বলে উঠলেন, হ্যাঁ, এখন নবী করীম (সা)-এর অনুমতি পাওয়ার পর তিনি মদীনায় প্রবেশ করতে পারেন।[১]

নতুন মানুষ নতুন উম্মাহ

এই বিস্তৃত ও গভীর ঈমান, এই শক্ত সুদৃঢ় পয়গম্বরসুলভ শিক্ষা, এই সূক্ষ্ম ও বিজ্ঞ দার্শনিকসুলভ প্রশিক্ষণ, অনন্য ও অত্যাশ্চর্য শক্তি ও ব্যক্তিত্ব এবং এই বিস্ময় উদ্রেককারী আসমানী কিতাবের সাথে যার অনন্য ও বিরল বস্তুসমূহ নিঃশেষ হবার নয় এবং যার সজীবতায় কখনো ঘাটতি পড়ে না। রসূলুল্লাহ (সা) মৃতপ্রায় মানবতার মাঝে এক নতুন জীবনের জন্ম দেন। মানবতার সেই সম্পদভাণ্ডার যা কাঁচামাল আকারে পড়ে থেকে নষ্ট হচ্ছিল, যে সবের উপকারিতা, কল্যাণ ও ব্যয় খাত কারোরই জানা ছিল না, যেগুলোকে মূর্খতা, অজ্ঞতা, কুফর ও কম হিম্মতি বরবাদ করে রেখেছিল, তিনি তাদের জীবনের গতিই পাল্টে দিলেন। আল্লাহ্র অপার সাহায্যে তিনি তার মধ্যে ঈমান ও আকীদা সৃষ্টি করে দিলেন। জীবনের নতুন প্রাণ সঞ্চার করলেন। চাপাপড়া যোগ্যতা তুলে ধরলেন এবং অভ্যন্তরীণ সামর্থ্যকে উদ্ভাসিত করলেন। এরপর এসবের প্রতিটিকে সঠিক মর্যাদায় স্থাপন করলেন যেন এর জন্যই তার জন্ম হয়েছিল। যেন জায়গা শূন্য ছিল এবং যেন এরই সে অপেক্ষা করছিল। সে ছিল এক নিষ্প্রাণ পাথর। এখন সে জীবন্ত, প্রাণবন্ত ও জাগ্রত মানুষে পরিণত হলো। সে ছিল অনুভূতিশূন্য, নিশ্চল ও মৃত। এখন সে প্রাণ ফিরে পেয়ে বিশ্বের ওপর রাজদণ্ড পরিচালনা করছে। প্রথমে ছিল অন্ধ যে নিজেই রাস্তা চিনত না আর এখন সে সারা দুনিয়ার রাহবার ও পথ-প্রদর্শক হিসেবে মানুষকে পথ দেখাচ্ছে।

اَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَاَحْيَيْنٰهُ وَجَعَلْنَا لَهٗ نُوْرًا يَّمْشِىْ بِهٖ فِى النَّاسِ كَمَنْ مَّثَلُهٗ فِى الظُّلُمٰتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا ـ

“যে ব্যক্তি মৃত ছিল যাকে আমি পরে জীবিত করেছি এবং যাকে মানুষের মধ্যে চলবার জন্য আলোক দিয়েছি সেই ব্যক্তি কি ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে অন্ধকারে রয়েছে এবং সেই স্থান থেকে বের হবার নয় ?” (সূরা আন‘আম, ১২২ আয়াত)

---

১. তফসীরে তাবারী, ২৮তম খন্ড.।

নবী করীম (সা)-এর মনোযোগ ও শিক্ষার বদৌলতে আরবের ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে এমন বিপ্লব দেখা দিল যে, গোটা দুনিয়া অতি অল্প দিনের মধ্যেই তাদের ভেতর সেই সব আজীমুশশান ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব ঘটতে দেখল যাঁরা ছিলেন যেমন বিস্ময়কর, তেমনি ইতিহাসে অবিস্মরণীয়। সেই ওমর (রা) যিনি এক সময় তাঁর পিতা খাত্তাবের বকরী চরাতেন আর তাঁর পিতা তাঁকে নানা কারণে বকাঝকা করতেন, শক্তি ও সংকল্পে তিনি কুরায়শদের মধ্যম সারির লোকদের অন্তর্গত ছিলেন, অস্বাভাবিক কোন বৈশিষ্ট্যের অধিকারী তিনি ছিলেন না এবং তাঁর সমসাময়িক লোকজন তাঁকে অস্বাভাবিক কোন গুরুত্বও দিত না, সেই ওমর (রা) এক নিমিষে তৎকালীন বিশ্বকে নিজের মাহাত্ম্য ও যোগ্যতা দ্বারা বিস্ময়াবিষ্ট করে তোলেন এবং রোম সম্রাট কায়সার ও পারস্য সম্রাট কিসরার রাজমুকুট ও রাজসিংহাসন ছিনিয়ে নেন এবং এমন এক ইসলামী রাষ্ট্রের বুনিয়াদ কায়েম করেন যা একই সঙ্গে উল্লিখিত দুই হুকুমতের ওপর পরিবেষ্টনকারী এবং প্রশাসনিক ও সর্বোত্তম ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার রাখে। আর তাকওয়া, পরহেযগারী ও ন্যায় বিচারের দিক দিয়ে যিনি ছিলেন তুলনাহীন—প্রবাদবাক্যের মত।

এই যে ওলীদের পুত্র খালিদের কথাই ধরুন। তিনি ছিলেন উৎসাহদীপ্ত কুরায়শ যুবকদের অন্যতম। স্থানীয় যুদ্ধগুলোতে সুনাম অর্জন করেছিলেন। কুরায়শ সর্দাররা গোত্রীয় যুদ্ধগুলোতে তাঁর সাহায্য গ্রহণ করত। আরব উপদ্বীপ এলাকাগুলোতেও বড় কোন খ্যাতি অর্জন করেন নি। অকস্মাৎ খোদায়ী তলোয়ার হিসেবে তিনি ঝলসে ওঠেন (سيف من سيوف الله)। যা কিছুই সামনে আসে তিনি কেটেকুটে পরিষ্কার করে চলেন। আল্লাহ্‌র এই অবিনাশী তলোয়ার বিজলিবৎ রোম সাম্রাজ্যের মাথায় গিয়ে পড়ে এবং ইতিহাসের বুকে অক্ষয় কীর্তি রেখে যায়।

ইনি আবূ উবায়দা যাঁর আমানতদারী ও নম্রতার প্রশংসা করা হতো। মুসলমানদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সেনাদলের পরিচালনা করতেন তিনি। তাঁকে দেখুন! মুসলমানদের সবচে' বড় নেতৃত্বের বোঝা বইছেন এবং রোম সম্রাট হেরাক্লিয়াসকে সিরিয়ার উর্বর ও শস্য-শ্যামল ভূখণ্ড থেকে চিরতরে বহিষ্কৃত করছেন। বেচারা সম্রাট দেশটার ওপর বিদায়ী দৃষ্টি নিক্ষেপ করছেন এবং বলছেন: হে সিরিয়া! তোমাকে বিদায়ী সালাম, এমন সালাম যার পর তোমার সাথে আর কখনো দেখা হবে না।

ইনি আমর ইবনু'ল-'আস যাকে কুরায়শদের বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান লোকদের মধ্যে গণ্য করা হতো। কুরায়শ নেতৃবৃন্দ তাঁকে আবিসিনিয়ায় পাঠায় যাতে মুসলিম মুহাজিরদেরকে দেশে ফিরিয়ে আনতে পারেন। কিন্তু ব্যর্থ হন তিনি। তাঁকে দেখুন, মিসর জয় করছেন এবং বিরাট শক্তির অধিকারী হচ্ছেন।

এই যে, ইনি সা'দ ইবন আবী ওয়াক্কাস! ইসলাম গ্রহণের আগে তাঁর সম্পর্কে বড় কোন সামরিক অভিযানের নেতৃত্বের কথা জানা যায় না কিংবা যুদ্ধবিদ্যা সম্পর্কে তিনি বিশেষজ্ঞ এ রকম কোন খ্যাতির পরিচয়ও পাওয়া যায় না। তাঁকে দেখুন, মাদায়েনের চাবিগুচ্ছ সামলাচ্ছেন এবং ইরাক ও ইরানকে মুসলিম সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে চিরদিনের জন্য 'ফাতিহ্-এ আজম' তথা শ্রেষ্ঠ বিজেতা বলে অভিহিত হচ্ছেন।

ইনি সালমান ফারসী, একজন ধর্মযাজকের পুত্র। পারস্যের এক অজ পাড়া-গাঁয়ে তাঁর জন্ম। এক গোলামি থেকে আরেক গোলামি, এক বিপদ থেকে আরেক বিপদের মাঝে নিক্ষিপ্ত হতে হতে মদীনায় এসে উপনীত হচ্ছেন এবং ইসলাম কবুল করছেন। তাঁকে দেখুন! তাঁরই স্বজাতির বিশাল রাজধানীর (মাদায়েন) প্রশাসক হয়ে আসেন। গতকাল যিনি ছিলেন একজন নগণ্য প্রজামাত্র, আজ তিনি তার প্রশাসক। তার চাইতেও অধিক বিস্ময়ের ব্যাপার হলো এতদসত্ত্বেও তাঁর নিজের ভোগবিমুখ জীবনধারায় কোনরূপ পরির্বতন পরিলক্ষিত হচ্ছে না। লোকে দেখতে পাচ্ছে, তাদের প্রশাসক একটি সাধারণ ঝুপড়িতে অবস্থান করেন এবং নিজের মাথায় বোঝা বহন করেন।

ইনি কাফ্রী-গোলাম বেলাল। সম্মান ও মর্যাদার এমন উঁচু স্তরে গিয়ে উপনীত যে, স্বয়ং আমীরুল মু'মিনীনও তাঁকে 'আমাদের নেতা' 'আমাদের সর্দার' বলেন। ইনি আবূ হুযায়ফার আযাদকৃত গোলাম (সালেম) যাঁর মধ্যে হযরত ওমর (রা) খেলাফত লাভের যোগ্যতা ও সামর্থ্য দেখতে পান। তিনি বলেন: আজ যদি তিনি (সালেম) বেঁচে থাকতেন তবে আমি তাকেই খলীফা নিযুক্ত করে যেতাম।

ইনি যায়দ ইবন হারিছা, মূতার যুদ্ধে মুসলিম সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব দেন অথচ সেই বাহিনীতেই জাফর ইবন আবূ তালিব, খালিদ ইব্ন ওলীদের মত বিশিষ্ট লোকেরা বর্তমান এবং তাঁর পুত্র উসামা এমন এক বাহিনীর নেতৃত্ব দেন যে বাহিনীতে আবূ বকর (রা), ওমর (রা)-এর মত লোকেরা বর্তমান।

আর এই যে, এঁরা হলেন আবূ যর, মিকদাদ, আবুদ-দারদা, আম্মার ইবন ইয়াসির, মুআয ইবন জাবাল ও উবাই ইবন কা'ব (রা)। ইসলামের বসন্ত

সমীরণের একটা ঝটকা তাঁদের ওপর দিয়ে বয়ে যেতেই দেখতে দেখতে তাঁরা দুনিয়ার খ্যাতনামা সাধক ও জ্ঞানী-গুণী বলে গণ্য হতে থাকেন। এঁরা হলেন আলী ইবন আবূ তালিব (রা), আয়েশা (রা), আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা), যায়দ ইব্ন ছাবিত (রা) ও আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা)- যাঁরা নিরক্ষর নবী (সা)-এর কোলে লালিত-পালিত হয়ে দুনিয়ার মহান ও শ্রেষ্ঠতম আলিমদের কাতারে পরিগণিত হচ্ছেন, যাঁদের থেকে জ্ঞানের নহর ও প্রজ্ঞার ফল্গুধারা প্রবাহিত হয়। স্বচ্ছ জ্ঞানের অধিকারী, অশুভ লৌকিকতা থেকে দূরে তাঁদের অবস্থান। যখন কথা বলেন, তখন মহাকাল নিঃশব্দে নীরবে তাঁদের কথা শুনতে থাকে। যখন সম্বোধন করেন তখন দুনিয়ার বড় বড় ঐতিহাসিকের কলম তা লিপিবদ্ধ করবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ে যাতে করে একটি শব্দও হারিয়ে না যায়।

ভারসাম্যপূর্ণ মানবগোষ্ঠী

এরপর অল্প দিনও অতিক্রান্ত হয়নি, সভ্য দুনিয়া দেখতে পেল সেই সব কাঁচামাল যেগুলো বিক্ষিপ্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছিল, সমকালীন জাতিগোষ্ঠীগুলো যেসবের এতটুকু কদর করেনি, প্রতিবেশী দেশগুলো যাদেরকে উপহাস করেছিল, সেগুলোর সমন্বয়ে এমন এক সমন্বিত বস্তু (মাজমূ'আ) তৈরি হলো যে, মানব ইতিহাস এর চেয়ে অধিক ভারসাম্যপূর্ণ ও পূর্ণাঙ্গ সমন্বিত কামালিয়াত দেখেনি। এ যেন একটি ঢালাইকৃত গোলাকার বস্তু যা দেখে বোঝাই যেত না যে, এর মাথা কোন্ দিকে অথবা রহমতের বারিধারার ন্যায় যার সম্পর্কে জানা যেত না যে, এর প্রথম ফোঁটাই বেশি বরকতময়, নাকি শেষ ফোঁটা! এমন সমন্বিত ও সুসংবদ্ধ যা মানব জীবনের প্রতিটি শাখার যোগ্যতা রাখে। দীন-দুনিয়ার সকল প্রয়োজনীয় আসবাব-উপাদান তাতে বিদ্যমান। এজন্য কারোর কাছে তার সাহায্য চাওয়ার প্রয়োজন নেই, কিন্তু সমগ্র দুনিয়া তার সাহায্যের মুখাপেক্ষী।

এই নবোদ্ভূত জামাত নিজেই তার সভ্যতার ভিত্তি স্থাপন করে। নতুন হুকুমতের ভিত্তিপ্রস্তরও সে নিজেই স্থাপন করে, অথচ এর আগে এর কোন অভিজ্ঞতাই তার ছিল না। তা সত্ত্বেও সে এর আদৌ প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেনি যে, অপর কোন জাতিগোষ্ঠীর কাছ থেকে কোন লোক ধার নেবে কিংবা রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনার ব্যাপারে অন্য কোন হুকুমতের কাছে সাহায্য চাইবে। এমন হুকুমতের ভিত্তি স্থাপন করে যার শাসন দু'দু'টো মহাদেশের সুবিশাল বিস্তৃত এলাকায় চলত। এর প্রতিটি শাখায় ও প্রতিটি প্রয়োজনের নিমিত্ত বেশ কিছু লোক এমন ছিলেন যাঁরা নিজেদের যোগ্যতা, দক্ষতা, কর্মকুশলতা, সততা,

বিশ্বস্ততা, শক্তি-সামর্থ্য ও দায়িত্বানুভূতির ক্ষেত্রে ছিলেন তুলনাহীন। এই বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্য কায়েম হলে এই নবোদ্ভূত জাতিগোষ্ঠী, যার জন্ম খুব বেশি দিন আগে হয়নি, এর প্রয়োজনীয় সকল লোকজন সরবরাহ করে যাদের কেউ ছিলেন ন্যায়পরায়ণ শাসক ও প্রশাসক, কেউ ছিলেন আমানতদার কোষাধ্যক্ষ, কেউ ছিলেন ন্যায়বিচারক কাযী, কেউ বা ইবাদতগুযার নেতা, কেউ পরহেযগার মুত্তাকী সমরনায়ক। এই মানসিক প্রশিক্ষণের বরকতে যে কাজ অব্যাহতভাবে চলছিল এবং এই ইসলামী দাওয়াতের সাহায্যে যা স্থায়িভাবে চলছিল, এই ইসলামী হুকুমত যোগ্যতম, আল্লাহ্‌ভীরু, দায়িত্বসচেতন ও কর্মক্ষম কর্মকর্তা-কর্মচারী পেতে থাকে। হুকুমতের যিম্মাদারী সেই সব লোকের কাঁধে অর্পিত হতো যারা হেদায়েতকে রাজস্ব আদায়ের মানসিকতার ওপর অগ্রাধিকার প্রদান করতেন, যাঁরা নিজেদেরকে তহ্‌শীলদার-কালেক্টরের পরিবর্তে মুবাল্লিগ ও হাদী (ইসলামের প্রচারক ও পথপ্রদর্শক) মনে করতেন, যাঁদের ব্যক্তিত্বের মধ্যে যোগ্যতা ও ন্যায়পরতা এবং দীন ও দুনিয়ার বিশুদ্ধ মিশ্রণ থাকত। এর প্রভাবে ইসলামী সভ্যতা আপন পরিপূর্ণ বৈশিষ্ট্যসহকারে উদ্ভাসিত হয় এবং দীনের বরকতসমূহ এভাবে অস্তিত্ব লাভ করে যে, এরপর কোন যুগেই তা এভাবে দেখা যায়নি।

বস্তুত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা) নবূওত ও রিসালাতের চাবি মানবীয় স্বভাব-প্রকৃতির তালার ওপর রেখে দিয়েছিলেন। ব্যস! চোখের পলকে তা খুলে গেল এবং এর সমস্ত রত্নভাণ্ডার, অত্যাশ্চর্য বস্তুসমূহ, শক্তিরাজি ও কামালিয়াত দুনিয়ার সামনে উন্মোচিত হয়ে গেল। তিনি জাহেলিয়াতের শাহ্‌রগ কেটে দেন এবং তার সকল জারিজুরি ভেঙেচুরে চুরমার করে দেন। তিনি বিদ্রোহী, অবাধ্য ও একগুঁয়ে পৃথিবীকে আল্লাহ্‌র শক্তির সাহায্যে বাধ্য করলেন যিন্দেগীর এক নতুন রাজপথের যাত্রী হতে এবং ইতিহাসে মানবতার একটি সম্পূর্ণ নতুন যুগের সূচনা করতে। এটাই ছিল সেই ইসলামী যুগ যা ইতিহাসের ললাটে সর্বদাই উজ্জ্বল তারকার ন্যায় জ্বলজ্বল করে চমকাতে থাকবে।

তৃতীয় অধ্যায়

মুসলমানদের নেতৃত্বের যুগ

মুসলমানদের নেতাসুলভ বৈশিষ্ট্যাবলী

মুসলমানরা কর্মক্ষেত্রে অবতরণ করল। দুনিয়ার নেতৃত্বের বাগডোর তারা নিজেদের হাতে তুলে নিল এবং নেতৃত্বের আসনে জেঁকে বসা অসুস্থ ও পীড়িত জাতিগোষ্ঠীকে অপসারণ করল যেই নেতৃত্ব তারা কখনোই সঠিকভাবে ব্যবহার করেনি। মুসলমানরা পৃথিবীর মানুষদেরকে নিজেদের সাথে নিয়ে ভারসাম্যপূর্ণ ও সঠিক গতিতে সহীহ্ মনযিলের দিকে অগ্রসর হতে শুরু করল। তাদের মধ্যে সেই সব গুণের সমাবেশ ঘটেছিল যা ঐসব জাতিগোষ্ঠীর নেতৃত্বের মহান পদমর্যাদার যোগ্য পাত্র বলে প্রমাণ করত এবং তাদের তত্ত্বাবধানে ও নেতৃত্বে তাবৎ জাতিগোষ্ঠীর কল্যাণ ও সৌভাগ্যের নিশ্চয়তা প্রদান করত। তাদের সে বৈশিষ্ট্যগুলো ছিল এরূপ:

১. তাঁদের কাছে ছিল আসমানী কিতাব ও খোদায়ী শরীয়ত। এজন্য তাঁদের অনুমাননির্ভর হবার কিংবা নিজেদের পক্ষ থেকে আইন প্রণয়নের যেমন দরকার ছিল না, তেমনি তাঁরা মূর্খতা ও অজ্ঞতা, প্রতিদিনের আইনগত পরিবর্তন-পরিবর্ধন সংস্কার এবং মারাত্মক রকমের ভ্রান্তি ও অনাচার থেকে মুক্ত ও নিরাপদ ছিল। নিজেদের রাজনীতি ও পারস্পরিক বিষয়াদির ক্ষেত্রে দিক্‌ভ্রান্তভাবে চলা ও অন্ধকারে হাত-পা ছোঁড়াছুঁড়ি করতেও তাঁরা বাধ্য ছিল না। তাঁদের কাছে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ ওহী ছিল, ছিল খোদায়ী শরীয়তের প্রদীপ্ত রৌশ্‌নী যার ওপর নির্ভর করে তারা পথ চলত এবং যার সাহায্যে জীবনের সমস্ত রাস্তা ও তার বাঁকসমূহ তাঁদের জন্য আলোকিত ছিল। তাদের প্রতিটি পদক্ষেপই আলোতে গিয়ে পড়ত এবং মনযিলে মকসূদ তাঁদের পরিষ্কার দৃষ্টিগোচর হতো।

اَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَاَحْيَيْنٰهُ وَجَعَلْنَا لَه نُوْرًا يَّمْشِىْ بِه فِى النَّاسِ كَمَنْ مَّثَلُه فِى الظُّلُمٰتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا -

"যে ব্যক্তি মৃত ছিল, যাকে আমি পরে জীবিত করেছি এবং যাকে মানুষের মধ্যে চলবার জন্য আলোক দিয়েছি সেই ব্যক্তি কি ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে অন্ধকারে রয়েছে এবং সেখান থেকে বের হবার নয় ?" (সূরা আন'আম ঃ ১২২)

তাঁদের কাছে খোদায়ী কানূন ছিল যে অনুসারে তাঁরা লোকের মধ্যে ফয়সালা করত। তাঁদেরকে হক ও ইনসাফের তথা সত্য ও ন্যায়ের পতাকাবাহী বানানো হয়েছিল এবং তাঁদেরকে কঠিন থেকে কঠিনতর উস্কানি ও উত্তেজনা এবং শত্রুতা ও অপ্রসন্ন অবস্থায়ও ইনসাফ ও সততার আঁচল হাতছাড়া করতে ও প্রবৃত্তির চাহিদা মাফিক প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার অনুমতি দেওয়া হয়নি।

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوَّامِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ز وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰى اَلَّا تَعْدِلُوْا ط اِعْدِلُوْا قف هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى وَاتَّقُوا اللّٰهَ ط اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ -

"হে মু'মিনগণ! আল্লাহ্র উদ্দেশে ন্যায় সাক্ষ্য দানে তোমরা অবিচল থাকবে; কোন সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ তোমাদের যেন কখনো সুবিচার বর্জনে প্ররোচিত না করে; সুবিচার করবে। এটাই তাকওয়ার নিকটতর এবং আল্লাহকে ভয় করবে। তোমরা যা কর নিশ্চয় আল্লাহ তার সম্যক খবর রাখেন।"(সূরা মায়িদাঃ ৮)

২. তাঁরা হুকুমত ও নেতৃত্বের পদে সুদৃঢ় নৈতিক ও চারিত্রিকি প্রশিক্ষণ এবং পূর্ণাঙ্গ আত্মিক পরিশুদ্ধি অর্জনের পর সমাসীন হয়েছিলেন। তাঁরা দুনিয়ার সাধারণ শাসক জাতিগোষ্ঠী ও ক্ষমতাসীন লোকদের ন্যায় নিজেদের সব রকমের নৈতিক ত্রুটি-বিচ্যুতিসহ নিচ থেকে ওপরের দিকে লাফ দেয়নি, বরং দীর্ঘকাল যাবত আসমানী প্রত্যাদেশ (ওহী-এ-ইলাহী) তাঁদের সংস্কার-সংশোধন ও প্রশিক্ষণ দান করেছিল এবং বছরের পর বছর ধরে তাঁরা রসূলুল্লাহ (সা)-এর পরিপূর্ণ তত্ত্বাবধান ও শিক্ষাধীনে ছিল। তিনি তাঁদের তাযকিয়া তথা আত্মিক পরিশুদ্ধি করতে থাকেন এবং তাঁদের পূর্ণাঙ্গ প্রশিক্ষণ দান করেন। যুহ্দ (পার্থিব ভোগ-বিলাসের প্রতি অনাসক্তি ও নির্লিপ্ততা) ও পরহেযগারীর সংযমী জীবনে তাঁদেরকে অভ্যস্ত করেন। সচ্চরিত্রতা, শালীনতা, আমানতদারী, অন্যের মুকাবিলায় নিজের স্বার্থ ত্যাগ, কুরবানী, আল্লাহ্র ভয় ইত্যাদিতে অভ্যস্ত বানান। হুকুমত ও পদের প্রতি লোভ বা মোহ তাঁদের দিল্ থেকে বের করে দেন। স্বয়ং তাঁর ইরশাদ ছিল, 'আল্লাহ্র কসম! আমি কোন পদ এমন কোন লোককে সমর্পণ করব না যে এর প্রার্থী কিংবা এর প্রতি আগ্রহী।"[১] ব্যক্তিগত উচ্চাভিলাষ ও

১. বুখারী ও মুসলিম।

ফেতনা-ফাসাদের প্রতি আকাঙ্ক্ষা থেকে তাঁদের দিল একেবারেই মুক্ত হয়ে গিয়েছিল। তাঁদের কানে রাত-দিন কুরআন মজীদের এই আয়াত গুঞ্জরিত হতোঃ

تِلْكَ الدَّارُ الْاٰخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِيْنَ لَا يُرِيْدُوْنَ عُلُوًّا فِى الْاَرْضِ وَلَا فَسَادًا ط وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ -

"এটা আখেরাতের সেই আবাস যা আমি নির্ধারিত করি তাদের জন্য যারা এই পৃথিবীতে উদ্ধত হতে ও বিপর্যয় সৃষ্টি করতে চায় না। শুভ পরিণাম মুত্তাকীদের জন্য।" (সূরা কাসাস : ৮৩)

এজন্যই তাঁরা হুকুমতের পদসমূহের ওপর পতঙ্গের মত ঝাঁপিয়ে পড়ত না, বরং তাঁরা এসব গ্রহণে অনীহা প্রকাশ করত এবং এর যিম্মাদারী তাঁদেরকে শংকিত করে তুলত। তাঁদের প্রত্যেকেই পিছু হটত এবং নিজেকে এই বোঝা বহনের অনুপযুক্ত মনে করত। নিজে যেচে পদপ্রার্থী হবে, এজন্য নিজের নাম পেশ করবে, নিজের মুখেই নিজের প্রশংসা গাইবে, নিজের সপক্ষে প্রচার-প্রোপাগাণ্ডায় নামবে, সে তো আরও অকল্পনীয়। এরপরও যখন তাঁরা কোন যিম্মাদারী নিজের হাতে তুলে নিত তখন তাকে লুটের মাল ভাবত না এবং তা গ্রাস করার জন্য এগিয়ে যেত না, বরং একে নিজের যিম্মায় অর্পিত এক পবিত্র আমানত ও আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে পরীক্ষাস্বরূপ মনে করত এবং দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করত যে, আল্লাহ্‌র সামনে তাকে একদিন হাযির হতে হবে এবং দৃঢ়ভাবে ছোট-বড় সব কিছুর জওয়াব দিতে হবে। তাঁরা সব সময় চোখের সামনে রাখত:

اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰۤى اَهْلِهَا وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ -

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন আমানত তার হকদারকে প্রত্যর্পণ করতে। তোমরা যখন মানুষের মধ্যে বিচার কাজ পরিচালনা করবে তখন ইনসাফের সাথে বিচার করবে।" (সূরা নিসা : ৫৮) অধিকন্তু থাকত আল্লাহ্‌র এই বাণী ঃ

وَهُوَ الَّذِىْ جَعَلَكُمْ خَلٰٓئِفَ الْاَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجٰتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِىْ مَاۤ اٰتٰكُمْ ط اِنَّ رَبَّكَ سَرِيْعُ الْعِقَابِ وَاِنَّهٗ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ -

"তিনি তোমাদেরকে দুনিয়ার প্রতিনিধি করেছেন এবং যা তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন সে সম্বন্ধে পরীক্ষার উদ্দেশে তোমাদের কতককে কতকের ওপর

মর্যাদায় উন্নত করেছেন। তোমার প্রতিপালক তো শাস্তি প্রদানে দ্রুত আর তিনি অবশ্যই ক্ষমাশীল, দয়াময়।" (সূরা আনআম : ১৬৫)

৩. তাঁরা কোন জাতিগোষ্ঠীর সেবাদাস কিংবা কোন রাজবংশের ও দেশের প্রতিনিধি ছিল না যাদের সামনে কেবল তাদের সুখ-শান্তি, প্রাচুর্য, উন্নতি ও সমৃদ্ধিই একমাত্র লক্ষ্য, যারা কেবল সেই জাতিগোষ্ঠীর প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখে এবং অবশিষ্ট সমস্ত জাতিগোষ্ঠী শাসিত হবার জন্যই পয়দা করা হয়েছে বলে বিশ্বাস করে। তাঁরা আরব ভূখণ্ড থেকে এজন্য বের হয়নি, দুনিয়ার বুকে আরবশাহীর বুনিয়াদ স্থাপন করবে এবং তার ছায়ায় আরাম-আয়েশের জীবন কাটাবে আর এর সমর্থনে অন্যদের ওপর গর্ব ও অহংকার করবে। এজন্যও নয় যে, লোকদের রোমান ও পারসিকদের গোলামি থেকে বের করে আরবদের ও তাঁদের নিজেদের গোলামিতে নিয়োজিত করবে। তাঁরা কেবল এজন্য বেরিয়েছিল যে, তাঁরা আল্লাহর বান্দাদেরকে নিজেদের মত সমস্ত মানুষের গোলামি থেকে মুক্ত করে কেবল লা-শারীক আল্লাহ্র গোলামি ও বন্দেগীতে স্থাপন করবে। মুসলিম দূত হযরত রিবঈ ইব্ন আমের (রা) পারস্য সম্রাট ইয়াযদাগির্দের ভরা দরবারে এই সত্যেরই ঘোষণা দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন ঃ

"আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে এজন্যই পাঠিয়েছেন যাতে আমরা মানুষকে মানুষের গোলামি থেকে মুক্ত করে এক আল্লাহ্র গোলামি ও বন্দেগীর দিকে, দুনিয়ার সংকীর্ণ কাল-কুঠরি থেকে মুক্তি দিয়ে তার প্রশস্ততা ও বিস্তৃতির দিকে এবং নানা ধর্মের নির্যাতন-নিপীড়ন থেকে নাজাত দিয়ে ইসলামের আদল-ইনসাফে নিয়ে যাই।"[১]

অনন্তর দুনিয়ার তাবৎ জাতিগোষ্ঠী তামাম মানব সম্প্রদায় তাঁদের দৃষ্টিতে একই মর্যাদাভুক্ত ছিল। যদি পার্থক্য থেকে থাকে তবে তা ছিল দীনদারীর পার্থক্য। রসূলুল্লাহ (সা)-এর এই ইরশাদের ওপর তাদের পরিপূর্ণ আমল ছিলঃ

الناس كلهم من ادم وادم من تراب لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي الا بالتقوى ـ

"মানুষ মাত্রই আদমের বংশধর আর আদম মাটি থেকে সৃষ্ট। কোন আরবের কোন অনারবের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব নেই, তেমনি কোন অনারবের কোন আরবের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব নেই একমাত্র তাকওয়া ছাড়া।"[২]

يَا اَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَّ اُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوْا ط اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰكُمْ ـ

---

১. ইবনে কাছীরকৃত আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, খ. ৭, পৃ. ৪০।

"হে লোকেরা! আমি তোমাদেরকে এক পুরুষ ও এক নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি যাতে তোমরা পরস্পর পরিচিত হতে পার। নিশ্চয় আল্লাহ্র কাছে সেই সর্বাধিক সম্মানিত যে তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক মুত্তাকী।" (সূরা হুজুরাত ঃ ১৩)

মিসরের শাসনকর্তা হযরত আমর ইবনুল-আসের পুত্র একবার এক মিসরীয়কে বেত্রাঘাত করে এবং স্বীয় বাপ-দাদার নামে গর্ব করে। হযরত ওমর (রা) এই ঘটনা জানতে পেরে উক্ত মিসরীয়কে অভিযুক্ত থেকে বদলা নেবার নির্দেশ দেন এবং আমর ইবনুল-আসকে বলেন : তোমরা কবে থেকে লোকদের গোলাম বানিয়ে নিয়েছ, অথচ তাদের মায়েরা স্বাধীন অবস্থায় তাদের জন্ম দিয়েছিল?[১]

ঐসব বিজেতা ও শাসক দীন-ধর্ম, ইল্ম তথা জ্ঞান ও সভ্যতা বিলাবার ক্ষেত্রে কখনো কার্পণ্য করেন নি কিংবা সংকীর্ণচিত্ততার পরিচয় দেন নি এবং রাষ্ট্রীয় কোন ব্যাপারে বা পারিতোষিক প্রদানের ক্ষেত্রে কখনো তাঁরা দেশ-এলাকা-অঞ্চল ও বর্ণ-বংশের কথা বিবেচনা করেন নি। তাঁরা ছিলেন দয়ামায়ার মেঘমালার মত যা ছিল সমগ্র জগত জুড়ে বিস্তৃত। তাঁদের স্নেহ-ভালবাসা ও অনুগ্রহ-আনুকূল্য সর্বসাধারণের জন্য ছিল উন্মুক্ত যা গোটা জগতকেই প্লাবিত করেছে। যমীনের সকল অংশই তাঁদের জন্য দো'আ করেছে এবং সৃষ্টিজগত আপন আপন যোগ্যতা ও সামর্থ্য অনুসারে এর থেকে উপকৃত হয়েছে।[২]

رهی اس سے محروم ابی نہ خا کی
هری هوگئ ساری کهیتی خدا کی

'এর থেকে জল ও স্থল কোনটাই বঞ্চিত থাকে নি,
'আল্লাহ্র যমীনের সকল ক্ষেত-খামারই সবুজ শ্যামল হয়ে গেছে।'

১.বিস্তারিত জানার জন্যে দ্র. ইবনুল জওযী কৃত তারীখে উমর ইবনুল খাত্তাব।

২. হযরত আবূ মূসা আশ'আরী (রা) হুযূর আকরাম (সা)-এর থেকে বর্ণনা করেন যে, আল্লাহ তা'আলা যেই হেদায়েত ও ইল্ম সহকারে আমাকে প্রেরণ করেছেন তার দৃষ্টান্ত এমন যে, কোন ভূমি খণ্ডে প্রচুর বৃষ্টিপাত হল। এর একটি অংশ নরম ও পরিষ্কার ছিল। সে পানি চুষে নিল। ফলে সেখানে বিরাট সবুজ ও তরতাজা ঘাস জন্মাল। কিছু অংশ ছিল কংকরময়, প্রস্তর সংকুল ও অনুর্বর। সে পানি ধরে রাখল এবং লোকে সেই সংরক্ষিত মজুদ পানি থেকে উপকৃত হল। নিজেরা সেই পানি পান করল এবং অপরকেও পান করাল। এক অংশ ছিল একেবারেই সমতল ময়দান। সে যেমন পানি ধরে রাখতে পারে না, তেমনি পানি শোষণও করতে পারে না যার ফলে সেখানে ঘাস-পাতা ও গাছপালা জন্মাবে। এ দৃষ্টান্ত তাদের যারা দীনের সমঝ লাভ করেছে এবং আল্লাহ্ আমাকে যে বস্তুসহ পাঠিয়েছেন তার দ্বারা তারা লাভবান হয়েছে। তারা নিজেরাও শিখেছে, শিখিয়েছে এবং শেষ উদাহরণ তার যে মাথা তুলে দেখেও নি যে আমি কি এনেছি এবং আল্লাহর সেই হেদায়েত কবুল করে নি যা দিয়ে আমাদের পাঠানো হয়েছে (সহীহ বুখারী, কিতাবুল ইল্ম)।

ঐসব লোকের ছায়ায় ও শাসনাধীনে দুনিয়ার তামাম জাতিগোষ্ঠী, জাতি-ধর্ম, বর্ণ-গোত্র নির্বিশেষে সভ্যতা-সংস্কৃতি বিনির্মাণে ও সরকারী প্রশাসনে নিজ নিজ পরিপূর্ণ অংশ গ্রহণে এবং আরবদের সঙ্গে পৃথিবীর পুনর্গঠনে শরীক হবার পূর্ণ সুযোগ লাভ করে বরং তাদের অনেক লোক বহু বিষয়ে আরবদেরও অতিক্রম করে যায়। তাদের মধ্যে এমন সব ফকীহ ও মুহাদ্দিস জন্মগ্রহণ করেন যারা স্বয়ং আরবদেরও মাথার তাজ ও মুসলমানদের গর্বের ধন। ইবনে খালদূনের ভাষায় ঃ এ এক আশ্চর্য ঐতিহাসিক সত্য যে,মুসলিম মিল্লাতের ইল্ম তথা জ্ঞান-বিজ্ঞানের ধারক-বাহকদের হাতে গোণা কয়েক জন ব্যতিরেকে অধিকাংশই অনারব। কী উলূমে শরঈয়ার ক্ষেত্রেই হোক, কী বুদ্ধিবৃত্তিক জ্ঞানের ক্ষেত্রেই হোক, সর্বক্ষেত্রেই এ কথা প্রযোজ্য। যদি তাঁদের মধ্যে কেউ আরবীয় রক্তের হয়েও থাকেন, তবুও ভাষা, প্রশিক্ষণ ও শিক্ষকগণ অনারব, যদিও তাঁদের ধর্ম আরবীয় এবং তাঁদের শরীয়ত নিয়ে যেই পয়গম্বর এসেছিলেন তিনিও আরবই ছিলেন।[১] পরবর্তী শতাব্দীগুলোতেও ঐসব অনারব মুসলমানদের মধ্যে এমন সব নেতৃস্থানীয় শাসক, মন্ত্রী, জ্ঞানী-গুণী, মনীষী ও বুযুর্গ জন্মগ্রহণ করেন যাঁরা ছিলেন পৃথিবীর সৌন্দর্য ও মানবতার নক্ষত্রসদৃশ এবং যাঁরা ব্যক্তিত্ব, আত্মার উৎকর্ষ, যোগ্যতা, প্রতিভা ও সামর্থ্যে, তদুপরি দীনদারী ও ইল্মের ময়দানে ক্ষণজন্মা পুরুষ ছিলেন। এঁদের সংখ্যা এত বিপুল ছিল যে, একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কেউই তাঁদের সঠিক সংখ্যা নিরূপণ করতে পারবে না।

৪. মানুষ দেহ ও আত্মা, হৃদয় ও বুদ্ধিবৃত্তি এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সমন্বিত রূপ। মানুষ প্রকৃত সৌভাগ্য ও কল্যাণ ততক্ষণ পর্যন্ত লাভ করতে পারে না এবং মানবতার ভারসাম্যময় উন্নতি ততক্ষণ পর্যন্ত হতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত না মানুষের এই সমস্ত শক্তি পরীক্ষিতভাবে ক্রমোন্নত ও বিকশিত হবে। পৃথিবীতে সৎ ও সুস্থ সংস্কৃতি ততক্ষণ পর্যন্ত অস্তিত্ব লাভ করতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত না এমন এক ধর্মীয়, নৈতিক, বুদ্ধিবৃত্তিক ও বস্তুগত পরিবেশ প্রতিষ্ঠিত হবে যেখানে মানুষের জন্য খুব সহজে মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশ সম্ভব হবে এবং অভিজ্ঞতা এটা প্রমাণ করে দিয়েছে যে, এটা ততক্ষণ পর্যন্ত সম্ভব নয় যতক্ষণ পর্যন্ত না জীবনের দিক-নির্দেশনা ও সংস্কৃতির পরিচালনা ভার ঐ সমস্ত লোকের হাতে অর্পিত হবে যারা আধ্যাত্মিকতা ও বস্তুবাদের উভয়টির প্রবক্তা, ধর্মীয় আদর্শ ও নৈতিকতার পরিপূর্ণ নমুনা এবং, সুস্থ বিবেক-বুদ্ধি ও বিশুদ্ধ জ্ঞান দ্বারা মণ্ডিত। তাদের আকীদা-বিশ্বাস ও প্রশিক্ষণের মধ্যে যদি সামান্যতমও ফাঁক-ফোকর কিংবা দাগ থাকে তবে তা তাদের প্রতিষ্ঠিত সভ্যতা-সংস্কৃতির মধ্যে ছড়িয়ে পড়বে এবং

১. মুকাদ্দিমা ইবনে খলদূন, মিসর সং ৪৯৯৯ পৃ.।

বিভিন্নরূপে তার বহিঃপ্রকাশ ঘটবে। আর যদি এমন কোন দল বিজয়ী হয় যারা কেবলই বস্তুর পূজারী, বস্তুগত আনন্দ-উপভোগে বিশ্বাসী, যারা এই পার্থিব জীবন ব্যতিরেকে আর কোন জীবনে বিশ্বাস করে না এবং ইন্দ্রিয়াতীত কোন সত্যেও যাদের প্রত্যয় নেই, তবে তাদের মেযাজ-এর মূলনীতি ও প্রবণতার প্রভাব-প্রতিক্রিয়া তাদের সভ্যতা-সংস্কৃতির ওপর পড়া অনিবার্য। উক্ত সভ্যতা-সংস্কৃতির বিশেষ ছাঁচে সে নিজেকে ঢেলে সাজাবেই এবং এর ওপর তার ছাপ সর্বদা স্থায়ী থাকবেই। ফল হবে এই যে, মানবতার একাংশে প্রাচুর্য উপচে পড়বে আর অন্যদিকে বিশাল এক অংশ রিক্ত হয়ে পড়বেই। সভ্যতা-সংস্কৃতির বহিঃপ্রকাশ ঘটবে ইট, পাথর, কাগজ, কাপড়, লোহা ও সীসায়। যুদ্ধের ময়দান, কোর্ট-কাছারী, খেলাধুলা ও বিনোদন বিলাসিতার আসরগুলো হবে তাদের কেন্দ্র এবং এসব কেন্দ্রে তারা তাদের আসর জাঁকিয়ে বসবে এবং নরক গুলযার করবে। হৃদয় ও আত্মা, মানুষের নৈতিক চরিত্র, পারিবারিক জীবন, সামাজিক ও পারস্পরিক সম্পর্ক ও লেনদেন তাদের প্রভাব বলয়ের বাইরে থাকবে। সেখানে তাদের ও পশুর মধ্যে তেমন কোন পার্থক্য থাকবে না। সভ্যতা-সংস্কৃতির অবস্থা হবে সেই দেহের ন্যায় যার ভেতর অস্বাভাবিক স্থূলত্ব থাকবে অর্থাৎ শরীর হবে ফোলা মাংসের স্তূপের ন্যায় যার দরুন তা বাহ্যিক দৃষ্টিতে যত সুন্দর ও স্বাস্থ্যবানই মনে হোক না কেন, ভেতরগত দিক দিয়ে তা হবে নানা রকম রোগ-ব্যাধির আখড়া এবং বিভিন্ন প্রকার কষ্ট ও যন্ত্রণার শিকার। তার হৃদয় হবে দুর্বল ও শোকার্ত এবং তার স্বাস্থ্য হবে ভারসাম্যহীন।

এর বিপরীতে যদি সেই দল বিজয়ী হয় যারা আদপেই বস্তুবাদকে স্বীকার করে না, এর প্রতি উদাসীন ও নির্বিকার, কেবল আধ্যাত্মিকতা ও প্রকৃতি-পরবর্তী সত্যের প্রবক্তা, যাদের দৃষ্টিভঙ্গি ও আচরণ জীবনবিমুখ ও নেতিবাচক তাহলে সভ্যতা-সংস্কৃতি তার সতেজ ও মানুষ তার প্রকৃতিগত সামর্থ্য হারিয়ে পঙ্গু হয়ে যাবে। এরূপ নেতাদের প্রভাবে মানুষ প্রান্তরবাসী ও গুহাবাসী জীবন এখতিয়ার করবে। নাগরিক জীবনের ওপর গুহাবাসের জীবনকে, তার অবিবাহিত জীবনকে দাম্পত্য জীবন যাপনের ওপর প্রাধান্য দেবে। এমতাবস্তায় আত্মনিপীড়ন প্রশংসনীয় বিবেচিত হয় যাতে দেহ দুর্বল এবং আত্মা পবিত্র ও সবল হয়ে যায়। লোকে জীবনের ওপর মৃত্যুকে অগ্রাধিকার দেয় যাতে করে বস্তুবাদের কোলাহল থেকে বেরিয়ে রূহানিয়াত তথা আধ্যাত্মিকতার শান্ত সমাহিত অঞ্চলে পৌঁছে যায় এবং সেখানে পূর্ণতার শিখরে উপনীত হয়। এজন্য যে, তাদের আকীদা-বিশ্বাস মতে এই বস্তুজগতে মানুষের পক্ষে পূর্ণতা লাভ করা সম্ভব নয়। এর স্বাভাবিক পরিণতি হয় এই যে, সভ্যতা-সংস্কৃতির ওপর মরণদশা চেপে বসে, শহর-বন্দর

বিরান এলাকায় পরিণত হতে থাকে এবং জীবনের শৃঙ্খলা বিশৃঙ্খলা ও বিক্ষিপ্ততায় রূপ নেয়। কেননা এই মূলনীতি ও আকীদা-বিশ্বাস মানব প্রকৃতির সঙ্গে সাংঘর্ষিক। সেজন্য মানব-প্রকৃতি থেকে থেকেই এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে থাকে এবং এর প্রতিশোধে এমন পাশবিক বস্তুবাদী পন্থা গ্রহণ করে যার ভেতর রূহানিয়াত তথা আধ্যাত্মিকতা ও আখলাক-চরিত্রের সঙ্গে কোনরূপ উদারতা প্রদর্শন করা হয় না। ফলশ্রুতিতে মনুষ্যত্ব ও মানবতার জায়গায় পশুত্ব কিংবা বিকৃত মানবতার আবির্ভাব ঘটে। কখনো এমন হয় যে, এই সংসারবিরাগী দলের ওপর কোন শক্তিশালী বস্তুবাদী দল আক্রমণোদ্যত হয় এবং প্রথমোক্ত দল নিজেদের স্বভাবজাত ও প্রকৃতিগত দুর্বলতার কারণে এর মুকাবিলা করতে ব্যর্থ হয়ে শেষাবধি আক্রমণোদ্যত দলের সামনে আত্মসমর্পণ করে বসে। অথবা সংসারবিরাগী দল স্বয়ং নিজেরাই জাগতিক ও পার্থিব ব্যাপারগুলো সামলানোর মধ্যে ঝামেলা অনুভব করে বস্তুবাদ কিংবা বস্তুবাদী দলের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয় এবং যাবতীয় রাজনৈতিক বিষয় তাদের নিকট সমর্পণ করে নিজেরা ইবাদত-বন্দেগী ও ধর্মীয় প্রথা-পর্ব নিয়েই সন্তুষ্ট থাকে। ধর্ম ও রাজনীতির বিচ্ছিন্নতা মতবাদ জন্মলাভ করতে থাকে। ফলে রূহানিয়াত ও আখলাক-চরিত্র দিন দিন প্রভাব শূন্য ও কর্মমুখর জীবন থেকে বিদায় নিতে থাকে, এমন কি মনুষ্য সমাজ এর নিয়ন্ত্রণ থেকে একেবারেই মুক্ত ও স্বাধীন হয়ে যায়। জীবন নির্ভেজাল বস্তুবাদী জীবনে পরিণত হয়ে যায় এবং ধর্ম ও নীতি-নৈতিকতা কেবল একটি ছায়াসর্বস্ব বস্তুতে পরিণত হয় কিংবা ভুল দর্শন হিসেবে অবশিষ্ট থেকে যায়। দুনিয়ার খুব কম সংখ্যক দলই (যারা মানব সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব দিয়েছে , দিয়েছে পথ-নির্দেশনা) এই দোষ থেকে মুক্ত ছিল। হয়তো তারা নিরেট বস্তুবাদী ছিল অথবা ছিল নির্ভেজাল সংসারবিরাগী। এজন্য মানব সভ্যতা তার অধিকাংশ সময় পাশবিক বস্তুবাদ ও সংসারবিরাগী– আধ্যাত্মিকতার মাঝে দ্যোদুল্যমান থেকেছে এবং মানুষের জীবন-তরণী দুই চরম প্রান্তিকতার মাঝে ঘড়ির পেণ্ডুলামের মত দোল খেয়েছে। কখনো বস্তুবাদ হয়েছে বিজয়ী, আবার কখনো বিজয় লাভ করেছে আধ্যাত্মিকতা তথা রূহানিয়াত। মানবতার ভাগ্যে ভারসাম্য ও সামগ্রিকতা জুটেছে খুব কমই।

সাহাবায়ে কিরাম (রা)-এর বৈশিষ্ট্য

সাহাবায়ে কিরাম (রা)-এর এই বৈশিষ্ট্য ছিল যে, তাঁরা ধর্ম ও নৈতিকতা এবং শক্তি ও রাষ্ট্রনীতির পরিপূর্ণ প্রতিচ্ছবি ছিলেন। এসবের বিক্ষিপ্ত গুণাবলী তাঁদের মধ্যে একই সঙ্গে সমাবেশ ঘটেছিল। তাদের মধ্যে মানবতা সকল

শাখা-প্রশাখা ও সৌন্দর্যসহ দৃশ্যমান ছিল। এই নৈতিক, চারিত্রিক ও উন্নততর আধ্যাত্মিক প্রশিক্ষণ এইরূপ বিস্ময়কর ও অনন্যভারসাম্য (যা মানুষের মধ্যে কুত্রাপি দৃষ্টিগোচর হয়), এরকম অস্বাভাবিক ব্যাপকতা যার উদাহরণ ইতিহাসে খুব কমই মেলে এবং এরপর পরিপূর্ণ বস্তুগত প্রস্তুতি ও বিস্তৃত জ্ঞান-বুদ্ধির ভিত্তিতে এটা সম্ভব ছিল যে, তাঁরা মানব সম্প্রদায়গুলোকে তাদের উন্নততর আধ্যাত্মিক, নৈতিক ও বস্তুগত লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও পরিপূর্ণতা পর্যন্ত পৌঁছাতে পারবে। অনন্তর আমরা ইতিহাসে খেলাফতে রাশেদার যুগ থেকে বেশি সর্বদিক দিয়ে পরিপূর্ণ ও সফল কোন যুগের সন্ধান পাইনা এই যুগে আধ্যাত্মিক ও নৈতিক, ধর্মীয় ও জ্ঞানগত এবং রূহানী উপায়-উপকরণাদি ইনসানে কামিল ও সুস্থ সভ্যতা-সংস্কৃতি সৃষ্টির ক্ষেত্রে একে অন্যের সহযোগী ছিল, ছিল সাহায্যকারী। এই হুকুমত যা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম হুকুমতগুলোর অন্তর্গত ছিল এবং এরকম রাজনৈতিক বস্তুগত শক্তি সহকারে যা সমকালীন সমস্ত শক্তির মুকাবিলায় শ্রেষ্ঠ ও অগ্রগামী ছিল, উন্নততর নৈতিকতার মাপকাঠি হিসেবে বিবেচিত হতো, বিবেচিত হতো নৈতিক শিক্ষামালা, জীবন-যিন্দেগী ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনার তুলাদণ্ড হিসেবে। ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পের সাথে নৈতিক চরিত্র ও শ্রেষ্ঠত্বও তার শীর্ষ বিন্দুতে উপনীত হয়েছিল। বিজয়ের ব্যাপ্তি ও সভ্যতা-সংস্কৃতির উন্নতির সাথে সাথে নীতি-নৈতিকতা ও আধ্যাত্মিকতার উন্নতিও অব্যাহত ছিল। অনন্তর ইসলামী হুকুমতের অস্বাভাবিক বিস্তৃতি, জনসংখ্যার চরম বৃদ্ধি, আরাম-আয়েশ ও বিলাসী দ্রব্যসামগ্রী ও উপায়-উপকরণের প্রাচুর্য ও আকষর্ণ সত্ত্বেও অপরাধমূলক ও অনৈতিক কার্যকলাপের ঘটনা খুব কমই ঘটত। ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির এবং ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের পারস্পরিক সম্পর্ক বিস্ময়কর রকম উত্তম ছিল। এটি ছিল এক আদর্শ যুগ যার চাইতে উন্নততর যুগের কথা মানুষ স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি এবং এর চাইতে অধিকতর মুবারক ও প্রাচুর্যপূর্ণ যমানার কথা কল্পনায়ও আসেনি।

এ ছিল কেবল সেসব লোকের জীবন-চরিত্রের অমীয় ফসল যাঁরা হুকুমত পরিচালনা করতেন এবং যাঁরা ছিলেন সভ্যতা-সংস্কৃতিক নিয়ন্ত্রক ও তত্ত্বাবধায়ক। ফসল ছিল তাঁদের আকীদা-বিশ্বাস, প্রশিক্ষণ, সরকার পদ্ধতি ও রাষ্ট্রনীতির মৌলনীতিমালার এজন্য যে, তাঁরা যেখানেই থাকতেন এবং যে অবস্থায় থাকতেন, ধর্ম ও নীতি-নৈতিকতার সর্বোত্তম নমুনা হতেন। তাঁরা শাসক হিসেবেই থাকুন অথবা সাধারণ একজন কর্মচারী হিসেবে, পুলিশই হোন অথবা সৈনিক, তাঁদের সর্বদাই সংযত, শুচি-শুভ্র, চরিত্রবান, আমানতদার, সততা ও বিশ্বস্ততার প্রতিমূর্তি, আল্লাহভীরু ও বিনয়ী হিসেবেই পাওয়া যেত।

জনৈক রোমক সর্দার নিম্নোক্ত ভাষায় মুসলিম সৈনিকদের প্রশংসা করেছেন:

রাত্রিবেলা তুমি তাঁদেরকে ইবাদত-বন্দেগীতে মশগুল দেখবে আর দিনের বেলা দেখবে রোযাদার হিসেবে, প্রতিজ্ঞা পালনকারী হিসেবে। তাঁরা মানুষকে সৎ কাজের আদেশ দেয় আর মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করে। নিজেদের মধ্যে ন্যায় ও সুবিচার করে আর সাম্যের পরিচয় দেয়।"[১]

অন্যজন নিম্নোক্ত ভাষায় সাক্ষ্য দিচ্ছেন ঃ

"দিনের বেলা তাঁরা ঘোড়সওয়ার মর্দে মুজাহিদ আর রাতের বেলা ইবাদতগুযার। নিজেদের বিজিত এলাকায়ও তাঁরা মূল্য দিয়ে আহার্য দ্রব্য ক্রয় করে খায়। কোথাও প্রবেশ করতে হলে সর্বাগ্রে সালাম প্রদান করে এবং যুদ্ধের ময়দানে এমন দৃঢ় ও সংঘবদ্ধভাবে লড়াই করে যে, শত্রু নিপাত করেই ছাড়ে।"[২]

তৃতীয় আরেকজন নিম্নোক্ত ভাষায় সাহাবায়ে কিরাম (রা)-এর প্রশংসা করেছেন ঃ

'রাত্রিকালে দেখলে দেখতে পাবে যেন দুনিয়ার সাথে তাঁদের কোন সম্পর্কই নেই এবং ইবাদত-বন্দেগী ছাড়া তাঁদের আর কোন কাজই নেই। আর দিনের বেলা তাঁদের দেখতে পাবে তাঁরা অশ্বপৃষ্ঠে আসীন, মনে হবে যেন এটাই তাঁদের একমাত্র কাজ। শ্রেষ্ঠতম ও নিপুণ তীরন্দায, বল্লম নিক্ষেপকারী হিসেবে তাঁদের কোন জুড়ি নেই। আল্লাহ্র স্মরণে তাঁরা এমন মগ্ন ও সরব যে, তাঁদের মজলিসে কারুর কথা শোনাও দুষ্কর।"[৩]

এই নৈতিক প্রশিক্ষণের ফল হয়েছিল এই যে, মাদায়েন বিজয়ের পর পারস্য সম্রাট কিসরার মণি-মুক্তা ও হীরকখচিত রাজমুকুট এবং বসন্তকালের দৃশ্য-শোভিত গালিচা যার মূল্য ছিল লক্ষ আশরাফী যা একজন সাধারণ সৈনিকের হস্তগত হয়। কিন্তু কি সাধ্য যে সে আত্মসাৎ করবে। সৈনিক এগুলো তার কমান্ডারের কাছে সোপর্দ করে এবং কমান্ডার সেটা খলীফা ওমর (রা)-এর কাছে পৌঁছে দেন। খলীফা বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যান এবং বলেন, যে সমস্ত লোক এগুলো কমান্ডারের হাতে তুলে দিয়েছে তাঁদের আমানতদারী প্রশংসনীয় বটে।[৪]

জীবন সম্পর্কে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি ও কর্মপন্থা

আল্লাহ্র রসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের অনুসারী এই প্রথম দলটি এমনই ছিলেন যে, তাঁদের ছায়ায় ও তাঁদের হুকুমতে মানবগোষ্ঠী পরিপূর্ণ

---

১. আহমদ ইবন মারওয়ান মালেকী বর্ণিত; ২. আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৭ম খণ্ড, ৫৩ পৃ.
৩. প্রাগুক্ত ১৬ পৃ.।
৪. সীরাত-ই ওমর ইবনু'ল-খাত্তাব, ইবনে জওযী কৃত।

সফলতা ও সৌভাগ্য লাভ করে এবং তাঁদের নেতৃত্বে তাদের প্রতিটি পদক্ষেপই যথাযথ স্থানে পড়ে এবং যথার্থ মনযিলের দিকেই উত্থিত হয়। পৃথিবী সর্ব প্রকার প্রশান্তি, তুষ্টি ও প্রাচুর্য, কল্যাণ ও বরকত লাভ করে। মানুষের কল্যাণ সাধন, তত্ত্বাবধান ও হেফাজতের ব্যাপারে তাঁরা ছিলেন পরিপূর্ণ যত্নবান। তাঁরা কোন কোন ধর্মানুসারীদের ন্যায় পার্থিব জীবনকে অভিশাপের বেড়ি মনে করতেন না। আবার তাঁরা একে আরাম-আয়েশ ও আনন্দ উপভোগের সর্বশেষ সুযোগ বলেও মনে করতেন না, বরং তাঁরা এর এক একটি মিনিটকে দামী মনে করতেন। এর সুস্বাদু বস্তু-সামগ্রী ও নেয়ামতরাজিকে অন্য কোন দিনের জন্য তুলে রাখতেন না। ঠিক তেমনি তাঁরা এই জীবনকে কোন সাবেক আমলের কৃত পাপের শাস্তিস্বরূপ অনিবার্য বিধিলিপিও মনে করতেন না। অধিকন্তু বস্তুপূজারী জাতিগুলোর ন্যায় তাঁরা দুনিয়াকে লুটের মালও মনে করতেন না যার ওপর বুভুক্ষের ন্যায় হুমড়ি খেয়ে পড়বেন এবং যমীনের বুকে মজুদ সম্পদ ও ধনভাণ্ডারকে তাঁরা লাওয়ারিশ মালও মনে করতেন না যা লুট করবার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়বেন। তাঁরা পৃথিবীর দুর্বল জাতিগুলোকে শিকার ভাবতেন না যা শিকার করবার জন্য অন্যের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামবেন। তাঁদের বদ্ধমূল বিশ্বাস ছিল যে, এই জীবন আল্লাহ্‌র দেয়া এক নেয়ামত যার মধ্যে আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভ করার এবং মনুষ্যত্বের সর্বোচ্চ স্তরে উপনীত হবার তাঁদেরকে সুযোগ দেওয়া হয়েছে, অবকাশ দেওয়া হয়েছে কাজের ও চেষ্টা-সাধনার, যার পরে তার জন্য আর কোন অবকাশ নেই।

اَلَّذِىْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلاً ط

"যিনি সৃষ্টি করেছেন মৃত্যু ও জীবন, তোমাদের পরীক্ষা করবার জন্য কে তোমাদের মধ্যে কর্মে উত্তম?" (সূরা মুল্‌ক: ২ আয়াত)

اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الاَرْضِ زِيْنَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ اَيُّهُمْ اَحْسَنُ عَمَلاً ـ

"পৃথিবীর ওপর যা কিছু আছে আমি সেগুলোকে ওর শোভা করেছি, মানুষকে এই পরীক্ষা করবার জন্য যে, ওদের মধ্যে কর্মে কে শ্রেষ্ঠ।" (সূরা কাহফ :৭)

তাঁরা এই জগতকে আল্লাহ্‌র রাজ্য মনে করতেন যেখানে আল্লাহ তাঁদেরকে প্রথমত মানুষ, অতঃপর মুসলমান হিসেবে আপন প্রতিনিধি ও পৃথিবীবাসীর তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করেছেন।

هُوَ الَّذِىْ خَلَقَ لَكُمْ مَا فِى الاَرْضِ جَمِيْعًا ـ

"তিনি পৃথিবীর সব কিছু তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন।" (সূরা বাকারা : ২৯)

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِىْٓ اٰدَمَ وَحَمَلْنٰهُمْ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنٰهُمْ مِنَ الطَّيِّبٰتِ وَفَضَّلْنٰهُمْ عَلٰى كَثِيْرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيْلاً ـ

"আমি তো আদম সন্তানকে মর্যাদা দান করেছি; স্থলে ও সমুদ্রে ওদের চলাচলের বাহন দিয়েছি, ওদেরকে উত্তম রিয্ক দান করেছি এবং আমি যাদেরকে সৃষ্টি করেছি তাদের অনেকের ওপর্ ওদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি।" (সূরা বনী ইসরাঈল : ৭০)

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى الْاَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ص وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِى ارْتَضٰى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ م بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنًا ط يَعْبُدُوْنَنِىْ لاَ يُشْرِكُوْنَ بِىْ شَيْئًا ـ

"তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে ও সৎ কর্ম করে আল্লাহ্ তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন যে, তিনি অবশ্যই তাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিনিধিত্ব দান করবেন যেমন তিনি প্রতিনিধিত্ব দান করেছিলেন তাদের পূর্ববর্তীদেরকে এবং তিনি অবশ্যই তাদের জন্য প্রতিষ্ঠিত করবেন তাদের দীনকে যা তিনি তাদের জন্য প্রতিষ্ঠিত করেছেন এবং তাদের ভয়-ভীতির পরিবর্তে তাদেরকে অবশ্য নিরাপত্তা দান করবেন। তারা আমার ইবাদত করবে, আমার কোন শরীক করবে না।" (সূরা নূর : ৫৫)

তাঁদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা ভূপৃষ্ঠের সম্পদ থেকে কোনরূপ অপচয় না করে ও বাহুল্য ব্যয় না করে উপকৃত হবার অধিকার দিয়েছেন।

كُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلاَتُسْرِفُوْا اِنَّهٗ لاَيُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ـ

"আহার করবে, পান করবে, কিন্তু অপচয় করবে না। নিশ্চয়ই তিনি অপচয়কারীদেরকে পছন্দ করেন না।" (সূরা আ'রাফ: ৩১)

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِيْنَةَ اللّٰهِ الَّتِىْٓ اَخْرَجَ لِعِبَادِهٖ وَالطَّيِّبٰتِ مِنَ الرِّزْقِ ط قُلْ هِىَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَّوْمَ الْقِيٰمَةِ ـ

"বলুন, আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের জন্য যেসব শোভার বস্তু ও বিশুদ্ধ জীবিকা সৃষ্টি করেছেন তা কে হারাম করেছে? বলুন, 'পার্থিব জীবনে, বিশেষ করে কিয়ামতের দিনে এই সমস্ত তাদের জন্য, যারা ঈমান আনে।"(সূরা আ'রাফ: ৩২)

তাঁদেরকে দুনিয়ার তাবৎ জাতিগোষ্ঠী ও মানব সম্প্রদায়ের ওপর তত্ত্বাবধায়ক ও অভিভাবক নিযুক্ত করেছেন এবং এ ব্যাপারে তারা আদিষ্ট যে, তাঁরা তাঁদের জীবনের গতি, চরিত্র ও প্রবণতার পর্যালোচনা করতে থাকবেন, খতিয়ান গ্রহণ করবেন, যারা সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হবে তাদেরকে তাঁরা সিরাতে মুস্তাকীমে টেনে আনবেন, যারা সীমা অতিক্রম করবে তাদের ভারসাম্যময় সীমারেখার মধ্যে ফিরিয়ে আনবেন, বক্রতা দূর করবেন, ফাঁক-ফোকর পূর্ণ করতে থাকবেন, শক্তিমানের কাছ থেকে দুর্বলের হক আদায় করে দেবেন, জালেম থেকে মজলুমের ইনসাফ করাবেন এবং আল্লাহর যমীনে ন্যায়, শান্তি ও সুবিচার কায়েম রাখবেন।

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ ـ

“তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মত, মানব জাতির জন্য তোমাদের আবির্ভাব হয়েছে; তোমরা সৎ কাজের জন্য নির্দেশ দান কর, অসৎ কাজে নিষেধ কর আর আল্লাহ্য় বিশ্বাস কর।” (সূরা আলে-ইমরান : ১১০)

يَآ اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ط كُوْنُوْا قَوَّمِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ ـ

“ হে মু'মিনগণ! তোমরা ন্যায় বিচারে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত থাকবে আল্লাহ্র সাক্ষীস্বরূপ।” (সূরা নিসা: ১৩৫)

একজন য়ূরোপীয় নওমুসলিম পণ্ডিত (মুহাম্মদ আসাদ) মুসলমানদের এই বৈশিষ্ট্যকে, জীবন সম্পর্কে এই ভারসাম্যপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি ও কর্মপন্থাকে অত্যন্ত সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন। এখানে তার কিছু অংশ উদ্ধৃত করা সমীচীন মনে করছি ঃ

“ইসলাম খ্রিস্ট ধর্মের মত দুনিয়াকে খারাপ দৃষ্টিতে দেখে না। ইসলামের প্রদত্ত শিক্ষামালা এই যে, আমরা পার্থিব জীবনের মূল্য নিরূপণের ক্ষেত্রে বর্তমান পাশ্চাত্য সভ্যতার ন্যায় যেন বাড়াবাড়ি না করি। খ্রিস্ট ধর্ম পার্থিব জীবনের নিন্দা করে এবং এর প্রতি ঘৃণার ভাব পোষণ করে। বর্তমান য়ূরোপ তথা পাশ্চাত্য জগত খ্রিস্ট ধর্মের মূল প্রাণসত্তার পরিপন্থী জীবনের ওপর এমনভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ে যেমন কোন ক্ষুধার্ত মানুষ দীর্ঘ অনাহারের পর আহার্যের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। সে খাবার গোগ্রাসে গিলতে থাকে বটে, কিন্তু তাকে সে মর্যাদা দিতে জানে না। ইসলাম এই উভয়টির বিপরীতে জীবনকে প্রশান্তি ও সম্মানের দৃষ্টিতে

দেখে। সে জীবনকে পূজা করে না, বরং এক উচ্চতর জীবনের পথে একটি অপরিহার্য মনযিল বলে গণ্য করে। সেজন্য মানুষের পক্ষে একে উপেক্ষা করা কিংবা অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখা এবং এই পার্থিক জীবনকে অসম্মান করা ও অমর্যাদা করা অনুচিত। জীবনের সফরে আমাদের এই দুনিয়া অতিক্রম করে যেতে হবে এবং আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তা নির্ধারিত হয়েই আছে। সুতরাং মানুষের জীবনের বিরাট মূল্য রয়েছে। কিন্তু আমাদের একথা ভুলে গেলে চলবে না যে, এটা কেবল একটা মাধ্যম ও যন্ত্রমাত্র। এর মূল্য কেবল ততটুকুই যতটুকু মূল্য হয় মাধ্যম ও যন্ত্রের; এর বেশি নয়। ইসলাম এই বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গি সমর্থন করে না যে, আমার রাজত্ব কেবল এই দুনিয়াতেই সীমাবদ্ধ এবং সে খ্রিস্ট ধর্মের এই ধারণাও সমর্থন করে না যে, আমার রাজত্ব এ পার্থিব জীবন নয়। আর তাই সে পার্থিব জীবনকে অবজ্ঞা করে। ইসলাম এই দুই চরম প্রান্তিক মতবাদের বিপরীতে মধ্যম পন্থার অনুসারী হিসেবে এ দু'য়ের মাঝামাঝি অবস্থান করে। কুরআনুল করীম আমাদেরকে এই ব্যাপক অর্থপূর্ণ দো'আ করতে শেখায় ঃ

رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً۔

"হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের দুনিয়াতে কল্যাণ দাও এবং আখিরাতে কল্যাণ দাও।" (সুরা বাকারা : ২০১)

'এই দুনিয়া ও এর যাবতীয় বস্তুসামগ্রীকে সম্মান প্রদান কোনভাবেই আমাদের আধ্যাত্মিক প্রয়াস ও আত্মিক চেষ্টা-সাধনার পথের প্রতিবন্ধক নয়। বস্তুগত উন্নতি- অগ্রগতি ও প্রাচূর্য পরম কাঙ্ক্ষিত যেমন নয় তেমনি নয় অনাকাঙ্ক্ষিত। আমাদের সকল চেষ্টা-সাধনার একমাত্র লক্ষ্য এই হওয়া উচিত যেন এমন ব্যক্তিগত ও সামাজিক অবস্থা ও উপকরণ সৃষ্টি হয় এবং এমন পরিবেশ কায়েম হয়ে যায় আর তেমন অবস্থা ও পরিবেশ বিদ্যমান থাকলে আমরা তা কায়েম রাখব যা মানুষের নৈতিক শক্তির উন্নতি ও ক্রমবিকাশে সহায়ক হতে পারে। এই মূলনীতি অনুসারে ইসলাম মুসলমানদের মধ্যে ছোট বড় প্রতিটি কাজের ক্ষেত্রে নৈতিক দায়িত্ববোধ সৃষ্টি করতে চায়। ইসলামের ধর্মীয় বিধান বাইবেলের এই বিভাজনকে আদৌ সমর্থন করে না, "সীজারের প্রাপ্য সীজারকে দাও আর আল্লাহ্‌র প্রাপ্য আল্লাহকে দাও।" কেননা ইসলাম আমাদের জীবনের অনিবার্য প্রয়োজনগুলোকে নৈতিক ও কার্যকর প্রকরণসমূহের মধ্যে বিভক্ত করার পক্ষপাতী নয়। ইসলামের মতে যে কোন একটি বাছাইয়ের অধিকার রয়েছে আর তাহলো এই যে, সে হয় সত্যকে গ্রহণ করবে অথবা মিথ্যাকে, হয় সে হক বেছে নেবে নয়তো বাতিলকে। এর মাঝামাঝি বলে কিছু

নেই। এজন্য সে আমল তথা কর্মের ওপর জোর দেয়। কেননা তা নৈতিকতারই অংশ বিশেষ। ইসলামী শিক্ষামালার দৃষ্টিকোণ থেকে প্রত্যেক মুসলমানকে পরিবেশ ও চতুষ্পার্শ্বের ঘটনাবলীর ব্যাপারে ব্যক্তিগতভাবে নিজেকে দায়ী ও জওয়াবদিহি করার দায়িত্বশীল ও ধর্মীয় চেষ্টা-সাধনার নিমিত্ত আদিষ্ট এবং প্রতিটি মুহূর্তে ও প্রতিটি ক্ষেত্রে সত্যের প্রতিষ্ঠা ও মিথ্যার উৎসাদনের জন্য দায়িত্বশীল ভাবতে হবে। কুরআনুল করীমে ইরশাদ হচ্ছে:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ -

"তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মত, মানব জাতির জন্যই তোমাদের আবির্ভাব হয়েছে; তোমরা সৎ কাজের নির্দেশ দান কর, অসৎ কাজে নিষেধ কর এবং আল্লাহ্য় বিশ্বাস কর।" (সূরা আলে-ইমরান: ১১০)

"এটা ইসলামের আক্রমণাত্মক কর্মকাণ্ডে ইসলামের প্রাথমিক বিজয় এবং ইসলামী রাজতন্ত্রকে নৈতিক যৌক্তিকতা প্রমাণ করে। অনন্তর ইসলাম সাম্রাজ্যবাদী একথাই যদি কেউ বলতে চায়, তাহলে ইসলাম সাম্রাজ্যবাদীই ছিল। কিন্তু এ সাম্রাজ্যবাদ আধিপত্যবাদের স্পৃহাতাড়িত নয় কিংবা তা অর্থনৈতিক ও জাতীয় স্বার্থপরতাসঞ্জাতও নয়। ইসলামের প্রথম যুগের মুজাহিদবৃন্দকে যে জিনিস যুদ্ধের মাঠে টেনে নিয়ে যেত বড়ই উৎসাহ-উদ্দীপনার সঙ্গে তা অপরের সম্পদ ও পরিশ্রমলব্ধ সামগ্রীর বিনিময়ে নিজেদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধির লোভ বা লালসায় নয়। তাঁদের লক্ষ্য এছাড়া আর কিছুই ছিল না যে, এমন এক পার্থিব কাঠামো নির্মাণ করতে হবে, যেখানে মানুষের জন্য সর্বোত্তম আধ্যাত্মিক উন্নতি ও বিকাশ লাভ সম্ভব হয়। ইসলামী শিক্ষামালার দৃষ্টিকোণ থেকে নৈতিকতা ও মর্যাদার জ্ঞান মানুষের কাছে নৈতিক দায়িত্ববোধের দাবি জানায়। এটা আত্মমর্যাদাহীনতার ব্যাপার যে, মানুষ ভাসাভাসাভাবে ন্যায় ও অন্যায় এবং হক বাতিলের মাঝে পার্থক্য করবে, এরপর সত্য ও ন্যায়ের উন্নতি এবং অন্যায় ও অসত্যের ধ্বংসের জন্য চেষ্টা করবে না। ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে মানুষ যদি ন্যায় ও সত্যের বিজয় ও হুকুমত প্রতিষ্ঠার জন্য প্রাণান্তকর পরিশ্রম ও দৌড়-ঝাঁপ করে তাহলে তা জীবন লাভ করে এবং ফলেফুলে শোভিত হয়। আর যদি এর সাহায্য করতে ও শক্তি যোগাতে কার্পণ্য করে এবং এর সাহায্য-সমর্থনে হাত গুটিয়ে নেয় তাহলে তার পতন ঘটবে এবং তা সম্পূর্ণরূপে পরাভূত ও পর্যুদস্ত হয়ে যাবে।"[১]

১. Islam At the Cross Roads, by Mohammad Asad, fomerly Leopold Weiss, p. 26-29.

ইসলামী শাসন ও সভ্যতার প্রভাব-প্রতিক্রিয়া ও ফলাফল

হিজরী ১ম শতকে ইসলামী সভ্যতা-সংস্কৃতি তার পরিপূর্ণ রূহ ও দৃশ্যপটসমূহসহ আবির্ভাব এবং ইসলামী হুকুমতের নিজস্ব রূপ ও রীতিনীতি সহকারে প্রতিষ্ঠিত হওয়া ছিল ধর্ম ও নৈতিকতার ইতিহাসে একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা এবং রাজনীতি ও সমাজনীতির ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ এক নতুন ঘটনা। এই বিপ্লবের ফলে পৃথিবীর সভ্যতার গতিধারাই পাল্টে যায়। ইসলামের এই বিরাট আজীমুশ্শান বিজয়ে জাহিলিয়াত এক অভূতপূর্ব পরীক্ষা ও বিপদের মুখোমুখি হয়। এতদিন পর্যন্ত তার প্রতিপক্ষের (ইসলাম-এর) অবস্থানগত মর্যাদা একটি ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক আহ্বানের বেশি ছিল না। এখন হঠাৎ করেই হয়ে গেল সৌভাগ্য ও মুক্তির একটি পূর্ণাঙ্গ বিধান, আধ্যাত্মিকতা ও বস্তুবাদের পরিপূর্ণ সমন্বয়, জীবন ও শক্তির পূর্ণ অভিব্যক্তি, একটি পূর্ণাঙ্গ সভ্যতা-সংস্কৃতি, একটি সমাজ, একটি শক্তিশালী হুকুমত এবং একটি পূর্ণাঙ্গ রাজনৈতিক সংবিধান।

এখন একদিকে ছিল এমন একটি যৌক্তিক, বুদ্ধিগ্রাহ্য ও আমল উপযোগী ধর্ম যা ছিল সরাসরি প্রজ্ঞা ও যুক্তিনির্ভর, আর অপর দিকে ছিল কেবলই কষ্ট-কল্পনা ও আজগুবী কিসসা-কাহিনী। একদিকে ছিল আল্লাহপ্রদত্ত শরীয়ত ও আসমানী ওহী, আর এর বিপক্ষে ছিল শুধুই অনুমান, নিছক মানবীয় অভিজ্ঞতা ও মানবরচিত আইন-কানূন।

একদিকে ছিল এমন শ্রেষ্ঠ ও সমুন্নত সভ্যতা-সংস্কৃতি যার বুনিয়াদ অনড় অটল এবং যার মূলনীতি অপরিবর্তনীয়। আল্লাহভীতি, সতর্কতা ও বিশ্বস্ততার রূহ এর সমগ্র রীতিনীতি ও বিধিমালাতে সক্রিয় ছিল। এর বৃত্ত ও পরিধির মধ্যে সম্পদ ও সম্মানের মুকাবিলায় নৈতিকতা ও সাধুতা এবং শূন্যগর্ভ আড়ম্বর প্রদর্শনীর মুকাবিলায় প্রাণসত্তা ও মৌলিকত্বের সম্মান ও মূল্যের প্রাধান্য ছিল। লোকের ভেতর সাম্য ছিল, শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রাধান্যের একমাত্র মানদণ্ড ছিল তাকওয়া। মানুষের মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দু ছিল আখিরাত। এজন্য তাদের স্বভাবে প্রশান্তি এবং অন্তরে তুষ্টি ছিল। পার্থিব সামান-আসবাবের লোভ ও এ নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা তাদের মধ্যে খুব সামান্যই ছিল। এর বিপক্ষে ছিল জাহেলী সভ্যতা, ছিল গোলযোগপূর্ণ, উত্তাল সংঘাতক্ষুব্ধ অস্থিরতা। বড়রা ছোটদের ওপর জুলুম করত এবং সবল দুর্বলকে গ্রাস করত। খেল-তামাশা ও চরিত্রহীনতার ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা এবং পদ ও সম্পদ, ভোগ-বিলাস ও আরাম-আয়েশের উপকরণ সংগ্রহের জন্য ছিল কঠিন প্রতিযোগিতা। এমন কি এর ফলে পৃথিবী একটি রণক্ষেত্রে এবং জীবন-যন্ত্রণায় পরিণত হয়ে গিয়েছিল। একদিকে ছিল ন্যায়বিচারক ইসলামী হকুমত যা আপন প্রজাদেরকে একই দৃষ্টিতে দেখত।

দুর্বলকে শক্তিমানের কাছ থেকে তার হক নিয়ে দিত। লোকে যেমন নিজের ঘরবাড়ি ও জানমালের হেফাজত করে তেমনি ইসলামী হুকুমত তার প্রজাদের নৈতিক চরিত্রের দেখাশোনা ও হেফাজত করাকে নিজের দায়িত্ব মনে করত। তাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি ছিল তাদের শাসকবৃন্দ এবং সর্বাধিক যুহ্দ তথা ভোগবিমুখ জীবন ছিল তাদের যাদের নিকট সর্বাধিক আরাম-আয়েশের উপকরণ ও ভোগ-বিলাসের অবারিত সুযোগ ছিল। এর মুকাবিলায় ছিল সেসব জাহেলী হুকুমত যেখানে জুলুম-নিপীড়নের অবাধ রাজত্ব ছিল। যে সব হুকুমতের কর্মকর্তারা জনগণের সহায়-সম্পদ আত্মসাৎ করত ও জুলুম-নিপীড়ন চালাত। লোকের সম্ভ্রম হানি ঘটাতে ও রক্তপাত করতে তারা একে অন্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামত এবং নিজেদের অসৎ চরিত্রের নমুনা পেশ করে জনগণের নৈতিক চরিত্র খারাপ করে দিত। তাদের মধ্যে নিকৃষ্টতম ছিল শাসক ও বাদশাহরা। তাদের রাজত্বে লোকে ক্ষুধায় না খেয়ে মারা যেত। আর তাদের জীব-জানোয়ার, এমন কি কুকুরগুলোও পেট পুরে খেত। তাদের মহলগুলো মূল্যবান স্বর্ণখচিত পর্দা দ্বারা সজ্জিত থাকত আর ওদিকে শরীর ঢাকার মত এক চিলতে কাপড়ও থাকত না সাধারাণ মানুষের।

তারপর লোকের সামনে ইসলাম গ্রহণের পথে আর কোন বাধা ছিল না, ছিল না জাহিলিয়াতকে অগ্রাধিকার দেবার কোন কারণ। ইসলাম কবুল করতে গিয়ে তাদের আর হারাবারও কিছু ছিল না, অথচ হাসিল হচ্ছিল সব কিছুই। ঈমানের মিষ্টতা, ইয়াকীনের শীতলতা, ইসলামের শক্তি-সামর্থ্য ও বলবীর্য, একটি শক্তিশালী হুকুমতের পৃষ্ঠপোষকতা এবং এমন সব বন্ধু ও সাহায্যকারীদের সাহায্য সমর্থন তারা লাভ করছিল যারা তাদের জন্য প্রয়োজনে নিজেদের জানমাল লুটিয়ে দিতে প্রস্তুত থাকত। চিত্তের প্রশান্তি ও মৃত্যু-পরবর্তী জীবন সম্পর্কে আস্থা ও তৃপ্তি লাভ ঘটত। মানুষ অনায়াসে জাহিলিয়াত থেকে ইসলামের দিকে ঝুঁকতে লাগল। তারা মুসলমান হতে লাগল। জাহিলিয়াতের এলাকায় ইসলাম বিস্তার লাভ করতে থাকল এবং ইসলামের শক্তি ও ক্ষমতা দৃঢ় ও সুসংহত হতে লাগল, এমন কি দুর্বল-চেতা লোকদের মনেও ইসলাম ও কুফর সম্পর্কে আর কোন দ্বিধা-দ্বন্দ্ব অবশিষ্ট রইল না। ফলে নির্ভেজাল আল্লাহ্র আনুগত্য করা তাদের পক্ষে সহজ হয়ে গেল।

এই বিপ্লবের প্রভাব-প্রতিক্রিয়া খুবই সুদূরপ্রসারী ও গভীর ছিল। আল্লাহ্-পরস্তীর রাস্তা যা জাহিলী হুকুমতে কষ্টকর ও বিপদসঙ্কুল ছিল, এখন তা খুবই সহজগম্য ও নিরাপদ হয়ে গেল। জাহিলিয়াতের পরিবেশে যেখানে আল্লাহ্র আনুগত্য কঠিন ও কষ্টকর ছিল, ইসলামী পরিবেশে সেখানে আল্লাহ্র নাফরমানী

করা কঠিন ও কষ্টকর হয়ে দাঁড়াল। এই গতকাল পর্যন্ত প্রকাশ্য সমাবেশে খোলা মাঠে বুক ফুলিয়ে ঘোষণা দিয়ে পাপাচারের দিকে, অন্যায়-অশ্লীলতার দিকে, জাহান্নাম অভিমুখে আহ্বান জানানো হত, সেখানে আর এমনটি করা সহজ ছিল না, বরং সুকঠিন ছিল। গতকাল অবধি আল্লাহ্র অসন্তুষ্টি ও তাঁর নাফরমানীর কার্যকারণ ও সুযোগ ছিল অবাধ ও অসংখ্য আর তা ছিল খোলাখুলি প্রকাশ্যে ঘোষণা দিয়ে। আর এখন এর ওপর বিরাট বাধ্যবাধকতা আরোপিত ও বড় রকমের বাধা-প্রতিবন্ধকতা স্থাপিত। কাল পর্যন্ত আল্লাহ্রই যমীনে আল্লাহ্র দিকে মানুষকে আহ্বান জানানো ও দাওয়াত প্রদান এমন এক অপরাধ ছিল যার ফলে দাঈ ও মুবাল্লিগকে অত্যন্ত সতর্কতা ও গোপনীয়তার আশ্রয় গ্রহণ দরকার পড়ত। আর আজ তা এমন এক শুভ কর্ম ছিল, কল্যাণকর কাজ ছিল যার জন্য কোন প্রকার গোপনীয়তার আশ্রয় গ্রহণের প্রয়োজন ছিল না। দাওয়াত প্রদানকারীর কোন প্রকার বিপদ যেমন ছিল না, তেমনি বিপদ ছিল না কবুলকারীরও। কুরআন মজীদে এই পার্থক্যটাই সুস্পষ্ট করে তুলে ধরেছে এভাবে ঃ

وَاذْكُرُوْٓا اِذْ اَنْتُمْ قَلِيْلٌ مُّسْتَضْعَفُوْنَ فِى الاَرْضِ تَخَافُوْنَ اَنْ يَّتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَاٰوٰكُمْ وَاَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهٖ وَرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ لَعَلَّكُم تَشْكُرُوْنَ -

"আর স্মরণ কর, যখন তোমরা ছিলে স্বল্প সংখ্যক, পৃথিবীতে তোমরা দুর্বলরূপে পরিগণিত হতে। তোমরা আশংকা করতে যে, লোকেরা তোমাদেরকে অকস্মাৎ ছোঁ মেরে ধরে নিয়ে যাবে। অতঃপর তিনি তোমাদেরকে আশ্রয় দেন, স্বীয় সাহায্য দ্বারা তোমাদেরকে শক্তিশালী করেন এবং তোমাদেরকে উত্তম বস্তুসমূহ রিযিকরূপে দান করেন যাতে তোমরা কৃতজ্ঞ হও।" (সূরা আনফাল : ২৬)

এই ক্ষমতা ও শক্তির কারণে মুসলমানরা এখন শাব্দিক অর্থেই আমরূ বি'ল-মারুফ ও নাহী 'আনি'ল-মুনকার তথা সৎ কাজে আদেশ ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করতে থাকে এবং আদেশ ও নিষেধ করার জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি-সামর্থ্য লাভ করে।

যেভাবে বসন্ত মৌসুমে উদ্ভিদ জগত ও মানুষের মেযাজ মৌসুম দ্বারা প্রভাবিত হয়, ঠিক তেমনি অনুভূত ও অননুভূত পন্থায় মুসলিম শাসন ও সভ্যতার যুগে মানুষের মন-মানসিকতাও পরিবর্তিত ও প্রভাবিত হতে থাকে। চিত্তে কোমলতা ও নম্রতা সৃষ্টি হতে থাকে। ইসলামের মৌল নীতিমালা ও সত্য বাণী মন ও মস্তিষ্কে প্রবিষ্ট হতে থাকে। বস্তুর মূল্য ও মান সম্পর্কে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি বদলাতে থাকে। গতকাল পর্যন্ত যে সব বস্তু ও গুণাবলী মানুষের দৃষ্টিতে বিরাট মর্যাদাপূর্ণ ও গুরুত্ববহ বলে বিবেচিত ছিল আজ আর তা তেমন থাকল না। আর যে সব বস্তু

গুরুত্বহীন ও মূল্যহীন ছিল আজ তা গুরুত্ববহ ও মূল্যবান হিসেবে বিবেচিত হলো এবং এর অনুসারী ও পূজারীদের মধ্যে হীনমন্যতাবোধ সৃষ্টি হলো। ইসলামের সাথে সম্পৃক্ত হওয়া, এর অভ্যাস, রীতিনীতি ও এর বৈশিষ্ট্যসমূহ এখতিয়ার করা গর্বের ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। দুনিয়া ক্রমান্বয়ে ইসলামের নিকটতর হচ্ছিল। পৃথিবীর বুকে বসবাসকারী মানুষ যেমন সূর্যের আবর্তন-বিবর্তন সম্পর্কে অনুভব করতে পারে না ঠিক তেমনি পৃথিবীর বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী ও এর মানুষগুলো নিজেদের ইসলামী প্রবণতা ও ইসলামের অভ্যন্তরীণ প্রভাব-প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে অনুভব করতে পারত না। জ্ঞান-বিজ্ঞান, দর্শন, ধর্ম ও সভ্যতা-সংস্কৃতি কোনকিছুই এর প্রভাব থেকে মুক্ত ছিল না। মানুষের বিবেক ও তার অন্তর এসব প্রভাবের সাক্ষ্য দিত এবং তাদের সুকুমার বৃত্তিতে এর বহিঃপ্রকাশ ঘটত। মুসলমানদের পতনের পরও যে সব সংস্কার আন্দোলন ঐসব জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে সৃষ্টি হয় তা ইসলামী প্রভাব ও ইসলামী ধ্যান-ধারণারই ফলস্বরূপ।

ইসলাম তৌহীদ তথা একত্ববাদের দাওয়াত পেশ করে এবং মূর্তিপূজা ও শির্ক-এর এমন নিন্দা জ্ঞাপন করে যে, এগুলো চিরদিনের জন্য হেয় ও অবজ্ঞেয় হয়ে যায়। লোকে অতঃপর এর নামে লজ্জা পেত এবং নিজেদেরকে এর থেকে মুক্ত প্রমাণ করতে চেষ্টা করত অথবা তারা অত্যন্ত সাহসিকতার সঙ্গে ও সাফাই সহকারে এর স্বীকৃতি দিত এবং বিস্ময়ের সঙ্গে বলত :

اَجَعَلَ الْاٰلِهَةَ اِلٰهًا وَّاحِدًا ط اِنَّ هٰذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ۔

"সে কি বহু ইলাহ্‌কে এক ইলাহ্ বানিয়ে নিয়েছে? এতো এক অত্যাশ্চর্য ব্যাপার!" (সূরা সাদ : ৫)

অথবা এখন তারা নিজেদের ধর্মের শির্কমূলক অঙ্গসমূহ ও কর্মকাণ্ডের ভিন্নতর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ পেশ করতে থাকে এবং এমন সব ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করতে থাকে যদ্দ্বারা সেগুলোকে তৌহীদ তথা একত্ববাদের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ বলে মনে হয়। খ্রিস্টানদের মধ্যে এমন একটি দলের উৎপত্তি ঘটে যারা হযরত ঈসা মসীহ্ (আ)-এর ঈশ্বরত্ব অস্বীকার ও প্রত্যাখ্যান এবং ত্রিত্ববাদের আকীদাকে তৌহীদের মোড়কে ব্যাখ্যা দিত। তাদের মধ্যে এমন সব সংস্কারকেরও জন্ম হয় যারা খ্রিস্টানদের মধ্যে বিভিন্ন ধর্মীয় দল-উপদল ও গির্জাধিপতিদের আল্লাহ্ ও তদীয় বান্দার মধ্যে মাধ্যম হিসাবে অস্বীকার করত, তাদের কঠিন ভাষায় সমালোচনা করত এবং তাদের বিশিষ্ট অধিকারগুলোকেও তারা অগ্রাহ্য করত। খ্রিস্টীয় ৮ম শতাব্দীতে য়ূরোপে এমন একটি সম্প্রদায়ের আবির্ভাব ঘটে যারা

পাদ্রীদের সামনে নিজেদের কৃত গোনাহর স্বীকৃতি প্রদানের বিরোধিতা করত এবং যাদের আহ্বান ছিল এই যে, একমাত্র আল্লাহর সকাশেই দো'আ ও ক্ষমা প্রার্থনা করা উচিত এবং নিজের পূর্বকৃত গোনাহ ও পাপরাজির স্বীকৃতি কেবল তাঁর সামনেই দেওয়া যেতে পারে। এক্ষেত্রে কোন মানুষের মধ্যস্থতার প্রয়োজন নেই।[১]

ঠিক তেমনি খ্রিস্টীয় ৮ম শতাব্দী থেকে ৯ম শতাব্দী পর্যন্ত য়ূরোপে এই আন্দোলন প্রবল শক্তিতে পরিচালিত হয় যে, ছবি ও মূর্তি একটি ধর্মবিরোধী কাজ এবং এসবের মধ্যে পবিত্রতার কোন কিছু নেই। এই আন্দোলন এত প্রবল শক্তি সঞ্চয় করে যে, তৃতীয় লুই, কনস্টান্টাইন ৫ম ও চতুর্থ লুই-এর মত প্রবল প্রতাপান্বিত রোমক সম্রাটরা পর্যন্ত একে সমর্থন ও পৃষ্ঠপোষকতা করেন।। প্রথমোল্লিখিত সম্রাট ৭২৬ খ্রিস্টাব্দে এক রাজকীয় ফরমান জারি করে সরকারীভাবে চিত্র ও মূর্তির পবিত্রতার প্রতি নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন। ৭৩০ খ্রিস্টাব্দে দ্বিতীয় ফরমানে একে তিনি মূর্তিপূজা হিসেবে অভিহিত করেছিলেন। খ্রিস্টান ও মূর্তিপূজক য়ূরোপ এবং রোমক ও গ্রীক সভ্যতায় (যার চিত্রশিল্পের পৃষ্ঠপোষকতা ও মূর্তি নির্মাণ পৃথিবী বিখ্যাত) চিত্র ও মূর্তির বিরুদ্ধে এই অনীহা ও জিহাদ নিশ্চিতই ইসলামের মূর্তি ভাঙা ও তৌহিদী ঘোষণার উচ্চকিত নাদই ছিল যা' পাশ্চাত্যে মুসলিম স্পেনের মাধ্যমে ইসলামের প্রচার-প্রসার ও প্রভাবাধীনে পৌছে। এর সমর্থন এ থেকেও পাওয়া যাবে যে, তুরিযানের প্রধান পাদ্রী-পুরোহিত এবং এই আন্দোলন ও দাওয়াতের বিরাট এক উৎসাহী সমর্থক ও পতাকাবাহী ক্লডিয়াস (যিনি তাঁর প্রভাবাধীন এলাকাতে চিত্র ও ক্রুশ কাষ্ঠ পুড়িয়ে ফেলতেন) সম্পর্কে ঐতিহাসিকভাবে জানা যায়, তাঁর জন্ম ও লালন -পালন স্পেনে হয়েছিল এবং এটা হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীর কথা যখন সেখানে মুসলিম শাসন ও মুসলিম সভ্যতা উন্নতির শীর্ষে অবস্থান করছিল।[২]

য়ূরোপের ধর্মীয় ইতিহাস ও খ্রিস্টীয় গির্জার কাহিনী যদি গভীর দৃষ্টিতে অধ্যয়ন করা হয় তাহলে ইসলামের বুদ্ধিবৃত্তিক প্রভাবের আরও অনেক নমুনা ও দৃষ্টান্ত আপনি দেখতে পাবেন। স্বয়ং মার্টিন লুথার কিং-এর বিখ্যাত সংস্কারমূলক আন্দোলন তার অনেক ত্রুটি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও ইসলাম দ্বারা প্রভাবিত ছিল এবং ঐতিহাসিকগণ একথা স্বীকার করেছেন, এই আন্দোলনের জনকের ওপর ইসলামী শিক্ষামালার প্রভাব পড়েছিল। কেবল ধর্মই নয়, বরং য়ূরোপের সমগ্র জীবন ও এর সভ্যতা-সংস্কৃতি ইসলামের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। রবার্ট ব্রিফল্ট (Robert Brifault) তাঁর The Making of Humanity নামক গ্রন্থে বলেন:

---

১. বিস্তারিত দ্র. দুহাল ইসলাম, সালাহুদ্দীন খোদা বখ্শ-এর বরাতে; ২. প্রাগুক্ত।

"For Although, there is not a single aspect of European growth in which the decisive influence of Islamic civilization is not traceable nowhere is it so clear and momentous as in the genesis of that power which constitutes the permanent distinctive force of the modern world and the supreme source of its victory—natural science and scientific spirit."

"য়ূরোপের উন্নতি ও অগ্রগতির কোন শাখা-প্রশাখা কিংবা কোন একটি দিকই এমন নেই যেখানে ইসলামী সভ্যতা তার ছাপ না রেখেছে কিংবা কোন প্রকার প্রভাব না ফেলেছে, উল্লেখযোগ্য ও উজ্জ্বলতর কোন স্মৃতি না রেখেছে। য়ূরোপীয় জীবনের ওপর ইসলাম এক বিরাট প্রভাব ফেলেছে।"[১]

একই লেখক অন্যত্র বলেন ঃ

"Science is the most momentous contribution of Arab Civilization to the modern world...It was not science only which brought Europe back to life. Other and manifold influences from the civilization of Islam communicated its first glow to European life."

"কেবল প্রাকৃতিক বিজ্ঞানই (যেক্ষেত্রে আরব মুসলমানদের অবদান সর্বজনস্বীকৃত) য়ূরোপে জীবন সঞ্চারের কৃতিত্বের অধিকারী নয়, বরং ইসলামী সভ্যতা য়ূরোপীয় জীবনের ওপর খুবই বিরাট ও বিভিন্নমুখী প্রভাব ফেলেছে। আর এর সূচনা সে সময়ই হয়ে যায় যখন ইসলামী সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রথম আলোকচ্ছটা য়ূরোপের ওপর পড়া শুরু করেছে।"[২]

আর এভাবেই ভারতীয় উপমহাদেশের বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর চরিত্র ও আচার-ব্যবহার, সমাজ ও আইন প্রণয়নে ইসলামী চিন্তা-চেতনা ও শরীআর প্রভাব চোখে পড়বে। নারীর প্রতি শ্রদ্ধাবোধ, তার অধিকারসমূহের স্বীকৃতি, বিভিন্ন মানব সম্প্রদায় ও দল-উপদলের মধ্যে সাম্যের মৌল নীতিমালা মুসলিম বিজয় এবং মুসলমানদের সঙ্গে মেলামেশার পর থেকে ক্রমবর্ধমানভাবে স্বীকৃত হয়েছে। মোটের ওপর সভ্য দুনিয়ার কোন ধর্ম ও কোন সভ্যতাই মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নবুওত লাভ ও ইসলামের আবির্ভাবের পর এই দাবি করতে পারে না যে, তারা ইসলাম ও মুসলমানদের দ্বারা আদৌ প্রভাবিত হয়নি।

ইসলামী হুকুমত ও ইসলামী সভ্যতার পতন যুগেও ইসলামের আগেকার আহ্বান (দাওয়াত) ও শক্তির প্রভাব-পরিচিতি ও স্মৃতিচিহ্ন অবশিষ্ট ছিল। এসবের

১. The Makinğ of Humanity, P. 190.
২. The Making of Humanity, P. 202.

মধ্যে একটি ছিল আল্লাহ্‌র পরিচিতি যা সমগ্র মুসলিম জগতে সাধারণ ব্যাপার ছিল। আল্লাহর ধ্যান-খেয়াল মুসলমানদের মন ও মস্তিষ্কের গভীরে এভাবে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছিল যে, তা সর্বপ্রকার বিপ্লব, পরিবর্তন-পরিবর্ধন ও ধর্মীয় অধঃপতন সত্ত্বেও বের হয়ে যায়নি, বের হতে পারেনি। মুসলমানদের পক্ষে অন্যায় ও পাপাচারে লিপ্ত হওয়া সম্ভব ছিল (মুসলমানদের পতন যুগে যা সুস্পষ্টভাবেই দেখা গেছে) কিন্তু আল্লাহ্‌র ধ্যান-খেয়াল তাদের মন-মস্তিষ্ক থেকে বের হতে পারেনি। নফসে লাওয়ামার ভর্ৎসনা, বিবেকের দংশন ও চোখ রাঙানি, সর্বাবস্থায় ও সর্বস্থানে আল্লাহ্‌র উপস্থিতির ধারণা, পরকালের ভয়ভীতি, অন্যায় ও পাপের নেশায় মত্ত আত্মবিস্মৃত অবস্থায়ও অন্তরে উঁকি মারত এবং কখনো কখনো অলক্ষ্যে তার কাজ করে যেত। এরই ফলে ফাসেক ও ফাজির পাপিষ্ঠ বদকাররাও অনেক সময় হঠাৎ করেই অন্যায় ও পাপাচার থেকে তওবাহ্ করে অত্যন্ত নেককার মুত্তাকী দলভুক্ত হয়ে যেত। শুঁড়িখানার মদ্যপরাও একটি ঠোক্কর খেয়ে সতর্ক সাবধান হয়ে কা'বার পথ ধরত। বড় বড় শাহ্‌যাদা ও বিলাস ব্যসনে লালিত-পালিত আমীর-নন্দন একটা মামুলী ধরনের অদৃশ্য সাবধান বাণী দ্বারা (যার থেকে সহস্র গুণ বেশি সাবধান বাণী বস্তুবাদ ও কুফরের যুগে প্রতিক্রিয়াহীন প্রমাণিত হয়ে থাকে) সিংহাসন ও রাজমুকুট ছেড়ে ফকীরী দরবেশীর ভোগবিমুখ তাকওয়ার জীবন অবলম্বন করতেন। কোন কোন সময় কুরআন পাঠকারী কুরআন মজীদের এই আয়াত পাঠ করেছে ঃ

اَلَمْ يَاْنِ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَنْ تَخْشَعَ قُلُوْبُهُمْ لِذِكْرِ اللّٰهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ لا وَلَا يَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْاَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوْبُهُمْ ط وَكَثِيْرٌ مِّنْهُمْ فٰسِقُوْنَ-

"যারা ঈমান আনে তাদের ঈমান ভক্তি বিগলিত হবার সময় কি আসেনি আল্লাহ্‌র স্মরণে এবং যে সত্য অবতীর্ণ হয়েছে তাতে ? এবং পূর্বে যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছিল তাদের মত যেন ওরা না হয় বহুকাল অতিক্রান্ত হয়ে গেলে যাদের অন্তকরণ কঠিন হয়ে পড়েছিল। ওদের অধিকাংশই সত্যত্যাগী। (সূরা হাদীদ : ১৬)

কোন কোন লোকের ব্যাপারে জানা গেছে, ঘুম থেকে জেগেই এমন সতর্ক ও সাবধান হয়ে গেছেন যে, তাঁদের জীবনে চিরদিনের জন্য বিপ্লব ঘটে গেছে।" ইতিহাসের পৃষ্ঠা যাঁদের দৃষ্টান্ত দ্বারা ভরপুর আছে।

বাগদাদের চরম ভোগ-বিলাস ও গাফিলতির যুগেও প্রভাব সৃষ্টিকারী ওয়ায়েজ ও সাহিবে দিল নসীহতকারীদের মজলিস ও মাহফিলগুলো কদাচিৎ এ ধরনের ঘটনা থেকে মুক্ত থাকত। ৫৮০ হিজরীতে বাগদাদ ভ্রমণকারী প্রখ্যাত আরব পর্যটক ইবন জুবায়র আন্দালুসী (মৃ. ৬১৪ হিঃ) শায়খ রাদিয়্যুদ্দীন কাযবীনির ওয়াজ মাহফিলের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, "ওয়াজ চলাকালে মানুষের চোখ দিয়ে অবিরল ধারায় অশ্রু প্রবাহিত হচ্ছিল। মানুষ পতঙ্গের মত পাগলের ন্যায় তওবাহ্র জন্য তাঁর হাতের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ছিল এবং নিজেদের চুল ছিঁড়ছিল।"

হাফিজ ইবনে জওযী রহমাতুল্লাহি আলায়হি (মৃ. ৫৯৭ হি.)-এর ওয়াজ মাহফিলের অবস্থা ছিল এই, "মানুষ চিৎকার করে কাঁদত। মানুষ পাগল-প্রায় হয়ে যেত এবং বেহুঁশ হয়ে পড়ে যেত। আর লোকেরা তাদেরকে ধরে মাহফিল থেকে উঠিয়ে নিয়ে যেত। নিজেদের কপালের চুল তাঁর হাতে ধরিয়ে দিত আর তিনি মাথায় হাত বুলিয়ে তাদেরকে সান্ত্বনা দিতেন।"[১]

হাফিজ ইবনে জওযী (র) স্বয়ং একবার তাঁর কথা বলতে গিয়ে লিখেছেন, এক লক্ষ মানুষ আমার হাতে তওবা করেছে।[২]

হি. ৫ম শতাব্দীর বিখ্যাত মুহাদ্দিছ শায়খ ইসমাঈল লাহোরী সম্পর্কে ঐতিহাসিক নিম্নরূপ মন্তব্য করেছেন ঃ

بزارها سردم درمجلس وعظوم شرف باسلام شدئد -

"হাজার হাজার মানুষ তাঁর ওয়াজ-মাহফিলে ইসলাম কবুল করত।"[৩] ইবনে বততুা অনেক ভারতীয় ওয়ায়েজীনের ওয়াজের তাছীর সম্পর্কে এ ধরনের কাহিনী লিখেছেন।

কুফর ও ধর্মহীনতার আধিপত্য ও প্রাধান্যের যুগে প্রভাব সৃষ্টির এমন দৃষ্টান্ত কদাচিৎ দেখা যেত। এ যুগে প্রভাবশালী থেকে প্রভাবশালী ধর্মীয় বাগ্মিতা ও নৈতিক উপদেশাবলী প্রভাবশূন্য হয়ে পড়ে।

আল্লাহ্র ধ্যান-ধারণা সে সময় এরূপ মজ্জাগত হয়ে পড়েছিল যা থেকে কোন কওম, ধর্ম কিংবা দল-উপদল মুক্ত ছিল না। ভাষা ও সাহিত্যে স্রষ্টার পরিচিতি, ধর্মীয় ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ এবং ওহী ও রিসালতের ভাষার শব্দসমষ্টি ও পরিভাষাসমূহ আত্মার ও রক্তের ন্যায় অব্যাহতভাবে এমনি প্রবাহিত ছিল যে, এই

১. রিহলা, ইবন জুবায়র কৃত, ৩০২পৃ.
২. সায়দুল খাতির ও লাফতাতুল-কাবাদ:
৩. তাযকিরা-ই-উলামা;

ভাষা ও সাহিত্যকে এর থেকে মুক্ত করা যেতে পারে না। ইসলামী টীকা-ব্যাখ্যা, ধর্মীয় শিষ্টাচার ও আদব অমুসলিমদের ভাষাসমূহের ওপর এভাবে জারি হয়ে গিয়েছিল এবং তারা এই পরিমাণে এতে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল যে, অন্য ভাষার বিকল্প শব্দ ব্যবহারে তাদের মন ভরত না। অমুসলিম সাহিত্যিক ও মনীষীরা অবাধে কুরআন মজীদ হিফ্জ করতেন। বিখ্যাত অমুসলিম সাহিত্যিক ও লেখক আবূ ইসহাক সাবী সম্পর্কে কথিত আছে, তিনি রমযান মাসে রোযাও রাখতেন। আল্লাহ্কে পাবার আগ্রহ ও আকাঙ্ক্ষা ছিল সমগ্র মুসলিম বিশ্বে ব্যাপক। হাজার হাজার নয়, বরং লক্ষ লক্ষ মানুষ মুসলিম দেশসমূহের শহরগুলোতে ধর্মীয় শিক্ষা লাভের আগ্রহে এবং আল্লাহওয়ালা মানুষের সন্ধানে মাঠ-ময়দান পাহাড়-পর্বত ও উপত্যকা পাড়ি দিয়ে পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত ছুটে বেড়াত। যারা মানুষকে আল্লাহ্র দিকে আহ্বান জানাতেন তাঁরা ছিলেন সমগ্র সৃষ্টিকুলের প্রত্যাবর্তনস্থল ও কেন্দ্রবিন্দু এবং তাঁদের আবাসগুলো আল্লাহ্সন্ধানী ও খোদাপ্রেমিক মানুষের ভিড়ে উপচে পড়ত। তাঁদের বসতবাড়ির জনসমাগম ও রওনক হুকুমতের প্রাণকেন্দ্র ও শাসকদের রাজধানীসমূহ থেকেও অনেক বেশি প্রাণবন্ত ও মুখর ছিল। বড় পীর হযরত শায়খ আবদুল কাদের জিলানী (রা)-এর মজলিস আব্বাসী খলীফাদের থেকেও অনেক বেশি জাঁকজমক ও রওনকপূর্ণ ছিল। আমীর-উমারা ও ধনাঢ্য ব্যক্তিরাও ধর্মীয় ধ্যান-ধারণা ও আল্লাহ-প্রাপ্তির আগ্রহ থেকে মুক্ত ছিল না। জীবনী গ্রন্থগুলো এ ধরনের উদাহরণে ভরপুর।

চতুর্থ অধ্যায়

মুসলমানদের পতন যুগ

পতন যুগের সূচনা ও এর কারণসমূহ

জনৈক লেখক কী সুন্দরই না বলেছেন, "মানুষের জীবনে এমন দুটো ব্যাপার আছে যার সঠিক মুহূর্তটি কেউ বলতে পারে না। এর একটার সম্পর্ক মানুষের ব্যক্তি জীবনের সঙ্গে আর তা হলো নিদ্রা। আর দ্বিতীয়টির সম্পর্ক জাতীয় জীবনের সঙ্গে আর তা হলো তার অধঃপতন। আজ পর্যন্ত কেউ বলতে পারেনি যে, অমুক ব্যক্তিটি ঠিক কখন নিদ্রাচ্ছন্ন হলো বা ঘুমিয়ে পড়ল এবং অমুক জাতির পতন ঠিক কোন্ দিন্ বা কোন তারিখ থেকে শুরু হলো। মানুষ কেবল তখনই তা জানতে পারে যখন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা জাতি অসাড় হয়ে পড়ে।

অধিকাংশ জাতিগোষ্ঠীর ক্ষেত্রেই এটা সত্য ও বাস্তব। কিন্তু মুসলিম উম্মাহর জীবনে পতনের সূচনা অপরাপর জাতিগোষ্ঠীর জীবনের তুলনায় অনেক বেশি সুস্পষ্ট ও দৃশ্যমান। আমরা যদি চরম উন্নতি ও পতনের মাঝের সীমাকে চিহ্নিত করতে চাই তাহলে আমরা আমাদের আঙুল সেই ঐতিহাসিক রেখার ওপর রেখে দেব যেই রেখা খেলাফতে রাশেদা ও আরব রাজতন্ত্র বা মুসলমানদের বাদশাহীর মধ্যে বিভাজনকারী সীমা। সরাসরি ইসলামী নেতৃত্ব বা এর মাধ্যমে দুনিয়ার নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের বাগডোর সেই সমস্ত ব্যক্তির হাতে ছিল যাঁদের প্রত্যেক সদস্য তাঁর ঈমান ও আকীদা, আমল ও আখলাক, প্রশিক্ষণ ও সভ্যতা-সংস্কৃতি, সুকুমার বৃত্তি ও উন্নত চরিত্র বা ভারসাম্য রক্ষায় দিক থেকে আল্লাহ্র রসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হিওয়াসাল্লাম-এর একটি স্থায়ী মু'জিযা ছিলেন। মহানবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁদেরকে ইসলামের ছাঁচে এমনভাবে ঢেলেছিলেন যে, একমাত্র দেহ ছাড়া আর কোন কিছুতে আপন অতীতের সঙ্গে তাঁদের কোন সাদৃশ্য অবশিষ্ট ছিল না। না ঝোঁক ও প্রবণতার ক্ষেত্রে, না মন-মানসিকতার মধ্যে আর না চিন্তা-ভাবনার পন্থা ও পদ্ধতির মধ্যে, না প্রবৃত্তির ক্ষেত্রে। এ সমস্ত সম্মানিত ব্যক্তি যাঁদের কথা ওপরে বলা হয়েছে-দীন ও দুনিয়ার সমন্বয়ের পরিপূর্ণ নমুনা ছিলেন। তাঁরা একাধারে সালাতের ইমাম, মসজিদের খতীব, কাযী ও বিচারক, বায়তুল মাল তথা সরকারী কোষাগারের আমানতদার ও বিশ্বস্ত ভাণ্ডাররক্ষক এবং সেনাবাহিনীর সিপাহসালার ছিলেন এবং একই সময় তাঁরা যুদ্ধ ও প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত সমাধান, রাষ্ট্র ও শহর-নগরের ব্যবস্থাপনা এবং

সাম্রাজ্যের অন্তর্গত বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা ও বিভাগের তত্ত্বাবধান করতেন। তাঁদের মধ্যে একেকজন একই সময়ে মুত্তাকী সাধক, সিপাহী ও মুজাহিদ, সমঝদার কাযী, মুজতাহিদ ও ফকীহ, কুশলী ও অভিজ্ঞ প্রশাসক ও নিপুণ রাজনীতিক ছিলেন। তাঁদের ব্যক্তিসত্তায় একই সময় (খলীফা ও আমীরুল মু'মিনীন হিসাবে) ধর্ম ও রাজনীতির সমন্বয় ঘটেছিল। তাঁদের চারিপাশে সেই সমস্ত লোকের জামাআত ছিল যাঁরা সেই একই মাদরাসা-ই নববী কিংবা মসজিদে নববীর শিক্ষা ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ছিলেন। একই ছাঁচে ঢালা, একই আত্মার ধারক-বাহক এবং একই স্বভাব-চরিত্র ও গুণে গুণান্বিত। খলীফা তাঁদের থেকে পরামর্শ গ্রহণ করতেন এবং কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজই তাঁদের পরামর্শ ও সাহায্য ছাড়া করতেন না। অনন্তর তাঁদের প্রাণসত্তা সভ্যতা-সংস্কৃতির সমগ্র কাঠামোতে, হুকুমতের গোটা ব্যবস্থায় এবং মানুষের সমগ্র জীবন, সমাজ ও চরিত্রের মধ্যে সঞ্চারিত হয়ে যায়। সভ্যতা-সংস্কৃতির ওপর তাঁদের ঝোঁক ও প্রবণতার ছায়াপাত ঘটে। তাতে তাঁদের বৈশিষ্ট্যাবলীর পূর্ণ প্রতিবিম্ব পড়ে। সেখানে আধ্যাত্মিকতা ও বস্তুবাদের মধ্যে কোন দ্বন্দ্ব ছিল না, ছিল না ধর্ম ও রাজনীতির মধ্যে কোন সংঘাত কিংবা সংঘর্ষ। সেখানে দীন ও দুনিয়ার কোন পার্থক্য বা বিভাজন ছিল না, ছিল না নীতি ও উপযোগিতার মধ্যে কোন প্রকার টানাপোড়েন। তেমনি উদ্দেশ্য সিদ্ধি ও নৈতিক চরিত্রের মধ্যেও কোন বিশেষত্ব ছিল না। সেখানে বিভিন্ন শ্রেণী-সম্প্রদায় ও দল-উপদলের মধ্যে পারস্পরিক যুদ্ধবিগ্রহ বা প্রবৃত্তিজাত কামনা-বাসনার ভেতর পারস্পরিক প্রতিযোগিতা ছিল না। মোটের ওপর তাঁদের সভ্যতা, সংস্কৃতি ও ইসলামী সালতানাতের সমাজ জীবন এর প্রতিষ্ঠাতাদের নৈতিক চরিত্র, বৈশিষ্ট্য, ভারসাম্য ও সামগ্রিকতার পূর্ণ প্রতিনিধিত্বকারী দর্পণস্বরূপ ছিল।

জিহাদ ও ইজতিহাদের অভাব

আসল কথা হলো এই, ইসলামের ইমামত তথা নেতৃত্বের বিষয়টি বড়ই নাযুক ও স্পর্শকতার এবং তা ব্যাপক ও বিস্তৃত গুণাবলি দাবি করে। যেই ব্যক্তি বা দল এই আসনে বা পদে অধিষ্ঠিত হন তার জন্য ব্যক্তিগত উপদেশ-পরামর্শ, তাকওয়া ও ন্যায়পরায়ণতা ছাড়াও জিহাদ ও ইজতিহাদের যোগ্যতা আবশ্যক। এই শব্দ দু'টি খুবই সরল ও হালকা ধরনের হলেও এর অর্থ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। জিহাদ বলতে বোঝায় : প্রিয়তম ও গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য বা কাম্য বস্তু হাসিলের উদ্দেশে নিজের চূড়ান্ত-শক্তি-সামর্থ্য ও উপায়-উপকরণ ব্যয় করা।

একজন মুসলমানের সব চাইতে বড় মকসূদ বা লক্ষ্য হলো আল্লাহর ফরমাবরদারী ও তাঁর সন্তুষ্টি লাভ এবং তাঁর সার্বভৌমত্ব ও বিধি-বিধানের সামনে পূর্ণ আত্মসমর্পণ। এজন্য প্রয়োজন এমন প্রতিটি আকীদা-বিশ্বাস, প্রশিক্ষণ,

একজন মুসলমানের সব চাইতে বড় মকসূদ বা লক্ষ্য হলো আল্লাহর ফরমাবরদারী ও তাঁর সন্তুষ্টি লাভ এবং তাঁর সার্বভৌমত্ব ও বিধি-বিধানের সামনে পূর্ণ আত্মসমর্পণ। এজন্য প্রয়োজন এমন প্রতিটি আকীদা-বিশ্বাস, প্রশিক্ষণ, নৈতিক চরিত্র, ইচ্ছা-অভিসন্ধি ও কামনা-বাসনার বিরুদ্ধে, দীর্ঘ জিহাদের যা এতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে এবং জিহাদ ভেতর বাইরের ঐ সমস্ত উপাস্য ও মিথ্যা মা'বুদগুলোর বিরুদ্ধে যা আল্লাহ্র আনুগত্য ও ইসলামের ক্ষেত্রে প্রতিপক্ষ ও প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে দেখা দেয়। এসব লক্ষ্য যখন অর্জিত হবে তখন একজন মুসলমানের জন্য জরুরী হলো, সে আল্লাহ্র সার্বভৌমত্ব ও তাঁর বিধানসমূহকে তার চারপাশের পৃথিবী এবং তারই মত আর সব মানুষের মাঝে ছড়িয়ে দেবার জন্য চেষ্টা-তদবীর করবে, প্রয়াস চালাবে। এটা তার ধর্মীয় দায়িত্ব ও আল্লাহ্র সৃষ্টিকুলের কল্যাণ কামনার স্বাভাবিক চাহিদা। এটা এজন্যও জরুরী, কোন কোন সময় ব্যক্তিগত দীনদারী ও পরিবেশের আনুকূল্য ব্যতিরেকে কঠিন হয়ে পড়ে। কুরআন মজীদের পরিভাষায় একেই ফেতনা বলে। পৃথিবীতে যত জড়বস্তু, প্রাণী, উদ্ভিদ ও মানুষ আছে তা আল্লাহর ইচ্ছা ও বিধানসমূহের তথা তাঁরই সৃষ্ট প্রাকৃতিক কানুনের সামনে মস্তকাবনত।

وَلَهٗٓ اَسْلَمَ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالاَرْضِ طَوْعًا وَّكَرْهًا وَّ اِلَيْهِ يُرْجَعُوْنَ -

"আর আসমানে ও যমীনে যা কিছু আছে সমস্তই স্বেচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায় তাঁর নিকট আত্মসমর্পণ করেছে। আর তাঁর দিকেই তারা প্রত্যানীত হবে।" (সূরা আলে ইমরান : ৮৩)

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يَسْجُدُ لَهٗ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِى الاَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُوْمُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَآبُّ وَكَثِيْرٌ مِّنَ النَّاسِ ط وَكَثِيْرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ ط

"তুমি কি দেখ না যে, আল্লাহ্কে সিজদা করে যা কিছু আছে আকাশমণ্ডলীতে ও পৃথিবীতে, সূর্য, চাঁদ, তারকারাজি, পর্বতমালা, বৃক্ষলতা, জীবজন্তু এবং সিজদা করে মানুষের মধ্যে অনেকে ? আবার অনেকের প্রতি অবধারিত হয়েছে শাস্তি।" (সূরা হজ্জ : ১৮)

এ ব্যাপারে মানুষের কোন প্রকার চেষ্টা-তদবীরের ভূমিকা বা কোন প্রকারের চেষ্টা-সাধনার আবশ্যকতা নেই। প্রাণীকুলের জন্য জীবন-মৃত্যু ও লালন-পালনের যেই আইন-কানুন রয়েছে এবং তার শরীর ও প্রকৃতির জন্য আল্লাহ্ তা'আলা যেই প্রাকৃতিক ব্যবস্থা নির্ধারণ করে দিয়েছেন এর ওপর তারা বিনা প্রশ্নে অবনত

বিনা প্রশ্নে অবনত মস্তকে চলছে এবং চলতে থাকবে। এর থেকে চুল পরিমাণও ব্যত্যয় ঘটবে না। যেই উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের নিমিত্ত মুসলমানদের চেষ্টা-সাধনা কাম্য ও কাঙ্ক্ষিত তা হলো আল্লাহর এই কানুন তথা বিধানের বাস্তবায়ন ও এর প্রয়োগ যা আম্বিয়া আলায়হিমুস-সালাম নিয়ে এসেছেন এবং যার বিজয় ও প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁদের অনুসারীরা আদিষ্ট। এর বিরোধী শক্তি ও আহ্বান দুনিয়ার বুকে হামেশা থাকবে। এই জিহাদ কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। এর অনেক প্রকার ও রূপ রয়েছে যুদ্ধও যার অন্যতম যা কোন কোন সময় এর সর্বোত্তম প্রকারে পরিণত হয়। এর উদ্দেশ্য হলো এই যে, ইসলামের সমান্তরালে কোন প্রতিপক্ষ বা প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি যেন অবশিষ্ট না থাকে যারা মানব প্রকৃতিকে বিরোধী দিকের পানে টানবে এবং অসংখ্য মানুষের জন্য কুফর ও ইসলামের মাঝে সংঘাত হিসেবে দেখা দেবে।

وَقَاتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ - وَيَكُوْنَ الدِّيْنُ لِلّٰهِ -

'আর তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাকবে যাবৎ না ফেতনা দূরীভূত হয় এবং আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠিত হয়।" (সূরা বাকারা: ১৯৩)

এই জিহাদের একটি দাবি এও যে, মানুষ সেই ইসলাম সম্পর্কে খুবই ওয়াকিফহাল হবে যার খাতিরে তারা জিহাদ করবে এবং কুফর ও জাহিলিয়াত সম্পর্কেও অবহিত থাকবে যার বিরুদ্ধে তারা যুদ্ধ করছে। তারা গভীরভাবে অবহিত হবে যাতে করে যেই পোশাকে ও যেই রঙেই তা জাহির হোক, দেখামাত্রই তা চিনবে। হযরত ওমর (রা)-এর একটি উক্তি হলো : আমার ভয় হয় যে, সেসব লোক ইসলামের শেকলের কড়াগুলো ছড়িয়ে দেবে , ইতস্তত বিক্ষিপ্ত করে দেবে, যারা ইসলামের ভেতর লালিত-পালিত হয়েছে, বর্ধিত হয়েছে, অথচ জাহিলিয়াতকে তার চেনে না। একথা নিশ্চিত যে, সকল মুসলমানের জন্য এটা জরুরী নয় যে, তারা কুফর ও জাহিলিয়াত সম্পর্কে গভীর ও বিস্তারিতভাবে অবহিত হবে এবং এর বিকাশ, অবয়ব ও রঙ-রূপ সম্পর্কে জানবে এবং চিনবে। কিন্তু এটা নিঃসন্দেহ, ইসলামের যারা দিক-নির্দেশনা দেবেন এবং কুফর ও জাহিলিয়াতের বিরুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর নেতৃত্ব দেবেন তাঁদের জন্য এটা জরুরী যে, তাঁরা সাধারণ ও মধ্যম শ্রেণীর মুসলমানদের তুলনায় কুফর ও জাহিলিয়াত সম্পর্কে অধিক অবগত হবেন।

তেমনি এটাও জরুরী যে, যে সমস্ত লোক এই পদে অধিষ্ঠিত হবেন তাঁদের প্রস্তুতি পূর্ণ এবং শক্তি পূর্ণাঙ্গ ও পরিপূর্ণ হবে। তাঁদের কাছে লোহা কাটবার জন্য লোহা, বরং ততোধিক শক্ত ইস্পাত থাকবে। কুফরের মুকাবিলা করবে সে সমস্ত উপায়-উপকরণ ও আসবাব দিয়ে যা তাদের নাগালের মধ্যে থাকবে যেগুলো মানুষ আবিষ্কার-উদ্ভাবন করতে পেরেছে এবং যতদূর সম্ভব মানুষের জ্ঞানায়ত্ত।

যেগুলো মানুষ আবিষ্কার-উদ্ভাবন করতে পেরেছে এবং যতদূর সম্ভব মানুষের জ্ঞানায়ত্ত। এজন্য আল্লাহ্‌র নির্দেশ রয়েছে ঃ

وَاَعِدُّوْا لَهُمْ مَّا اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ قُوَّةٍ وَّمِنْ رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُوْنَ بِهٖ عَدُوَّ اللّٰهِ وَعَدُوَّكُمْ وَاٰخَرِيْنَ مِنْ دُوْنِهِمْ ج لَاتَعْلَمُوْنَهُمْ ـ اَللّٰهُ يَعْلَمُهُمْ ط وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَيْءٍ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ يُوَفَّ اِلَيْكُمْ وَاَنْتُمْ لَاتُظْلَمُوْنَ ـ

"তোমাদের তাদের মুকাবিলার জন্য যথাসাধ্য শক্তি ও অশ্ববাহিনী প্রস্তুত রাখবে, এর দ্বারা তোমরা সন্ত্রস্ত করবে আল্লাহ্‌র শত্রুকে, তোমাদের শত্রুকে এবং এতদ্ব্যতীত অন্যদেরকে যাদেরকে তোমরা জান না, আল্লাহ্ তাদেরকে জানেন। আল্লাহ্‌র পথে তোমরা যা কিছু ব্যয় করবে তার পূর্ণ প্রতিদান তোমাদেরকে দেওয়া হবে এবং তোমাদের প্রতি জুলুম করা হবে না" (সূরা আনফাল : ৬০)।

ইজতিহাদ দ্বারা আমরা বোঝাতে চাই, মুসলমানদের নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব (ইমামত) যে সমস্ত লোকের হাতে থাকবে যারা সামনে আসা জীবনের নতুন নতুন সমস্যা-সংকটকে এককভাবে অথবা সমষ্টিগতভাবে সঠিক ও যথাযথ ফয়সালা করবার যোগ্যতা ও সামর্থ্য রাখেন এবং ইসলামের স্পিরিট ও ইসলামের আইন প্রণয়নের মৌল নীতিমালা সম্পর্কে এতটা অবহিত এবং মসলা বের করবার ব্যাপারে এতটা পারঙ্গম হবেন যে, তাঁরা মুসলিম উম্মাহর সামনে বিরাজমান সংকটগুলোর সমাধান করতে পারেন এবং দ্বিধাদ্বন্দ্বকালে ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় যিনি তাদের দিক-নির্দেশনা দিতে পারেন। অধিকন্তু তারা এতটা মেধা, কর্মক্ষমতা ও জ্ঞানের অধিকারী ও পরিশ্রমী হবেন যাতে আল্লাহ্‌তা'আলা সমগ্র সৃষ্টিজগতে ও যমীনের বুকে যেই প্রাকৃতিক শক্তি, সম্পদ ও শক্তির উৎস রেখে দিয়েছেন তা থেকে তাঁরা কাজ নিতে পারেন এবং সেগুলোকে ইসলামের লক্ষ্য অর্জনের সহায়ক বানাতে পারেন। বাতিলপন্থীরা সেগুলোকে তাদের কামনা-বাসনা চরিতার্থ করার জন্যে ব্যবহার করবে এবং যমীনে ফেতনা-ফাসাদ, অশান্তি ও অরাজকতা সৃষ্টির কাজে এ সবের সাহায্য নেবে। পক্ষান্তরে সত্য পথের পথিক এসব থেকে কাজ নেবে যেজন্য আল্লাহ্ তাআলা এসব পয়দা করেছেন।

উমায়্যা ও আব্বাসী খলীফাবৃন্দ

কিন্তু দুর্ভাগ্য দুনিয়াবাসীর, খুলাফায়ে রাশেদীনের পর পৃথিবীর নেতৃত্বের মর্যাদামণ্ডিত আসনে এমন সব লোক জেঁকে বসে যারা এজন্য কোন প্রকৃত প্রস্তুতি গ্রহণ করেনি। খুলাফায়ে রাশেদীনের ন্যায় ও স্বয়ং আপন যুগের অনেক

মুসলমানের মত তারা উচ্চতর ধর্মীয় ও নৈতিক প্রশিক্ষণ লাভ করেনি। তাদের ধর্মীয়, আধ্যাত্মিক ও নৈতিক চরিত্রের মান এতটা সমুন্নত ছিল না যা মুসলিম মিল্লাতের একজন নেতার মর্যাদার উপযোগী। তাদের মস্তিষ্ক ও স্বভাব-প্রকৃতি আরবের প্রাচীন প্রশিক্ষণ ও পরিবেশের প্রভাব থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হতে পারেনি। তাদের মধ্যে না জিহাদের রূহ ছিল আর না ছিল ইজতিহাদের শক্তি যা দুনিয়ার ইমামত ও বিশ্বব্যাপী নেতৃত্বের জন্য অপরিহার্য। খলীফা-ই রাশেদ হযরত ওমর ইব্ন আবদুল আযীয (মৃ. ১৭১ হি.) ব্যতীত উমাইয়া ও আব্বাসী খলীফাদের সকলের অবস্থা ছিল এরূপই।

রাজতন্ত্রের প্রভাব ও পরিণতি

এর ফলশ্রুতিতে ইসলামের লৌহ প্রাকারে অনেক ফাঁক-ফোকর দেখা দেয়। ফলে উপর্যুপরি নানাবিধ ফেতনা ও মুসীবত দেখা দেয়। সেগুলোর সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে দেয়া গেল ঃ

ধর্ম ও রাজনীতির বিভাজন

ধর্ম ও রাষ্ট্রনীতির মধ্যে কার্যত বিভাজন দেখা দেয়। কেননা পরবর্তী শাসকগণ জ্ঞানে, গরিমায় ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে এতটুকু যোগ্যতার অধিকারী ছিলেন না যে, তাদের উলামায়ে কিরাম ও দীনদার লোকদের সাহায্যের প্রয়োজন পড়বে না। তাঁরা হুকুমত ও রাষ্ট্রনীতিকেই নিজেদের হাতে রাখেন এবং যখন তাঁরা চেয়েছেন কিংবা যখন পরিবেশ-পরিস্থিতির চাহিদা ও দাবি দেখা দিয়েছে কেবল তখনই পরামর্শদাতা ও বিশেষজ্ঞ হিসেবে তারা উলামায়ে কিরাম ও দীনদার লোকদের সাহায্য নিয়েছেন ও যতটুকু তারা চেয়েছেন কবুল করেছেন এবং যখন চেয়েছেন তাদের পরামর্শ পাশে রেখে দিয়েছেন, সে মতে আমল করেন নি। এভাবে রাষ্ট্রনীতি ধর্মের খবরদারী ও তত্ত্বাবধান থেকে মুক্ত হয়ে শেকলবিহীন হাতির ন্যায় লাগামহীন হয়ে পড়ে। এরপর থেকে দীনদার ও উলামা শ্রেণী হয় হুকুমতের বিরোধী হয়ে গেছেন কিংবা মাঝে মাঝে তাদের বিরুদ্ধে আন্দোলনে নেমেছেন। আবার কেউ কেউ রাষ্ট্র ও রাজনীতির ময়দান থেকে নিজেদেরকে দূরে সরিয়ে নিয়েছেন এবং তাৎক্ষণিক বিপ্লব সম্পর্কে হতাশ হয়ে চতুষ্পার্শের ঘটনাবলী থেকে চোখ বন্ধ করে ব্যক্তির সংশোধন ও প্রশিক্ষণের কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন। কেউ কেউ নিজের পরিবেশের খারাবী দৃষ্টে আর্তনাদ করতেন, আর্তস্বরে চিৎকার করতেন এবং এসবের ওপর ধর্মীয় ও নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে তীব্র সমালোচনা করতেন। কিন্তু কী করবেন? তাঁরা ছিলেন অসহায় , মজবুর। তাঁদের কিছু করার উপায় ছিল না। আবার কেউ কেউ

কোন ধর্মীয় মুসলিহাতের খাতিরে বা ব্যক্তিস্বার্থে হুকুমতের সাথে সহযোগিতা করতেন এবং তাদের ব্যবস্থায় শরীক থেকে যতটুকু সম্ভব ইসলাহ ও সংশোধনের প্রয়াস পেতেন। সে যা-ই হোক, এভাবে কার্যত ধর্ম ও রাষ্ট্রনীতি আলাদা হয়ে যায় এবং এ ব্যাপারে খোলাফায়ে রাশেদার আগে দুনিয়ার রাষ্ট্রীয় আইন-কানুন ও ব্যবস্থাপনার যে অবস্থা ছিল তারই একটি রঙ পয়দা হয়ে গেল। ধর্ম দিন দিন শক্তিহীন, প্রভাবশূন্য ও নিষ্প্রভ হয়ে চলল আর ওদিকে রাষ্ট্রনীতি হাত-পা মেলতে শুরু করল। ধর্মের লাগাম শিথিল এবং রাষ্ট্রনীতি নিয়ন্ত্রণহীন ও তার স্বেচ্ছাচারিতা বৃদ্ধি পেতে থাকল। সেইদিন থেকেই উলামায়ে কিরাম ও দীনদার লোক এবং দুনিয়াদার ও জাগতিক বিষয়বুদ্ধিসম্পন্ন লোকেরা পরিষ্কার দুটো পৃথক সম্প্রদায়ে পরিণত হলো এবং এ দু'য়ের মাঝে ফাঁক দিন দিন বিস্তৃত থেকে বিস্তৃততর হতে থাকল এবং কোন কোন সময় তা বৈরিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পর্যবসিত হতো।

রাষ্ট্রপরিচালকদের মধ্যে জাহিলিয়তের প্রবণতা সৃষ্টি

হুকুমতের সদস্যবৃন্দ, এমন কি স্বয়ং খলীফা নিজেও ধর্ম ও নৈতিক চরিত্রের পূর্ণ নমুনা ছিলেন না। এমন কি তাদের কারোর কারোর মধ্যে জাহিলী যুগের রোগ-জীবাণু ও প্রবণতা পাওয়া যেত। স্বাভাবিকভাবেই তাদের ব্যক্তিগত প্রবণতা ও মন-মানসিকতার প্রভাব জাতীয় জীবনের ওপর পড়ত এবং লোকে সাধারণত তাদেরই আচার-আচরণ ও প্রবণতার অন্ধ অনুকরণ করত। ধর্মের খবরদারি ও দেখাশোনা খতম হয়ে গিয়েছিল। তাদের জবাবদিহিতা উঠে গিয়েছিল। আমরু বিল-মা'রুফ ওয়া নাহী আনিল-মুনকার তথা সৎ কাজে আদেশ ও মন্দ কাজ থেকে নিষেধের প্রাধান্য খতম হয়ে গিয়েছিল। কেননা এর পেছনে কোন শক্তি কিংবা রাষ্ট্রের সমর্থন ও পৃষ্ঠপোষকতা ছিল না। এ ছিল কেবল হাতে গোণা এমন কতিপয় লোকের স্বেচ্ছাপ্রণোদিত আমল যাদের কাছে কোন শক্তি এবং অমান্য ও অবাধ্যতার ক্ষেত্রে কাউকে শাস্তি দানের কোন অধিকার ছিল না, অথচ এর বিপরীতে লাগামহীন ও মুক্ত জীবনের লোভনীয় হাতছানি ছিল অনেক। ফলে মুসলিম জনপদগুলোর ভেতর জাহিলিয়াত শ্বাস গ্রহণের অবাধ সুযোগ পায় এবং ক্রমান্বয়ে তা মাথা তুলে দাঁড়ায়। আরাম-আয়েশ, ভোগ-বিলাস, সমৃদ্ধি কামনা ও আনন্দ উপভোগের জীবন ব্যাপক হয়ে যায়। খেলাধুলা ও ক্রীড়া-কৌতুকের বাজার হয়ে যায় গরম ও রমরমা। বিলাসব্যসন ও প্রবৃত্তিপূজার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ভোগ-লিপ্সা বৃদ্ধি পায়। এই নৈতিক অধঃপতন ও ভোগবিলাসে মত্ত কোন জাতির পক্ষে ইসলামের দাওয়াত ও তাবলীগের দায়িত্ব পালন, 'আম্বিয়া আলায়হিমুস-সালাতু ওয়াস-সালামের প্রতিনিধিত্ব করা, আল্লাহ তা'আলা ও পরকালকে স্মরণ করিয়ে দিতে থাকা, তাকওয়া ও দীনদারীকে

উৎসাহিত করা এবং লোকের জন্য উন্নততর চারিত্রিক নমুনা কায়েম করা সম্ভব নয়, বরং এসব অবস্থায় জাতি তার নিজের অস্তিত্ব, সম্মান ও আযাদী বজায় রাখার শক্তিও খুইয়ে বসে।

سُنَّةَ اللّٰهِ فِى الَّذِيْنَ خَلَوْ مِنْ قَبْلُ ج وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبْدِيلاً ـ

"পূর্বে যারা অতীত হয়ে গেছে তাদের ব্যাপারে এটাই ছিল আল্লাহ্র রীতি। তুমি কখনও আল্লাহর রীতিতে কোন পরিবর্তন পাবে না।" (সূরা আহযাব ঃ৬২)

ইসলামের অপপ্রতিনিধিত্ব

অল্প দু'একটি ব্যতিক্রম ছাড়া এই সব লোক নিজেদের আমল-আখলাক ও পারস্পরিক লেনদেন সংক্রান্ত বিষয়াদিতে ইসলামের শরঈ রাষ্ট্রনীতি, এর সামরিক আইন-কানুন, এর সাংস্কৃতিক ব্যবস্থা ও এর নৈতিক শিক্ষামালার খুব কমই প্রতিনিধিত্ব করত। এভাবে অমুসলিমদের দিল থেকে ইসলামের পয়গামের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ ও তার প্রভাব চলে যেতে লাগল এবং ওদের প্রতি তাদের আস্থায় ভাটা পড়ল। জনৈক য়ূরোপীয় ঐতিহাসিকের ভাষায়: That the decline of Islam began when people stared to lose faith in the sincerity of its representatives. অর্থাৎ ইসলামের পতন সেদিন থেকে শুরু হলো যেদিন মানুষ ঐ সমস্ত লোকের সততার ব্যাপারে, তাদের আন্তরিকতা নিয়ে সন্দেহ পোষণ করতে লাগল যারা নতুন ধর্মের প্রতিনিধিত্ব করছিল।

দার্শনিক জটিলতা নিয়ে মেতে থাকা

সেই পতন যুগে মুসলিম পণ্ডিত ও চিন্তানায়কগণ যেই পরিমাণ অধিবিদ্যা (Metaphysics) ও গ্রীকদের ধর্মতত্ত্বের (Theology) দিকে মনোযোগ দেন সেই পরিমাণ প্রাকৃতিক বিজ্ঞান (Natural Science) কার্যকর ফলপ্রসু জ্ঞান-বিজ্ঞানের দিকে দিকে নজর দেননি, অথচ এই গ্রীক দর্শন ও ধর্মতত্ত্ব গ্রীকদের দেবমালা বা প্রতিমাবিদ্যা (Mythology) বৈ কিছুই ছিল না যাকে তারা নিজেদের চাতুর্যরূপে দার্শনিকসুলভ শব্দসমষ্টি ও পরিভাষার আড়ালে একটি যুক্তিশাস্ত্রের পোশাকে পেশ করেছিল। তা ছিল স্রেফ কতিপয় অলীক কল্পনার সমষ্টি ও শব্দসমষ্টির এমন এক ইন্দ্রজাল যার পেছনে কোন বাস্তবতা ও মৌলিকত্ব ছিল না। আল্লাহ তা'আলা আপন অনুগ্রহ ও করুণায় মুসলমানদেরকে এই অহেতুক ও অর্থহীন বিষয় থেকে মুক্ত করে দিয়েছিলেন এবং নবুওতের মাধ্যমে তাদেরকে আল্লাহ্র যাত ও সিফাত তথা তাঁর সত্তা ও গুণাবলীর সেই নিশ্চিত ও অকাট্য জ্ঞান দান করেছিলেন যার বর্তমানে সেই অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ এবং আল্লাহ্র যাত ও সিফাত সম্পর্কে সেই রাসায়নিক মিশ্রণ ও বিশ্লেষণের (যা ঐশী দর্শন ও বাণীর

পদ্ধতি) আদৌ প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু আফসোসের বিষয় এই যে, দার্শনিক ও কালামশাস্ত্রবিদগণ এই মহানেয়ামতের কদর না করে সেই সব আলোচনা সমালোচনার অর্থহীন কাজে, দুনিয়া ও আখিরাতে যেগুলোর কোনই লাভ নেই, শতাব্দীর পর শতাব্দী পর্যন্ত নিজেদের সর্বোত্তম যোগ্যতা ও মেধার অপচয় করেন। এই মগ্নতা তাদেরকে সেই সব জ্ঞান-বিজ্ঞান ও অভিজ্ঞতার দিকে মনোযোগ দেবার সুযোগ দেয়নি যা তাদের জন্য বিশ্বজগতের সমূহ প্রাকৃতিক শক্তিকে বশীভূত ও অধীনস্থ করে দিত এবং এরপর সে এসব শক্তিকে ইসলামের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও কল্যাণকর উপাদানের অনুগত ও সেবক বানিয়ে ইসলামের বস্তুগত ও আধ্যাত্মিক একচ্ছত্র শাসনকে তামাম পৃথিবীর ওপর কায়েম করে দিতে সমর্থ হতো। ঠিক তেমনি তারা নিউ প্লেটোনিক দর্শন তথা অধিবিদ্যার আলোচনা-সমালোচনা ও ওয়াহদাতুল উজুদ মতবাদ নিয়েও প্রয়োজনাতিরিক্ত সময় ও শক্তি ব্যয় করে।

শির্ক ও বিদ'আত

এই পতন যুগে মুসলমানদের মধ্যে শির্ক ও মূর্খতা, প্রাচীন সব জাহিল জাতিগোষ্ঠীর আকীদা-বিশ্বাস ও ধ্যান-ধারণা এবং গোমরাহী ও পথভ্রষ্টতা অনুপ্রবেশ করতে শুরু করে এবং মুসলিম জীবনে ও তাদের মেযাজে এমন সব বিদ'আত স্থান করে নেয় যেগুলো ধর্মীয় জীবনের একটি বিরাট স্থান দখল করে নেয় এবং মুসলমানদেরকে বিশুদ্ধ দীন ও দুনিয়ার সাফল্য থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। প্রকাশ থাকে যে, দুনিয়ার অপরাপর জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে মুসলমানদের যা কিছু বৈশিষ্ট্য তা এই দীনের বদৌলতেই, এই ইসলামের কারণেই যা আল্লাহ্র রসূল (সা) আল্লাহ্র কাছ থেকে নিয়ে এসেছিলেন।

صُنْعَ اللّٰهِ الَّذِيْٓ اَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ ۔

"এটা আল্লাহ্রই সৃষ্টি নৈপুণ্য যিনি সমস্ত কিছুকে করেছেন সুষম"[ফুস্সিলাতঃ ৪২ সূরা নামল : ৮৮] " تنزيل من حكيم حميد এটা প্রজ্ঞাময় ও স্ব-মহিমায় প্রশংসিত সত্তার পক্ষ থেকে নাযিলকৃত। অনন্তর যখন এর মধ্যে মানুষের জ্ঞানবুদ্ধি, স্বকপোল-কল্পিত আমল ও রসমের অনুপ্রবেশ ঘটবে এবং আল্লাহ্ না করুন, তা তার মৌলিকত্ব খুইয়ে বসবে তখন দুনিয়া ও আখিরাতের সৌভাগ্যের গ্যারান্টি আর অবশিষ্ট থাকবে না এবং সে এই যোগ্যতাও হারিয়ে ফেলবে যে, মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধি তার সামনে মাথা নত করবে এবং মানুষের দিল্ সে জয় করবে।

দাওয়াত ও তাজদীদের অব্যাহত ধারা

প্রকাশ থাকে যে, আসল দীন কিন্তু এই গোটা মুদ্দতে সর্বপ্রকার পরিবর্তন ও বিকৃতির হাত থেকে নিরাপদই থাকে। মুসলমানরা সঠিক রাস্তা থেকে যেখানে যেখানে সরে এসেছিল কিংবা বিপথগামী হয়েছিল কুরআন ও সুন্নাহ্‌র সঙ্গে মিলিয়ে দেখলেই ধরা পড়ত। দীন ও শরীয়ত মুসলমানদের ভুলের ক্ষেত্রে কখনো সঙ্গ দেয়নি, বরং এসবের অধ্যয়ন থেকে গায়ের ইসলামী তথা অনৈসলামী পরিবেশ, শির্‌কমূলক ও বিদআতসর্বস্ব কার্যকলাপ, রসম, জাহিলী আমল-আখলাক ও অভ্যাসের বিরুদ্ধে, অধিকন্তু আমীর-উমারা শ্রেণী ও রাজা-বাদশাহ্‌দের ভোগ-বিলাস ও জোর-যবরদস্তির বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ বিক্ষোভ ও জিহাদী প্রেরণা সৃষ্টি হতো। এরই ফলে ইসলামী ইতিহাসের প্রতিটি যুগে ও মুসলিম বিশ্বের প্রতিটি কোণে এমন সব উন্নত মনোবলসম্পন্ন ও অটুট ইচ্ছাশক্তির অধিকারী মানুষ জন্ম নিতে থাকেন, যাঁরা এই উম্মাহ্‌র মধ্যে আম্বিয়ায়ে কিরামের প্রতিনিধিত্বের হক আদায় করেছেন, মুসলমানদের মুর্দা দেহে জিহাদী রূহের সঞ্চার করেছেন, বছরের পর বছর ধরে জড় ও নির্জীব সমতলে গতি ও তরঙ্গের সৃষ্টি করেছেন, মাসলা-মাসাইল ও বিভিন্ন জ্ঞানের ক্ষেত্রে নিজেদের চিন্তা-চেতনা জীবন্ত করেছেন এবং মুজতাহিদসুলভ যোগ্যতা দিয়ে মুসলমানদের মধ্যে নবতর ইসলামী রূহ ও মানসিক জাগরণ সৃষ্টি করেছেন। পর্যবেক্ষণসুলভ দৃষ্টিশক্তির অধিকারী একজন ঐতিহাসিকের চোখে জিহাদ ও তাজদীদের ইতিহাসে কোন শূন্যতা ও বিরতি দৃষ্টি গোচর হয় না। সংস্কারের জ্বলন্ত মশাল ও প্রদীপ অব্যাহত পন্থায় একের থেকে অন্যে আলো জ্বেলে দিয়েছে এবং প্রবল ঘূর্ণিঝড়ও সে আলো নিভিয়ে দিতে পারেনি।[১]

এরই সাথে সাথে যখন ইসলাম কিংবা মুসলিম বিশ্বের সামনে নতুন কোন বিপদ এসে দেখা দিয়েছে, তখন কোন মর্দে মুজাহিদ ময়দানে এসে দাঁড়িয়েছেন এবং কেবল সেই বিপদকে দূর করেছেন তাই নয়, বরং মুসলিম বিশ্বে এক নতুন রূহ্ ও নতুন জীবন সঞ্চার করেছেন। সুলতান নূরুদ্দীন যঙ্গী ও সুলতান সালাহুদ্দীন আইয়ূবীর অতুলনীয় ব্যক্তিত্ব এর উজ্জ্বলতর উদাহরণ।

ক্রুসেড ও যঙ্গী খান্দান

খ্রিস্টান য়ূরোপ শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ইসলামের ওপর ক্ষুব্ধ ছিল। মুসলমানরা তার গোটা প্রাচ্য সাম্রাজ্যের ওপর দখল জমিয়ে রেখেছিল এবং

১. দ্র. তারীখে দাওয়াত ও আযীমত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৯৭;

তাদের সমস্ত পবিত্র স্থানই মুসলমানদের দখলে ছিল। কিন্তু শক্তিশালী মুসলিম সাম্রাজ্যের উপস্থিতিতে ও প্রতিবেশী খ্রিস্টান রাজ্যগুলোর ওপর তাদের অব্যাহত অগ্রাভিযানের দরুন তাদের আক্রমণ পরিচালনার সাহস হতো না। হি. ৫ম/খ্রি. ১১শ শতাব্দীর শেষে এমন অবস্থার উদ্ভব হয় যে, য়ূরোপের ক্রুসেড যোদ্ধারা সিরিয়া ও ফিলিস্তীন অভিমুখে ধাবিত হয় এবং তাদের সেনাবাহিনী বন্যা ও তুফানের বেগে ছড়িয়ে পড়ে। ৪৯২হি./১০৯৯ খ্রি. সনে ক্রুসেডাররা জেরুসালেম (বায়তুল মাকদিস) জয় করে নেয় এবং কয়েক বছরের মধ্যেই ফিলিস্তীন রাষ্ট্রের এক বিরাট অংশই তাদের দখলে চলে যায়। বিখ্যাত ইংরেজ ঐতিহাসিক স্টানলি লেনপুল বলেন:

"The crusaders penetrated like a wedge between the old wood and the new and for a while seemed to cleave the trunk of Mohamadan Empire into splinters."

"ক্রুসেডাররা এসব দেশে এমন সহজে ঢুকে পড়েছিল যেমন পুরনো কাষ্ঠখণ্ডের ভেতর খুব সহজে পেরেক ঢুকানো হয়। স্বল্প সময়ের জন্য এরূপ মনে হচ্ছিল যে, তারা ইসলামরূপী বৃক্ষের মূল কাণ্ড উপড়ে ফেলে তা ধুনিত তুলোর মত উড়িয়ে দেবে।"[১]

ক্রুসেডাররা বায়তুল মুকাদ্দাসে প্রবেশের সময় বিজয়ের নেশায় উন্মত্ত হয়ে অসহায় মুসলমানদের সঙ্গে যে আচরণ করেছিল তার উল্লেখ একজন দায়িত্বশীল খ্রিস্টান ঐতিহাসিক নিম্নোক্তভাবে করেছেন ঃ

"So terrible, it is said, was the carnage which followed that the horses of the Crusaders who rode up to the mosque of Omar were knee-deep in the stream of blood. Infants were seized by their feet and dashed against the walls or whirled over the battlements, while the Jews were all burnt alive in their synagogue."

"বায়তুল মুকাদ্দাসে বিজয়ীবেশে প্রবেশ করার পর ক্রুসেড যোদ্ধারা এভাবে পাইকারী হত্যাকাণ্ড চালিয়েছিল যে, যে সব ক্রুসেড যোদ্ধা ঘোড়ায় চড়ে মসজিদে ওমর (রা)-এ গিয়েছিল তাদের ঘোড়ার হাঁটু পর্যন্ত রক্তের বন্যায় ডুবে গিয়েছিল। বাচ্চা শিশুদেরকে ঠ্যাং ধরে দেওয়াল গাত্রে আছড়ে মারা হয় অথবা প্রাচীরের ওপর থেকে চক্রাকারে ঘুরিয়ে বাইরে নিক্ষেপ করা হয়। অন্যদিকে ইয়াহূদীদেরকে তাদের সিনাগগের মধ্যে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হয়।"[২]

---

১. সুলতান সালাহুদ্দীন, ২১৪ পৃ.(উর্দু সংস্করণ ১৮৯ পৃ

২. .আবুল ফিদা হামাবীর ইতিহাস; ।

বায়তুল মুকাদ্দাস বিজয় ছিল মুসলিম সাম্রাজ্যের দুর্বলতা ও পতন এবং খ্রিস্টান বিশ্বের উত্থান ও ক্রমবর্ধমান শক্তির পরিচায়ক। এ ছিল মুসলিম বিশ্বের জন্য বিপদ সংকেত। খ্রিস্টানদের দুঃসাহস ও ধৃষ্টতা এরপর থেকে এতখানি বেড়ে যায় যে, কির্ক-এর শাসনকর্তা রেজিনাল্ড মক্কা মুআজ্জমা ও মদীনা মুনাওয়ারার ওপর আক্রমণ পরিচালনার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছিল। রিদ্দার ঘটনার পর ইসলামের ইতিহাসে এর চাইতে বেশি নাযুক মুহূর্ত ও বিপজ্জনক সময় আর আসেনি।

ঠিক এমনি ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ, দ্বিধাদ্বন্দ্ব ও বর্ধিত হতাশার মাঝে মুসলিম জাহানের ভাগ্যাকাশে এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের আবির্ভাব ঘটে। যেখানে আদৌ আশার ক্ষীণ আলোকরেখা দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল না, সেখান থেকে এমন এক নতুন শক্তির অভ্যুদয় হয় যার কল্পনাও কারও মনে ঠাঁই পায়নি। আর সেটা ছিল মাওসিলের যঙ্গী খান্দানের দু'জন সদস্য ইমাদুদ্দীন যঙ্গী (মৃ. ৫৪১ হি.) এবং তদীয় পুত্র নূরুদ্দীন যঙ্গী (মৃ ৫৬৯ হি.)। তাঁরা ক্রুসেডারদের উপর্যুপরি পরাজয় বরণে বাধ্য করেন এবং বায়তুল মুকাদ্দাস ব্যতিরেকে (যার বিজয় সুলতান সালাহুদ্দীনের ভাগ্যে নির্ধারিত ছিল) ফিলিস্তীনের প্রায় গোটাটাই ক্রুসেডারদের হাত থেকে মুক্ত করেছিলেন। নূরুদ্দীন যঙ্গী তাঁর আত্মিক সৌজন্য, যুহ্দ ও আল্লাহ-ভীতি, উত্তম ব্যবস্থাপনা, ন্যায়বিচার, বিশ্বস্ততা, বিনয় ও নম্রতা, জিহাদী প্রেরণা এবং ঈমান ও ইয়াকীনের দিক দিয়ে ইসলামের ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব হিসাবে উদ্ভাসিত হয়ে আছেন। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ইবনুল-আছীর জাযারী তদীয় 'তারীখুল কামিল' নামক গ্রন্থে বলেনঃ আমি বিগত সুলতানদের জীবন ও সার্বিক অবস্থা সম্পর্কে গভীরভাবে পড়াশোনা করেছি। খুলাফায়ে রাশেদীন ও ওমর ইবনু'ল আবদুল আযীযের পর নূরুদ্দীনের চাইতে অনুপম চরিত্রের অধিকারী এবং তাঁর চেয়ে অধিক ন্যায় বিচারক সুলতান আমি আর দেখিনি।[১]

সালাহুদ্দীনের নেতৃত্ব

নূরুদ্দীনের পর তাঁরই হাতে গড়া ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সুলতান সালাহুদ্দীন খ্রিস্টান জগতের মুকাবিলায় মুসলিম বিশ্বের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। অবশেষে বিভিন্ন যুদ্ধের পর তিনি হিত্তীন (ফিলিস্তীন) প্রান্তরে ১৪ই রবিউল আউয়াল, ৫৮৩ হি./৪ঠা জুলাই ১১৮৭ খ্রি. ক্রুসেডারদের এমন শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেন যে, তাদের কোমর ভেঙে যায় এবং তাদের ভাগ্যের চূড়ান্ত ফয়সালা শুনিয়ে দেয়। লেনপুল নিম্নোক্ত ভাষায় এর ছবি এঁকেছেন:

---

১. সুলতান সালাহুদ্দীন, ২০৫।

"A Single saracen was seen dragging some thirty Christians he had taken prisoners and tied together with ropes. The dead lay in heaps, like stones upon stones, whilst mutilated heads strewed the ground like a plentiful crop of melons,"

"এক একজন মুসলিম সৈনিক তিরিশ জনের মত খ্রিস্টান সৈন্যের প্লাটুন, যাদেরকে সে স্বহস্তে বন্দী করেছিল, তাঁবুর দড়ি দিয়ে বেঁধে নিয়ে যাচ্ছিল। নিহত ক্রুসেডারদের লাশ ও তাদের কর্তিত হাত-পা এমনভাবে স্তূপাকারে পড়েছিল যেমনভাবে পাথরের পর পাথর স্তূপাকারে পড়ে থাকে। কর্তিত ও খণ্ড-বিখণ্ড লাশ এরূপ বিক্ষিপ্তভাবে মাটিতে পড়ে ছিল যেরূপ তরমুজের ক্ষেতে তরমুজ বিক্ষিপ্তভাবে পড়ে থাকে।"[১]

যুদ্ধের এই রক্তাক্ত ময়দানে তিরিশ হাজার লোক মারা গিয়েছিল বলে দীর্ঘদিন যাবত প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল।

হিত্তীন যুদ্ধে বিজয় লাভের পর সুলতান সালাহুদ্দীন ২৭শে রজব তারিখে হি. ৫৮৩/১১৮৭ খ্রি. বায়তুল মুকাদ্দাস পুনরুদ্ধার করেন এবং সেই আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করেন যা সুদীর্ঘ ৯০ বছর যাবত মুসলমানদের হৃদয়-মনকে অস্থির করে রেখেছিল। সুলতানের বিশ্বস্ত বন্ধু ও সাথী কাযী বাহাউদ্দীন ইবন শাদ্দাদ বলেন :

"এ ছিল এক বিরাট বিজয়। এই পবিত্র মুহূর্তে বায়তুল মুকাদ্দাসে আলিম-উলামা, কামিল-ফাযিল ও মুসাফির-পর্যটকদের এক বিরাট সমাবেশ ঘটে। লোকেরা যখন জানতে পারল যে, সমুদ্রোপকূলবর্তী এলাকাসমূহ মুসলমানরা জয় করে ফেলেছে, তখন মিসর ও সিরিয়া থেকে উলামায়ে কিরাম দলে দলে বায়তুল মুকাদ্দাস অভিমুখে রওয়ানা হন। চতুর্দিকে দো'আ ও তকবীর-তাহলীল ধ্বনিত হচ্ছিল। ৯০ বছর পর বায়তুল মুকাদ্দাসে জুমুআর সালাত অনুষ্ঠিত হয় এবং কুব্বাতু'স-সাখরার ওপর যেই ক্রস-কাষ্ঠ স্থাপন করা হয়েছিল তা নামিয়ে ফেলা হয়। সে এক আশ্চর্য দৃশ্য! ইসলামের বিজয় ও আল্লাহ্‌র সাহায্য খোলা চোখে দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল।"[২]

সুলতান সালাহুদ্দীন প্রদর্শিত এ সময়কার সদাশয়তা, উদারতা, মহত্ত্ব ও ইসলামী আখলাক-চরিত্রের কথা উল্লেখ করে ঐতিহাসিক লেনপুল বলেন :

"If the taking of Jerusalem were the only fact known about Saladin, it were enough to prove him the most chivalrous and great-hearted conqueror of his own and perhaps of any age."

---

১. সুলতান সালাহুদ্দীন, ২১৪ পৃ.; উর্দু সংস্করণ ১৮৯ পৃ.।
২. আবুল ফিদা হামাবীর ইতিহাস।

"সুলতান সালাহুদ্দীনের সমস্ত গুণের ভেতর কেবল এই একটি গুণের কথা যদি দুনিয়া জানত, যদি জানতে পারত তিনি কীভাবে জেরুসালেমকে অনুগৃহীত করেছিলেন তাহলে তারা এক বাক্যে স্বীকার করত যে, সুলতান সালাহুদ্দীন কেবল তাঁর যুগের নন, বরং সর্বযুগের সর্বাপেক্ষা উন্নত মনোবলসম্পন্ন হৃদয়বান মানুষ এবং বীরত্ব ও ঔদার্যের জীবন প্রতীক ছিলেন।"[১]

মুসলমানদের হাতে বায়তুল মুকাদ্দাস বিজয় এবং হিত্তীন রণক্ষেত্রে খ্রিস্টানদের অবমাননাকর পরাজয়ে গোটা য়ূরোপে পুনরায় ক্রোধ ও জিঘাংসার আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে। সমগ্র য়ূরোপ সিরিয়া (শাম)-এর মত ছোট্ট দেশটির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। এদের সকলের মুকাবিলায় ছিলেন একাকী সুলতান সালাহুদ্দীন, তাঁর আত্মীয়-বান্ধব ও কতিপয় মিত্র যাঁরা গোটা মুসলিম বিশ্বের পক্ষ থেকে খ্রিস্টান শক্তিকে প্রতিরোধ ও প্রতিহত করে যাচ্ছিলেন।

অবশেষে পাঁচ বছরের অব্যাহত রক্তাক্ত যুদ্ধের পর ১১৯২ খ্রিস্টাব্দে রমলা নামক স্থানে ক্লান্ত ও অবসন্ন উভয় পক্ষের মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হয়। বায়তুল মুকাদ্দাসসহ মুসলমানদের বিজিত শহর ও দুর্গগুলো আগের মতই মুসলমানদের হাতে থাকে।

সমুদ্রোপকূলবর্তী ক্ষুদ্র রাজ্য একরের নিয়ন্ত্রণ খ্রিস্টানদের হাতে ছিল। বাদ বাকি গোটা দেশই ছিল সুলতান সালাহুদ্দীনের অধিকারে। সুলতান সালাহুদ্দীন যে দায়িত্ব ও খেদমত নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন এবং সত্যি বলতে কি, আল্লাহ তা'আলা যে কর্মভার তাঁর কাঁধে ন্যস্ত করেছিলেন তাঁর হাতে তা পূর্ণতা লাভ করে। লেনপুল বলেন:

The Holy War was over; the five years' contest ended. Before the great victory at Hittin in July, 1187. not an inch of Palestine west of the Jordan was in the Muslim's hands. After the peace of Ramla in September, 1192, the whole land was theirs except an arrow strip of coast from Tyre to Jaffa. Saladin had no cause to be ashamed of the treaty.

"পাঁচ বছরের অব্যাহত রক্তারক্তির পর অবশেষে পবিত্র যুদ্ধ (?) শেষ হলো। ১১৮৭ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে হিত্তীনে মুসলমানদের বিজয়ের আগে জর্দান নদীর পশ্চিমে তাদের অধিকারে এক ইঞ্চি জায়গাও ছিল না। ১১৯২ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বরে যখন রমলার সন্ধি স্থাপিত হয় তখন সূর থেকে শুরু করে য়াফা পর্যন্ত সমুদ্রোপকূল এলাকায় এক চিলতে ভূখণ্ড ছাড়া গোটা দেশটাই

১. সুলতান সালাহুদ্দীন, ২৩৪ পৃ.।

মুসলমানদের অধিকারে চলে গেল। এই সন্ধি স্থাপনের দরুন সালাহুদ্দীনের এতটুকু লজ্জিত হবার প্রয়োজন ছিল না।"[১]

সুলতান সালাহুদ্দীন সর্বোত্তম সাংগঠনিক যোগ্যতা ও নেতৃত্বসুলভ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন। তিনি কেবল সিপাহসালার ও বিজেতাই ছিলেন না, বরং জনপ্রিয় নেতা ও সকলের কাছেই গ্রহণযোগ্য সিপাহীও ছিলেন। কয়েক শতাব্দী পর বিক্ষিপ্ত ও বিস্রস্ত ইসলামী রাজ্য ও শক্তি এবং নানাভাবে বিভক্ত ও পরস্পর বিরোধী মুসলিম জাতিগোষ্ঠী ও গোত্রগুলোকে তিনি জিহাদের পতাকাতলে সমবেত করেন। সুদীর্ঘকাল পর তাঁর নেতৃত্বে মুসলিম বিশ্ব একটি সুসংগঠিত ও সুশৃংখল আন্তরিকতাপূর্ণ যুদ্ধ করে যার লক্ষ্য ইসলামের হেফাজত ও জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ ছাড়া আর কিছু ছিল না। লেনপুল যথাযথ লিখেছেন:

"All the strength of Christendom concentrated in the third Crusade had not shaken Saladin's power. His soldiers may have murmured at their long months of hard and perilous service year after year, but they never refused to come to his summons and lay down their lives in his cause............"

"তৃতীয় ক্রুসেড যুদ্ধে সমগ্র খ্রিস্টান জগতের মিলিত শক্তি মুসলমানদের মুকাবিলায় অবতীর্ণ হয়। কিন্তু সালাহুদ্দীনের শক্তিতে তারা এতটুকু চিড় ধরাতে পারেনি। সালাহুদ্দীনের সৈন্যরা মাসের পর মাস কঠিন পরিশ্রম এবং বছরের পর বছর বিপদসঙ্কুল খেদমতে নিয়োজিত থাকার কারণে ক্লান্তি ও অবসাদে ভেঙে পড়েছিল বটে, কিন্তু তাদের মুখে অভিযোগের লেশমাত্র ছিল না। তলব মাত্রই হাজির হতে এবং একটি নেক কাজে নিজেদের জীবন কুরবানী দিতে তাদের কেউ পিছপা হয়নি।"[২]

সম্মুখে অগ্রসর হয়ে তিনি বলেন:

Kurds, Turkmans, Arabs and Egyptians, they were all Moslem's and his servants when he called. In spite of their differences of race, their national jealousies and tribal pride, he had kept them together as one host-not without difficulty and, twice or thrice, a critical waver.

"কুর্দ, তুর্কমেন, আরব, মিসরীয় সমস্ত মুসলমানই ছিল সুলতানের খাদেম। তলব মাত্রই তারা খাদেমের মতই সুলতানের খেদমতে এসে হাজির হতো। কে কোন্ বংশের কিংবা কে কোন্ জাতিগোষ্ঠীর সেদিকে তাদের লক্ষ্য ছিল না। বর্ণ, বংশ, গোত্রগত বৈপরীত্য সত্ত্বেও সুলতান তাদেরকে এমন একটি অখণ্ড ও

১. সুলতান সালাহুদ্দীন, ৩৫৮, পৃ.।
২. সুলতান সালাহুদ্দীন, ৩৫৮, পৃ.।

ঐক্যবদ্ধ শক্তিতে পরিণত করেছিলেন যে, গোটা বাহিনী যেন এক আত্মায় লীন হয়ে গিয়েছিল। মনে হতো সবাই যেন একই জাতিগোষ্ঠীর সদস্য!"[১]

সালাহুদ্দীনের পরে

৫৮৯ হিজরীর ২৭শে সফর / ৪ঠা মার্চ, ১১৯৩ খ্রি. তারিখে ইসলামের এই বিশ্বস্ত সন্তান দুনিয়া থেকে বিদায় গ্রহণ করেন। সালাহুদ্দীনের জিহাদী প্রয়াস ও তাঁর সময়োপযোগী নেতৃত্ব মুসলিম জাহানকে ক্রুসেডারদের গোলামির ভয়াবহ বিপদ থেকে দীর্ঘ দিনের জন্য নিরাপদ করে দেয়। মুসলিম জাহানের ভাগ্যাকাশ পরিষ্কার হয়ে যায়। ক্রুসেডাররা কিন্তু এসব যুদ্ধ থেকে ঠিকই ফায়দা লোটে। তারা নিজেদের ও মুসলিম জাহানের দুর্বলতাগুলো অধ্যয়ন ও অভিজ্ঞতার নিরিখে পর্যালোচনা করার পর নতুন ক্রুসেড যুদ্ধের (যার পরিণতি ঊনবিংশ শতাব্দীতে এসে দেখা দেয়) প্রস্তুতিতে মগ্ন হয়ে পড়ে। কিন্তু মুসলিম জাহানের ওপর পুনরায় আলস্য ও গাফিলতির ভূত চেপে বসে। পারস্পরিক অনৈক্য ও হানাহানি পুনরায় মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। সালাহুদ্দীনের পর মুসলিম জাহান পুনরায় এরকম অকৃত্রিম নেতা ও পথ-প্রদর্শক পায়নি, যিনি নিঃস্বার্থভাবে ইসলামের খেদমতের জন্য অস্থির হয়েছেন, যার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ ছাড়া আর কিছু নয় এবং যিনি মুসলিম জাহানের এতটা আস্থা ও বিশ্বাস অর্জন করেছেন আর মুসলিম বিশ্বের নাড়ির সঙ্গে যিনি এতটা সম্পর্কিত ছিলেন যতটা ছিলেন সুলতান সালাহুদ্দীন। ফলে মুসলিম জাহান আরেকবার স্বার্থপরতা, গৃহযুদ্ধ ও চক্রান্তের শিকার হয়ে যায় এবং তার এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত পতন ও দুর্যোগের ঘনঘটায় ছেয়ে যায়।

জাহিলিয়াতের জন্য প্রতিবন্ধকতা

কিন্তু মুসলমান তার যাবতীয় খারাবী ও ত্রুটি-বিচ্যুতি এবং নিজেদের সর্বপ্রকার স্খলন সত্ত্বেও সমকালীন সমস্ত জাহেলী জাতিগোষ্ঠীর মুকাবিলায় আম্বিয়া আলায়হিমুস-সালাম প্রদর্শিত রাজপথের কাছাকাছি অবস্থান করছিল এবং তারা আল্লাহ্র অধিক অনুগত ও বাধ্য ছিল। তাদের অস্তিত্ব ও তাদের ছিটেফোঁটা ক্ষমতা জাহিলিয়াতের বিস্তার ও উন্নতির পথে বিরাট প্রতিবন্ধক ও লৌহ প্রাকার প্রমাণিত হচ্ছিল। তারা নিজেদের যাবতীয় দুর্বলতা সত্ত্বেও দুনিয়ার এক গুরুত্বপূর্ণ শক্তি ছিল যাদেরকে অপরাপর রাজশক্তি ভয় পেত এবং সদা সন্ত্রস্ত থাকত। তাদের দৃষ্টিতেও মুসলমানরা বিরাট গুরুত্বের অধিকারী ছিল। বাহ্যিক অবয়বে ধরা না পড়লেও এবং বাইরের হুকুমতগুলোর কাছে তা অনুভূত

১. সুলতান সালাহুদ্দীন, ৩১০-১১, পৃ.।

না হলেও ভেতর থেকে এই শক্তি ক্রমান্বয়ে দুর্বল থেকে দুর্বলতর হয়ে চলেছিল, এমন কি হি. ৭ম শতাব্দীর মধ্যভাগে তাদের রাজনৈতিক বিশৃংখলা ও নৈতিক দুর্বলতা পরিষ্কারভাবে ফুটে ওঠে এবং মুসলিম শক্তির সেই ভীতিকর ছায়া যা দূর থেকে দৃষ্টিগোচর হতো–দৃষ্টিপথ থেকে অপসৃত হয়ে যায়। সাথে সাথে মুসলমানদের ওপর বর্বর ও অসভ্য জাতিগোষ্ঠী ও প্রতিপক্ষ শক্তিগুলো ঝাঁপিয়ে পড়ে। মুসলিম দেশগুলো লাওয়ারিশ মালের মত বিজয়ী শক্তিগুলোর হাতে ভাগ-বণ্টিত হতে থাকে।

তাতারী ফেৎনা

এ সব বন্য ও বর্বর আক্রমণের মধ্যে সব চাইতে বড় আক্রমণ ছিল তাতারীদের আক্রমণ যা পিপীলিকা ও পতঙ্গের ন্যায় প্রাচ্য ভূখণ্ড থেকে অগ্রসর হয় এবং সমগ্র মুসলিম জাহান ছেয়ে ফেলে। তাতারী আক্রমণ মুসলিম জাহানের জন্য ছিল এক মহা দুর্যোগ যার ফলে মুসলিম বিশ্বের ভিত্তিই নড়বড়ে হয়ে যায়। মুসলমানরা ছিল হতবিহ্বল ও কিংকর্তব্যবিমূঢ়। এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত এক ধরনের ত্রাস ও নৈরাশ্যজনক অবস্থা বিরাজ করছিল। একবার তো প্রায় গোটা মুসলিম জাহানই (বিশেষ করে এর প্রাচ্য ভূখণ্ড) এই মর্মবিদারক ফেতনার আওতায় চলে এসেছিল। ঐতিহাসিক ইব্ন আছীরও এই ঘটনার কথা উল্লেখ করতে গিয়ে তাঁর মনের অবস্থা ও প্রতিক্রিয়া প্রচ্ছন্ন রাখতে পারেন নি। তিনি লিখেছেন :

“এই দুর্যোগ ও দুর্বিপাক এতই ভয়াবহ ও অসহনীয় ছিল যে, কয়েক বছর যাবত আমি দো-টানার মধ্যে ছিলাম-এ ঘটনা সম্পর্কে আলোচনা করব কি না। এখনও যে করছি তাও বিরাট দ্বিধা-দ্বন্দ্বের সাথে করছি। ইসলাম ও মুসলমানদের মৃত্যু খবর শোনানো কার পক্ষেই বা সহজ আর এতখানি বুকের পাটাই বা কার আছে যে, তাদের যিল্লতি ও লাঞ্ছনার কাহিনী শোনাবে? হায়! আমি যদি জন্মগ্রহণ না করতাম। হায়! আমি যদি এর আগেই মারা যেতাম, হারিয়ে যেতাম বিস্মৃতির অতলে। এতদ্‌সত্ত্বেও আমার কতক দোস্ত আমাকে এ ঘটনা লিখতে উদ্বুদ্ধ করলেন। এরপরও আমি দ্বিধান্বিত ছিলাম। কিন্তু আমি দেখলাম এটা না লেখার মধ্যেও কোন ফায়দা নেই।

“এ এমনই এক দুর্ঘটনা এবং এমনই এক মুসীবত যে, দুনিয়ার ইতিহাসে এর কোন নজীর পাওয়া যাবে না। এ ঘটনার সম্পর্ক গোটা মানব সমাজের সঙ্গে। যদি কেউ দাবি করে যে, আদম (আ)-এর পর থেকে আজ অবধি দুনিয়ার বুকে এ ধরনের নির্দয় ঘটনা আর একটিও ঘটেনি তবে তা ভুল হবে না। আর তা

এজন্য যে, ইতিহাসে এর সমপাল্লার কোন ঘটনার সন্ধানই পাওয়া যায় না। দুনিয়া কেয়ামত পর্যন্ত (ইয়াজূজ-মা'জূজ ভিন্ন) কখনো যেন এমন ঘটনা প্রত্যক্ষ না করে। ঐ সব বর্বর পশু কারোর প্রতি এতটুকু কৃপা দেখায় নি। তারা নারী-পুরুষ ও শিশুদের হত্যা করেছে, মহিলাদের পেট চিরেছে এবং গর্ভস্থ সন্তানকে হত্যা করেছে। লা-হাওলা ওয়ালা কূওয়াতা ইল্লা বিল্লাহি'ল-আলিয়্যি'ল আজীম। এ দুর্যোগ ও দুর্ঘটনা ছিল যেন বিশ্বগ্রাসী। মহাপ্লাবন আকারে এটা দেখা দেয় এবং দেখতে দেখতেই তা গোটা পৃথিবীটাই যেন ছেয়ে ফেলে!"[১]

৬৫৬ হিজরীতে এই বন্য ও বর্বর তাতারীরা তৎকালীন মুসলিম বিশ্বের রাজধানী বাগদাদে বিজয়ী বেশে প্রবেশ করে এবং এর অস্তিত্ব লণ্ডভণ্ড করে দেয়। ঐতিহাসিক ইবন কাছীর বাগদাদের ধ্বংস ও তাতারীদের ব্যাপক গণ হত্যা ও হৃদয়বিদারক ঘটনার কথা লিখতে গিয়ে বলেনঃ

"চল্লিশ দিন পর্যন্ত বাগদাদে ব্যাপক হত্যা ও ধ্বংসের রাজত্ব চলে। চল্লিশ দিন পর তৎকালীন বিশ্বের গৌরবোজ্জ্বল ও জমজমাট এই শহরটি এমনভাবে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয় যে, মাত্র গুটি কয়েক লোকই সেখানে দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল। বাজার ও পথ-ঘাটগুলো ছিল মানুষের লাশে পূর্ণ। লাশের এক একটি স্তূপ ছোটখাটো একটি টিলার মত মনে হচ্ছিল। এসব লাশের ওপর বৃষ্টিপাত হলে তা ফুলে আরও বীভৎস আকার ধারণ করে। গোটা শহর ভর্তি গলিত লাশের গন্ধে এলাকার আবহাওয়াই দূষিত হয়ে পড়ে। ফলে চতুর্দিকে মহামারী ছড়িয়ে পড়ে যার বিরূপ প্রতিক্রিয়া সিরিয়া (শাম) পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছে। দূষিত আবহাওয়া ও মহামারীর কারণে আরও বহু লোক মারা যায়। বাগদাদে তখন দুর্ভিক্ষ, মহামারী ও ধ্বংস—এই তিনের রাজত্ব চলছিল।"[২]

মিসরীয় সেনাবাহিনীর মুকাবিলায় তাতারীদের পরাজয়

ইরাক ও সিরিয়া দখলের পর তাতারীদের লক্ষ্য স্বাভাবিকভাবেই মিসরের দিকে ছিল। আর মিসরই ছিল একমাত্র দেশ যা তাতারীদের ধ্বংসযজ্ঞের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছিল। মিসরের সুলতান আল-মালিকুল মুজাফফার সায়ফুদ্দীন কুতুয পরিষ্কার বুঝতে পারছিলেন, এবার নির্ঘাত মিসরের পালা। তাতারীরা যদি আগেভাগেই তার ওপর চড়াও হয়ে বসে তাহলে দেশের স্বাধীনতা বিপন্ন হবে। অতএব, মিসরের অভ্যন্তরে থেকে আত্মরক্ষার পরিবর্তে সম্মুখে অগ্রসর হয়ে শামে তাতারীদের ওপর হামলা পরিচালনা করাটাকেই তিনি সমীচীন মনে করলেন। অনন্তর ৬৫৮ হিজরীর পবিত্র মাহে রমযানের ২৫ তারিখে আয়ন-ই জালূত নামক স্থানে তাতারীদের সঙ্গে মিসরের মুসলিম ফৌজের তীব্র যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং পূর্ব অভিজ্ঞতার বিপরীত এ যুদ্ধে তাতারীদের সম্পূর্ণ পরাজয় ঘটে এবং

তারা পালাতে থাকে। মিসরীয় ফৌজ পলায়নরত তাতারীদের পশ্চাদ্ধাবন করে এবং ব্যাপক হারে তাদের কচুকাটা করে। বিপুল সংখ্যক তাতারী মুসলমানদের হাতে বন্দীও হয়।

সায়ফুদ্দীন কুতুয-এর পর আল-মালিকুজ-জাহির বায়বার্স কয়েকবার তাতারীদের উপর্যুপরি পরাজিত করেন এবং গোটা সিরিয়া এলাকা থেকে তাদেরকে উৎখাত ও বহিষ্কৃত করেন। এভাবে "তাতারীদের পরাজয় অসম্ভব" এই প্রবাদ বাক্যটি মিথ্যায় পর্যবসিত হয়।

মুসলমানদের মুকাবিলায় বিজয়ী, ইসলামের হাতে পরাজিত ও বন্দী

সে যা-ই হোক, তাতারীরা ইরাক থেকে নিয়ে ইরান ও তুর্কিস্তান পর্যন্ত সমগ্র এলাকা দখল করেছিল এবং স্বয়ং রাজধানী বাগদাদ ছিল তাদের দখলে। একটি অর্ধ-বন্য মূর্তিপূজারী জাতিগোষ্ঠীর পক্ষে মুসলিম জাহানের শিক্ষা ও সভ্যতা কেন্দ্রের ওপর দখল জমিয়ে বসে থাকা এমন একটি দুঃখজনক ঘটনা ছিল যার প্রভাব গোটা মুসলিম জাহান, সমগ্র জীবন-যিন্দেগী, সভ্যতা-সংস্কৃতি ও নৈতিকতার ওপর পড়ছিল। মুসলিম জাহানে কোন শক্তি এমন ছিল না যা তাদেরকে ইরাক থেকে বেদখল করতে পারে, উৎখাত করতে পারে। এ সময় ইসলামের আধ্যাত্মিক ও বশীকরণ শক্তির এক মু'জিযা প্রকাশিত হয় এবং কতিপয় অজ্ঞাত পরিচয় মুসলিম দাঈ ও মুসলমান দরবারী আমীর-উমারার মনোযোগ ও চেষ্টার ফলে তাতারী সুলতান ও আমীর-উমারার মধ্যে ইসলামের প্রচার শুরু হয়ে যায়। আর এভাবেই এই অজেয় জাতিগোষ্ঠীকে জয় করে নেয় যারা সমগ্র মুসলিম জাহানকে একবার জয় করে নিয়েছিল। ঐতিহাসিক ইবন কাছীর ৬৯৪ হিজরীর ঘটনাবলী বর্ণনায় লিখেছেন:

"এ বছর চেঙ্গীয খানের প্রপৌত্র কাযান ইবন আরগূন ইব্ন ঈগা ইবন তূলী ইবন চেঙ্গীয খান তাতারীদের বাদশাহ হন এবং আমীর তূযূন (র)-এর হাতে প্রকাশ্যে ইসলাম গ্রহণ করেন। তাতারীরা প্রায় সকলেই বা বেশির ভাগই ইসলামে দীক্ষিত হন। যেদিন বাদশাহ ইসলাম কবুল করেন সেদিন মানুষের ওপর স্বর্ণ-রৌপ্য ও মোতি বর্ষণ করা হয়। বাদশাহ মাহমূদ নাম ধারণ করেন এবং জুমুআ ও খুতবায় শরীক হন। বহু পৌত্তলিক মন্দির তিনি ধ্বংস করেন এবং অমুসলিমদের ওপর জিযয়া কর ধার্য করেন। বাগদাদ ও অপরাপর শহর থেকে লুটকৃত জিনিসপত্র ফেরত দেয়া হয়। লোকেরা তাতারীদের হাতে তসবীহমালা দৃষ্টে আল্লাহ্‌র অপার অনুগ্রহ ও বদান্যতার জন্য শুকরিয়া আদায় করে।"[১]

---

১. আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ১৩ শ খণ্ড, ৩০৪ পৃ.।

মুসলিম জাহানে তাতারী হামলার প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া

তাতারী আক্রমণের ফলে মুসলিম জাহানে এমন এক ধাক্কা লাগে যা সামাল দেবার জন্য বহু সময়ের দরকার ছিল। তাতারী হামলার ফলেই মুসলমানদের চিন্তা শক্তিতে নির্জীবতা ও উদাসীনতা এবং ভবিষ্যতে হতাশা ও স্থবিরতা জন্ম নেয়। এই হামলার ফলে ধর্মীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য, কাব্য, রচনা, নৈতিক চরিত্র ও আচার-আচরণ ও সামাজিকতা সব কিছুর ওপর প্রভাব পড়েছিল। জ্ঞান ও সাহিত্য ভাণ্ডারে নতুন নতুন দিক বিনির্মাণ, সংস্কার, নির্মাণ ও উন্নয়ন সাধনের পরিবর্তে এখন জ্ঞানী-গুণী ও দীন-ধর্মের ধারক-বাহকেরা কোনমতে বর্তমান পুঁজির রক্ষণাবেক্ষণ ও হেফাজতের যুক্তিসম্মত করার চিন্তায় ব্যস্ত হয়ে পড়েন এবং মানব সভ্যতার এ ছিল এক বিরাট দুর্ভাগ্য যে, দুনিয়ার নেতৃত্বের বাগডোর সেই সব মূর্খ ও বন্য জাতিগোষ্ঠীর হাতে গিয়ে পড়েছিল যাদের না ছিল কোন আসমানী ধর্ম আর না তারা কোন জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সভ্যতা-সংস্কৃতিরই মালিক ছিল। তাদের নেতৃত্বাধীনে কোন প্রকার জ্ঞানগত ও ধর্মীয় উন্নতির আশা করা যেতে পারে না। তাদের ইসলাম কবুলের পর যদিও মুসলমানরা তাদের ধ্বংসযজ্ঞ ও রক্তপাতের হাত থেকে নিরাপদ হয়ে গিয়েছিল এবং তাদের ধর্মীয় স্বাধীনতাও মিলেছিল, ইসলাম শাসক শ্রেণীর ধর্ম বনে গিয়ে ছিল, কিন্তু এই সব নও মুসলিম তাতারীদের মধ্যে আর যা-ই হোক, ধর্মীয় ও তত্ত্বগত নেতৃত্ব দেবার এবং ইসলামী ইমামতের যোগ্যতা ও সামর্থ্য ছিল না। এই যোগ্যতা ও সামর্থ্য পয়দা হবার জন্য এক দীর্ঘ সময়ের দরকার ছিল। সেই মুহূর্তে এমন একটি জীবন্ত প্রাণবন্ত উন্নত মনোবলসম্পন্ন মুজাহিদ চরিত্রের অধিকারী জাতিগোষ্ঠীর প্রয়োজন ছিল যারা পতনোন্মুখ মুসলিম জাহানকে সামাল দিতে পারেন, তাদের মধ্যে নতুন জীবন ও নতুন প্রাণ সঞ্চার করতে পারেন এবং মুসলিম জাহানের নেতৃত্বের অপরিহার্য দায়িত্ব পালনের কোশেশ করবেন।

নেতৃত্বের ময়দানে উছমানী তুর্কীদের আগমন

কিছুকাল পরেই হি. ৮ম শতাব্দীতে উছমানী তুর্কীরা ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চে এসে হাজির হয়। তারা দুনিয়াকে সাধারণভাবে ও মুসলমানদের দৃষ্টিকে বিশেষভাবে নিজেদের দিকে সেই সময় আকর্ষণ করে যখন সুলতান মুহাম্মদ ফাতেহ হি. ৮৫৩/খ্রি.১৪৫৩ সালে মাত্র চব্বিশ বছর বয়সে বায়যান্টাইন সাম্রাজ্যের অজেয় রাজধানী কনস্টান্টিনোপল জয় করে নেন। এই ঘটনা মুসলমানদের মধ্যে এক নতুন আবেগ-উচ্ছ্বাস ও উৎসাহ-উদ্দীপনা সৃষ্টি করে। তুর্কীরা যাদের নেতৃত্ব দিচ্ছিল উছমানী রাজবংশ-এর যোগ্য ছিল যে, তাদের

ওপর মুসলিম জাতির নেতৃত্বের ব্যাপারে, মুসলমানদের শক্তিকে আবার নতুন করে ফিরিয়ে আনার ক্ষেত্রে, দুনিয়ার বুকে তাদের হৃত সম্মান ও মর্যাদা পুনরুদ্ধারের ব্যাপারে আস্থা স্থাপন করা হবে। যে কনস্টান্টিনোপল বিগত আট শত বছর ধরে বার বার চেষ্টা করা সত্ত্বেও মুসলমানদের নিকট অজেয় ছিল, তুর্কীরা তা-ই জয় করে। এটা ছিল তাদের পারঙ্গমতা, শক্তি-সামর্থ্য ও সাময়িক উদ্ভাবনী শক্তির চরমোৎকর্ষ লাভেরই প্রমাণবহ। তারা যে সামরিক শক্তি ও সমরোপকরণের ক্ষেত্রে সমকালীন-পৃথিবীর তামাম জাতিগোষ্ঠীর তুলনায় অগ্রগামী ও শ্রেষ্ঠ ছিল এটা ছিল তার সুস্পষ্ট প্রমাণ। অধিকন্তু তাদের মধ্যে এই সামর্থ্যও বিদ্যমান ছিল যে, তারা তাদের লক্ষ্য হাসিলের নিমিত্ত জ্ঞান ও কর্মের শক্তি ও ইজতিহাদের দ্বারা কাজ নিতে পারে এবং জাতির যিনি নেতৃত্ব দেবেন তার জন্য এ সমস্ত গুণ থাকা অপরিহার্য শর্তও বটে।

পাশ্চাত্য লেখক Baron Carra de Vaux তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ Islamic Thinkers-এর ১ম খণ্ডে সুলতান মুহাম্মদ ফাতেহ্ সম্পর্কে লিখতে গিয়ে বলেন:

"The victory of Mohammad, the Conqueror, was not a gift of fortune or the result of the Eastern Empire having grown weak, The Sultan had been preparing for it for a long time. He had taken advantage of all the existing scientific knowledge. The connon had just been invented and he decided to equip himself with the biggest cannon in the world and for this he acquired the services of a Hungarian engineer who constructed a connon that could fire a ball weighing 300 K.G's to a distance of one mile. It is said that this cannon was pulled by 700 men and took two hours to be loaded, Muhammad marched upon Constantiople with 3,00,000 soldiers and a strong artillery. His fleet, which besieged the city from the sea, consisted of 120 warships, By great ingenuity the Sultan resolved to send a part of his fleet by land. He launched seventy ships into the sea from the direction of Qasim Pasha by carrying them over wooden boards upon which fat had been applied (to make them slippery.)

"এই বিজয় কেবল ভাগ্যের জোরে কিংবা আকস্মিকভাবে হঠাৎ করে অর্জিত হয়নি। আর এর কারণ কেবল বায়যান্টাইন সাম্রাজ্যের দুর্বলতাই ছিল না। আসল কারণ ছিল এই, সুলতান (মুহাম্মদ) অনেক আগে থেকেই এর জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করছিলেন এবং তাঁর যুগে জ্ঞান-বিজ্ঞানের যতগুলো শক্তি ছিল সে সবের সাহায্য নিচ্ছিলেন। সে সময় নতুন নতুন কামান আবিষ্কৃত হচ্ছিল। তিনি সে যুগে যত বড় বিরাট ও শক্তিশালী কামান তৈরি করা সম্ভব তার জন্য চেষ্টা চালান। এজন্য তিনি হাঙ্গেরীর জনৈক ইঞ্জিনিয়ারকে কাজে লাগান। তিনি সুলতানের চাহিদানুযায়ী এমন একটি কামান তৈরি করেন যার সাহায্যে তিনশ

কিলোগ্রাম ওজনের গোলা এক মাইল দুরে নিক্ষেপ করা যেত। কথিত আছে, এই কামান টেনে নেবার জন্য সাত শত লোকের প্রয়োজন পড়ত এবং এতে গোলা ভর্তির জন্য দু'ঘণ্টা সময়ের দরকার হত। সুলতান মুহাম্মদ ফাতেহ যখন কনস্টান্টিনোপল বিজয়ের জন্য বহির্গত হন তখন তিন লক্ষ সৈন্য তাঁর অধীনে ছিল আর ছিল বিপুল সংখ্যক শক্তিশালী কামান বহর। একশ' বিশটি জাহাজসম্বলিত তাঁর নৌবহর কনস্টানিনোপলকে সমুদ্রের দিকে থেকে অবরোধ করে রেখেছিল। তিনি তাঁর আবিষ্কার ও উদ্ভাবনী শক্তির সাহায্যে সিদ্ধান্ত নেন সামরিক বহরের একটি অংশ স্থলভাগ দিয়ে উপসাগর পর্যন্ত টেনে নিয়ে যাওয়া হবে। এ উদ্দেশে তিনি কাঠের গুড়িগুলোকে চেঁছে-ছুলে তার ওপর চর্বি মাখিয়ে তার ওপর দিয়ে জাহাজ বহর টেনে নেওয়ার ব্যবস্থা করেন। আর এভাবে কাসেম পাশার অধীনে ৭০টি জাহাজ সমুদ্রে ভাসিয়েছিলেন।"

সুলতান মুহাম্মদ ফাতেহ সম্পর্কে য়ূরোপ এতটা ভীত ও সন্ত্রস্ত ছিল যে, তাঁর ইনতিকালে রোমের পোপ আনন্দ উৎসব করার নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং তিন দিন অব্যাহতভাবে কৃতজ্ঞতাস্বরূপ ঈশ্বরের উদ্দেশে প্রার্থনা করার নির্দেশ জারী করেছিলেন।[১]

তুর্কীদের বৈশিষ্ট্য

তুর্কী মুসলমানদের মধ্যে এমন কিছু বৈশিষ্ট্য ছিল যদ্দরুন তারা মুসলমানদের নেতৃত্ব দেবার অধিকার রাখত। তাঁদের সে বৈশিষ্ট্যগুলো ছিল নিম্নরূপ:

(১) তারা ছিল উন্নত মনোবলসম্পন্ন, উৎসাহদীপ্ত ও প্রাণপ্রাচুর্যে ভরা একটি জীবন্ত জাতি যাদের মধ্যে জিহাদী রূহ সক্রিয় ছিল এবং যারা বেদুঈন যিন্দেগী ও সহজ সরল ও অনাড়ম্বর জীবনের কাছাকাছি অবস্থানের কারণে তাদের নৈতিক, চারিত্রিক ও সামাজিক রোগ-ব্যাধির হাত থেকে নিরাপদ ছিল যেসব রোগে প্রাচ্য ভূখণ্ডের অন্যান্য মুসলিম জাতিগোষ্ঠী আক্রান্ত হয়ে দুর্বল হয়ে পড়েছিল।

(২) তাদের কাছে এমন সামরিক শক্তি ছিল যা দিয়ে তারা ইসলামের বস্তুগত ও আধ্যাত্মিক প্রাধান্য কেবল বজায় রাখতেই নয়, বরং চতুর্দিকে ছড়িয়ে দিতে এবং প্রতিদ্বন্দ্বী ও প্রতিপক্ষ জাতিগুলোর আগ্রাসন প্রতিরোধ করতে পারে এবং দুনিয়ার নেতৃত্বের আসনে সমাসীন হতে পারে। একই সময় উছমানী সালতানাত তিনটি মহাদেশ অর্থাৎ এশিয়া, আফ্রিকা ও য়ূরোপের বুকে রাজত্ব

১. ফালসাফা-ই তারীখুল ইসলামী, মুহাম্মদ জামীল বেইহামকৃত, ২৭৪ পৃ. ;

করত। মুসলিম প্রাচ্য ইরান থেকে শুরু করে মরক্কো অবধি তাদের অধীন ছিল। এশিয়া মাইনরও তারা পদানত করেছিল এবং য়ূরোপে অগ্রাভিযান চালিয়ে তারা ভিয়েনার দোরগোড়ায় পৌঁছে গিয়েছিল। ভূ-মধ্যসাগরের ওপর ছিল তাদের একচ্ছত্র আধিপত্য। এর ওপর অন্য কোন জাতি কিংবা সাম্রাজ্যের কোন প্রভাব ছিল না।

রুশ সম্রাট পিটার দি গ্রেট-এর আস্থাভাজন এক বন্ধু একবার কনস্টান্টিনোপল থেকে সম্রাটকে লিখেছিলেন যে, সুলতান কৃষ্ণসাগরকে নিজের ব্যক্তিগত বা ঘরোয়া সম্পদ মনে করেন যেখানে অন্য কারুর প্রবেশাধিকার নেই। তুর্কী নৌবহরের মুকাবিলা সমগ্র য়ূরোপ মিলেও করতে পারত না। ৯৪৫ হি/ ১৫৪৭ খ্রি. পোপের আহ্বানে ভেনিস, স্পেন, পর্তুগাল ও মাল্টার সম্মিলিত নৌবহর তুর্কী নৌবহরকে পর্যুদস্ত করার প্রয়াস পায়, কিন্তু নিদারুণভাবে পরাজিত হয়। সুলতান সুলায়মানের শাসনামলে কি স্থলভাগে আর কি জলভাগে, সর্বত্র তুর্কীদের রাজনৈতিক ও আধ্যাত্মিক প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হয়। তাঁর আমলে উছমানী সালতানাতের সীমানা উত্তরে সাভা দরিয়া, দক্ষিণে নীল নদের উৎস মুখ ও ভারত মহাসাগর, পূর্বে ককেশাস পর্বতমালা ও পশ্চিমে আটলাস পর্বত পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল। তাঁর শাসনাধীন এলাকা চার লক্ষ বর্গমাইল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তুর্কী নৌবহরে তখন তিন হাজার সামরিক জাহাজ। একমাত্র রোম ছাড়া প্রাচীন আমলের প্রায় সব বিখ্যাত শহরই ছিল তুর্কী সুলতানদের অধীন।[১]

সমগ্র য়ূরোপ তুর্কীদের ভয়ে কাঁপত। তাদের বড় বড় রাজা-বাদশাহরা তুর্কী সুলতানদের আশ্রয়ে থাকাকেই বেশি নিরাপদ ভাবত। তাদের সম্মানে গির্জায় ঘন্টা ধ্বনি থেমে যেত।

(৩) আন্তর্জাতিক নেতৃত্বের উপযোগী সর্বোত্তম কৌশলগত ভৌগোলিক কেন্দ্রও ছিলো তাদের হাতে। তারা বলকান উপদ্বীপ থেকে একই সময় এশিয়া ও য়ূরোপের খবরদারি করতে পারত। তাদের রাজধানী ছিল কৃষ্ণসাগর ও মর্মর সাগরের মধ্যবর্তী এলাকায় এবং য়ূরোপ ও এশিয়ার সঙ্গমস্থলে। ফলে একই সাথে তিন তিনটি মহাদেশের (য়ূরোপ, এশিয়া ও আফ্রিকা) খবরদারির জন্য এটাই ছিল সর্বোত্তম রাজধানী। তাই নেপোলিয়ন একবার বলেছিলেন ঃ

"If a World-Government ever came to be established, Constantinople alone would be an ideal capital for it."

অর্থাৎ যদি কোন দিন সমগ্র বিশ্বব্যাপী এক অখণ্ড সাম্রাজ্য কায়েম হয় তবে এর রাজধানী হিসেবে কনস্টান্টিনোপলই হবে সর্বোত্তম স্থান।

---

১. ফালসাফা-ই তারীখুল ইসলামী, মুহাম্মদ জামীল বেইহামকৃত, ২৮০-১ পৃ.।

তুর্কীদের অবস্থান ছিল সেই য়ূরোপ ভূখণ্ডে নিকট ভবিষ্যতে যে ভূখণ্ডটি বিরাট গুরুত্ব ও অবস্থানগত মর্যাদা লাভ করতে যাচ্ছিল। জীবনের শক্তি-সামর্থ্য ও উন্নতি-অগ্রগতির যাবতীয় উপাদান-উপকরণ তার মধ্যে উথাল-পাতাল করছিল। যদি আল্লাহ্ পাক তৌফিক দিতেন তাহলে তুর্কীদের পক্ষে ইল্‌ম ও আক্‌ল তথা জ্ঞান-বিজ্ঞান ও বুদ্ধিবৃত্তির ময়দানে অগ্রসর হয়ে য়ূরোপের খ্রিস্টান জাতিগোষ্ঠীর বিজয়ী হয়ে বিশ্ব নেতৃত্বের বাগডোর হাতে তুলে নেবার আগেই বিশ্ব নেতৃত্বের আসনে সমাসীন হয়ে গোটা দুনিয়াকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচানো এবং তাকে সত্য ও হেদায়েতের প্রশস্ত মনযিল অভিমুখে পরিচালিত করা সম্ভব ছিল-যে সত্য ও সুস্পষ্ট দিক-নির্দেশনা (হেদায়েত)-এর উজ্জ্বল আলোকবর্তিকা তারা ইসলামের বদৌলতে লাভ করেছিল।

তুর্কীদের অধঃপতন

কিন্তু তুর্কী জাতির বরং মুসলিম জাতির ততোধিক দুর্ভাগ্য যে, উন্নতি-অগ্রগতি ও উত্থান যুগেই তুর্কীদের পতন শুরু হয়ে যায় এবং প্রাচীন জাতিগুলোর পুরাতন রোগ-ব্যাধিতে তারাও আক্রান্ত হয়ে পড়ে। তাদের পরস্পরের ভেতর হিংসা-বিদ্বেষ ও পরশ্রীকাতরতা দেখা দিল। সুলতান স্বেচ্ছাচারী হয়ে উঠতে লাগলেন। শাসকদের প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা বিগড়ে যায়। চারিত্রিক অধঃপতন শুরু হয়ে যায়। প্রশাসকবৃন্দ ও সিপাহসালার জাতি ও সাম্রাজ্যের সঙ্গে বেঈমানী ও গাদ্দারী করতে থাকে। জাতির মধ্যে আরামপ্রিয়তা ও আয়েশী জীবনের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি হতে থাকে। মোটের ওপর পতনোন্মুখ জাতির সর্বপ্রকার দোষ-ত্রুটি সৃষ্টি হয়ে যায় যে সবের বিস্তারিত বিবরণ তুর্কিদের ইতিহাস গ্রন্থগুলোতে মিলবে। এখানে সেসব পেশের সুযোগ নেই।[১]

তুর্কী জাতির স্থবিরতা ও পশ্চাদ্‌পদতা

সবচে' বড় যে রোগটি তুর্কীদের মধ্যে দেখা দিয়েছিল তা হল জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিক্ষা ক্ষেত্রে জড়তা ও স্থবিরতা এবং সমরশাস্ত্র, সামরিক সংগঠন ও উন্নতি-অগ্রগতির ক্ষেত্রে তারা বেমালুম ভুলে গিয়েছিল কুরআন মজীদের আয়াতঃ

وَاَعِدُّوْا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ قُوَّةٍ وَّمِنْ رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُوْنَ بِهٖ عَدُوَّ اللّٰهِ وَعَدُوَّكُمْ وَاٰخَرِيْنَ مِنْ دُوْنِهِمْ لَا تَعْلَمُوْنَهُمْ ـ اَللّٰهُ يَعْلَمُهُمْ ـ

"তোমরা তাদের মুকাবিলার জন্য যথাসাধ্য শক্তি ও অশ্ব-বাহিনী প্রস্তুত রাখবে; এর দ্বারা তোমরা সন্ত্রস্ত করবে আল্লাহ্‌র শত্রুকে, তোমাদের শত্রুকে এবং

১. ফালসাফা-ই তারীখুল ইসলামী, মুহাম্মদ জামীল বেইহামকৃত, ২৮০-১ পৃ.।

এ ছাড়া অন্যদেরকে যাদেরকে তোমরা জান না। আল্লাহ তাদেরকে জানেন।" (সূরা আনফাল : ৬০)

এবং মহানবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের এই বাণীও যেন তাদের স্মৃতি থেকে হারিয়ে গিয়েছিল ঃ الحكمة ضالة المؤمن حيث وجدها فهو احق بها "প্রজ্ঞা মু'মিনের হারানো সম্পদ: যেখানে তা পাবে সেই হবে তার সর্বাধিক হকদার।"[১] এমতাবস্থায় যখন তারা য়ূরোপের প্রতিদ্বন্দ্বী রাষ্ট্রসমূহ ও জাতি-গোষ্ঠীগুলোর মাঝে ঘেরাও অবস্থায় ছিল তখন তাদের মিসর বিজয়ী হযরত আমর ইবনু'ল-আস (রা)-এর সেই উপদেশ সব সময় স্মরণ রাখা দরকার ছিল যা তিনি মিসরের মুসলমানদের দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, "তোমরা কখনো এ কথা ভুলবে না, তোমরা কিয়ামত অবধি বিপদের মুখোমুখী অবস্থায় রয়েছে এবং এক গুরুত্বপূর্ণ পথের প্রান্তদেশের ওপর দাঁড়িয়ে আছ। এজন্য তোমাদেরকে সব সময় হুঁশিয়ার থাকতে হবে, সদাসতর্ক থাকতে হবে, সশস্ত্র অবস্থায় থাকতে হবে। কেননা তোমাদের চতুর্দিকে শত্রু। তাদের শ্যেন দৃষ্টি রয়েছে তোমাদের ওপর, তোমাদের দেশের ওপর।"

কিন্তু নিতান্তই আফসোসের বিষয়, তুর্কীরা নিশ্চিন্তে বসে রইল। স্বস্থানে নিশ্চেষ্ট গয়ে আসন গেড়ে রইল। অপর দিকে য়ূরোপীয় জাতিগোষ্ঠী কোথা থেকে কোথায় গিয়ে পৌঁছল।

প্রখ্যাত তুর্কী মনীষী খালেদা এদীব খানম তুর্কীদের এই জ্ঞান ও শিক্ষারাজ্যের স্থবিরতা সম্পর্কে অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় বিবৃত করেছেন। তিনি বলেনঃ

"পৃথিবীর ওপর যতদিন মুতাকাল্লিম (কালামশাস্ত্রবিদ)-দের দর্শনের নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব ছিল তুরস্কের জ্ঞানী-গুণী ও উলামায়ে কিরাম নিজেদের কাজ নেহায়েত সুন্দরভাবে আঞ্জাম দিতে থাকেন। সুলায়মানিয়া মাদরাসা ও সুলতান মুহাম্মদ ফাতেহ মাদরাসা সে সময় প্রচলিত সকল জ্ঞান-বিজ্ঞান ও বিষয় শাস্ত্রের কেন্দ্র ছিল। কিন্তু পাশ্চাত্য জগত কালাম শাস্ত্রের শেকল ভেঙে নতুন জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ভিত্তি স্থাপন করল যা দুনিয়ার জীবনে এক বিপ্লব সৃষ্টি করেছিল তখন আলিম-উলামা সম্প্রদায় শিক্ষকতার দায়িত্বপালনের আর যোগ্য রইলো না। তারা মনে করতেন যে, ত্রয়োদশ শতাব্দীতে জ্ঞান-বিজ্ঞান যেই অবস্থানে ছিল সেখান থেকে তা আর এক-কদমও সামনে অগ্রসর হয়নি। এ ধরনের ধারণা উনবিংশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত তাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় জেঁকে বসে থাকে। তুরস্ক এবং অপরাপর মুসলিম দেশগুলোর আলিম-উলামার এ ধরনের ধ্যান-ধারণা ইসলামী প্রেরণার সঙ্গে কোনরূপ সম্বন্ধ রাখে না। কালাম শাস্ত্রীয় দর্শন কিংবা ইলমে

১. তিরমিযী-ইলম: হাদীস ২৮২৭।

কালাম চাই তা খ্রিস্টানদের হোক অথবা মুসলমানদের– গ্রীক দর্শনের ওপর স্থাপিত। এর ওপর কমবেশি এরিস্টোটলের চিন্তা-ভাবনা ও ধ্যান-ধারণা প্রভাব জাঁকিয়ে আছে। এরিস্টোটলের এই দর্শন ছিল পৌত্তলিক দর্শন। এখানে আমরা সংক্ষিপ্তভাবে খ্রিস্টান পণ্ডিত ও মুসলিম আলিম-উলামার চিন্তাধারা ও পদ্ধতির পারস্পরিক তুলনার প্রয়োজন অনুভব করছি।

"কুরআনুল করীমে প্রাকৃতিক জগত সৃষ্টি সম্পর্কে কোথাও বিস্তারিতভাবে আলোচনা নেই। এর শিক্ষায় বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে নৈতিক ও সামাজিক জীবনের ওপর। এর বিশেষ লক্ষ্য হল ভাল-মন্দ এবং কল্যাণ ও অকল্যাণের মধ্যে প্রভেদ তুলে ধরা। কুরআনুল করীম পৃথিবীর মানুষদের জন্য একটি কর্ম-বিধান একটি জীবন-বিধান নিয়ে এসেছে। মৃত্যু পরবর্তী জীবন ও আধ্যাত্মিক বিষয়াদি সম্পর্কে যা কিছু এতে বলা হয়েছে সেখানেও কোন প্রকার জটিলতা কিংবা ঘোরপ্যাঁচ নেই। এর বুনিয়াদী শিক্ষা হলো তৌহীদের শিক্ষা, একত্ববাদের শিক্ষা। আর এজন্যই ইসলাম অত্যন্ত সহজ সরল ধর্ম এবং ইসলামে অপর ধর্মের তুলনায় প্রকৃতিগত সম্পর্কে নতুন চিন্তাধারা ও দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করার অনেক বেশি অবকাশ ছিল। কিন্তু অনাড়ম্বর, সহজ সারল্য ও বিস্তৃত দৃষ্টিভঙ্গি যা নতুন জ্ঞানগত গবেষণার জন্য এতটা অনুকূল হওয়া সত্ত্বেও মুসলমানদের মধ্যে বেশি দিন থাকতে পারে নি। নবম শতাব্দীর আলিম-উলামা ও কালামশাস্ত্রবিদগণ কেবল ফিক্হ শাস্ত্রকেই নয় বরং ঐশী দর্শন তথা ধর্মতত্ত্বকেও মূলনীতি ও আইনের শেকলে বেঁধে ফেলে। ফলে গবেষণা ও ইজতিহাদের দরজা বন্ধ হয়ে গেল। ঠিক সে সময় মুসলিম দর্শনের মধ্যে এরিস্টোটলীয় দর্শন ও ধ্যান-ধারণা অনুপ্রবিষ্ট হয়।

"এর বিপরীতে খ্রিস্ট ধর্মে যাকে ঈসা মসীহ (আ)র ধর্ম না বলে সেন্ট পলের ধর্ম বলাই অধিকতর সঙ্গত– পৃথিবী সৃষ্টির ভেতর প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের বিস্তারিত ব্যাখ্যা বর্তমান। খ্রিস্টানরা একে আল্লাহ্র বাণী হিসেবে স্বীকার করে নিয়েছিল। এজন্য তাদের ওপর এই দায়িত্ব বর্তাত যে, এই বিশ্ব সৃষ্টির ব্যাখ্যার সত্যতা তারা প্রমাণ করবে। এই মনগড়া ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে পর্যবেক্ষণ লব্ধ সত্য তাদের ব্যাখ্যা সমর্থন করত না। এ জন্যই তাদেরকে প্রমাণপঞ্জীর সাহায্য গ্রহণ করতে হয়। দার্শনিক এরিস্টোটলের দ্বারস্থ তাদেরকে এ জন্যই হতে হয় যে, তাদের যুক্তি ইন্দ্রজালের বেশি কিছু ছিল না।

"পাশ্চাত্য জগত যখন প্রকৃতির অধ্যয়ন পর্যবেক্ষণ, অভিজ্ঞতা ও আলোচনা-পর্যালোচনার মাধ্যমে করতে শুরু করল তখন গির্জার পোপ-পাদরীদের হুশ-জ্ঞান লোপ পাবার দশা। এদিকে নতুন জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রক্রিয়ার সাদৃশ্য বড় বড় আবিষ্কার-উদ্ভাবন হতে লাগল আর ওদিকে খ্রিস্টান পণ্ডিতদের মনে ভীতির সৃষ্টি হলো যে, এবার গির্জার রাজত্ব শেষ হবার পালা।

অনন্তর পাশ্চাত্য জগতে এমন এক যুগের সূচনা হলো যে যুগে বড় বড় বিজ্ঞানী যারা প্রকৃতি জগতের গণ্ডীর মধ্যে থেকে গবেষণায় মগ্ন ছিলেন– হত্যা করা হতো।

ধর্ম ও বিজ্ঞানের এই রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের পর শেষ পর্যন্ত খ্রিস্টান গির্জাকেই আপোষকামিতার আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়। গির্জা তার স্কুল ও ধর্মীয় পাঠশালা-গুলোর সিলেবাসে বিজ্ঞানকে অন্তর্ভুক্ত করে। এর বিশ্ববিদ্যালয়গুলো, যা আগে একেবারেই ইসলামী মাদরাসাগুলোর মতই ছিল বিজ্ঞান ও আধুনিক জ্ঞানের বিভিন্ন শাখার কেন্দ্রে পরিণত হয়। কিন্তু এরই সাথে সাথে সে ইন্দ্রিয়াতীত দর্শনকেও পরিত্যাগ করেনি। ফল হলো এই যে, গির্জার প্রভাব শিক্ষিত শ্রেণীর ওপর ন্যুনতম পক্ষে একটি অংশের ওপর বহাল থাকে। ক্যাথলিক ও প্রোটেস্টান্ট পাদরীরা জ্ঞান-বিজ্ঞানের এই নতুন শাখাগুলোতে পারদর্শী হতেন এবং নতুন যুগের যুবকদের সঙ্গে যে কোন বিষয়ে আলোচনা করতে পারতেন।

"উছমানীদের এখানে আলিম-উলামার অবস্থা ছিল সম্পূর্ণ উল্টো। তারা আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানে শিক্ষা লাভের প্রতি আদৌ দৃকপাত করে নি বরং নতুন চিন্তাধারা ও ধ্যানধারণা তাদের শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রবেশ করতে দেয়নি। যতদিন পর্যন্ত মুসলিম মিল্লাতের শিক্ষার চাবিকাঠি তাদের হাতে ছিল ততদিন সাধ্য কিযে নতুন কোন কিছু এর কাছে ঘেষে। ফল দাঁড়াল এই যে, তাদের জ্ঞানের ওপর স্থবিরতা ও জড়তা জেঁকে বসে। এদিকে পতন যুগে তাদের রাজনৈতিক ব্যস্ততা এতটা বৃদ্ধি পায় যে, পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতার ঝামেলায় জড়াবার মত তাদের ফুরসত ছিল না। সোজা প্রেসক্রিপশন ছিল এই যে, এরিস্টোটলের দর্শনের ওপর আসন গেড়ে বস এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের বুনিয়াদ দলীল-প্রমাণের ওপর থাকতে দাও। অনন্তর ইসলামী মাদরাসাগুলোর ঊনবিংশ শতাব্দীতেও সেই রঙই টিকে থাকে যা ছিল ত্রয়োদশ শতাব্দীতে।"

মুসলিম বিশ্বের সাধারণ বুদ্ধিবৃত্তিক ও জ্ঞানগত অধঃগতি

জ্ঞানগত জড়তা ও স্থবিরতা এবং বুদ্ধিবৃত্তিক পশ্চাদপদতা সে সময় কেবল তুর্কীদের শিক্ষিত, বুদ্ধিজীবী ও ধর্মীয় মহলেরই বৈশিষ্ট্য ছিল না, বরং পূর্ব প্রান্ত থেকে পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত সমগ্র মুসলিম বিশ্বই এক জ্ঞানগত বিপর্যয়ের শিকার ছিল। তাদের মস্তিষ্ক ক্লান্ত ও অবসাদগ্রস্ত এবং তাদের স্বভাব-প্রকৃতি নিভু নিভু প্রায় দৃষ্টিগোচর হতো। জড়তা ও বিষণ্নতা সমগ্র মুসলিম বিশ্বের আকাশকে ছেয়ে রেখেছিল। আমরা যদি সতর্কতার সাথে অষ্টম শতাব্দী থেকে এই বুদ্ধিবৃত্তিক পশ্চাদ্পদতার সূচনা না ধরি, তবুও এতে কোনই সন্দেহ নেই যে, হিজরী ৯ম শতাব্দীই ছিল শেষ শতাব্দী যখন চিন্তার ক্ষেত্রে নতুনত্ব, ইজতিহাদী তথা উদ্ভাবনী শক্তি এবং সাহিত্যে, কাব্যে, দর্শনে ও শিল্পকলায় শ্রেষ্ঠত্ব ও সৃষ্টিশীলতার

চিহ্ন চোখে পড়ে। এটাই ছিল সেই শতাব্দী যেই শতাব্দীতে ইবনে খালদূনের মুকাদ্দিমার ন্যায় গ্রন্থ মুসলিম জাহান লাভ করে। হি. ১০ম শতাব্দীতে অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে উদাসীনতা ও নির্জীবতা, অন্ধ আনুগত্য তথা তাকলীদ ও অনুকরণের চিহ্ন দৃষ্টিগোচর হয়। এই উদাসীনতা ও পশ্চাৎপদতা কোন বিশেষ শাখা বা কোন বিশেষ শাস্ত্রের সঙ্গে নির্দিষ্ট ছিল না। ধর্মীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান, কাব্য, সাহিত্য, রচনা, ইতিহাস, শিক্ষা পাঠক্রম ও শিক্ষা ব্যবস্থা সব কিছুই কমবেশি এর দ্বারা প্রভাবিত দৃষ্টিগোচর হয়। বিগত শতাব্দীগুলোর আলিম-উলামার আলোচনা ও জীবনী গ্রন্থসমূহ পাঠ করুন, শত শত নামের মধ্যে এমন একজনের নাম মেলা ভার হবে যাঁকে ক্ষণজন্মা প্রতিভা হিসাবে আখ্যায়িত করা চলে কিংবা যিনি কোন বিষয়ে নতুন কিছু পেশ করেছেন অথবা জ্ঞান-বিজ্ঞানের কোন বিশেষ শাখায় কোন মূল্যবান সংযোজন ঘটিয়েছেন। বিগত শতাব্দীগুলোতে আমরা কয়েকজনকে এর বাইরে রাখতে পারি যাঁরা নিজেদের যুগে সাধারণ শিক্ষাগত ও বুদ্ধিবৃত্তিক মানের দিক দিয়ে বহু উর্ধ্বে অবস্থান করতেন, যারা ধর্মীয় ক্ষেত্রে কিংবা শিক্ষার ময়দানে বিরাট কোন বিপ্লবাত্মক অবদান রেখেছেন অথবা জ্ঞানের জগতে যুগান্তকারী কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। সৌভাগ্যের বিষয়, ব্যতিক্রমী এই মনীষিগণের সকলেই ভারতীয় উপমহাদেশের। এঁদের অন্যতম হযরত শায়খ আহমদ সরহিন্দী মুজাদ্দিদ আলফেছানী মৃ. ১০৩৪ হি.) যাঁর লিখিত মকতূবাত (পত্র সংকলন) ইসলামের ইলমী ও ধর্মীয় পুঁজির ভাণ্ডারে এক মূল্যবান সংযোজন ঘটিয়েছে এবং যিনি সমগ্র মুসলিম জাহানের ওপর গভীর প্রভাব ফেলেছেন। দ্বিতীয় জন হলেন হযরত শাহ ওলীউল্লাহ মুহাদ্দিছ দেহলভী (মৃ. ১১৭৬ হি.) যাঁর লিখিত হুজ্জাতুল্লাহিল-বালিগা, ইযালাতুল খিফা, আল-ফাওযুল-কাবীর ও রিসালাতুল-ইনসাফ নামক গ্রন্থ স্ব স্ব ক্ষেত্রে একক ও অনন্য। তৃতীয়জন তাঁরই পুত্র শাহ রফীউদ্দীন দেহলভী (মৃ. ১২৩৩ হি.) যাঁর 'তাকমীলুল আযহান' ও 'রিসালা আস্‌রারুল মুহব্বত' নামক গ্রন্থ কতক বিষয়ে নতুন চিন্তা ও ধ্যান-ধারণা পেশ করেছে। চতুর্থ জন হযরত শাহ ইসমাঈল শহীদ দেহলভী (মৃ. ১২৪৬ হি.) যাঁর 'মানসাবে ইমামত' ও 'আবাকাত' নামক দু'টি গ্রন্থ ইজতিহাদী গ্রন্থের মর্যাদা দাবি করতে পারে এবং স্ব-স্ব বিষয়বস্তুর ওপর অতুলনীয় গ্রন্থ। তেমন ফিরিঙ্গী মহলের খান্দান ও যূরোপের কোন কোন শিক্ষাক্রমের ধারা আপন মেধা ও সৃষ্টিকুশলতার ক্ষেত্রে খুবই বিশিষ্ট দেখতে পাওয়া যায় এবং তাঁরা তাদের সমকালীন শিক্ষিত মহলের ওপর গভীর প্রভাব ফেলেছেন। কিন্তু তাঁদের মেধা ও পাণ্ডিত্য পাঠ্যসূচীর সীমা খুব কমই অতিক্রম করে।

কেবল ধর্মীয় জ্ঞানের ক্ষেত্রেই নয়, কাব্য ও সাহিত্যও তার পেলবতা ও সজীবতা হারিয়ে ফেলেছিল এবং এসবের ওপরও তাকলীদ তথা অন্ধ অনুকরণপ্রিয়তা জেঁকে বসেছিল। রচনা ও গদ্য সাহিত্যকেও কৃত্রিমতা, লৌকিকতা, ছন্দের তাবেদারী, শব্দের কচকচানি ও অলংকার বাহুল্য নিষ্প্রাণ ও নিষ্প্রভ করে দিয়েছিল। বন্ধুদের কাছে লিখিত পত্র, ইতিহাস গ্রন্থ ও দাফতরিক লেখালেখি ও ফরমানগুলোও এই সব দোষ-ত্রুটি থেকে মুক্ত ছিল না। কোথাও কোথাও সাহিত্য ও রচনার এমন কোন নমুনা পাওয়া যেত যা সে যুগের সাধারণ রুচি থেকে স্বতন্ত্র ও নীচু মানের চেয়ে কিছুটা উন্নত দৃষ্টিগোচর হয়।

মাদরাসাগুলো ও অন্যান্য বিদ্যালয়গুলোও কঠিন জড়তা ও অন্ধ আনুগত্যের শিকার এবং এক ধরনের জ্ঞানগত ও চিন্তাগত পতনের হাতে বন্দী দেখতে পাওয়া যায়। প্রাচীন যুগের আলিমগণের জ্ঞান-বিদ্যামণ্ডিত ও রুচি-সম্বলিত কিতাবগুলো পাঠ্যসূচী থেকে ক্রমান্বয়ে বাদ দেওয়া হয়। সেগুলোর স্থলে পরবর্তী যুগের আলিমগণের লিখিত ইজতিহাদী মর্যাদায় অনুত্তীর্ণ কিতাবাদি পাঠ্যসূচী ভুক্ত হয়। এসব গ্রন্থের লেখকরা ছিলেন পূর্ববর্তী যুগের আলিমগণের নিছক অন্ধ অনুকরণকারী, পাদটীকা রচয়িতা ও ভাষ্যকার। ফলে মতন তথা মূলপাঠের স্থান দখল করে টীকা-ভাষ্য যে সবের রচনায় ঐ সব লেখক গ্রন্থকার কাগজ সম্পর্কে অত্যন্ত মিতব্যয়িতার আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন এবং সাধারণের পক্ষে বোধগম্য ও প্রাঞ্জল সুস্পষ্ট ভাষা ব্যবহারের পরিবর্তে ইশারা-ইঙ্গিত ও সূক্ষ্ম রহস্যপূর্ণ ভাষা ব্যবহার করেছিলেন। এ সবের থেকে সেই জ্ঞানগত ও বুদ্ধিবৃত্তিক পতনের পরিমাপ করা যাবে যা সমগ্র মুসলিম জাহানের ওপর ছেয়ে ছিল এবং যা থেকে তার কোন দিক ও জীবনের কোন শাখাই মুক্ত থাকে নি।

তুর্কীদের সমসাময়িক প্রাচ্য সাম্রাজ্য

উছমানী সালতানাতের সমকালীন ও সমকক্ষ প্রাচ্যে দু'টো শক্তিশালী হুকুমত ছিল তন্মধ্যে ভারতবর্ষে মোগল সাম্রাজ্য এদের অন্যতম। ৯৩৩ হি./১৫২৬ খি. সম্রাট বাবর তাঁর শক্তিশালী হাতে এই সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করেন। সুলতান ১ম সলীম-এর তিনি ছিলেন সমসাময়িক। বাবরের পর একের পর এক কয়েকজন শক্তিশালী সম্রাট দিল্লীর মোগল সিংহাসনে আরোহণ করেন। তুর্কী সালতানাতের পর প্রাচ্যে এটাই ছিল সর্ববৃহৎ ও শক্তিশালী সাম্রাজ্য। এই বংশের সর্বশেষ শক্তিশালী সম্রাট ছিলেন সম্রাট আওরঙ্গযীব আলমগীর যিনি সাম্রাজ্যের ব্যাপ্তি ও বিস্তৃতি, বিজয়ের আধিক্য, দীনদারী ও ধর্মীয় জ্ঞানবত্তার দিক দিয়ে ভারতবর্ষের সমগ্র মুসলিম ইতিহাসে বিশেষ বৈশিষ্ট্যের দাবিদার।

আওরঙ্গযীব নব্বই বছরের অধিককাল আয়ু পেয়েছিলেন এবং একাদিক্রমে পঞ্চাশ বছর রাজত্ব করেন। হি. ১১১৮ সালে খ্রিস্টীয় অষ্টাদশ শতকের প্রথম ভাগে তিনি ইনতিকাল করেন। যুগটা ছিল য়ূরোপের পুনর্জাগরণ, জাতিগঠন ও উন্নতি-অগ্রগতির জন্য বিশেষভাবে খ্যাত। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, আওরঙ্গযীব পরবর্তী সকল মোগল বাদশাহই অযোগ্য, দুর্বল ও আরামপ্রিয় প্রমাণিত হওয়ায় তাদের পক্ষে য়ূরোপের পক্ষ থেকে আগত বিপদ-আপদের মুকাবিলা এবং মুসলিম উম্মাহর হেফাজত করাতো দূরে থাক, আপন দেশ ও সাম্রাজ্যও তারা রক্ষা করতে সক্ষম হয়নি। শেষ পর্যন্ত নিজেদের অযোগ্যতা, দুর্বলতা ও অনৈক্যের কারণে ইংরেজ শাসনের প্রতিষ্ঠা ঘটে এবং সুসংহত হয়। সেই সাথে ইংলন্ডের উন্নতি-অগ্রগতি, সম্পদের প্রাচুর্য ও শিল্প বিপ্লবের সূচনা সৃষ্টির কারণ হয় এবং পরোক্ষভাবে অধিকাংশ মুসলিম দেশের পরাধীনতা ও গোলামির হেতু হয়ে দাঁড়ায়।[১]

প্রাচ্য ভূখণ্ডে দ্বিতীয় সর্ববৃহৎ সাম্রাজ্য ছিল ইরানের সাফাভী হুকুমত যা এক বিরাট সভ্যতা-সংস্কৃতির অধিকারী ও উন্নত সাম্রাজ্য ছিল। কিন্তু শী'আ মতবাদ নিয়ে বাড়াবাড়ি ও এর প্রতি অতিমাত্রায় স্পর্শকাতরতা প্রদর্শন, তদুপরি তুর্কী হুকুমতের সঙ্গে সংঘাত-সংঘর্ষ তাকে এই অবকাশ দেয়নি যে, ঠাণ্ডা মাথায় ও সুস্থ মস্তিষ্কে কোন গঠনমূলক চিন্তা করবে। ফলে তাদের সর্বোত্তম সময়টাই যেই মুহূর্তে য়ূরোপ দ্রুত গতিতে অগ্রগতির পথে এগিয়ে চলছিল, কখনো তুর্কী সীমান্তে হামলা, আবার কখনো নিজেদের হেফাজত ও প্রতিরোধ করতেই অতিবাহিত হয়ে যায়।

Brooks Adams তাঁর The Law of Civilization and Decay নামক গ্রন্থ বলেন ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধের পর থেকে বাংলার লুণ্ঠিত সম্পদ আসা শুরু হয় আর সত্বর এর ফল প্রকাশ পেতে শুরু করে। এতবড় বিরাট শিল্প বিপ্লব যার প্রভাবে পৃথিবীর প্রত্যন্ত কোণে কোণে অনুভূত হচ্ছে– সৃষ্টিই হতো না যদি পলাশীর যুদ্ধ সংঘটিত না হতো। কেননা ভারতবর্ষের সম্পদেই এই শিল্প বিপ্লব সৃষ্টির সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করেছিল। দ্বিতীয়ত, ভারতবর্ষ থেকে সম্পদের পাহাড় যখন লণ্ডনে এসে আছড়ে পড়তে শুরু করল এবং পুঁজি বৃদ্ধি পেল তখন আবিষ্কার-উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে এক বিরাট প্রতিযোগিতা শুরু হলো। তৃতীয়ত, পৃথিবী সৃষ্টির পর থেকে টাকা-পয়সার দ্বারা আজ পর্যন্ত এত বেশি মুনাফা অর্জিত হয় নি যতটা হয়েছে লুণ্ঠিত ভারতীয় সম্পদ দ্বারা। কেননা পঞ্চাশ বছর পর্যন্ত এক্ষেত্রে ইংলণ্ডের কোন প্রতিদ্বন্দ্বীও ছিল না।

সার উইলিয়াম ডিগবী বলেন ঃ

"England's industrial supremacy owes its origin to the vast hoards of Bengal and the Karnatik being made available for her use ... Before Plassey was faught and own and before the ebb. "(Prosperous India; A Revolution , p. 30). tream of treasure began to flow to England, the industries of our country were at a very low ebb." *(Prosperous India: A Revolution, p. 30)*

"পলাশীর যুদ্ধের আগে যখন ভারতবর্ষের সম্পদ প্লাবনের বেগে ইংলণ্ডের বুকে আছড়ে পড়ে নি ততদিন আমাদের দেশের সৌভাগ্য সূর্য উদিত হয় নি। প্রকৃত ব্যাপার হলো, ইংলণ্ডের শিল্প বিপ্লব বাঙলার বেশুমার সম্পদ এবং কর্নাটকের বিপুল ভাণ্ডারের বদৌলতেই সম্ভব হয়েছিল" (মাহমুদ বাঙ্গালোরী)।

ব্যক্তিগত প্রয়াস

এই হেমন্ত কালেও ইসলামরূপ বৃক্ষে সবুজ কিশলয়ের উন্মেষ ঘটেছে এবং হেমন্তেও তা এমন সব ফল-ফুলের উদ্‌গম ঘটিয়েছে যার দৃষ্টান্ত ইসলামের বসন্ত মৌসুমেও খুব একটা বেশি পাওয়া যায় না এবং এর উদাহরণ পেশ করতে অপরাপর জাতির ইতিহাস অক্ষম। এই যুগ জাতীয় অধঃপতন ও স্থবিরতার। কিন্তু সাথে সাথে তা কতিপয় প্রতিভাধর ব্যক্তিত্বের দৃঢ় সংকল্প, অটুট ইচ্ছা শক্তি, ব্যক্তিগত চেষ্টা-সাধনার যুগ হিসেবেও দৃষ্টিগোচর হয়। কয়েকটি দেশে এমন কয়েকজন অটুট ইচ্ছাশক্তি ও সংকল্প, অদম্য মনোবল ও জাগ্রত মস্তিষ্কের অধিকারী নেতা ও মুজাহিদের আবির্ভাব ঘটে যারা ঐসব পতনোন্মুখ ও অধঃমুখী জাতিগোষ্ঠী ও দেশের মাঝে কিছু কালের জন্য হলেও নতুন প্রাণ সঞ্চার করেন। ভারতবর্ষে সুলতান ফতহ আলী টিপুর মত উন্নত মনোবলসম্পন্ন সমুন্নত দৃষ্টির অধিকারী সিংহহৃদয় নেতার জন্ম হয় যিনি ভারতবর্ষকে বিদেশী বিপদাশংকা থেকে প্রায় মুক্তই করে ফেলতে চলেছিলেন। অপর দিকে হযরত সাইয়েদ আহমদ শহীদের মত অটুট মনোবলসম্পন্ন ও প্রভাব সৃষ্টিকারী দাঈ ও মুজাহিদ জন্ম নেন যিনি খেলাফতে রাশেদার মূলনীতির ওপর এমন একটি ইসলামী হুকুমত কায়েম করতে চাইতেন যার গণ্ডী ভারতবর্ষ থেকে শুরু করে বুখারা অবধি বিস্তৃত হবে। তাঁর দাওয়াত ও প্রশিক্ষণ হাজার হাজার সংখ্যায় এমন সব সমুন্নত চরিত্রের মুজাহিদ, অটুট মনোবলসম্পন্ন ও উৎসর্গিতপ্রাণ দাঈ, মুবাল্লিগ ও সিপাহী জন্ম দেয় যাঁরা নিজেদের ঈমান ও ইয়াকীন, লিল্লাহিয়াত ও ইখলাস এবং ধর্মীয় জোশ ও মর্যাদাবোধের সেই প্রাথমিক যুগগুলোর স্মৃতিকেই যেন জাগিয়ে তোলেন। কিন্তু জাতীয় অধঃপতন, সামাজিক বিকৃতি ও বিশৃঙ্খলা এবং রাজনৈতিক অসচেতনতা এই পর্যায়ে গিয়ে উপনীত হয়েছিল যে, এ রকম বিশাল ও শক্তিশালী ব্যক্তিত্বও মুসলমানদের অবস্থা এবং তাদের অবনতি ও অধঃপতনের গতির ভেতর কোন বড় রকমের পরিবর্তন সাধনে সক্ষম হননি এবং মুসলিম উম্মাহ্ সামগ্রিকভাবে ঐসব মুজাহিদসুলভ ও পুনঃজাগরণমূলক কর্মপ্রয়াস থেকে উপকৃত হতে পারেনি

য়ূরোপের শিল্প বিপ্লব ও বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি

খ্রিস্টীয় ষষ্ঠদশ ও সপ্তদশ শতাব্দী থেকেই তুর্কীরা অবনতি ও অধঃপতন এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে পশ্চাৎপদতা ও স্থবিরতার শিকার হয়ে গিয়েছিল। মানব ইতিহাসের এটাই সেই গুরুত্বপূর্ণ যুগ যার প্রভাব পরবর্তী শতাব্দীগুলোর ওপর গভীরভাবে রেখাপাত করেছে। এই যুগেই য়ূরোপ তার দীর্ঘ নিদ্রা থেকে

আড়মোড়া ভেঙে জেগে উঠেছিল এবং প্রবল জোশে ও পাগলের ন্যায় উঠে পড়ে অলসতা ও অজ্ঞতার এই দীর্ঘ যুগের ক্ষতি পুষিয়ে নিতে চাইছিল। তারা জীবনের প্রতিটি শাখায় জ্যামিতিক গতিতে উন্নতি (کریز پاترقی) করছিল। প্রাকৃতিক শক্তিসমূহ আয়ত্ত, সৃষ্টি জগতের প্রভাব-প্রতিক্রিয়ার পর্দা উন্মোচন এবং অজানা সমুদ্র ও ভূখণ্ড তারা আবিষ্কার করছিল। জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতিটি শাখায় তাদের বিজয় ও জীবনের প্রতিটি শাখায় তাদের আবিষ্কার-উদ্ভাবন অব্যাহত ছিল। এই সংক্ষিপ্ততম সময়ের মধ্যে তাদের ভেতর জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্র বড় বড় বিশেষজ্ঞ পণ্ডিত, আবিষ্কারক ও উদ্ভাবকের জন্ম হয়। এঁদের মধ্যে কোপার্নিকাস, ব্রুনো, গ্যালিলিও, কেপলার ও নিউটন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যাঁরা জ্যোর্তিবিজ্ঞান ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের জগতে এক নতুন মাত্রা যোগ করেন। পর্যটক ও নাবিকদের মধ্যে কলম্বাস, ভাস্কো ডি গামা ও ম্যাগলিন-এর মত উদ্যমী, সাহসী ও দৃঢ়চেতা ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব ঘটে যাঁরা নতুন পৃথিবী, নতুন নতুন সাগর ও অজানা অনেক দেশ আবিষ্কার করেন।

জাতিসমূহের ইতিহাস এই যুগে নতুনভাবে বিন্যস্ত হচ্ছিল। এই আমলের এক একটি মুহূর্ত কয়েক দিনের এবং এক একটি দিন কয়েক বছরের সমতুল্য ছিল। এ যুগসন্ধিক্ষণে যে প্রস্তুতির একটি মুহূর্ত খুইয়েছে কার্যত তার সুদীর্ঘকাল নষ্ট হয়ে গেছে। নিতান্তই আফসোসের বিষয়, মুসলমানরা এ সময় কয়েকটি মুহূর্ত নয়, বরং কয়েকটি শতাব্দী নষ্ট করেছে। পক্ষান্তরে য়ূরোপীয় জাতিগোষ্ঠী এ সময় একটি মিনিট নয় এক একটি সেকেন্ডের মুল্য দিয়েছে এবং এর থেকে ফায়দা উঠিয়েছে এবং শতাব্দীকালের দূরত্ব বছরে অতিক্রম করেছে।

জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্পের ময়দানে তুর্কীদের পশ্চাৎপদতার পরিমাপ এথেকে করা যাবে যে, খ্রিস্টীয় ষষ্ঠদশ শতাব্দীর পূর্বে তুরস্কে জাহাজ নির্মাণ শিল্পের সূচনাই হয়নি। অষ্টাদশ শতাব্দীতে প্রেস, মুদ্রণযন্ত্র, স্বাস্থ্য কেন্দ্র ও ফৌজী প্রশিক্ষণের জন্য নতুন ধরনের স্কুলের সঙ্গে পরিচিত হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে পর্যন্ত তুরস্ক নতুন নতুন আবিষ্কার-উদ্বাবন ও উন্নতি-অগ্রগতি সম্পর্কে এতটাই অপরিচিত ছিল যে, রাজধানী কনস্টান্টিনোপলের অধিবাসীরা যখন তাদের রাজধানীর আকাশে বেলুন উড়তে দেখতে পেল তখন তারা একে যাদু কিংবা যাদুর ঘুড়ির বেশী ভাবতে পারেনি। এ সময় য়ূরোপের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য পর্যন্ত প্রতিযোগিতায় তুরস্কের মুকাবিলায় অনেক এগিয়ে গিয়েছিল। এমন কি মিসর পর্যন্ত কোন কোন উপকারী বিষয়ে উপকৃত হবার ক্ষেত্রে অনেকটাই অগ্রসর হয়ে গিয়েছিল। তুরস্কের চার বছর আগেই মিসরে রেল যোগাযোগ

ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। ডাক টিকেটের প্রচলনও তুরস্কের কয়েক মাস আগে মিসরে ঘটেছিল।[১]

মুসলিম বিশ্বের নেতৃত্বের আসনে সমাসীন তুরস্কের অবস্থাই যখন এই, তখন তুর্কী সালতানাতের অধীন কিংবা প্রভাবাধীন অন্যান্য আরব ও মুসলিম রাষ্ট্রের অবস্থা সহজেই পরিমাপ করা যেতে পারে। ঐসব দেশে তখন পর্যন্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্পের প্রচলন ঘটেনি। মঁসিয়ে ভলনে নামক জনৈক ফরাসী পর্যটক যিনি অষ্টাদশ শতকে মিসর ভ্রমণ করেন এবং চার বছর সিরিয়ায় অবস্থান করেন৷ তাঁর ভ্রমণ-কাহিনীতে লিখেছেন, "এ দেশ শিল্পে এতটাই অনগ্রসর যে, যদি তোমার ঘড়ি খারাপ হয়ে যায় তাহলে কোন বিদেশী ছাড়া ঘড়ি ঠিক করার জন্য কাউকে পাবে না।"[২]

This country (Syria) is so backward in the matter of industry that if your watch goes wrong here, you will have to go to a foreigner to get it mended.

অতঃপর মুসলমানদের পতন কেবল জ্ঞান-বিজ্ঞান, দর্শন, শিল্প ও কৃষি ক্ষেত্রেই ছিল না, বরং এই পতন ছিল সাধারণ ও সর্বব্যাপী যা মুসলমানদের আষ্টেপৃষ্ঠে ঘিরে রেখেছিল, এমন কি সমর বিজ্ঞান ও সামরিক নৈপুণ্যের দিক দিয়েও তারা য়ূরোপের তুলনায় পিছিয়ে গিয়েছিল, অথচ একদিন তারা এক্ষেত্রে নেতৃত্বের আসনে সমাসীন ছিল এবং সমর ক্ষেত্রে তুর্কীদের শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রাধান্যের স্বীকৃতি সারা দুনিয়া দিত। কিন্তু অন্যান্য ক্ষেত্রের ন্যায় এক্ষেত্রেও য়ূরোপ এগিয়ে যায়। তারা তাদের গবেষণা, আবিষ্কার-উদ্ভাবন, সাংগঠনিক ক্ষমতা ও উন্নত ব্যবস্থাপনার বদৌলতে সমরশাস্ত্রের ময়দানেও তুরস্কের তুলনায় অনেক এগিয়ে যায়। ফলে য়ূরোপ ১৭৭৪ খ্রিস্টাব্দে তুর্কী ফৌজকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করে। এতে করে দুনিয়ার সামনে পরিষ্কার হয়ে যায়, তুর্কীদের সামরিক শক্তি য়ূরোপের খ্রিস্টীয় জাতিগোষ্ঠীর তুলনায় অনেক পিছিয়ে। এই পরাজয়ে তুরস্কের উছমানী হুকুমতের চোখ কিছুটা হলেও উন্মোচিত হয়। তারা কতিপয় য়ূরোপীয় সমর বিশেষজ্ঞের সহায়তায় সামরিক বাহিনীকে পুনর্গঠিত ও প্রশিক্ষিত করে তোলার কাজ শুরু করে। কিন্তু সংস্কার ও উন্নয়নের মূল পদক্ষেপের সূচনা করেন সুলতান তৃতীয় সলীম উনবিংশ শতাব্দীর সূচনায়। শাহী প্রাসাদের বাইরে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সুলতান নতুন ধরনের স্কুল প্রতিষ্ঠিত করেন। ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ কায়েম করেন যেখানে তিনি নিজেই ক্লাস নিতেন। "নিজাম-ই জাদীদ" নামে

১. نئ ایجادات کی تاریخ دারুল হেলাল, মিসর,
২. ড. আহমদ আমীনকৃত . زعماء الاصلاح فی العصر الحدیث প. ৬।

তিনি এক নতুন ফৌজের ভিত্তি রাখেন এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থাপনায় কিছুটা পরিবর্তন আনেন। কিন্তু তুর্কী জাতি ও সাম্রাজ্যের জড়তা ও স্থবিরতা এতটাই প্রকট ছিল যে, পুরাতন ফৌজ বিদ্রোহ করে সুলতানকেই হত্যা করে ফেলে। অতঃপর এই সংস্কারমূলক অভিযানে সুলতান ২য় মাহমুদ (শাসনকাল ১৮০৭-৩৯ খ্রি.) এবং তারপর সুলতান ১ম আবদুল মজীদ (১৮৩৯-৫১ খ্রি.) প্রতিনিধিত্ব করেন। তুর্কী জাতি অতঃপর উন্নতি-অগ্রগতির পথে কিছুটা অগ্রসর হয়।

অগ্রগতির ময়দানে তুকী মুসলমানেরা যে দূরত্বটুকু অতিক্রম করে তার সাথে য়ূরোপীয়দের দূরত্বের মুকাবিলা করুন যা তারা অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীতে অতিক্রম করেছিল। উন্নতি-অগ্রগতির ময়দানের এ দুয়ের দৌড় প্রতিযোগিতা আমাদের কচ্ছপ ও খরগোশের দৌড়ের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। এক্ষেত্রে পার্থক্য কেবল এতটুকুই যে, খরগোশ (এখানে য়ূরোপ। - অনুবাদক) সদাজাগ্রত ও ধাবমান আর অপরদিকে কচ্ছপ (এখানে তুর্কীসহ সমগ্র মুসলিম জাহান। - অনুবাদক) তার ধীর গতি সত্ত্বেও মাঝে মাঝে তন্দ্রা ও নিদ্রার মাঝে কিছুটা বিশ্রাম খোঁজে।

অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীতে মরক্কো, আলজিরিয়া, মিসর, ভারতবর্ষ ও তুর্কিস্তানে প্রাচ্যের মুসলিম জাতিগোষ্ঠী এবং পাশ্চাত্য জাতিগোষ্ঠী ও শক্তিগুলোর মধ্যে যে সংঘাত-সংঘর্ষ দেখা দেয় তার ফয়সালা মূলত ১৬শ ও ১৭শ শতাব্দীতেই হয়ে গিয়েছিল এবং এর ফলাফল কী হবে তার ভবিষ্যদ্বাণীও তখনই করে দেয়া যেতে পারত।

৫ম অধ্যায়

বিশ্ব নেতৃত্বের আসনে পাশ্চাত্য জগত ও তার ফলাফল

পাশ্চাত্যের উত্থান

তুর্কীদের পতনের ফলে আর্ন্তজাতিক শক্তি ও ক্ষমতার চাবিকাঠি এবং সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক নেতৃত্ব য়ূরোপের অমুসলিম জাতিগোষ্ঠীর হাতে চলে যায় যারা দীর্ঘকাল ধরে প্রস্তুতি নিচ্ছিল। তাদের সমকক্ষ ও সমপর্যায়ের কোন প্রতিদ্বন্দ্বীও তখন ময়দানে ছিল না। প্রাচ্য বা পাশ্চাত্যের পর্যন্ত কোন দেশ কিংবা কোন রাষ্ট্রই তাদের প্রভাব থেকে মুক্ত ছিল না। বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী হয়তো বস্তুগত দিক দিয়ে অথবা রাজনৈতিকভাবে তাদের গোলাম ও অধীন ছিল অথবা মানসিক, জ্ঞানগত ও সাংস্কৃতিকভাবে তাদের প্রভাবাধীন ছিল।

আমরা সেই সব প্রভাব যা নেতৃত্ব ও ক্ষমতার এই হাত বদলের ফলে দুনিয়ার জাতিসমূহের মানসিকতা, নৈতিক চরিত্র, সমাজ, সংস্কৃতি, সভ্যতা, মানবীয় ঝোঁক ও প্রবণতার ওপর ফেলেছিল তা পর্যালোচনা করবার আগে এবং এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবার পূর্বে যে, এই বিপ্লবের দ্বারা মানবতা লাভবান হয়েছে না কি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, এটা জরুরী যে, পাশ্চাত্য সভ্যতা-সংস্কৃতির প্রকৃতি ও স্বভাব কি তা আমরা দেখব। আমরা তার অবয়ব ও স্পিরিট এবং সাথে সাথে তাদের দ্বারা প্রভাবিত জাতিগোষ্ঠীর জীবন-দর্শন বোঝবার চেষ্টা করব। আর এটাও দেখব, কিভাবে সেগুলো জন্ম নিয়েছে এবং কিভাবে লালিত-পালিত ও বর্ধিত হয়েছে।

পাশ্চাত্য সভ্যতার বংশধারা

বিংশ শতাব্দীর পাশ্চাত্য সভ্যতা (যেমনটি কোন কোন ভাসা ভাসা দৃষ্টির অধিকারী মনে করেন) এমন কোন স্বল্প বয়সী সভ্যতা নয় বিগত কয়েক শতাব্দী যার জন্ম হয়েছে। মূলত এই সভ্যতার ইতিহাস কয়েক হাজার বছরের পুরনো। এর পৈতৃক বংশগত সম্পর্ক গ্রীক ও রোমক সভ্যতার সঙ্গে। উক্ত দুই সভ্যতা আপন উত্তরাধিকার হিসেবে যে রাজনৈতিক ব্যবস্থা, সামাজিক দর্শন এবং বুদ্ধিবৃত্তিক ও তাত্ত্বিক পুঁজি রেখে গিয়েছিল তা তার ভাগে পড়ে। এর সমগ্র ঝোঁক-প্রবণতা ও বৈশিষ্ট্য সে বংশপরম্পরায় লাভ করে।

সর্বপ্রথম গ্রীক সভ্যতায় পাশ্চাত্য মন-মানসিকতার অভিব্যক্তি ঘটে। এটাই ছিল প্রথম কৃষ্টি ও সংস্কৃতি যা নির্ভেজাল পাশ্চাত্য দর্শনের ভিত্তির ওপর কায়েম হয় এবং এর মধ্যে পাশ্চাত্য মনস্তত্ত্বের পরিপূর্ণ অভিব্যক্তি ঘটে। গ্রীক সভ্যতার ধ্বংসাবশেষের ওপর রোমক সভ্যতার প্রাসাদ গড়ে ওঠে যার মধ্যে একই পাশ্চাত্য স্পিরিট কাজ করছিল। পাশ্চাত্যের জাতিগুলো শতাব্দীর পর শতাব্দী এই দুই সভ্যতার বৈশিষ্ট্যগুলো ও মেযাজ, তাদের দর্শন, জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য ও চিন্তাধারাসমূহে আঁকড়ে ধরে থাকে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে সেই সব বৈশিষ্ট্যসহ সেগুলো এক নতুন পোশাকে আবির্ভূত হয়। এই পোশাকের চাকচিক্যে তা নতুন বলে দৃষ্টিবিভ্রম ঘটে। কিন্তু মূলত তার পুরোটা বুনন গ্রীক ও রোমকদের হাতেই সম্পন্ন হয়েছে।

এরই ভিত্তিতে আমরা জরুরী মনে করছি, আমরা প্রথমে গ্রীক ও রোমান সভ্যতার সাথে পরিচিত হব এবং উল্লিখিত দুই সভ্যতার মেযাজ ও স্পিরিট সম্পর্কে জানব যাতে করে আমরা নির্ভুল ও যথার্থভাবে বিংশ শতাব্দীর পাশ্চাত্য সভ্যতার মূল্যায়ন করতে পারি।

গ্রীক সভ্যতা

গ্রীক সভ্যতার চুলচেরা বিশ্লেষণ ও সমালোচনা থেকে সেই সমস্ত অংশ বাদ দিয়ে যেগুলো মুখ্য নয়, বরং গৌণ ও ডালপালা পর্যায়ের ও নিছক দৃশ্যমান বস্তু এবং যেগুলো সাধারণ মানবীয় সভ্যতার মধ্যে সাজুয্যপূর্ণ তাঁর একটি সুনির্দিষ্ট মেযাজের পরিচয় পাওয়া যায়। এর বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরূপ ঃ

(১) যে সব ব্যাপার বা বিষয় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয় সেগুলোর প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শন ও সেসবের প্রতি সন্দেহ পোষণ;

(২) ধর্মীয় অনুভূতির অভাব ও আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে ঘাটতি;

(৩) ভোগবাদিতা ও পার্থিব আরাম-আয়েশের প্রতি সুতীব্র আকর্ষণ;

(৪) দেশপ্রেমের ক্ষেত্রে সীমাতিরিক্ত বাড়াবাড়ি।

আমরা এ সবের বিভিন্ন দিক ও শাখা-প্রশাখাকে যদি এক শব্দে প্রকাশ করতে চাই, তবে এর জন্য এককভাবে 'বস্তুবাদ' শব্দটিই যথেষ্ট হবে। অতএব গ্রীক সভ্যতার মৌলিক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে বস্তুবাদ। গ্রীকদের দর্শনশাস্ত্র, কাব্য, এমন কি ধর্ম পর্যন্ত সব কিছুই তাদের বস্তুবাদী স্পিরিটের প্রতিনিধিত্ব করে। তারা আল্লাহর সিফাত তথা গুণাবলী ও তাঁর কুদরতের ধারণা বিভিন্ন দেবতার আকার-আকৃতি ব্যতিরেকে করতে পারেনি। তারা ঐ সব গুণের মূর্তি গড়েছে এবং সেসব দেবতার জন্য উপাসনালয় তৈরি করেছে যাতে করে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য

পন্থায় সেগুলোর সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষা করা যায়। জীবিকার জন্য তাদের ছিল এক দেবতা, দয়া-মায়া ও করুণার আরেক দেবতা, আর এক দেবতা ছিল আযাব ও গযবের তথা শাস্তির। এরপর তারা সেগুলোর দিকে বস্তুগত দেহের সমস্ত বৈশিষ্ট্য ও সম্পর্কযুক্ত বিষয় সম্পর্কিত করে এবং সে সবের চতুর্পার্শ্বে কিসসা-কাহিনীর জাল বিছিয়ে দেয়। তারা অঙ্গবিহীন আবেগ-অনুভূতিকে পর্যন্ত দৈহিক ও আঙ্গিক কাঠামোরূপে পেশ করে। তাদের মতে প্রেমের ছিল এক দেবতা আর আরেক দেবতা ছিল সৌন্দর্যের। এ্যারিস্টোটলের দর্শনে দশ প্রকার বুদ্ধিবৃত্তি (عقول عشره Ten kinds of Predication) ও নয় মহাশূন্যের যেই তালিকাসূচী পাওয়া যায় তাও এই বস্তবাদী বুদ্ধিবৃত্তিরই বিস্ময় ও চমৎকাররিত্ব যার প্রভাব থেকে গ্রীক প্রকৃতি ও মানস কখনো মুক্তি পায়নি।

পাশ্চাত্যের পণ্ডিতরাও গ্রীক সভ্যতায় বস্তুবাদের প্রাধান্যকে মেনে নিয়েছেন এবং তাদের লিখিত গ্রন্থ ও পুঁথি-পুস্তকে এবং তাত্ত্বিক আলোচনায় এর দিকে তারা অঙ্গুলি সংকেত করেছেন। কয়েক বছর আগে ড. হাস নামক জনৈক পাশ্চাত্য লেখক জেনেভায় What is European Civilization? শীর্ষক তিনটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন। তাঁরই একটি উক্তি খালেদা এদিব খানমের সূত্রে নিম্নে উদ্ধৃত করা হচ্ছে ঃ

"বর্তমান পাশ্চাত্য সভ্যতার কেন্দ্র ছিল প্রাচীন গ্রীক সভ্যতা। তাদের দৃষ্টিতে আসল কথা হচ্ছে মানুষের সমগ্র শক্তির সুসমন্বিত বিকাশ এবং সবচেয়ে বড় আদর্শ হচ্ছে সুন্দর, সুঠাম ও সুডৌল দেহধারী মানুষ। স্পষ্টত এতে সবচে' বেশী জোর দেয়া হয়েছে অনুভূতির ওপর। দৈহিক প্রশিক্ষণ (Physical Education) বা শরীর চর্চা, খেলাধুলা, নৃত্য ইত্যাদির ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হতো। মানসিক শিক্ষা যা কাব্য চর্চা, সঙ্গীত, নাটক, দর্শন, বিজ্ঞান ইত্যাদি নির্ভর ছিল, একটি বিশেষ সীমার বাইরে অগ্রসর হতে পারেনি যাতে করে মননশীলতার উন্নতি দৈহিক উন্নতির ক্ষতির কারণ হতে না পারে। গ্রীসের ধর্মে না আধ্যাত্মিকতার কোন উপাদান আছে আর না আছে ধর্মীয় বিদ্যা বা ধর্মতত্ত্ব, অধিবিদ্যা আর না আছে ধর্মীয় নেতাদের কোন শ্রেণী।"[১]

অনেক পাশ্চাত্য পণ্ডিত ও লেখক গ্রীকদের ধর্মীয় দুর্বলতা ও তাদের ওপর কর্মের প্রভাবহীনতা এবং ধর্মীয় কাজকর্ম ও প্রথার মধ্যে যথাযথ গুরুত্বের অভাব এবং খেলাধুলা ও আমোদ-প্রমোদের আধিক্যের কথা উল্লেখ করেছেন। History of European Morals-এর লেখক Lecky বলেন: The Greek spirit was essentially

1. Halide Edib: The conflict of East and West in Turkey, p. 226-227.

rationalistic and eclectic, the Egyptian spirit was essentially mystical and devotional. অর্থাৎ গ্রীকদের স্পিরিট ছিল বুদ্ধিবৃত্তিক ও মস্তিষ্কনির্ভর পক্ষান্তরে মিসরীয়দের গোটাটাই ছিল আধ্যাত্মিক ও আত্মিক। তিনি Apuleius-এর এই উক্তি উদ্ধৃত করেছেনঃ The Egyptian deities were chiefly honoured by lamentations and the Greek divinities by dances. অথাৎ মিসরীয় দেবতারা তুষ্ট ও সম্মানিত হয় কান্নকাটি ও আহাজারিতে আর গ্রীক দেবতারা খুশী হয় নৃত্যে।

এরপর লেখক বলেন ঃ

The truth of that last part of this very significant remark appears in every page of Greek history. No nation has a richer collection of games and festivals growing out of its religious system; in none did a light, sportive and often licentious fancy play more fearlessly around, the popular creed in none was religiours terrorism more rare, The Divinity was seldom looked upon as holier than man, and a due observance of certain rites and ceremonies was demed an ample tribute to pay to him..

অর্থাৎ এতে কোনই সন্দেহ নেই যে, এই উক্তির শেষ অংশের সত্যতা গ্রীসের ইতিহাসে পদে পদে পাওয়া যায়। বস্তুত কোন ধর্মের প্রথা-পদ্ধতি ও আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে আনন্দ উৎসব, ক্রীড়া-কৌতুক ও খেল-তামাশার এতটা মিশ্রণ পাওয়া যায় না যতটা পাওয়া যায় এতে। আবার তেমনি কোন ধর্মে ভয়-ভীতির উপাদান এত কম পাওয়া যায় না যতটা পাওয়া যায় এতে। এই ধর্মে আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ও ভক্তি-শ্রদ্ধা সম্পর্কে এতটাই ধারণা পাওয়া যায় যতটুকু ধারণা মানুষ কোন বুযুর্গ সম্পর্কে পোষণ করে থাকে। ব্যস, এর বেশি নয় এবং আল্লাহ্‌কে কতকগুলো মামুলী প্রথা ও আচার-অনুষ্ঠান সহকারে স্মরণ করা তাদের দৃষ্টিতে তাঁর মর্যাদা ও মাহাত্ম্য প্রকাশের জন্য ছিল যথেষ্ট।[১]

কিন্তু এতে বিস্মিত হবার কিছু নেই। পাশ্চাত্যের বস্তুপূজারী ও অনুভূতিপ্রবণ মেযাজ ও প্রকৃতি ছাড়াও গ্রীকদের ধর্মীয় দর্শন ও তাদের আকীদা-বিশ্বাসের অবয়বটাই এমন ছিল যে, ভয়-ভীতিমিশ্রিত শ্রদ্ধা-ভক্তি ও বিনয়, আল্লাহমুখী হওয়ার প্রবণতা তাদের ভেতর জন্মই নিতে পারত না। আল্লাহ্‌র যাবতীয় সিফাত তথা গুণাবলী, সর্বপ্রকার এখতিয়ার, কর্ম, নির্বাহী ক্ষমতা, সৃষ্টি ও আদেশ দানের ক্ষমতার প্রতি অস্বীকৃতি জ্ঞাপন এবং তাঁকে একেবারেই নির্গুণ ও ক্ষমতা রহিত হিসাবে অভিহিত করা এবং এই বিশ্বজগতের সৃষ্টি ও ব্যবস্থাপনাকে নিজেদের মনগড়া ও কল্পিত সক্রিয় বুদ্ধিবৃত্তির দিকে সম্পৃক্ত করার স্বাভাবিক ও যৌক্তিক

1. W.E.H. Lecky: History of European Morals, London 1869. Vol-1.-P.344-45.

পরিণতি এটাই হতে পারে যে, জীবনে আল্লাহ্র কোন আবশ্যকতা এবং তাঁর সঙ্গে কোনরূপ সম্পর্ক ও তাঁর প্রতি কোন আকর্ষণ কিংবা আগ্রহ থাকবে না, তাঁর প্রতি থাকবে না কোন আশাবাদ, তেমনি থাকবে না তাঁর সম্পর্কে কোন প্রকার ভয়, দিলে থাকবে না কোন ভীতি কিংবা ভালবাসা। প্রয়োজন মুহূর্তে ও বিপদের সময় তাঁর কাছে দোআ প্রার্থনা ও সকাতর অনুনয়-বিনয় করবে না, করার প্রয়োজন বোধও করবে না। কেননা এই দর্শন অনুসারে তিনি (আল্লাহ্ তা'আলা) এমন এক সত্তা যিনি অব্যাহতিপ্রাপ্ত ও নিষ্ক্রিয়। সমগ্র বিশ্বজগতের ব্যবস্থাপনায় যাঁর না কোন এখতিয়ার আছে আর না আছে কোন শক্তি ও ক্ষমতা। তিনি প্রথম বুদ্ধিবৃত্তি সৃষ্টি করার পর বিশ্বজগত থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন ও সম্পর্ক ছিন্ন করেছেন পরিপূর্ণরূপে। এজন্য যারা এমন আকীদা-বিশ্বাস পোষণ করে তাদের জীবন কার্যত এমনভাবে অতিবাহিত হয় এবং অতিবাহিত হওয়া উচিত যেন আল্লাহ্ বলতে কিছু নেই এবং যারা আল্লাহ্কে অস্বীকার করেন তাদের জীবন থেকে এই ঐতিহাসিক বর্ণনা-বিবৃতি ব্যতিরেকে যে, আল্লাহ্ তা'আলা কেবল প্রথম বুদ্ধি সৃষ্টি করেছেন আর এছাড়া তিনি অন্য কোন দিক দিয়ে বিশিষ্ট নন। অনন্তর আমরা যখন শুনি, গ্রীকদের মধ্যে ভয়-ভক্তিমিশ্রিত বিনয় ও শ্রদ্ধার ঘাটতি ছিল এবং তাদের ইবাদত-বন্দেগী ও ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপ নিষ্প্রাণ এক কাঠামোর অতিরিক্ত আর কিছু ছিল না এবং যখন আমরা এও শুনি, তারা খোদা তথা পরম স্রষ্টাকে একজন শ্রদ্ধাভাজন মুরুব্বী বা বুযুর্গের চেয়ে বেশী মূল্য দিত না, সম্মান করত না, তখন আমাদের আদৌও বিস্মিত হওয়া ঠিক হবে না এজন্য যে, ইতিহাসে মানুষ শত শত শিল্পী, কারিগর ও আবিষ্কারকদের জীবনী পাঠ করে কিন্তু কখনো তাদের প্রতি তাদের মনে ভয়-ভক্তিমিশ্রিত বিনয় ও শ্রদ্ধা এবং তাদের সঙ্গে বন্দেগী ও দাসত্বের সম্পর্ক সৃষ্টি হয় না। বন্দেগীর সম্পর্ক তো সেই সময় সৃষ্টি হয় যখন মানুষ আল্লাহ্কে এই বিশ্বজগতের মালিক মুখতার তথা সর্বময় ক্ষমতার আধার মনে করে এবং নিজেকে তাঁর মুখাপেক্ষী ভাবে।

পার্থিব জীবনের প্রতি পরম আগ্রহ ও ভালবাসা, এর প্রতি সম্মান ও গুরুত্ব প্রদানের ওপর অত্যধিক জোর প্রদান ও বাড়াবাড়ি প্রদর্শন, ভাস্কর্য ও মূর্তির প্রতি আকর্ষণ, সুর ও গান-বাজনার মধ্যে নিমগ্নতা ও শিল্পকলার পৃষ্ঠপোষকতা এবং সীমাহীন ব্যক্তি স্বাধীনতার ওপর সীমাতিরিক্ত জোর প্রদানের ফলে গ্রীসের নৈতিক চরিত্র ও সমাজ জীবনের ওপর খারাপ আছর পড়ে। নৈতিক ও চারিত্রিক বেলেল্লাপনা, সব রকমের আইন-শৃঙ্খলার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও প্রতিবাদ বিক্ষোভ নিত্য-দিনের ফ্যাশনে পরিণত হয়। প্রবৃত্তিজাত কামনা-বাসনার আনুগত্য, যতটা বেশি পারা যায় জীবনের আনন্দ ও স্বাদ-আহ্লাদ লুটে নেয়া এবং 'নগদ যা পাও

হাত পেতে নাও' অথবা 'আজ মরলে কাল দু'দিন' –অতএব পেছনের ভাবনা ভেবে নিজেকে বঞ্চিত না করে বর্তমানটাকে যতটা পারা যায় ভোগ করাকে মুক্তবুদ্ধি ও স্বাধীনতার সমার্থক ভাবা হতে থাকে। প্লেটো একজন গণতন্ত্রী যুবকের যেই জীবন-চরিত ও জীবন যাপন পদ্ধতি সম্পর্কে বর্ণনা দিয়েছেন সেই বর্ণনার সঙ্গে বিংশ শতাব্দীর একজন মুক্ত বুদ্ধির অধিকারী টগবগে তরুণের আপাদমস্তক মিল রয়েছে। দুজনকে আদৌ ভিন্নতরো মনে হয় না।

"যদি তাকে বলা হয়, মানুষের সব রকমের আকাঙ্ক্ষা ও কামনা-বাসনা একই রূপ সম্মান ও পূরণযোগ্য নয়। কিছু কিছু কামনা-বাসনা পসন্দনীয় ও সম্মানযোগ্য এবং সেগুলো পূরণ করায় কোন ক্ষতি নেই। আর কিছু কিছু আছে যেগুলো পসন্দনীয় নয়। এগুলো এড়িয়ে চলাই উত্তম এবং এ সবের ওপর বাধা-নিষেধ ও বাধ্যবাধকতা আরোপ করা জরুরী, তখন সে এই সহী-শুদ্ধ আইন কবুল করে না, মেনে নেয় না, এমন কি সে এ ধরনের কথা শোনার জন্যও তৈরি হয় না। যখন তার সামনে এ ধরনের যুক্তিসঙ্গত কথা রাখা হয় তখন সে বিদ্রূপ ও উপহাসের ভঙ্গীতে মাথা নাড়ে এবং সজোরে এই বৃক্তৃতা দিতে শুরু করে যে, মানুষের সর্বপ্রকার আকাঙ্ক্ষা ও কামনা-বাসনাই একই রূপ সম্মানযোগ্য। সে মাফিক সে জীবনও যাপন করে এবং তার সর্বপ্রকার প্রবৃত্তিজাত কামনা-বাসনাকে পরিতৃপ্ত করে, তার প্রতিটি আকাঙ্ক্ষাই সে চরিতার্থ করে, পূরণ করতে থাকে এবং যখন তার মন যা চায় তাই সে করে। কখনো তাকে মাতালে অবস্থায় গান-বাজনায় মত্ত দেখতে পাওয়া যাবে, আবার কখনো খেয়াল চাপল তো পণ করে কেবল পানি পানকেই যথেষ্ট ভাববে। কখনো সামরিক প্রশিক্ষণ ও তার নিয়মাবলী শিখতে দেখা যাবে, আবার কখনো একেবারে বেকার ও অলস জীবন যাপন করতে পাওয়া যাবে এবং সব কিছুকেই তাকে তুলে রাখবে। কখনো দার্শনিকসুলভ জীবন যাপন করতে থাকবে, আবার অন্য সময় রাজনৈতিক জীবনেও অংশ গ্রহণ করবে, রাজনৈতিক কার্যক্রমে যোগ দেবে এবং সময়ের চাহিদা মেটাতে রাজনৈতিক প্লাটফর্মে বৃক্তৃতা দিতেও দেখা যাবে, এমন কি তাকে সৈনিকদের প্রশংসা করতে শোনা যাবে এবং তাদের প্রতি তার আগ্রহ লক্ষ্য করা যাবে। কখনো-বা সফল ব্যবসায়ীর প্রতি ঈর্ষাপরবশ হয়ে ব্যবসা শুরু করে দেবে। মোটকথা, তার জীবনের কোন নিয়ম নেই, শৃঙ্খলা নেই, সুনির্দিষ্ট কোন বিধানের অনুসরণ নেই। মজার ব্যাপার হলো এই যে, সে এই জীবনকে খুবই আনন্দদায়ক, রসঘন ও অবাক মনে করে এবং শেষ পর্যন্ত এভাবেই সে জীবন কাটায়।"[১]

১. প্লেটোর রিপাবলিক।

পাশ্চাত্যের স্বভাব ও প্রকৃতির আরেকটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ। এশিয়ার তুলনায় জাতীয়তাবাদী প্রেরণা য়ূরোপে অধিকতর শক্তিশালী ও ব্যাপক। এ ব্যাপারে কিছুটা ভৌগোলিক অবস্থানেরও ভূমিকা রয়েছে। এশিয়ায় প্রাকৃতিক এলাকা অধিক বিস্তৃত। বিভিন্ন প্রকারের আবহাওয়া, পাহাড়-পর্বত এবং মানুষের নানাবিধ কিসিমসংবলিত, অধিকতর উর্বর। তদুপরি জীবনোপকরণের ক্ষেত্রেও প্রাচুর্যের সমাহার। এশিয়া মহাদেশে রাজ্যের প্রবণতা স্বভাবতই বিস্তৃতি ও সাধারণ ব্যাপকতার দিকে এবং এশিয়া ভূখণ্ডে পৃথিবীর বিস্তৃততম সাম্রাজ্য কায়েম হয়েছে। এর বিপরীতে য়ূরোপে জীবনের ঘাত-প্রতিঘাত, অস্তিত্ব রক্ষার কঠিন সংগ্রাম ও সংঘর্ষ অব্যাহতভাবেই দেখতে পাওয়া যায়। এর জনবসতি ঘন, এলাকা সংকীর্ণ এবং জীবন-উপকরণ সীমিত। পাহাড়-পর্বত ও নদী-নালার প্রাকৃতিক সীমানা পাশ্চাত্য জাতিগোষ্ঠীগুলোকে স্থায়ীভাবে সংকীর্ণ প্রাকৃতিক বৃত্তের মাঝে আবদ্ধ করে দিয়েছে, বিশেষত য়ূরোপের মধ্য, পশ্চিম ও দক্ষিণ ভাগ বিস্তৃত রাজ্যের লালন-পালন ও বিকাশের জন্য অনুকূল নয়। এজন্য প্রাচীন য়ূরোপেও রাজনৈতিক ধ্যান-ধারণা নগর-রাষ্ট্রের (City-state) ঊর্ধ্বে অগ্রসর হতে পারেনি যার আয়তন কয়েক মাইলের বেশী বিস্তৃত হতো না। তথাপি তা সম্পূর্ণ স্বায়ত্ত শাসিত হতো। এর সর্বাপেক্ষা বড় নজীর গ্রীসে পাওয়া যাবে যেখানে প্রাচীন কাল থেকেই অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বায়ত্তশাসিত নগর-রাষ্ট্রের উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়।

অতএব, এটা মোটেই বিস্ময়কর নয়, গ্রীসের লোকেরা জাতীয়তাবাদী ধ্যান-ধারণায় গভীরভাবে বিশ্বাসী ছিল। বিজ্ঞানী লেকী স্বীকার করেন এবং বলেন, সক্রেটিস ও Anaxagorias যে আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রের ধ্যান-ধারণার কথা কখনো কখনো ব্যক্ত করেছেন গ্রীসে তা কখনোই জনপ্রিয় ধারণা ও মতবাদ হিসেবে স্বীকৃতি পায়নি এবং সেখানে তাদের কোন সমর্থকও ছিল না। এরিস্টোটলের System of Ethics তথা নৈতিক বিধি-ব্যবস্থা গ্রীক ও অগ্রীক-এর ভেদ রেখার ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। দার্শনিক ও পণ্ডিত মহলের সম্মিলিত চেষ্টায় নৈতিকতার শ্রেষ্ঠত্ব ও গুণাবলীর যে তালিকা তৈরি করা হয়েছিল তার শীর্ষে ছিল দেশপ্রেম। এরিস্টোটল তো এতদূর পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছে ছিলেন যে, গ্রীসের লোকেরা বিদেশীদের (অর্থাৎ যারা গ্রীক নগর রাষ্ট্রের অধিবাসী নয়) সাথে সেই রূপ ব্যবহার ও আচরণ করবে যা তারা পশু ও জীব-জন্তুর সাথে করে। এ জাতীয় চিন্তাধারা গ্রীসের লোকদের ভেতর এমন বদ্ধমুল হয়ে গিয়েছিল এবং এর প্রভাব এতদূর জেঁকে বসেছিল যে, যখন জনৈক দার্শনিক বললেন, আমার

সহানুভূতির পরিধি কেবল আমার নিজের দেশের মধ্যেই সীমিত নয় বরং সমগ্র গ্রীসব্যাপী আবর্তিত তখন লোকে তাঁকে বিস্ময়ভরে দেখতে লাগল।[১]

রোমক সভ্যতা

রোমকরা গ্রীকদের স্থলাভিষিক্ত হল এবং শক্তিতে, রাজ্যের ব্যবস্থাপনা ও শৃঙ্খলা বিধানে, সাম্রাজ্যের বিস্তৃতিতে ও সামরিক গুণাবলীর ক্ষেত্রে তারা গ্রীকদের ছাড়িয়ে গেল। কিন্তু জ্ঞান-বিজ্ঞান ও দর্শন, সাহিত্য ও কাব্য, সভ্যতা ও সংস্কৃতির ময়দানে তারা গ্রীকদের পর্যায়ে পৌঁছুতে পারেনি। ওসব ক্ষেত্রে গ্রীকদের নেতৃত্ব ও প্রাধান্য দুনিয়াব্যাপী স্বীকৃত ছিল, এমন কি স্বয়ং বিজেতা রোমকদের অন্তর মানসের ওপরও এ ছাপ স্থায়ীভাবে বসে গিয়েছিল। রোমকরা তখনও তাদের সামরিক যুগের অবস্থান করছিল। এজন্য তারা স্বভাবতই মানসিক পরিপূর্ণতা, সূক্ষ্ম ও পরিশীলিত বিষয়গুলোতে গ্রীকদেরকেই তাদের নেতা মেনে নেয় এবং তাদেরই দর্শণ শাস্ত্র ও ধ্যান-ধারণা চর্বন করে। লেকী বলেনঃ

"It is also evident that the Greeks having had for several centuries a splendid literature, at a time when the Romans had none, and when the Latin language was still too crude for literary purposes, the period in which the Romans first emerged from a purely military condition would bring with it an ascendancy of Greek ideas. Fabius Pictor and Cincius Alimentus, the earliest native historians, both wrote in Greek .... After the conquest of Greece, the political ascendancy of the Romans and the intellectual ascendancy of Greece were alike universal. The conquered people, whose patriotic feelings had been greatly enfeebled by the influences I have noticed, acquiesced readily in their new condition, and notwithstanding the vehement exertions of the conservative party, Greek manners, sentiments, and ideas soon penetrate all classes and moulded all forms of Roman life."

"গ্রীকরা তাদের মূল্যবান জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সাহিত্য শত শত বছর ধরে লালন করে চলেছিল। বস্তুত রোমকরা সামরিক যুগেই অবস্থান করছিল যারা সাহিত্যের নামটুকুর সাথেও পরিচিত ছিল না, বরং তাদের ভাষা পর্যন্ত মর্ম প্রকাশে ও উচ্চতর ধ্যান-ধারণার প্রতিনিধিত্ব করতে অক্ষম ছিল। জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে রোমকদের এই দৈন্যের অনিবার্য পরিণতি ছিল এই যে, তারা গ্রীক সভ্যতা-সংস্কৃতি দ্বারা পরাভূত হয়ে যাবে এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতিটি শাখা-প্রশাখায় তাদের দ্বারা প্রভাবিত থাকবে। অনন্তর আমরা জানি, প্রাচীনকালের রোমক ঐতিহাসিকরা গ্রীক ভাষাতেই পুস্তকাদি লিখতেন এবং এই

1. History of European Morals, London 1809, Vol. p. 243

নিয়ম দীর্ঘকাল পর্যন্ত কায়েম ছিল। কেবল লেখালেখির কথাই বা বলি কেন, আচার-ব্যবহার, জীবন যাপন পদ্ধতি, আবেগ-অনুভূতি, মোটের ওপর জীবনের প্রতিটি শাখায় গ্রীক সভ্যতা-সংস্কৃতি রোমক সংস্কৃতির ওপর জেঁকে বসেছিল। রোমকরা অবলীলায় ও নির্দ্বিধায় গ্রীকদের অনুকরণ করত এবং এজন্য তারা গর্ব করত।"[১]

আর এভাবেই জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য, আচার-আচরণ ও অভ্যাসের মাধ্যমে গ্রীক জাতির দর্শন ও সংস্কৃতি নয়, বরং গ্রীক মন-মানস ও চিন্তা-চেতনা রোমকদের মধ্যে স্থানান্তরিত হয় এবং তাদের শিরা-উপশিরার মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হয়। এমনিতেও রোমকরা তাদের পশ্চিমা প্রকৃতি ও মেযাজের দরুন প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে এমন কিছু বেশি ভিন্ন ছিল না। জীবনের বহু দিকেই উভয়ের মধ্যে অনেকখানি সাদৃশ্য ছিল। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ের ওপর বিশ্বাস করতে রোমকরাও অভ্যস্ত ছিল। জীবনের মান ও মূল্যের ব্যাপারে এখানেও ততটাই অতিরিক্ততা ও বাড়াবাড়ি ছিল। আকীদা-বিশ্বাস ও বাস্তবতা সম্পর্কে এরাও দুর্বল ঈমানের, উদার ও মুক্ত বুদ্ধির অধিকারী ছিল। ধর্মীয় আইন-শৃঙ্খলা, আমল ও প্রথা-পদ্ধতির প্রতি বিশেষ কোন শ্রদ্ধা ও মর্যাদাবোধ ছিল না। জাতীয়তা ও স্বাদেশিকতাবোধের আতিশয্য রোমকদের মধ্যেও পাওয়া যেত এবং অধিকন্তু শক্তির প্রতি সম্মানবোধ ইবাদত ও পবিত্রতার পর্যায়ে পৌঁছে ছিল।

রোমক ইতিহাস থেকে জানা যায়, রোমকরা তাদের ধর্ম ও আকীদা-বিশ্বাসের ক্ষেত্রে দৃঢ় বিশ্বাসী ছিল না। আর এ ব্যাপারে তাদের করারও কিছু ছিল না। কেননা যে সমস্ত শেরেকী ও কুসংস্কারপূর্ণ ধর্ম রোমে প্রচলিত ছিল তার দাবি ছিল এই যে, রোমকরা জ্ঞানের জগতে যে পরিমাণ উন্নতি করবে, তাদের মস্তিষ্ক যে পরিমাণ আলোকোজ্জ্বল হবে ঠিক ততটাই সেই ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাবোধে ঘাটতি দেখা দেবে। তারা যেন প্রথম থেকেই সিদ্ধান্ত নিয়ে রেখেছিল যে, দেবতাদের রাজনৈতিক ও পার্থিব বিষয়াদির সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই। সিসেরো বলেন, থিয়েটারে যখন এ ধরনের বিষয়বস্তুর ওপর কবিতা পাঠ করা হতো, দেবতাদের জাগতিক বিষয়াদিতে কোন ভূমিকা নেই, করার কিছু নেই তখন লোকে অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে শুনত।[১] সেন্ট অগাস্টিন (Augustine) প্রমুখ বিস্ময়ের সঙ্গে বলেন, এই সব রোমান মূর্তিপূজক মন্দিরে তো দেবতাদের পূজা করত, আবার নাট্যমঞ্চে তাদের নিয়েই ঠাট্টা-মস্করা করত।[২] রোমান ধর্মের নিয়ন্ত্রণ তাদের অনুসারীদের ওপর এতটা শিথিল হয়ে গিয়েছিল এবং ধর্মীয় আবেগ-উদ্দীপনা এতটা শীতল হয়ে গিয়েছিল যে, লোকেরা কোন কোন সময়

1. Lecky: History of European Morals. London 1869.1. vol. P. 178
2. Lecky: History of European Morals, p. 179.

দেবতাদের সাথে বেয়াদবী ও উত্তেজিত হয়ে গোস্তাখী করতে এতটুকু ইতস্তত বা পরওয়া করত না। লেকী বলেন, ধর্মের নৈতিক প্রভাব প্রায় নিঃশেষই হয়ে গিয়েছিল, পবিত্রতার প্রেরণা প্রায় নিশ্চিহ্নই হয়ে যায় এবং এর দৃশ্য সবারই দৃষ্টিগোচর হতে থাকে। অনন্তর অগাস্টাস-এর নৌবহর যখন নিমজ্জিত হয়ে যায় তখন সে ক্রোধান্বিত হয়ে সমুদ্র দেবতা নেপচুনের মূর্তি ভেঙে চুরে চুরমার করে দেয়। যখন জার্মানিকাসের মৃত্যু হলো তখন লোকে দেবতাদের পূজামণ্ডপে গিয়ে অবাধে প্রস্তর বর্ষণ করে।[১]

রোমকদের নৈতিক চরিত্র, আচার-আচরণ, রাজনীতি ও সমাজে ধর্মের কোন প্রভাব, তাদের অনুভূতি ও প্রবণতার ওপর এর কোন প্রকার কর্তৃত্ব অবশিষ্ট ছিল না। ধর্মের মধ্যেও কোন গভীরতা ছিল না, ছিল না কোন শক্তি-সামর্থ্য যে, তা দিলের গভীরে প্রবেশ করবে এবং আত্মার ওপর, রূহের ওপর রাজত্ব করবে। এ কেবলই এক অনুষ্ঠান সর্বস্ব প্রথায় পরিণত হয়ে গিয়েছিল। রাজনীতি ও সামাজিক কল্যাণ উপযোগিতার দাবি ছিল এই, নামসর্বস্ব হলেও ধর্মের অস্তিত্ব কোন না কোনরূপে হলেও অবশিষ্ট থাকুক। লেকী আরও বলেন,

The Roman religion was purely selfish. It was simply a method of obtaining prosperity, averting calamity and reading the future. Ancient Rome prooduced many heroes but no saints. Its self-sacrifice was patriotic, not religious. Its religion was neither an independent teacher nor a source of inspiration.

"রোমক ধর্ম ছিল স্বার্থপরতাসর্বস্ব ও আত্মকেন্দ্রিক। এর লক্ষ্য এর অধিক ছিল না যে, কী করে প্রাচুর্য লাভ করা যায়, দুঃখ-কষ্ট ও বিপদ-আপদের হাত থেকে নিরাপদ থাকা যায় এবং ভবিষ্যত সম্পর্কে জানা যায়। অনন্তর এরই প্রতিক্রিয়া ছিল যে, রোম বহু বীর পুরুষের জন্ম দিয়েছে বটে, কিন্তু আত্মত্যাগী সাধক পুরুষ একজনও জন্ম দিতে সক্ষম হয়নি। এখানে আত্মত্যাগ ও আত্মোৎসর্গের সর্বোচ্চ যেই নজীর পাওয়া যায় তাও ধর্মের প্রভাব ও প্রেরণায় নয়, বরং স্বদেশপ্রেমের প্রেরণায়। ওদের ধর্ম স্বাধীন নয়, নয় প্রেরণার উৎস।"[২]

রোমকদের একটি বড় বৈশিষ্ট্য হলো তাদের রাজতন্ত্রপ্রীতি, সাম্রাজ্যবাদী মানসিকতা, জীবন সম্পর্কে নির্ভেজাল বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গি। এটাই সেই উত্তরাধিকার যা বর্তমান য়ুরোপ তার রোমক পূর্বসূরীদের থেকে পেয়েছে। প্রখ্যাত জার্মান নওমুসলিম আল্লামা মুহাম্মদ আসাদ Islam at the Crossroad (সংঘাতের মুখে ইসলাম) নামক গ্রন্থে বলেন ঃ

"....... the underlying idea of the Roman Empire was the conquest of power and the exploitation of other nations for the benefit of the mother

country alone. To promote better living for a previleged group, no violence was for the Romans too bad, no injustice too base. The famous 'Roman Justice' was justice for the Romans alone. It is clear that such an attitude was possible only on the basis of an entirely materialistic conception of life and civilization—a materialism certainly refined by an intellectual taste, but none the less foreign to all spiritual values. The Romans never in reality knew religion. Their traditional gods were a pale imitation of the Greek mythology, colöurless ghosts silently accepted for the benefit of social convention. In no way were the gods allowed to interfere with real life. They had to give oracle through the medium of their priests if they were asked; but they were never supposed to confer moral laws upon men."

"রোম সাম্রাজ্যের ওপর যেই বিশেষ ধারণা আসন গেড়ে বসেছিল তা ছিল শুধুই ক্ষমতা লাভের দুর্নিবার বাসনা, কেবলই রাজ্য ও রাজত্ব লাভ, অপরাপর দেশ ও জাতিগোষ্ঠীকে নির্মম ও নিষ্ঠুরভাবে শোষণ করে নিজ দেশের শ্রীবৃদ্ধি সাধন, ওলট পালটের মাধ্যমে স্বজাতির সম্পদ স্ফীতকরণ। রোমক নেতৃবর্গ, আমীর-উমারা ও উচ্চ শ্রেণীর লোকেরা নিজেদের প্রাচুর্য ঘেরা ও বিলাসী জীবন যাত্রার প্রয়োজনীয় উপায়-উপকরণ সংগ্রহের জন্য কোন প্রকার জুলুম ও নিষ্ঠুর আচরণকেই দূষণীয় মনে করত না। রোমকদের ন্যায়-বিচার ও ইনসাফের যে বিশ্বজোড়া খ্যাতি তা ছিল কেবল রোমকদের জন্যই নির্দিষ্ট। এই নির্দিষ্ট জীবনাচার ও চরিত্র জীবন ও কৃষ্টির কেবল বস্তুবাদী ধ্যান-ধারণা ও চিন্তা-চেতনার ওপরই কায়েম হতে পারত। যদিও তাদের বস্তুবাদী চেতনা ও ধ্যান-ধারণার মধ্যে কিছুটা সাজ-সজ্জা ও রুচির সৌন্দর্য ও পরিচ্ছন্নতা সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল–কিন্তু তা সব রকমের আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ থেকে একেবারেই সম্পর্কহীন ছিল, অপরিচিত ছিল। রোমকরা কখনোই গভীরভাবে ভেবে-চিন্তে ও নিষ্ঠা সহকারে ধর্ম-জীবন এখতিয়ার করেনি। তাদের অনুসরণীয় ও অনুকরণীয় দেবতা ছিল শুধুই গ্রীক গল্প-উপাখ্যান ও নানান কল্প-কাহিনীর ফিকে অনুকরণ। তারা শুধুই নিজেদের সামাজিক সংহতি ও জাতীয় ঐক্যের ধারণায় সেসব আরওয়াহ মেনে নিয়েছিল। তারা সেসব দেবতাকে নিজেদের বাস্তব জীবনে ও কর্মের ময়দানে নাক গলাবার অনুমতি দিত না। তাদের কাজ কেবল এতটুকু ছিল যে, যখন তাদের কাছে চাওয়া হবে তখন তারা তাদের মন্দিরের পূজারী-পাণ্ডাদের মৌখিক ভবিষ্যদ্বাণী করে দেবে। কিন্তু তাদেরকে তারা এই অধিকার কখনো দেয়নি যে, তারা জনগণের ওপর নৈতিক বিধি-নিষেধ আরোপ করবে।"[১]

1. Muhammad Asād: Islam at the Crossroad, P. 38-39

গণতান্ত্রিক যুগের শেষ দিকে রোমে নৈতিক ও চারিত্রিক অধঃপতন, পাশবিক কামনা-বাসনার অবাধ রাজত্ব এবং বিত্ত-বৈভবের এমন এক প্লাবন এসে দেখা দিল যে, রোমকরা তার মধ্যে একেবারে ডুবে গেল এবং সেই নৈতিক শৃঙ্খলা ও বিধানসমূহ যেগুলো রোমক জাতির প্রাথমিক বৈশিষ্ট্য ছিল, খড়কুটোর মত ভেসে গেল এবং সংহতির প্রাসাদে এমন কাঁপন সৃষ্টি করল, মনে হল এই বুঝি তা ভূমিতে ধ্বসে পড়বে। ড. ড্রেপার তাঁর History of the conflict between Religion and Science নামক গ্রন্থে এর যে ছবি এঁকেছেন তা নিম্নরূপ ঃ

"When the Empire in a military and political sense had reached its culmination, in a religious and social aspect it had attained its height of immorality. It had become thoroughly epicurean; its maxim was that life should be made a feast, that virtue is only the seasoning of pleasure, and temperance the means of prolonging it. Dining-rooms glittering with gold and incrusted with gems, slaves and superb apparel, the fascinations of feminine society where all the women were dissolute, magnificent baths, theatres, gladiators—such were the objects of Roman desire. The conquerors of the world had discovered that the only thing worth worshipping is Force. By it all things might be secured, all that tool and trade had laboriously obtained. The confiscation of goods and lands, taxation of provinces, were the reward of successful warfare; and the emperor was a symbol of Force. There was a social splendour, but it was the phosphorescent corruption of the Ancient Mediterranean world."

"সামরিক শক্তি ও রাজনৈতিক প্রভাবের দিক দিয়ে রোম সাম্রাজ্য যখন উন্নতির শীর্ষে গিয়ে উপনীত হল তখন ধর্মীয় ও সামাজিক দিক থেকে তার আরাম-আয়েশ ও নৈতিক ও চারিত্রিক অবস্থা অবনতির শেষ ধাপে পৌঁছে গেছে। রোমকদের বিলাসপ্রীতির কোন সীমা-পরিসীমা ছিল না। তাদের নীতি ছিল এই যে, মানুষ তার জীবনকে একটি বিরতিহীন ভোগ-বিলাস বানিয়ে দেবে। পাক-পবিত্রতা ও নীতি-নৈতিকতা দস্তরখানের ওপর নিমকদান বিশেষ এবং এক আধটু ভারসাম্য রক্ষা ও ভোগকে প্রলম্বিত করার জন্যেই। নানা প্রকার জওয়াহেরাত খচিত স্বর্ণ-রৌপ্যের পাত্রে তাদের দস্তরখান ঝলমল করতে দেখা যেত। তাদের কর্মচারী জরিখচিত দামী পোশাক পরিহিত অবস্থায় তাদের খেদমতের নিমিত্ত সদা প্রস্তুত থাকত। সাধারণভাবে সতীত্ব ও পবিত্রতার রৌপ্য জিঞ্জীরের বন্ধনমুক্ত রোমের সুন্দরীরা তাদের পানোন্মত্ত সাহচর্যের আনন্দ ও ফূর্তিকে চাঙ্গা করার নেশায় মত্ত থাকত। আলীশান হাম্মাম, চিত্তাকর্ষক বিনোদন কেন্দ্র, উৎসাহমুখর ও আবেগ-উদ্বেলিত মল্লভূমি, যেখানে মল্লবীরেরা কখনো একে

অন্যের সঙ্গে, আবার কখনো বন্য ও হিংস্র পশুর সঙ্গে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হতো এবং ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের শক্তি পরীক্ষা অব্যাহত থাকত যতক্ষণ না প্রতিপক্ষদ্বয়ের কোন এক পক্ষ রক্ত ও কাদামাটির মধ্যে হারিয়ে যেত, রোমকদের বিত্ত-বৈভবের উপকরণের আরও বৃদ্ধি ঘটাত। এসব বিশ্ববিজেতাদের অভিজ্ঞতার পর এটা জানা গিয়েছিল যে, পূজা-অর্চনার যোগ্য কোন বস্তু যদি থেকে থাকে তাহলে তা একমাত্র শক্তি। এজন্য যে, এই শক্তির বদৌলতেই ঐ সমস্ত পুঁজি ও সম্পদ অর্জন করা সম্ভব যা কায়িক পরিশ্রম ও ব্যবসা-বাণিজ্যের অব্যাহত ও প্রাণান্তকর প্রয়াস ও ঘাম ঝরানোর মাধ্যমে সৃষ্টি হয়েছে। বিত্ত-সম্পদের অধিকার ও রাজস্বপ্রাপ্তি বাহুশক্তির বদৌলতে যুদ্ধে বিজয়ী হবারই অনিবার্য ফল-ফসল এবং রোমক সাম্রাজ্যের শাসকবৃন্দ এই অসীম শক্তিমত্তারই প্রতীক। মোটকথা, রোমকদের সাংস্কৃতিক নীতি-রীতির মধ্যে শান-শওকতের একটি ঝলক তো দেখতে পাওয়া যেত। কিন্তু এটা ছিল সেই চোখ ধাঁধানো ঝলক সদৃশ যা গ্রীসের পতন যুগের সভ্যতার ওপর চড়ে বসেছিল।"[১]

খ্রিস্ট ধর্মের আগমন ও রোমকদের খ্রিস্ট ধর্ম গ্রহণ

মূর্তিপূজক রোমক সাম্রাজ্যের ওপর খ্রিস্ট ধর্মের আসন গেড়ে বসা ছিল এমন এক বিপ্লবাত্মক ঘটনা যার গুরুত্ব কোন ঐতিহাসিক উপেক্ষা করতে পারেন না। ঘটনাটা এভাবে সংঘটিত হয়েছিল যে, রোমক সম্রাট কনস্টান্টাইন ৩০৫ খ্রি. রোমক সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। আর তার খ্রিস্ট ধর্ম গ্রহণের মাধ্যমে রোম সাম্রাজ্যে খ্রিস্ট ধর্ম আসন গাড়তে সক্ষম হয় এবং সেই সাথে আকস্মিকভাবেই সে এমন এক বিশাল বিস্তৃত সাম্রাজ্য, সীমাহীন ক্ষমতা ও এখতিয়ার লাভ করে যার স্বপ্নও সে কখনো দেখতে পারত না। সম্রাট কনস্টান্টাইন খ্রিস্টানদের সীমাহীন ত্যাগ-তিতিক্ষা ও কুরবানীর মাধ্যমে সিংহাসন লাভ করেছিলেন বিধায় সিংহাসন লাভের পর তিনি তাদেরকে এর উপযুক্ত বিনিময় প্রদান করেন এবং সাম্রাজ্যে তাদেরকে অংশীদারিত্ব দান করেন।

খ্রিস্ট ধর্মে মূর্তিপূজার মিশ্রণ

কিন্তু আসলে তা খ্রিস্ট ধর্মের জন্য কোন স্মরণীয় ঘটনা ছিল না, বরং তা ছিল এক বিরাট অশুভ ঘটনা। সে বিশাল রোম সাম্রাজ্য লাভ করল বটে, কিন্তু এর বিনিময়ে খ্রিস্ট ধর্মের মূল্যবান পুঁজিই সে খুইয়ে বসল। খ্রিস্টানরা যুদ্ধের ময়দানে

1. Draper, History of the Conflict between Religion and Science p. 31-32.

সফল হল বটে, কিন্তু দীন-ধর্মের ময়দানে তারা পরাজিত ও পর্যুদস্ত হলো। রোমক মূর্তিপূজারী ও স্বয়ং খ্রিস্টানরা হযরত ঈসা মসীহ (আ)-এর আনীত ধর্মকে বিকৃত করে দিল। আর এ ব্যাপারে সব চাইতে বড় ভূমিকা ছিল স্বয়ং খ্রিস্ট ধর্মের প্রসিদ্ধ রক্ষক ও পতাকাবাহী সম্রাট কনস্টান্টাইনের। ড্রেপারের ভাষায় ঃ

"Place, power, profit—these were in view of whoever now joined the conquering sect. Crowds of worldly persons, who cared nothing about its religious ideas, became its warmest supporters. Pagans at heart, their influence was soon manifested in the paganization of Christianity that forhwith ensued. The Emperor, no better than they, did nothing to check their proceedings. But he did not personally conform to the ceremonial requirements of the Church until the close of his evil life, A. D. 337."1

"Though the Christian party had proved itself sufficiently strong to give a master to the Empire, it was never sufficiently strong to destroy its antagonist, paganism. The issue of struggle between them was an amalgamation of the principles of both. In this, Christianity differed from Mohammedanism which absolutely annihilated its antagonist and spread its own doctrines without adulteration."2

"To the Emperor—a mere worldling—a man without any religious convictions, doubtless it appeared best for himself, best for the Empire, and best for the contending parties, Christian and pagan, to promote their union or amalgamation as much as possible. Even sincere Christians do not seem to have been averse to this; perhaps they believed that the new doctrines would diffuse most thoroughly by incorporating in themselves ideas borrowed from the old, that Truth would assert herself in the end and the impurity be cast off."3

"সফল ও বিজয়ী দলের সাথে যারাই হাত মেলাল এবং যে কেউ তাদের সঙ্গে শরীক হলো তারাই বড় বড় পদ লাভ করল এবং বিরাট বিরাট সম্মান ও পদ-মর্যাদার অধিকারী হলো। ফল দাঁড়াল এই যে, যে দুনিয়াদার লোকেরা ধর্মের বিন্দুমাত্র পরওয়াও করত না তারাই খ্রিস্ট ধর্মের উৎসাহী সমর্থকে পরিণত হলো। যেহেতু তারা বাহ্যত খ্রিস্টান ছিল, কিন্তু ভেতরে ভেতরে ছিল মূর্তিপূজারী ও মুশরিক, ফলে তাদের প্রভাবে খ্রিস্ট ধর্মের মধ্যে মূর্তিপূজা ও শেরেকী উপাদানের মিশ্রণ শুরু হলো। কনস্টান্টাইন মতাদর্শগত দিক দিয়ে যেহেতু তাদেরই সমগোত্রীয় ছিলেন– এমন কোন পথ গ্রহণ করেন নি যদ্দারা তাদের এই মুনাফিকসুলভ ও প্রতারণামূলক কর্মকাণ্ডের প্রতিবিধান করা যায়। কনস্টান্টাইনের

গোটা জীবনটাই পাপাচারের মধ্যে অতিবাহিত হয়। জীবনের শেষ পর্যায়ে (মৃত্যু ৩৩৭ খ্রি.) এসে তিনি ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে কিছুটা আনুগত্যের পরিচয় দেন যেসব আচার-অনুষ্ঠান পালনের জন্য গির্জা তাকীদ করত।"[১]

"যদিও খ্রিস্টান দল এতটা শক্তিশালী হয়ে গিয়েছিল যে, যাকেই তারা নিজেদের স্বার্থোদ্ধারের পক্ষের লোক ভেবেছে তাকেই সিংহাসনে বসিয়ে দিয়েছে। কিন্তু তথাপিও এই শক্তি ও ক্ষমতা তাদের অর্জিত হয়নি যে, তাদের প্রতিপক্ষ অর্থাৎ মূর্তিপূজাকে সম্পূর্ণরূপে উৎসাদন করবে। ফলে পারস্পরিক দ্বন্দ্বের ফল দাঁড়াল এই, উভয়ের নীতি ও আদর্শ পরস্পরের মধ্যে মিশে গেল এবং এক নতুন ধর্মমতের উদ্ভব ঘটল যার ভেতর মূর্তিপূজা ও খ্রিস্ট ধর্ম উভয় কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়িয়ে গেল। খ্রিস্ট ধর্ম ও ইসলামের মধ্যে এ ব্যাপারে যেই বড় রকমের পার্থক্য তাহলো, ইসলাম তার প্রতিপক্ষ অর্থাৎ মূর্তিপূজা ও পৌত্তলিকতাকে একেবারে জড়েমূলে উৎখাত করে দেয় এবং আপন আকীদা-বিশ্বাস কোনরূপ ভেজাল ও মিশ্রণ ছাড়াই প্রকাশ করে।"[২]

"এই দুনিয়াসর্বস্ব সম্রাট, যার ধর্মীয় আকীদা-বিশ্বাস বিন্দুমাত্র মূল্যও বহন করত না, নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থ, সাম্রাজ্যের কল্যাণ ও উভয় পরস্পর-বিরোধী দল অর্থাৎ খ্রিস্টান ও মূর্তিপূজারীদের মঙ্গল এর ভেতর দেখতে পান যে, যতদূর সম্ভব এসবের মধ্যে মিলন ও সমঝোতা সৃষ্টি করা যাক। কট্টর ও গোড়া খ্রিস্টানদেরও এরূপ কর্মকৌশল গ্রহণে কোনরূপ আপত্তি ছিল না। সম্ভবত তারা মনে করত, নতুন শিক্ষামালার সাথে পুরনো আকীদা-বিশ্বাসের সংমিশ্রণের ফলে নতুন ধর্ম দ্রুত উন্নতি করবে এবং শেষ পর্যন্ত নাপাক আবর্জনার মিশ্রণ থেকে পাক-সাফ হয়ে কেবল সত্যিকার ধর্মই অবশিষ্ট থাকবে।"[৩]

খ্রিস্ট ধর্মের স্পিরিট ও সৌন্দর্যবিবর্জিত পৌত্তলিকতা ও খ্রিস্ট ধর্মের এই জগাখিচুড়ি সালসা এর উপযোগী ছিল না যে পতনোন্মুখ রোমকদের জীবন, চরিত্র ও আখলাককে তা সামাল দেবে এবং তাদের ভেতর পূত-পবিত্র ধর্মীয় জীবনের প্রাণ সঞ্চার করবে এবং রোমকদের ইতিহাসে এক নতুন গৌরবোজ্জ্বল যুগের সূচনা ঘটাবে। এর বিপরীতে সে বৈরাগ্যবাদের এক নতুন বিদআত আবিষ্কার করে যা সম্ভবত মানবতা ও সভ্যতা-সংস্কৃতির জন্যে পৌত্তলিক রোমকদের পাশবিকতার চেয়েও বেশী দুর্বহ বোঝা হিসেবে দেখা দিয়েছিল। য়ূরোপের

---

1. J. W. Draper, History of the Confilict between Religion and Science, 1927, p-34-35.
২. প্রাগুক্ত, পৃ, ৪০.
৩. প্রাগুক্ত, ৪০-৪১।

বস্তপূজা ও ধর্মহীনতার বিস্তারের মধ্যে মানুষের জন্য ক্ষতিকর ও ব্যাধিতুল্য এবং মানব প্রকৃতির শত্রু এই বৈরাগ্যবাদের অনেকখানি ভূমিকা রয়েছে। এজন্য বিষয়টি কিছুটা বিশদভাবে আলোচনা হবার দরকার রয়েছে।

বৈরাগ্যবাদের খেপামি ও পাগলামী

বৈরাগ্যবাদের মধ্যে এতটা বাড়াবাড়ি ও সীমাতিরিক্ততা সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল যে, এ যুগে তা কল্পনায় আনাও কষ্টকর। ড্রেপার তাঁর গ্রন্থে এর যে ভয়াবহ চিত্র তুলে ধরেছেন তার থেকে আমরা এখানে নমুনাস্বরূপ কিছুটা বিবরণ তুলে ধরছি।

সংসারবিরাগী পণ্ডিত ও সাধু-সন্ন্যাসীদের মোটামুটি সংখ্যা কোথায় গিয়ে পৌঁছেছিল তা নিয়ে ঐতিহাসিকদের মতানৈক্যের কারণে অকাট্যভাবে তা বলা না গেলেও তাদের আধিক্য ও বৈরাগ্যবাদী আন্দোলনের প্রচার ও জনপ্রিয়তার পরিমাপ নিম্নোদ্ধৃত পরিসংখ্যান থেকে করা যেতে পারে। সেন্ট জারূমের আমলে ইস্টার উৎসব অনুষ্ঠানে আনুমানিক পঞ্চাশ হাজার সাধু-সন্ন্যাসীর সমাবেশ ঘটত। চতুর্থ শতাব্দীতে কেবল একজন মোহন্তের অধীনে পাঁচ হাজার সন্ন্যাসী ছিল। সেন্ট সেরাপীনের অধীনে ছিল দশ হাজার সাধু-সন্ন্যাসী এবং ৪র্থ শতাব্দীর সমাপ্তিতে তো এই হালত হয়ে গিয়েছিল যে, যেই পরিমাণ জনবসতি স্বয়ং মিসরের শহরগুলোতে ছিল প্রায় ততটা পরিমাণই ছিল ঐসব সংসারবিরাগী ও সাধু-সন্ন্যাসীদের সংখ্যা। দু'চার বছরের নয়, পুরো দু'শ বছর পর্যন্ত দৈহিক ও শারীরিক নিগ্রহকে চূড়ান্ত নৈতিকতা মনে করা হতে থাকে। ঐতিহাসিকগণ এসবের লোমহর্ষক বিবরণ লিপিবদ্ধ করে গেছেন। আলেকজান্দ্রিয়ার সেন্ট ম্যাকারিয়স সম্পর্কে প্রসিদ্ধ জনশ্রুতি এ রকম, তিনি ছ'মাস যাবত পুঁতিগন্ধময় নোংরা স্থানে ঘুমুতেন যাতে বিষাক্ত মশা-মাছি তার নগ্নদেহকে কামড়ায়। অধিকন্তু তিনি এক মণ ওজনের লোহা সব সময় বহন করতেন। তারই অনুরক্ত শিষ্য সেন্ট ইউসিস প্রায় দু'মণ ওজনের লোহা বয়ে বেড়াতেন এবং তিন বছর যাবত একটি শুকিয়ে যাওয়া কুয়ার মধ্যে অবস্থান করেন। বিখ্যাত সাধু যোহন সম্পর্কে কথিত আছে, তিনি লাগাতার তিন বছর দাঁড়িয়ে ইবাদত-বন্দেগী করেন। একটা মুদ্দত পর্যন্ত তিনি মুহূর্তের তরেও না বসেছেন, আর না শুয়েছেন। যখন খুবই ক্লান্ত হয়ে পড়তেন তখন প্রস্তর খণ্ডে হেলান দিয়ে একটু জিড়িয়ে নিতেন। কোন কোন সাধু-সন্ন্যাসী সম্পর্কে তো এ পর্যন্ত বর্ণিত হয়েছে যে, তারা শরীরে কোন রকম কাপড় ব্যবহার করত না। লম্বা চুল দিয়ে সতর ঢাকত এবং চতুষ্পদ জন্তুর মত হামাগুড়ি দিয়ে পথ চলত। সাধারণত তারা সে সময় ঘরবাড়িতে বসবাস করত না, বরং হিংস্র বন্য প্রাণীর গুহা, কুয়া কিংবা নির্জন কবরস্থানে তারা বাস করত। সংসারবিরাগী সাধু-সন্ন্যাসীদের একটি দল কেবল ঘাস-পাতা

খেয়ে জীবন ধারণ করত। শারীরিক পবিত্রতাকে আধ্যাত্মিক পবিত্রতার পরিপন্থী ধারণা করা হতো এবং যেই সাধু সংসারনির্লিপ্ততা ও বৈরাগ্যবাদের ক্ষেত্রে যত দ্রুত উন্নতি করত ঠিক সেই পরিমাণ দুর্গন্ধ ও ময়লা আবর্জনার আধার হতো। সেন্ট এনথানাসিয়াস অত্যন্ত গর্বের সাথে বর্ণনা করেছেন, সেন্ট এন্টনী বয়োবৃদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও দীর্ঘকাল পর্যন্ত পা ধোয়ার মত পাপে লিপ্ত হননি। সেন্ট আবরাহাম পঞ্চাশ বছরের খ্রিস্টীয় সাধনার যিন্দেগীতে নিজের চেহারায় কিংবা পায়ের পাতার ওপর পানির ছিঁটাটুকুও পড়তে দেননি। সাধু আলেকজান্ডার অত্যন্ত আফসোস ও বিস্ময়ের সঙ্গে বলেন, এমন একটা যমানা ছিল যখন আমাদের পূর্বসূরিগণ মুখ ধোয়াকে হারাম মনে করতেন, পক্ষান্তরে এখন আমরা হাম্মামে যাই।

সাধু-সন্ন্যাসীরা (রাহেবগণ) শিক্ষকের বেশ ধারণ করে ইতস্তত ঘোরাফিরা করত এবং ছোট ছোট বাচ্চাকে ফুসলিয়ে নিজেদের দলে ঢোকাত। পিতা-মাতার তাদের সন্তানদের ওপর কোন অধিকার ছিল না। যেসব সন্তান আপন পিতা-মাতাকে ছেড়ে সংসার-বিরাগী হয়ে যেত তাদের নামে চতুর্দিকে জনসাধারণ বাহ্বা দিত। প্রথমে যে আছর ও প্রভাব-প্রতিপত্তি সম্মানিত খান্দান ও পিতামাতা লাভ করত তা এখন পাদরী ও সাধু-সন্ন্যাসীদের দিকে স্থানান্তরিত হতো। পাদ্রীরা বৈরাগ্য ও সন্ন্যাসবাদের নিমিত্ত বালকদের অপহরণ করত। সেন্ট এ্যামব্রোসে এ ধরনের অপহরণের ঘটনা এত বৃদ্ধি পেয়েছিল যে, তা লক্ষ্য করে মায়েরা আপন আপন শিশু-সন্তানদের ঘরে আটকে রাখত।

বৈরাগ্যবাদের আন্দোলনের নৈতিক পরিণত হলো এই, পুরুষোচিত ও বীরোচিত গুণাবলী দূষণীয় হিসেবে অভিহিত হলো। আধ্যাত্মিক সাধনায় লিপ্ত সাধক প্রসন্নতা, স্পষ্টবাদিতা, বদান্যতা, বীরত্ব, সাহসিকতা প্রভৃতি গুণাবলীর কখনো ধারে কাছেও ঘেঁষে নি। সন্ন্যাসমূলক জীবন যাপন পদ্ধতির দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ পরিণতি হলো এই, পারিবারিক জীবনের ভিত্তি নড়বড়ে হয়ে গেল এবং মানুষের দিল থেকে আত্মীয়-স্বজনের প্রতি সম্ভ্রমবোধ উঠে গেল। এই যুগে মা-বাপের প্রতি অকৃতজ্ঞতা ও আত্মীয়-স্বজনের সাথে হৃদয়হীনতার নজীর এত অধিক পরিমাণে দৃষ্টিগোচর হয় যার পরিমাপ করাটাও কঠিন। মঠবাসী এই সব সাধু-সন্ন্যাসী ও আধ্যাত্মিক সাধনায় লিপ্ত সাধকরা নিজেদের মায়েদের অন্তরেও ব্যথা দিত, স্ত্রীর হক নষ্ট করত, নিজ সন্তানদেরকে অভিভাবকহীনভাবেও ওয়ারিশ অবস্থায় অন্যের ওপর ছেড়ে দিত। তাদের জীবনের চরম লক্ষ্যটাই হতো এই, স্বয়ং তাদের যেন পারলৌকিক মোক্ষ লাভ ঘটে। তাদের এ ব্যাপারে আদৌ কোন মাথা ব্যথা ছিল না, তাদের সঙ্গে সম্পর্কিত ও তাদের ওপর নির্ভরশীল পরিবারের লোকজন বাঁচল নাকি মরল। এ ব্যাপারে লেকী যেসব ঘটনার উল্লেখ করেছেন তা পাঠে আজও মানুষের চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে ওঠে। মেয়েদের ছায়া দেখলেও

তারা পালাত। কখনো দৈবক্রমে মেয়েদের ছায়াপাত ঘটলে অথবা রাস্তায় কিংবা গলিপথে কোন মহিলার আকস্মিক মুখোমুখি হয়ে গেলে তারা ভাবত, তাদের সারা জীবনের আরাধনা-উপাসনা ও সাধনা সব মাটি হয়ে গেল, এমন কি নিজের মা ও সহোদর বোনের সাথে কথা বলাকেও তারা মহাপাপ মনে করত। লেকী এ প্রসঙ্গে যেসব ঘটনা, লিপিবদ্ধ করেছেন তা পড়লে কখনো হাসি পায়, আবার কখনো কান্নাও আসে।

নীতি-নৈতিকতা ও সভ্যতা-সংস্কৃতির ওপর স্বভাব-বিরুদ্ধতার প্রভাব

এমনটি ধারণা করা ঠিক হবে না, এই চরম সন্ন্যাস ও বৈরাগ্যবাদ রোমকদের বস্তুবাদী মানসিকতার তীব্রতা ও বাড়াবাড়ি এবং পশুসুলভ কামনা-বাসনার মধ্যে কিছুটা ভারসাম্য ও ত্রাস সৃষ্টি করে থাকবে। না, সাধারণত এমনটা হতো না। ব্যাপারটা মানবীয় প্রকৃতির বিরোধী এবং বিভিন্ন ধর্ম ও নৈতিকতার অভিজ্ঞতা এর বিপরীত। মূলত যেসব জিনিস বিদ্রোহী বস্তুবাদের মধ্যে ভারসাম্য সৃষ্টি করত তাকে একটি সুষম জীবনে রূপান্তরিত করতে পারে, তা কেবল এমন আধ্যাত্মিক, ধর্মীয় ও নৈতিক প্রজ্ঞামূলক ব্যবস্থা যা মানুষের সুস্থ প্রকৃতির অনুকূল হবে এবং তার প্রকৃতিকে আমূল পরিবর্তনের ব্যাপারে অনড় হবে না, তার লক্ষ্য মিটিয়ে দেওয়া হবে না, লক্ষ্য হবে বরং গতিপথ ঘুরিয়ে দেয়া, ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করা। তার দিক মন্দের দিক থেকে ভালোর দিকে, অকল্যাণের দিক থেকে কল্যাণের দিকে পাল্টে দেবে। ইসলামের কর্মপন্থা এবং মহানবী সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের মুবারক আদর্শ এটাই। আরবরা ছিল বীর বাহাদুর ও যুদ্ধপ্রিয়। তিনি তাদের বীরত্বকে শীতল ও নিষ্প্রভ করে দেননি, বরং শুধু এতটুকু করেছেন যে, গোত্রীয় গৃহযুদ্ধ ও জাহেলী প্রতিশোধ-স্পৃহা থেকে মোড়-ঘুরিয়ে তা জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ্ ও আল্লাহ্র কলেমাকে বুলন্দ করার দিকে ঘুরিয়ে দিয়েছেন। আরবরা জন্মগতভাবেই অত্যন্ত দানশীল ও উন্নত মনোবলের অধিকারী ছিল। কিন্তু তাদের দানশীলতা ও উন্নত মনোবল গর্ব ও যশ-খ্যাতির পেছনে ব্যয়িত হতো। তিনি তা আল্লাহ্র পথে ব্যয় করার কাজে লাগিয়ে দিলেন। মোট কথা, তিনি তাদের জাহেলী বৈশিষ্ট্য, নীতি-নৈতিকতা ও আচার-আচরণকে ইসলামী ছাঁচে ঢেলে দিলেন এবং সেগুলোকে উপকারী ও কার্যকর প্রয়োজনীয় বস্তু বানিয়ে দিলেন। তিনি জাহেলিয়াতের পরিবর্তে ইসলামের পরিপূর্ণ নিজাম ও প্রতিটি বস্তুর উত্তম বিনিময় প্রদান করলেন। স্বভাব ও প্রবৃত্তিকে সজীবতা ও ক্রীড়া-কৌতুকের সুযোগও দান করলেন এজন্য যে, একজন জলীলুল কদর আলেম (শায়খুল ইসলাম হাফিজ ইবনে তায়মিয়ার)-এর বিখ্যাত উক্তিঃ মানবীয় স্বভাব ও প্রকৃতি সর্বদাই কোন জিনিস থেকে কেবল তখন হাত গুটিয়ে নেয় এবং তার ওপর দাবি

পরিত্যাগ করে তখন যখন সে এর বিকল্প পায়। মানুষ স্বভাবতই কিছু করার জন্যই জন্ম নিয়েছে এবং তার স্বভাবের দাবি ও চাহিদা হলো কাজ ও কর্মের মধ্যে ডুবে যাওয়া। নিষ্ক্রিয় ও স্থবির হয়ে যাওয়া মানুষের স্বভাব ও প্রকৃতিবিরুদ্ধ।[১] আম্বিয়ায়ে কিরাম (আ) মানুষের স্বভাব-প্রকৃতি বদলে দেবেন বলে আসেন নি, বরং তাকে পূর্ণতা দানের জন্য এসেছিলেন।[২]

وان الانبياء قد بعثوا بتكميل الفطرة وتكريرها لا تبديلها وتغيرها

হাদীস ও সীরাত গ্রন্থে এর বহু দৃষ্টান্ত মিলবে। মহানবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়া সাল্লাম যখন মদীনা মুনাওয়ারায় আগমন করেন তখন সে সময় মদীনাবাসীদের দুটো পর্ব ছিল যে উপলক্ষে তারা আনন্দ-উল্লাস ও আমোদ-প্রমোদে মত্ত হতো। তিনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমাদের এ দু'দিন কেমন অর্থাৎ এই দু'দিনে তোমরা কি কর? উত্তরে লোকেরা বলল, আমরা জাহেলী যুগে এ উপলক্ষে আমোদ-প্রমোদ ও আনন্দ-উল্লাসে মত্ত হতাম। মহানবী (সা) বললেনঃ আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে এর চেয়ে উত্তম দুই দিন দান করেছেন ঃ ঈদুল আযহা ও ঈদুল ফিতর।[৩] হযরত আয়েশা (রা) বলেন, একবার ঈদের দিন আমার কাছে আনসারদের দু'টো বালিকা গান গাইছিল। গানের বিষয়বস্তু ছিল বু'আছ যুদ্ধ সম্পর্কিত। এরা গায়িকা ছিল না। ইতোমধ্যে হযরত আবূ বকর (রা) সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। তিনি বালিকা দু'টিকে গান গাইতে দেখে বললেন, আল্লাহ্র রাসূলের ঘরে শয়তানের গীত গাওয়া হচ্ছে? মহানবী (সা) তখন বললেন ঃ

يا ابابكر ان لكل قوم عيدا وهذا عيدنا دعهما يا ابابكر فانما ايام عيد -

আবূ বকর! প্রতিটি জাতিগোষ্ঠীর জন্য একটি উৎসবের দিন রয়েছে আর এটা হচ্ছে আমাদের উৎসব। অপর বর্ণনায় বলা হয়েছে, তিনি বলেন আবু বকর! ব্যাপারটা যেতে দাও। আজকের এই দিনটা ঈদের দিন।[৪]

পক্ষান্তরে রোমের খ্রিস্ট ধর্ম নিষ্ক্রিয় ও স্থবির প্রকৃতির পরিবর্তনে ও তা সমূলে ধ্বংস করার দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিল এবং এমন এক বিধান ও রীতি পেশ

---

১. ইবনে তায়মিয়া, কিতাব ইকতিযাউস-সিরাতাল-মুস্তকীম, ১৪২ পৃ.

২. ইবনে তায়মিয়া, কিতাবুন নুবুওয়াত।

৩. আবূ দাউদ, আহমদ, নাসাঈ।

৪. দ্র. বুখারী, সালাত অধ্যায়, হাদীছ নং ৯৫২, বায়হাকী ১০/৯৫২, ইব্‌ন মাজা, নিকাহ অধ্যায়

করল মানবীয় স্বভাব ও প্রকৃতি যার ভার বইতে পারল না। সে মনুষ্য শক্তির অতিরিক্ত এক বোঝা মানুষের কাঁধে চাপিয়ে দিল। রোমের আগের চরম বস্তুবাদের বিরুদ্ধে একটি প্রতিক্রিয়া হিসেবে লোকে একে ইচ্ছায় ও অনিচ্ছায় মেনে নেয়, কিন্তু সত্বরই এর হাত থেকে মুক্তি লাভ করে এবং চাপা পড়া মজলুম স্বভাব ও প্রকৃতি ভীষণ প্রতিশোধ নেয়। এই চরম বৈরাগ্যবাদ স্বভাব ও প্রকৃতির পরম সত্যকে এড়িয়ে যাওয়া এবং অপরিণামদর্শিতাবশত খ্রিস্ট ধর্ম লোকের আচার-আচরণ ও অভ্যাস এবং ধ্বংসোন্মুখ সভ্যতা-সংস্কৃতির পতনের হাত থেকে রক্ষা করতে পারেনি। অবস্থা ছিল এই যে, খ্রিস্টান দেশগুলোতে একই সময় অপরাধ প্রবণতা ও বল্গাহীন স্বাধীনতা এবং সন্ন্যাস ও বৈরাগ্যবাদের দুই পরস্পরবিরোধী আন্দোলন কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলছিল, বরং একথা বলাই অধিকতর সঙ্গত হবে যে, বৈরাগ্যবাদ মাঠে-ময়দানে তো নির্জনবাস করছিল এবং নাগরিক জীবনের ওপর তার কোন নিয়ন্ত্রণ বা কর্তৃত্ব ছিল না। পক্ষান্তরে অন্যায় ও পাপাচারের আন্দোলন শহরগুলোর অভ্যন্তরে খুব জোরেশোরে চলছিল। লেকী তদীয় History of European Morals নামক গ্রন্থে এর ছবি এঁকেছেন এভাবেঃ

"জনগণের নীতি-নৈতিকতার মাঝে চরম অবক্ষয় শুরু হয়েছিল। রাজদরবারের বিলাস ব্যসন ও ভোগ-বিলাসিতা, দরবারীদের গোলামী স্বভাব ও দাস্য মনোবৃত্তি, বেশভূষা ও সাজ-সজ্জাপ্রীতির রমরমা অবস্থা। তৎকালীন দুনিয়া চরম বৈরাগ্যবাদ ও চরম পাপাচারের নাগরদোলার মাঝে দুলছিল, বরং কোন কোন শহরে যেসব শহরে সর্বাধিক সংখ্যক সংসারবিরাগী সাধু-সন্তু জন্ম নিয়েছিল সেসব শহরেই বিলাস ব্যসন ও অনাচারের রাজত্ব চলছিল অবাধে। মোটের ওপর অনাচার, পাপাচার ও কুসংস্কারের এমন সমাবেশ ঘটেছিল যা ছিল মানুষের আভিজাত্য, শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ত্বের অকাট্য দুশমন। জনমত এমত পরিমাণ দুর্বল হয়ে গিয়েছিল যে, অপমান দুর্নামের কোন ভয় আর অবশিষ্ট ছিল না, বরং এসব লোকের মন থেকে একেবারে উঠেই গিয়েছিল। মানুষের মনে বিরাজিত ধর্মভয় তাকে অন্যায়-অনাচার থেকে বিরত রাখতে পারত, কিন্তু এই বিশ্বাস সেই ভয়-ভীতিকেও দূরীভূত করে দিয়েছিল যে, দোআ প্রভৃতির মাধ্যমে সর্বপ্রকার গোনাহ ও পাপ-তাপ মাফ হয়ে যেতে পারে। প্রতারণা, ধোঁকা, প্রবঞ্চনা ও মিথ্যা কথনের বাজার ছিল গরম যা সিজারদের যুগেও ছিল না। অবশ্য জুলুম-নির্যাতন, জোর-যবরদস্তি, নিষ্ঠুরতা, হৃদয়হীনতা ও নির্লজ্জতাও এতটা ছিল না। কিন্তু এর সাথে মুক্ত চিন্তা তথা চিন্তার স্বাধীনতা ও জাতীয়তাবাদী প্রেরণারও কমতি ছিল।"[১]

---

1. Lecky, History of European Morals, vol. 2. p. 162-3.

পাদ্রীদের দুর্নীতি ও অবাধ ভোগ-বিলাস

বৈরাগ্যবাদ ও ধর্মের এই নেতিবাচক ব্যবস্থা অনিবার্যভাবেই স্বভাব ও প্রকৃতি-বিরুদ্ধ ছিল। কিন্তু নতুন ধর্মের প্রভাব ও এর আধ্যাত্মিক ক্ষমতা স্বভাব ও প্রকৃতিকে দাবিয়ে রেখেছিল। কিন্তু অল্প দিন পরেই স্বয়ং ধর্মীয় কেন্দ্র ও হালকাগুলোর ভেতর সেই সমস্ত দোষ-ত্রুটি ও ভোগ-বিলাস শুরু হয়ে যায় যার বিরুদ্ধে বৈরাগ্য ও সন্ন্যাসবাদের আন্দোলন শুরু হয়েছিল, এমন কি তা নৈতিক অবক্ষয় ও অধঃপতন এবং স্বীয় প্রাচুর্য ও বিলাস পূজার ক্ষেত্রে নির্ভেজাল দুনিয়াদার লোকদের থেকেও অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছিল। ফলে হুকুমতকে বাধ্য হয়েই ঐসব ধর্মীয় দাওয়াতের ধারা বন্ধ করে দিতে হয় যার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল খ্রিস্টানদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ ও প্রেম-প্রীতি সৃষ্টি করা। ঠিক তেমনি শহীদ ও ওলী-আওলিয়ার ওরস ও মৃত্যু বার্ষিকী পালনের অনুষ্ঠানাদিও নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়। কেননা এই সব নির্ভেজাল ধর্মীয় অনুষ্ঠান অনাচার, পাপাচার ও নির্লজ্জতার আখড়ায় পরিণত হয়েছিল। বড় বড় পাদ্রীর বিরুদ্ধে বিরাট রকমের নৈতিক স্খলন ও চারিত্রিক অধঃপতনের অভিযোগ ছিল। সেন্ট জারূম বলেন, গির্জাধিপতি পাদ্রীদের ভোগ-বিলাসিতার সামনে আমীর-উমারা ও বিত্তবানদের ভোগ-বিলাসও লজ্জা পেত। স্বয়ং পোপও নৈতিক ও চারিত্রিক দোষে দুষ্ট ছিলেন এবং সম্পদের মোহ ও বিত্তের প্রতি আকর্ষণ তাকে এতটা পেয়ে বসেছিল যে, তিনি পদ ও পদমর্যাদা মামুলী বাণিজ্যিক পণ্যের ন্যায় বিক্রি করতেন, এমন কি কখনো কখনো তা নীলামেও তুলতেন। স্বর্গের পরওয়ানা জমি জিরাতের মামুলী দলীল-দস্তাবেযের ন্যায় পাপ মুক্তির পরওয়ানা, ক্ষমার সার্টিফিকেট, আইন লঙ্ঘনের অনুমোদন বা সনদ অবাধে বিক্রি হত। ধর্মীয় পদাধিকারীরা ছিল ভীষণ ঘুষখোর ও সুদখোর। বাহুল্য খরচ ও অপচয়ের অবস্থা এরূপ ছিল যে, পোপ ৭ম ইনোসেন্ট পোপের মুকুট বন্ধক রেখেছিলেন এবং পোপ ১০ম লিউ সম্পর্কে কথিত আছে, তিনি তিন জন পোপের আয়-আমদানী বাহুল্য খরচ করে উড়িয়ে দিয়েছিলেন অর্থাৎ তার পূর্বের পোপেরা যেসব বিত্ত-সম্পদ রেখে গিয়েছিলেন প্রথমে সেসব খরচ করেন। এরপর নিজের উপার্জিত সম্পদ খরচ করেন। এও যখন যথেষ্ট হলো না তখন তার উত্তরাধিকারীদের আয়-আমদানী আগাম উশুল করে খরচ করে ফেলেন। বর্ণিত আছে, ফ্রান্সের সমগ্র রাজস্বও ঐসব পোপদের ব্যয় সংকুলানের জন্য যথেষ্ট ছিল না।[১]

মোটকথা, গির্জার ইতিহাস, গির্জাধিপতিদের চরিত্র ও চালচিত্র কুরআনুল করীমের নিম্নোক্ত আয়াতের যেন সত্যিকার ব্যাখ্যা ছিল ঃ

1. Draper, History of the Canftict between Religion and Science. P.

يَٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ اٰمَنُوٓا اِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْاَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَاْكُلُوْنَ اَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ـ

"হে মু'মিনগণ! পণ্ডিত ও সংসারবিরাগীদের মধ্যে অনেকেই লোকের ধন-সম্পদ অন্যায়ভাবে ভোগ করে থাকে এবং লোককে আল্লাহ্‌র পথ থেকে নিবৃত্ত করে।" (সূরা তাওবা ঃ ৩৪)

গির্জা ও রাষ্ট্রের মধ্যে দ্বন্দ্ব-সংঘাত

খ্রি. একাদশ শতাব্দীতে গির্জা ও রাষ্ট্রের মধ্যে দ্বন্দ্ব-সংঘাত শুরু হয় এবং তা মারাত্মক রূপ পরিগ্রহ করে। প্রথম দিক এই সংঘাতে পোপের জয় হয় এবং পোপের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি এতটা বৃদ্ধি পায় যে, সম্রাট চতুর্থ হেনরীকে ১০৭৭ খ্রিস্টাব্দে পোপ হিল্ডার ব্রান্ড এই নির্দেশ প্রেরণ করেন যেন তিনি ক্যানোসা দূর্গে তাঁর সামনে হাজির হন। অনন্তর সম্রাট অবনত মস্তকে পোপের দরবারে হাজির হন। পোপ অগত্যা লোকের সুপারিশে নিতান্তই নিরুপায় হয়ে সম্রাটকে তাঁর সামনে খাড়া হবার অনুমতি প্রদান করেন এবং সম্রাট নগ্ন পদে পশমী মোজা পরিহিত অবস্থায় পোপের সম্মুখীন হন এবং পোপের হাতে তওবা করেন। পোপ সম্রাটের অন্যায়-অপরাধ ও ভুল-ভ্রান্তি ক্ষমা করেন। এরপর এই সব দ্বন্দ্ব-সংঘাতে কখনো পোপ জয় লাভ করেন, আবার কখনো বা পরাজিত হন। অবশেষে রাষ্ট্রের মুকাবিলায় গির্জাকে শেষ পর্যন্ত মাথা নোয়াতে হয়। আর সংঘাতের এই গোটা মুদ্দতে সাধারণ মানুষকে একই সঙ্গে ধর্ম ও রাজনীতি তথা গির্জা ও রাষ্ট্রের দ্বৈত গোলামীতে আবদ্ধ থাকতে হয়।

ক্ষমতার অপব্যবহার ও য়ূরোপীয় সভ্যতার ওপর এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া

গির্জাধিপতি হিসেবে পোপ মধ্যযুগে এমন এক বিরাট বিস্তৃত ক্ষমতা ও বিশাল সাম্রাজ্যের অধিকারী ছিলেন যেমনটা স্বয়ং রোম সম্রাটও ছিলেন না। অতএব, বিরাট ক্ষমতা ও বিশাল সাম্রাজ্যের অধিকারী হিসেবে পোপের পক্ষে ধর্মের ছত্রছায়ায় য়ূরোপকে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সভ্যতা-সংস্কৃতির ময়দানে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া খুবই সহজ ছিল। ড্রেপার লিখেছেন,

"Had not the sovereign pontiffs been so completely occupied with maintaining their emoluments and temporalities in Italy, they might have made the whole continent advance like one man. Their officials could pass without difficulty into every nation, and communicate without

embarrassment with each other, from Ireland to Bohemia, from Italy to Scotland. The possession of a common tongue gave them the administration of international affairs with intelligent allies everywhere, speaking the same language."[1]

"সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী এই সব পোপ যদি নিজেদের ক্ষমতার অপব্যবহার না করতেন এবং স্বার্থ পূজার শিকার না হতেন, তাহলে তাদের এই ক্ষমতা ছিল যে, তাদের এতটুকু ইশারা ও ইঙ্গিতে সমগ্র য়ূরোপ একযোগে ও ঐক্যবদ্ধভাবে এতটা উন্নতি করতে পারত যে, পৃথিবী বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যেত! তাদের প্রতিনির্ধিবৃন্দ অবাধে সকল দেশে যাতায়াত করতে পারত। তারা আয়ারল্যান্ড থেকে নিয়ে বোহেমিয়া এবং ইটালী থেকে নিয়ে স্কটল্যান্ড পর্যন্ত অবাধে নিজেদের পরস্পরের মধ্যে কথাবার্তা বলতে পারত। ভাষা একই হবার দরুন তারা আন্তর্জাতিক বিষয়গুলোর দেখাশোনা ও কর্তৃত্ব করার ব্যাপারে জেঁকে বসে এবং প্রতিটি দেশেই তারা এমন সব হুশিয়ার, সদাসতর্ক ও বিবিধ ব্যাপার উপলব্ধিতে সক্ষম এমন সব সহযোগী ও মিত্র পেয়ে যায় যারা অভিন্ন ভাষায় কথা বলত এবং সাধারণ বিষয়গুলোতে তাদের সহযোগিতা দেবার জন্য প্রস্তুত ছিল।"

কিন্তু খ্রিস্ট ধর্ম ও খ্রিস্টান জাতিগোষ্ঠীগুলোর দুর্ভাগ্য ছিল এই, গির্জাধিপতিরা এ বিরাট শক্তির অপব্যবহার করে। তারা এ দ্বারা নিজেদের ব্যক্তিগত প্রভাব-প্রতিপত্তি বিস্তার ও স্বার্থসিদ্ধি করে এবং য়ূরোপ আগের মতই অধঃপতন, মূর্খতা ও কুসংস্কারের তিমিরে ডুবে থাকে। ফলে নগর সভ্যতা ও সংস্কৃতির উন্নতি ঘটবার পরিবর্তে বিরাট অবনতিই ঘটে। য়ূরোপ মহাদেশের জনসংখ্যা হাজার বছরে এবং ইংল্যান্ডের জনবসতি বিগত পাঁচশ' বছরেও দ্বিগুণ হতে পারেনি। এতে কোনই সন্দেহ নেই, এ ব্যাপারে পাদ্রী ও খ্রিস্টান সাধু-সন্ন্যাসীদের এক বিরাট ভূমিকা রয়েছে। কেননা তারা কুমার জীবন যাপন করত এবং এরূপ জীবনধারার ব্যাপক প্রচার করত। এর সাথে গির্জা সর্বদাই যতদূর সম্ভব লোকদেরকে ডাক্তার, চিকিৎসক কিংবা অনুরূপ পেশার লোকদের থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছে আর চেষ্টা চালিয়েছে যাতে করে মানুষ এদের সাথে পরিচিত হতে না পারে এবং যাতে করে দান-দক্ষিণা নির্ভর মঠ বা আশ্রমগুলোর আয়-আমদানী প্রভাবিত না হয় এবং ডাক্তার ও চিকিৎসকরা তাদের মুনাফা লোটার পথে প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠতে না পারে। এর ফল দাঁড়াল, য়ূরোপের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত বিরাটাকারে মহামারী ও রোগ-ব্যাধি ছড়িয়ে পড়ে এবং মানুষের ব্যাপক প্রাণহানি ঘটে। ১৪৩০ খ্রিস্টাব্দে-ব্রিটেন সফরকারী এনিয়াস

1. Draper, op. cit., p. 234-35.

সিলভিয়াস তাঁর সফরের ওপর যেই বিবরণী লিখেছিলেন তা থেকে সে দেশের সভ্যতা ও সাংস্কৃতিক বিপর্যয় ও অধঃপতন, দুঃখ-দারিদ্র্য ও অনাহারক্লিষ্ট জীবনের বিবরণ পাওয়া যায়।

ধর্ম গ্রন্থে সংযোজন, পরিমার্জন ও বিকৃতি সাধন

খ্রিস্ট ধর্মের ধারক-বাহকেরা অতঃপর সবচে' বিপজ্জনক যেই ভুলটি করে যার ফলে তারা এই ধর্মকে, যেই ধর্মের তারা ছিল প্রতিনিধি, এমন কি নিজেরাই নিজেদেরকেই বিপদের সম্মুখীন ও ক্ষতিগ্রস্ত করেছিল, তা ছিল এই যে, তারা তাদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থগুলোর মধ্যে সেই সব ঐতিহাসিক, ভৌগোলিক ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি ও বিখ্যাত সব তত্ত্বগত দর্শন ঢুকিয়ে দেয় যেগুলো ঐ যুগের নিরিখে যথার্থ ও স্বীকৃত ছিল এবং মানুষের জ্ঞানের সীমারেখা ঐ যুগ পর্যন্ত অতদূরেই পৌঁছে ছিল। কিন্তু তা কখনোই মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধির সীমা ছিল না। আর যদি সেই যুগের নিরিখে তাকে সীমা মনেও করা হয় তবে তা চূড়ান্ত সীমা বা শেষ সীমা ছিল না। এজন্য যে, মানুষের জ্ঞান ক্রমিক হারে অগ্রসরমান, উন্নয়নমুখী ও তা ভ্রমণশীল, যার অবস্থান একান্তই সাময়িক। এর ওপর কখনোই স্থায়ী সৌধ নির্মাণ করা যায় না। কখনো কখনো তা বালির বাঁধের ন্যায় ধসে পড়ে। ফলে এর ওপর প্রাসাদ-সৌধ নির্মিত হলে তা যে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে তা নিতান্তই স্বাভাবিক। গির্জার লোকেরা সম্ভবত এরূপ খোশ-খেয়ালের বশবর্তী হয়ে এরূপ করে থাকবে এবং তাদের উদ্দেশ্য সম্ভবত এই ছিল, এর দ্বারা ঐসব আসমানী গ্রন্থের মাহাত্ম্য ও গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পাবে। কিন্তু পরবর্তীতে এগুলোই তাদের জন্য দুর্বহ বোঝা এবং ধর্ম ও বুদ্ধিবৃত্তির সেই অশুভ যুদ্ধের নিমিত্ত হয়ে দাঁড়ায় যার ভেতর ধর্ম (সেই ধর্ম যার মধ্যে মানবীয় জ্ঞান-বুদ্ধির মিশ্রণ তথা ভেজাল ছিল) পরাজিত হলো এবং য়ূরোপে ধর্মানুসারীদের এমন পতন ঘটল যার পর আর তারা মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারেনি। এর চেয়েও বেশি দুঃখজনক ব্যাপার হলো, য়ূরোপ ধর্মহীন ও অবিশ্বাসী হয়ে গেল।

ধর্মের ধারক-বাহক এ সব পাদ্রী ও সাধু-সন্ন্যাসী এ সব সংযোজন-বিয়োজন ও বিকৃতির ওপরই থেমে থাকল না এবং সে সব ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিক তথ্যাদিকেও যেগুলো লোকের মুখে মুখে ফিরত এবং এভাবে মশহূর হয়ে গিয়েছিল কিংবা বাইবেলের কোন কোন ভাষ্যকার ও ব্যাখ্যাতা যেগুলোকে তাদের ব্যাখ্যা-ভাষ্যে উল্লেখ করেছিলেন সেগুলোর ওপর ধর্মের আলখেল্লা পরিয়ে দিল এবং সেগুলোকে ধর্মীয় রঙে রঞ্জিত করে খ্রিস্টীয় শিক্ষামালা ও মূলনীতির অন্তর্ভুক্ত করে নিল যার ওপর বিশ্বাস স্থাপন করা ছিল একজন খ্রিস্টানের জন্য অপরিহার্য। এ বিষয়ে তারা বই-পুস্তক লিখল এবং সেই সব ভৌগোলিক

বিষয়গুলোকে, যার পেছনে কোন আসমানী সনদ ছিল না, Christian Topography নাম দিল এবং সেগুলো অবনত মস্তকে মেনে নিতে লোকজনকে বাধ্য করল। আর যারা তা মানল না তাদেরকে ধর্মদ্রোহী ও অবিশ্বাসী কাফির অভিধায় অভিহিত করল।

ধর্ম ও বিজ্ঞানের মধ্যে সংঘাত-সংঘর্ষ এবং চার্চের জুলুম

ঘটনাক্রমে এটা ছিল এমন এক সময় য়ূরোপে যখন ইসলাম ও মুসলিম বিজ্ঞানীদের প্রভাবে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চাপাপড়া আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণ ঘটে। দার্শনিক, চিন্তানায়ক ও বিজ্ঞানীরা অন্ধ আনুগত্যের শেকল ভেঙে ফেলল। তারা এমন সব দর্শন ও দৃষ্টিভঙ্গি প্রত্যাখ্যান করল যেগুলো ভূগোল, ইতিহাস ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের নামে ধর্ম গ্রন্থগুলোতে ঢুকিয়েছিল এবং অত্যন্ত সাহসিকতার সঙ্গে ও খোলাখুলিভাবে তাত্ত্বিক সমালোচনা করল। তারা না বুঝে চোখ বন্ধ করে সেগুলো মেনে নিতে স্পষ্ট অস্বীকৃতি জানাল। এরই সাথে সাথে তারা অর্থাৎ দার্শনিক ও বিজ্ঞানিগণ নিজেদের আবিষ্কার-উদ্ভাবন ও অভিজ্ঞতার ঘোষণাও প্রদান করল। ব্যস! আর কি! ঘোষণা প্রদানের সাথে সাথেই ধর্মীয় মহলে তুমুল হৈ চৈ শুরু হয়ে গেল। চার্চ তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠল। তারা ছিল ক্ষমতা ও সীমাহীন প্রভাব-প্রতিপত্তির মালিক। প্রথমত তারা এদের ধর্মদ্রোহী হিসেবে আখ্যায়িত করল। অতঃপর খ্রিস্ট ধর্মের নামে তাদের হত্যা করা এবং তাদের সহায়-সম্পদ ও মালামাল ক্রোক করা বৈধ ঘোষিত হলো। এসব অবিশ্বাসী বিজ্ঞানী ও দার্শনিকদের বিচারের উদ্দেশে চার্চ কর্তৃক Court of Inquisition প্রতিষ্ঠিত হলো। পোপের ভাষায় ঃ কোর্ট সেই সব ধর্মদ্রোহী ও নাস্তিকদের শাস্তি প্রদান করবে যারা শহরে-বন্দরে, ঘরে-বাইরে, অন্ধকার গৃহ কোণে, বনে-জঙ্গলে, পর্বত-গুহায় ও ক্ষেতে-খামারে ছড়িয়ে রয়েছে। এই সব কোর্ট তাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব অত্যন্ত নিষ্ঠা ও উৎসাহের সাথেই পালন করে। তাদের গোয়েন্দা সমগ্র য়ূরোপের সর্বত্র ছড়িয়ে ছিল এবং এ ব্যাপারে গোয়ন্দা বিভাগ অপরাধীদের পাকড়াও করতে এবং সন্দেহজনক লোকদের তৎপরতার ওপর খবরদারি করতে চেষ্টার আদৌ কোন ত্রুটি করেনি। জনৈক খ্রিস্টান পণ্ডিতের ভাষায় ঃ It was hardly possible for a man to be a Christian and die in his bed. অর্থাৎ একজন খ্রিস্টান বিছানায় মারা যাবে তা একেবারেই অসম্ভব। অনুমিত হয়, এই বিভাগ (Court of Inquisition) যেসব লোককে শাস্তি দিয়েছে তাদের সংখ্যা ১৪৮১ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৮০১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিন লক্ষের কম হবে না। এদের মধ্যে ৩২ হাজার লোককে জীবিত পুড়িয়ে মারা হয়। আর পুড়িয়ে মারা এসব লোকের মধ্যে বিখ্যাত বিজ্ঞানী ব্রুনোও ছিলেন যাঁর প্রধান অপরাধ ছিল, এই পৃথিবী ছাড়াও

আরও পৃথিবী আছে যেখানে অন্যান্য প্রাণীর বসবাস রয়েছে, তিনি এই মত পোষণ করতেন। ইনকুইজিশন বিভাগের কর্মকর্তারা তাঁকে এই সুপারিশসহ জাগতিক বিষয়ক কর্মকর্তাদেরকে নিকট অর্পণ করে যে, এঁকে যেন খুবই লঘু শাস্তি প্রদান করা হয় এবং এও যেন খেয়াল রাখা হয়, তাঁর শরীর থেকে এক ফোটা রক্ত যেন মাটিতে না পড়ে। এর অর্থ ছিল এই যে, তাঁকে যেন জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হয়। ঠিক তেমনি বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ পণ্ডিত গ্যালিলিওকে এজন্য মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা হয়, তিনি 'পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে ঘোরে' —এই মত পোষণ করতেন।

ধর্মের বিরুদ্ধে রেনেসাঁপন্থীদের বিদ্রোহ

শেষ পর্যন্ত মুক্তবুদ্ধি ও প্রগতিবাদীদের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেল। তারা ধর্ম ও প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠীর প্রতিনিধিদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের পতাকা উড্ডীন করল। তারা ধর্মীয় গোষ্ঠীর এই জোর-জুলুম, স্থবিরতা ও inquisition বিভাগের ঐসব নিপীড়ন-নির্যাতনের কারণে এমন নাখোশ ও বিক্ষুব্ধ হল যে, ঐ সমস্ত ধর্মীয় মহলের বলে পরিচিত আকীদা-বিশ্বাস, ইলম ও আদব-আখলাক সম্পর্কে তাদের মনে ঘৃণার সঞ্চার হয়। আর তাদের মনে প্রথম দিকে খ্রিস্ট ধর্মের বিরুদ্ধে, অতঃপর ক্রমান্বয়ে সাধারণভাবে ধর্মের বিরুদ্ধেই বৈরিতা সৃষ্টি হয়ে যায় এবং যেই যুদ্ধ প্রথম দিকে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও বুদ্ধিবৃত্তির পতাকাবাহী ও খ্রিস্ট ধর্মের (মূলত সেন্ট পলের ধর্মের) প্রতিনিধিবৃন্দের মাঝে ছিল, পরে তা ধর্ম মাত্রই ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের পারস্পরিক সংঘর্ষের রূপ ধারণ করে। প্রগতিবাদী ও মুক্তবুদ্ধির পতাকাবাহীরা নিজে থেকেই এই সিদ্ধান্ত নিল, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও ধর্ম একে অন্যের প্রতিপক্ষ ও প্রতিদ্বন্দ্বী, যা কখনোই এক হতে পারে না। এদের মধ্যে আর কখনো সন্ধি ও সমঝোতা হতে পারে না। এজন্য জ্ঞান-বিজ্ঞান ও বুদ্ধিবৃত্তির প্রতি বিশ্বস্ততা প্রমাণের নিমিত্ত প্রয়োজন হলো ধর্মের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া। এদের সামনে যখন ধর্মের নাম উচ্চারিত হতো তখন আকস্মিকভাবেই ধর্মীয় প্রতিনিধি ও গির্জাধিপতি পুরোহিতদের লোমহর্ষক জুলুম-নিপীড়নের ভয়াবহ ছবি তাদের চোখে জীবন্ত হয়ে ভেসে উঠত, ভেসে উঠত সেই সব নিরপরাধ জ্ঞানী-গুণী, বিজ্ঞানী ও দার্শনিকদের ছবি যাঁরা অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে ও অসহায় অবস্থায় ঐসব জল্লাদদের হাতে যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যুবরণ করেছিলেন। ধর্মীয় সম্প্রদায় ও গোষ্ঠীর নামে তাদের চোখের সামনে ক্রোধব্যঞ্জক চেহারা, রুদ্র ও রুক্ষ মূর্তি, অগ্নিক্ষরা চোখ, সংকীর্ণচেতা পাদ্রীদের স্থূল মস্তিষ্কই ভেসে উঠত। ফলে কেবল খ্রিস্ট ধর্মের বিরুদ্ধে না হয়ে সাধারণভাবে সকল ধর্মের প্রতিই ভীতি ও ঘৃণাকে তারা জীবনের মূলনীতি বানিয়ে নেয় এবং ভবিষ্যত বংশধরদের সামনেও তারা এই ঘৃণা ও অবজ্ঞাকেই উত্তরাধিকার ও পূঁজিরূপে রেখে যায়।

বুদ্ধিজীবীদের তাড়াহুড়া ও পক্ষপাতমূলক গোঁড়ামি

এই সব প্রগতিবাদী বুদ্ধিজীবীর ভেতর এতটা ধৈর্য, ধীর-স্থির মাথায় অধ্যয়ন ও গভীর চিন্তা-ভাবনা করার শক্তি ছিল না, ছিল না আবিষ্কার-অনুসন্ধানের সামর্থ্য ও যোগ্যতা যে, তারা প্রকৃত ধর্ম ও এর প্রতিনিধিত্বের মেকী দাবিদারদের মধ্যে পার্থক্য করবে এবং অনুধাবন করতে পারবে, এসব ঘটনায় আসলে ধর্ম কতটা দায়ী ছিল আর কতটা দায়ী গির্জার পাদ্রী-পুরোহিতদের মূঢ়তা, মূর্খতা, জোর-যবরদস্তি ও ভ্রান্ত প্রতিনিধিত্ব। যদি দ্বিতীয় দল এর জন্য দায়ী হন (এবং মূলত তারাই সকল অঘটনের জন্য দায়ী ছিল) তাহলে এর জন্য ধর্মকে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করানো, তাকে শাস্তি দেওয়া ও তার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করা কতটা সুবিবেচনাপ্রসূত? কিন্তু ক্রোধ, ধর্মের অনুসারীদের সঙ্গে শত্রুতা ও তাড়াহুড়াপ্রিয়তা এ বিষয়ে ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে দেখার অবকাশ তাদের দেয়নি যেমনটি সাধারণত বিদ্রোহ ও বিক্ষোভ প্রদর্শনের সময় হয়ে থাকে। তারা ধর্মের প্রতি কোনরূপ নমনীয়তা প্রদর্শন কিংবা সমঝোতা পসন্দ করেনি।

তাদের মধ্যে সত্যের প্রতি এতটুকু আগ্রহ ও আপন জাতির কল্যাণ কামনা ও উদার মনোভাব ছিল না, ছিল না এমত মন-মানসিকতা যে, তারা ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে অধ্যয়ন করবে যা ছিল তাদের সমসাময়িক বহু জাতির ধর্ম এবং যা খুবই সহজভাবে এই দ্বন্দ্ব-সংঘাত এবং ধর্ম ও বুদ্ধিবৃত্তির মধ্যকার এই অপ্রয়োজনীয় সংঘর্ষের হাত থেকে মুক্তি দিত যা যুক্তিগ্রাহ্য ও ভাল কিছুর দাবি করত, অযৌক্তিক ও অপসন্দনীয় বিষয় থেকে বাধা দিত, দুনিয়ার ক্ষতিকর নয় এমন নির্দোষ বিনোদন ও উপকারী জিনিসের ব্যাপারে তাদের অনুমতি দিত, ক্ষতিকর ও ঘৃণ্য বিষয়গুলোকে নিষিদ্ধ হিসাবে অভিহিত করত এবং অহেতুক শেকল ও পায়ের বেড়িগুলো কেটে দিত যা বিকৃত ধর্মগুলো এবং জোর-যবরদস্তকারী ধর্মানুসারী ও ক্ষমতাসীন লোকেরা শরীরে চাপিয়ে রেখেছিল।

يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ـ

“যে তাদেরকে সৎ কাজের নির্দেশ দেয় এবং অসৎ কাজে বাধা দেয়, যে তাদের জন্য পবিত্র বস্তু হালাল করে এবং অপবিত্র বস্তু হারাম করে এবং যে মুক্ত করে তাদেরকে তাদের গুরুভার থেকে ও শৃঙ্খল থেকে যা তাদের ওপর ছিল” (সূরা আ'রাফ ঃ ১৫৭)।

কিন্তু ক্রুসেড যুদ্ধের ফলশ্রুতিতে সৃষ্ট অনুদার সম্প্রদায়প্রীতি, গোড়ামি এবং খ্রিস্টান পাশ্চাত্য ও মুসলিম প্রাচ্যের মাঝে সৃষ্ট সেই সব বিভেদের প্রাচীরের কারণে, সাথে সাথে গির্জাধিপতি পাদ্রী-পুরোহিতদের ইসলাম ও ইসলামের পয়গম্বরের বিরুদ্ধে অপপ্রচার, অধিকন্তু অধ্যয়ন ও অনুসন্ধানের শ্রম স্বীকার না করা এবং মৃত্যুপরবর্তী জীবন ও পারলৌকিক মুক্তি সম্পর্কে বেপরোয়া ও নিশ্চিন্ত হবার কারণে তারা ইসলামের প্রতি আদৌ কোন দৃকপাত করেনি।

এ ব্যাপারে স্বয়ং মুসলমানদের প্রয়োজনীয় তাবলীগি মানসিকতার অভাব ও অলসতাও ছিল। তারা কয়েক শত বছর য়ূরোপের মত একটি গুরুত্বপূর্ণ মহাদেশে ইসলামের প্রচার-প্রসার এবং এর অধিবাসীদেরকে ইসলামের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার প্রতি মনোনিবেশ করেনি, অথচ ইসলামী হুকুমতের উত্থান এবং য়ূরোপের বিভিন্ন সাম্রাজ্যের সঙ্গে সমকালীন ও সমতাসূচক সম্পর্ক থাকার দরুন এর পুরো সুযোগ ছিল।

মোটের ওপর য়ূরোপের লোকেরা এ রকম নাযুক মুহূর্তে ইসলামের নেতৃত্ব ও দিক-দর্শন থেকে বঞ্চিত থাকে।

য়ূরোপের বস্তুবাদ

সে যা-ই হোক, যা আশংকা করা গিয়েছিল অবশেষে তাই ঘটল। য়ূরোপ বস্তুবাদের দিকে পুরোপুরি ঝুঁকে পড়ল। ধ্যান-ধারণা, দৃষ্টিকোণ, মন-মস্তিষ্ক ও মানসিকতা, আচার-আচরণ ও সামাজিকতা, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সাহিত্য, সরকার ও রাজনীতি, মোট কথা, জীবনের সকল শাখা-প্রশাখায় বস্তুবাদ জেঁকে বসল ও বিজয়ী হলো, যদিও তা হঠাৎ করে নয়, বরং ক্রমান্বয়ে। প্রথম দিকে এর গতি ছিল শ্লথ, কিন্তু পরবর্তীতে অত্যন্ত জোরেশোরে ও দ্রুত গতিতে য়ূরোপ বস্তুবাদের দিকে অগ্রসর হতে শুরু করল। সমাজ বিজ্ঞানী, দার্শনিক ও বিজ্ঞানী সৃষ্টিজগত নিয়ে এভাবে চিন্তা-ভাবনা ও আলোচনা করতে শুরু করল যেন এর কোন স্রষ্টা নেই, নেই কোন পরিচালক ও ব্যবস্থাপক এবং এই প্রকৃতি ও বস্তুর ঊর্ধ্বে এমন কোন শক্তি নেই যিনি এই জগতে হস্তক্ষেপ করেন এবং এর শান্তি-শৃংখলা বিধানে ভূমিকা পালন করেন। তারা প্রকৃতি জগত ও এর বাহ্যিক অবয়বসমূহ ও প্রভাবের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ নির্ভেজাল যান্ত্রিক পন্থায় করতে লাগল। আর তারা এর নাম দিল বৈজ্ঞানিক ও গবেষণামূলক পদ্ধতি এবং এমন প্রতিটি আলোচনা ও দৃষ্টিভঙ্গি যার ভিত্তি আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব ও তাঁর বিশ্বাসের ওপর স্থাপিত, অন্ধ আনুগত্যমূলক ও অবৈজ্ঞানিক হিসেবে আখ্যায়িত করা হতে লাগল। তারা একে ঠাট্টা-বিদ্রূপ ও উপহাস করতে থাকল : আর এ পথের মনযিল ছিল এই যে, তারা চলতে চলতে

শক্তি (Energy) ও বস্তু ভিন্ন আর সব কিছুই তারা অস্বীকার করল ও প্রত্যাখ্যান করে বসল এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয় এমন প্রতিটি বস্তু মানতে আপত্তি জানাল যা ওজন, পরিমাণ ও পরিসংখ্যানের বাইরে। এর স্বাভাবিক ও যৌক্তিক পরিণতি দাঁড়াল এই, আল্লাহর অস্তিত্ব ও বুদ্ধির অগম্য সব কিছুই কল্পনা হিসাবে ঠাঁই পেল যেগুলো জ্ঞান-বুদ্ধি দ্বারা সমর্থিত হতো না।

তারা দীর্ঘ দিন যাবত আল্লাহ্‌কে অস্বীকার করেনি এবং ধর্মের বিরুদ্ধেও সুস্পষ্টভাবে ও খোলাখুলি যুদ্ধ ঘোষণা করেনি। আসলে তারা সকলেই নাস্তিকও ছিল না, ছিল না ধর্মের দুশমন। কিন্তু যে চিন্তাধারা ও আলোচনার যেই পথ তারা এখতিয়ার করেছিল, যেই অবস্থান তারা গ্রহণ করেছিল তা এমন ধর্মের সঙ্গে খাপ খেতে পারত না যার গোটা প্রাসাদই ঈমান বিল-গায়ব তথা অদৃশ্যে বিশ্বাস, ওহী ও নুবূওয়াতের ভিত্তির ওপর স্থাপিত এবং যা পারলৌকিক জীবনের ওপর এতটা জোর দেয় আর এর ভেতর কোনটাই অভিজ্ঞতা ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যের আওতায় আসে না এবং ওজন, পরিমাপ ও পরিসংখ্যান দ্বারাও তার সত্যতা সমর্থন করা যায় না। এজন্য প্রতিদিনই তাদের ধর্মীয় আকীদা-বিশ্বাসে সন্দেহ-সংশয় এবং এসব মেনে নিতে দ্যোদুল্যমানতা সৃষ্টি হতে থাকে।

য়ূরোপে রেনেসাঁ তথা পুনর্জাগরণের পরের লোকেরা দীর্ঘকাল পর্যন্ত বস্তুগত দৃষ্টিকোণ ও বস্তুগত জীবন এবং ধর্মীয় কাজকর্ম ও প্রথাগুলোকে একত্র ও সমন্বিত করার প্রয়াস চালাতে থাকে। ধর্মের প্রতি আনুগত্য থেকে তারা তখনও পুরোপুরি ভাবে মুক্ত ও স্বাধীন হয় নি এবং খ্রিস্টান বিশ্বে ধর্মীয় পরিবেশ তখনও অবশিষ্ট ছিল, একেবারে শেষ হয়ে যায়নি। নৈতিক ও সামাজিক স্বার্থেরও দাবি ছিল যে, নামকা-ওয়াস্তে হলেও ধর্মীয় সমাজ ব্যবস্থা অবশ্যই টিকিয়ে রাখতে হবে এবং তা থাকা দরকারও বটে, যা জাতির লোকদের মধ্যে সেতু বন্ধন হিসেবে কাজ করবে এবং দেশকে সামাজিক বিশৃঙ্খলা ও নৈতিক অরাজকতার হাত থেকে রক্ষা করবে। কিন্তু বস্তুবাদী সভ্যতার গতি এত দ্রুত ছিল যে, ধর্ম ও তার প্রথাগুলো (রুসূম) তার সাথী হতে পারেনি। বস্তুবাদ ও আধ্যাত্মিক ধর্মের একত্র ও সমন্বিতকরণের মাঝে কষ্ট, লৌকিকতা ও সময়ের অপচয় ছিল। ফলে সে কিছুদিন পর এই লৌকিকতাকেও বিসর্জন দিল এবং পরিষ্কার ও খোলাখুলি ধর্মহীনতা ও বস্তুবাদকে গ্রহণ করল।

ঠিক এ যুগেই য়ূরোপের প্রতিটি দেশে ও প্রতিটি অঞ্চলে এক বিপুল সংখ্যক এমন সব লেখক, সাহিত্যিক, সমাজ ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানী জন্মগ্রহণ করেন যারা বস্তুবাদের শিঙ্গায় ফুঁ দিলেন এবং দেশের জনগণের মন-মস্তিষ্কে বস্তুপূজার বীজ বপন করলেন। নীতিশাস্ত্রবিদগণ নীতি-নৈতিকতার বস্তুবাদী ব্যাখ্যা দান করতেন। তারা কখনো-বা উপযোগিতাবাদের দর্শন পেশ করতেন, আবার কখনো বা পেশ

করতেন "খাও, দাও, ফুর্তি কর"-এর দর্শন। মেকিয়াভেলী (১৪৬৯-১৫২৭) ইতিপূর্বেই 'ধর্ম ও রাজনীতি আলাদা' এই দর্শন পেশ করেছিলেন এবং নীতি-নৈতিকতাকে দু'ভাগে ভাগ করেছিলেন। একটি হলো সরকারী আর আরেকটি ব্যক্তিগত। তিনি তাঁর সিদ্ধান্ত দিয়ে দিয়েছিলেন যে, যদি ধর্মের প্রয়োজন থাকেই তাহলে তা থাকবে কেবল মানুষের একান্তই ব্যক্তিগত বিষয় হিসেবে যার সঙ্গে রাজনীতির কোনই সম্পর্ক থাকবে না। রাষ্ট্র থাকবে সব কিছুর ঊর্ধ্বে এবং সব কিছুর মুকাবিলায় তার থাকবে অগ্রাধিকার। সে সব কিছুর থেকে অধিক মূল্যবান বলে বিবেচিত হবে। খ্রিস্ট ধর্মের সম্পর্ক থাকবে কেবল অপার্থিব তথা পারলৌকিক জীবনের সঙ্গে। আমাদের এই পার্থিব ও জাগতিক জীবনের সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই। ধর্মভীরু ও সৎ লোকের কোন প্রয়োজন রাষ্ট্রের নেই, এমন কোন উপকারিতাও এর নেই। এজন্য যে, তারা হয় ধর্মের ও ধর্মীয় বিধি-বিধানের অনুসারী ও অনুগত এবং তারা প্রয়োজনে নৈতিক নীতিমালা ও ঔচিত্যবোধকে উপেক্ষা করতে পারে না। রাজা-বাদশাহ ও প্রশাসনে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গকে শৃগালের মত ধূর্ত হতে হয় এবং রাষ্ট্রের প্রয়োজনে ও রাজনৈতিক স্বার্থের গরজে প্রতিজ্ঞাভঙ্গ, মিথ্যা কথন, ধোঁকা ও প্রতারণা, খেয়ানত ও মুনাফিকীর মত নীতিহীন কাজ করতে হয়। এ ব্যাপারে তাকে দ্বিধান্বিত হলে চলে না, হওয়া উচিত নয়। মেকিয়াভেলীর এই আহ্বান পুরোপুরি কার্যকর হলো, সফল হলো। ভৌগোলিক জাতীয়তাবাদী দর্শন (যা প্রাচীন ধর্মের স্থান দখল করছিল) এই মতবাদকে পুরোপুরি সহায়তা প্রদান করে।

লেখক, সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীরা তাদের যাদুকরী বক্তৃতা, লেখনী ও সম্মোহন সৃষ্টিকারী বাগ্মিতা ও কাব্যের মাধ্যমে প্রাচীন নীতি-নৈতিকতা ও সামাজিক বিধি-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সমগ্র দেশে এক বিদ্রোহ সৃষ্টি করে। তারা অন্যায় ও পাপকে মনোজ্ঞ ও চিত্তাকর্ষক বানিয়ে পেশ করে। মনুষ্য প্রকৃতি ও মানবীয় স্বভাবকে সর্বপ্রকার বন্ধন থেকে মুক্ত, মানুষকে তার দায়িত্ব, কর্তব্য ও জওয়াবদিহিতার হাত থেকে স্বাধীন তথা একেবারে বল্গাহীন ও বাধা-বন্ধনহীন মুক্ত বিহঙ্গ হবার প্রচার-পোপাগান্ডা চালায়। জীবনের মজা লুটবার, প্রবৃত্তিজাত কামনা-বাসনার যাবতীয় চাহিদার পূর্ণ পরিতৃপ্তির ও ভোগ-বিলাসের প্রকাশ্য আহ্বান জানায় এবং এই জীবনের মূল্যায়নে বিরাট বাড়াবাড়ি ও অতিরঞ্জনের সহায়তা নেয় এবং 'নগদ যা পাও হাত পেতে নাও, বাকীর খাতা শূন্য থাক'-এর দর্শন মাফিক নগদ প্রাপ্তি এবং বাহ্যিক ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুগত স্বার্থ ব্যতিরেকে আর সব কিছুকেই প্রত্যাখ্যান ও উপেক্ষা করে।

আর এভাবেই ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর পাশ্চাত্য জীবন প্রতিমা পূজারী গ্রীস ও রোমের জাহিলী যিন্দেগীর প্রতিচ্ছবিতে পরিণত হয়। এ ছিল যেন তার নতুন সংস্করণ যা ঊনবিংশ শতাব্দীতে নতুনভাবে সযত্ন প্রয়াস সহকারে তৈরি করা হয়েছিল। গ্রীস ও রোমের যেসব ছবি প্রাচ্য খ্রিস্ট ধর্ম হাল্কা ও ফিকে করে দিয়েছিল ঊনবিংশ শতাব্দীর চিত্রকররা তাকে পুনরায় উজ্জ্বল ও প্রোজ্জ্বল করে তোলে। এতে আশ্চর্যের কিছু ছিল না। আজকের পশ্চিমা জাতিগুলো ঐসব গ্রীক, রোমান ও পশ্চিমা জাতিগোষ্ঠীরই সুযোগ্য উত্তরাধিকারী। বর্তমান পশ্চিমা সভ্যতা-সংস্কৃতি এবং প্রাচীন গ্রীক ও রোমান সভ্যতা-সংস্কৃতির মধ্যে নিকট সাদৃশ্য পাওয়া যায়। য়ূরোপের বর্তমান ধর্মীয় জীবনও আধ্যাত্মিকতা থেকে তেমনি শূন্য যেমনটি ছিল গ্রীকদের ধর্ম। এই দুর্বলতা, ভয়-ভক্তিমিশ্রিত বিনয় ও ধর্মীয় গাম্ভীর্যের ঘাটতি, জীবনে ক্রীড়া- কৌতুক তথা খেল-তামাশার আধিক্যেরও সেই একই সব অবস্থা যা গ্রীসে ছিল। এটা ছিল সে সব প্রকৃতি বিজ্ঞানী ও দার্শনিকদের সেই দৃষ্টিভঙ্গি ও গবেষণার পরিণতি যা য়ূরোপে পূর্ণ জনপ্রিয়তা ও গ্রহণযোগ্যতা লাভ করে এবং তাই দীন-ধর্মের স্থান দখল করে নেয়। ঠিক তেমনি আজ জীবনের কামনা-বাসনা, ভোগের চাহিদা ও স্বাদ গ্রহণ এবং দুনিয়ার বুকে অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা পূরণের অবস্থাও ঠিক তাই যা সক্রেটিস তার যুগের গণতান্ত্রিক যুবকের বলে বর্ণনা করেছেন দার্শনিক প্লেটোর 'রিপাবলিক' নামক গ্রন্থে। অধিকন্তু ধর্মীয় সন্দেহ-সংশয় ও দ্বিধা-সংকোচ, ধর্মীয় আইন-কানুন ও শৃঙ্খলা, ধর্মীয় দায়িত্ব-কর্তব্য ও প্রথাসমূহের অমর্যাদা করার ক্ষেত্রেও আজকের য়ূরোপ গ্রীস ও রোম থেকে পিছিয়ে নেই।

খ্রিষ্ট ধর্ম অথবা বস্তুবাদ

বাস্তব সত্য হলো, আজকের য়ূরোপের আত্মা ও মননকে নিয়ন্ত্রণকারী যে ধর্ম তা খ্রিস্ট ধর্ম নয়, বরং বস্তুবাদ ও বস্তুপূজা এবং পাশ্চাত্য জীবনধারা থেকে তার প্রতিটি পদক্ষেপে এর সত্যতা সমর্থিত হয়। Islam at the Crossroad-এর লেখক বলেন ঃ

"No doubt, there are still many individuals in the West who feel and think in a religious way and make the most desperate efforts to reconcile their beliefs with the spirit of their civilization, but they are exceptions only. The average Occidental—be he a Democrat or a Fascist, a Capitalist or a Bolshevik, a manual worker or an intellectual—knows only one positive 'religion', and that is the worship of material progress, the belief that there is no other goal in life than to make life continually easier or, as the current expression goes, 'independent of nature'. The temples of this 'religion' are the gigantic factories, cinemas, chemical laboratories, dancing halls,

hydro-electric works; and its priests are bankers, engineers, film-stars, captains of industry, finance magnates. The unavoidable result of this craving after power and pleasure in the creation of hostile groups armed to the teeth and determined to destroy one another whenever and wherever their respective interests come to a clash. And on the cultural side the result is the question of practical utility alone, and whose highest criterion of good and evil is the material success."1

"এতে কোনই সন্দেহ নেই, পশ্চিমা দেশগুলোতে এখনো এমন বহু লোক পাওয়া যাবে যারা ধর্মীয় ধারায় অনুভব করেন, চিন্তা করেন এবং প্রাণপণ চেষ্টা করেন তাদের ধর্ম বিশ্বাস ও সভ্যতার মধ্যে সমন্বয় ঘটাতে। কিন্তু তারা হচ্ছেন ব্যতিক্রম মাত্র। গণতন্ত্রী অথবা ফ্যাসিস্ট, পুঁজিবাদী অথবা সমাজতন্ত্রী বলশেভিক, দিন মজুর অথবা বুদ্ধিজীবী ॥ য়ুরোপের যে কোন সাধারণ ও মধ্যম শ্রেণীর মানুষ একটি মাত্র ইতিবাচক ধর্মকেই চেনে ও জানে আর তা হল বস্তুবাদী উন্নতি-অগ্রগতির পূজা। তার বিশ্বাস, জীবনকে ক্রমাগত মুক্ত, বাধাবন্ধনহীন ও সহজতর করে তোলা ব্যতিরেকে জীবনের আর কোন লক্ষ্য নেই অথবা চলতি কথায় প্রকৃতি-নিরপেক্ষ হওয়াই তার ধর্ম। বিরাট বিরাট কারখানা, সিনেমা, রাসায়নিক গবেষণাগার, নাচঘর তথা নৃত্য-কলা ভবন, পানি-বিদ্যুৎ ইঞ্জিনিয়ার, অভিনেতা-অভিনেত্রী, শিল্পপতি ও অর্থবিত্তের অধিকারী কৃতবিদ্য পুরুষ। ক্ষমতা ও আনন্দের এই নেশার অপরিহার্য পরিণাম হয়েছে যেখানে সেখানে স্বার্থের সংঘাতউদ্ভূত সশস্ত্র দ্বন্দ্ব ও সংঘাত। আর সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে এর ফল হচ্ছে এমন এক ধরনের মানুষ সৃষ্টি যাদের নীতি-বোধ নিছক উপযোগবাদের প্রশ্নে সীমাবদ্ধ এবং যার ভাল-মন্দের সর্বোচ্চ মাপকাঠি হচ্ছে একমাত্র বস্তুবাদী সাফল্য ও কামিয়াবী।"[১]

উক্ত লেখক আরও বলেন ঃ

"পশ্চিমা সভ্যতা সুস্পষ্ট ভাষায় প্রবলভাবে আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব অস্বীকার করে না। কিন্তু প্রকৃত সত্য হলো, তার বুদ্ধিবৃত্তি সংক্রান্ত ধারায় আল্লাহ্‌র কোন স্থান নেই। আর তার কোন প্রয়োজনও সেখানে অনুভব করা হয় না।"[২]

লন্ডন ভার্সিটির দর্শন ও মনস্তত্ত্ব বিভাগের প্রাক্তন চেয়ারম্যান Professor C.E.M. Joad তাঁর Guide to Modern Wickedne নামক গ্রন্থে তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেনঃ

---

1. Islam at the Crossroads, 5th edition, 55-56.

"আমি সম্প্রতি কুড়ি জন ছাত্রছাত্রীর একটি তরুণ দলকে যাদের সকলের বয়স বিশের কিছু বেশিই হবে, জিজ্ঞেস করেছিলাম, তাদের মধ্যে কতজন যে কোন অর্থে খ্রিস্টান? কেবল তিনজন এই প্রশ্নের ইতিবাচক উত্তর দিল এবং তারা যে খ্রিস্টান তা স্বীকার করল। সাতজন ছাত্রছাত্রী বলল, তারা এ ব্যাপারে কখনো ভেবে দেখেনি। বাকী দশজন পরিষ্কারভাবে বলল, তারা খোলাখুলি খ্রিস্ট ধর্মের বিরোধী। আমার ধারণা খ্রিস্ট ধর্ম যারা মানে আর যারা মানে না তাদের এই আনুপাতিক হার এদেশে কোন ব্যতিক্রমী ও অস্বাভাবিক উদাহরণ নয়। তবে হ্যাঁ, এই প্রশ্ন যদি আজ থেকে পঞ্চাশ বছর কিংবা অন্যূন বিশ বছর আগে করা হতো তবে এর উত্তর অনিবার্যভাবেই প্রদত্ত উত্তর থেকে ভিন্নতর হতো। এরই ওপর ভিত্তি করে বলা যায়, খুব কম সংখ্যক লোকই আছে যারা Canon Barry- এর এরূপ ধারণার সাথে একমত হবেন, এক বিরাট খ্রিস্টীয় পুনর্জাগরণ ও উন্নতি বর্তমান পৃথিবীকে মুক্তি দিতে পারে। আমার মতে তাঁর এই দাবিকে যথার্থ প্রমাণ করার মত কোন জিনিস নেই। তবে হ্যাঁ, এটা ভিন্ন কথা, এটা তাঁর আন্তরিক কামনা। এমন বহু হয় যে, কামনা ধারণা সৃষ্টি করে দেয়। কিন্তু তা দলীল-প্রমাণ সৃষ্টি করতে পারে না। এদেশের অবস্থা ও লক্ষণাদি পরিষ্কার বলে দিচ্ছে, খ্রিস্টান গির্জাগুলো আগামী শতাব্দীতে তাদের আয়ুষ্কাল পূর্ণ করবে। একটি দৈনিক পত্রিকার নিম্নোক্ত উদ্ধৃতি থেকে এর সমর্থন মিলবে ঃ

"৭৭ বছরের এক বৃদ্ধ এমন এক পদ্ধতি আবিষ্কার করেছে, যদ্দ্বারা সে পবিত্র বাইবেলের পুরনো কপিগুলোকে বন্দুকের বাট, কৃত্রিম রেশম, গাত্তা পরচা ও টাকার নোটে রূপান্তরিত করতে পারবে। এই মেশিন সে কার্ডিফ ফ্যাক্টরী ও আটটি অপরাপর কারখানায় স্থাপন করেছে এবং বাইবেলের কপি থেকে যুদ্ধের আধুনিক সাজ-সামান তৈরি হচ্ছে। আবিষ্কারক এই মেশিনের সাহায্যে বিপুল সম্পদ বানিয়েছে।"

"অতএব হে লোকসকল! যাদেরকে আল্লাহ্ কান দিয়েছেন তারা শুনে নাও।"[১]

বিত্ত-পূজা

এই লেখকই তাঁর Philosophy of Our Times নামক অপর এক গ্রন্থে বলেন,

"শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ইংল্যাণ্ডের কল্পনা ও ধ্যান-ধারণায় 'কি করে বিত্ত-সম্পদ লাভ করা যায়' এটাই জেঁকে বসে আছে। সম্পদ লাভের উদগ্র আকাঙ্ক্ষা গত দুই শতাব্দী যাবত অন্যান্য সকল কর্মপ্রয়াস ও কর্ম প্রচেষ্টার ওপর

---
1. Guide to Modern Wickedness, p-114-15.

বেশি কাজ করে যাচ্ছে। কেননা সম্পদ মালিকানা লাভের মাধ্যম এবং ব্যক্তিগত মালিকানার প্রাচুর্য, দীপ্তি ও মাহাত্ম্য দ্বারাই মানুষের যোগ্যতা ও উপযুক্ততার পরিমাপ করা হয়ে থাকে। রাজনীতি, শিল্প-সাহিত্য, সিনেমা, রেডিও এবং কখনো কখনো গির্জার মিম্বরগুলো থেকে বছরের পর বছর পাঠক ও শ্রোতাদেরকে এই শিক্ষাই প্রদান করা হয়েছে, সভ্য জাতি তারাই যাদের মধ্যে লাভ ও অর্জনের প্রেরণা চরমভাবে উন্নতি করেছে।

“এই বিত্ত পূজা আমাদের ধর্মীয় আকীদা-বিশ্বাসের সঙ্গে সাংঘর্ষিক। কেননা ধর্ম এই বিশ্বাস ও প্রতীতি দান করে যে, দারিদ্র্য ভাল এবং ধনাঢ্যতা কেবল খারাপই নয়, বরং ধনীদের পক্ষে সৎ হবার সম্ভাবনা এতটাই কম গরীবদের পক্ষে যতটা বেশি। যদিও বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণতার দাবি এবং ধর্মীয় শিক্ষা যুগপৎভাবে এটাই শেখায়, খোদা-পরস্তী ও জান্নাত লাভ দরিদ্রের পক্ষেই সম্ভব। তথাপি লোকে ধর্মের শিক্ষাকে সত্য মনে করে সে মতে কাজ করবার কোন প্রকার আগ্রহ জাহির করে নি এবং বর্তমান বিত্ত-সম্পদ অর্জনকে স্থায়ী পারলৌকিক শান্তি লাভের ওপর সন্তুষ্ট চিত্তেই অগ্রাধিকার দিচ্ছে। সম্ভবত তাদের এই ধারণা যে, বিছানায় পড়ে মরার আগে মৃত্যুশয্যায় তওবা করে তারা পরকালে এতটাই লাভবান হতে পারবে যতটা তারা লাভবান হচ্ছে এই পার্থিব জগতের সম্পদ ভাণ্ডার তথা ব্যাংক-ব্যালান্স থেকে। তাদের এই ধারণাকে স্যামুয়েল বাটলার তাঁর পুস্তকে এভাবে প্রকাশ করেছেন, দুষ্টপ্রকৃতির লেখকরা বলে, আমরা খোদা ও সম্পদের একই সাথে পূজা করতে পারি না। আমরা একথা মেনে নিলাম যে, এটা সহজসাধ্য নয়। কিন্তু অর্জনযোগ্য জিনিস কবেই বা সহজলভ্য?

“আমাদের নীতি যা-ই হোক না কেন— ঘটনা হলো, মুখে আমরা যাই বলি না কেন, কাজের বেলায় আমরা সকলেই বাটলারের পাক্কা অনুসারী। আমরা বিত্ত-সম্পদের এতটাই ভক্ত-অনুরক্ত এবং আমাদের এই বদ্ধমূল বিশ্বাস যে, সম্পদই ব্যক্তি ও সাম্রাজ্যের মর্যাদা বৃদ্ধির কারণ হিসাবে দেখা দেয়॥ এতটাই দৃঢ়ভাবে মনের গহীনে প্রোথিত যে, এর দ্বারা জগতের দু'টো উৎসাহদায়ক নীতি বা তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে যা বিরাট ঐতিহাসিক গুরুত্বের অধিকারী। এর একটি হল ‘লেসেজ ফেয়ার’ তথা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অবাধ স্বাধীনতার নীতি অর্থাৎ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ না করার নীতি যা ঊনবিংশ শতাব্দী জুড়ে জেঁকে বসেছিল। এই নীতির দাবি হলো, মানুষ সব সময় নিজের কাজকে অধিক থেকে অধিকতর আর্থিক মুনাফার ওপর সীমাবদ্ধ ও পরিবেষ্টিত রাখে যেন তার ভোগের ধর্মই হলো, কাজের প্রেরণাদায়ক শক্তি দিলের আবেগ-উদ্দীপনা নয়, বরং কেবলই সম্পদ আহরণের নেশা।

"দ্বিতীয় মূলনীতি হলো যা বিংশ শতাব্দীতে বিশ্বের সর্বত্র জেঁকে বসতে দেখা যাচ্ছে, আর তা হলো, কার্ল মার্কসের Theory of Economic determinism. এই নীতি বা তত্ত্ব বলে, মানুষের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সর্বদাই তার আর্থিক প্রয়োজনীয়তার ওপর নির্ভরশীল এবং এই ব্যবস্থাই তার সাহিত্য, নীতি ও ব্যবহারশাস্ত্র, ধর্ম, যুক্তিবিদ্যার, অধিকন্তু রাষ্ট্রব্যবস্থার স্রষ্টা হয়ে থাকে। এই দুই নীতির গ্রহণযোগ্যতার সীমাবদ্ধতা সেই মূল্যবোধের ওপর যা আমাদের পুরুষ ও মহিলারা স্পষ্টতরভাবে সম্পদের ব্যক্তিগত ও রাজনৈতিক সৌন্দর্যের মানের ওপর রাখে।"১

একই গ্রন্থে অপর এক স্থানে তিনি বলেন,

" যেই জীবন দৃষ্টি এই যুগের ওপর জেঁকে বসে আছে তা হলো অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং সকল সমস্যা ও সমস্ত ব্যাপারকেই পেট ও পকেটের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা।" ২

মি. জন গুন্থার নামক বিশিষ্ট আমেরিকান সাংবাদিক তাঁর Inside Europe নামক পুস্তকে এই বিত্তপূজা নিম্নোক্তভাবে আলোচনা করেছেনঃ

"ইংরেজরা সপ্তাহে ছয় দিন ব্যাংক অব ইংল্যান্ডের পূজা করে থাকে। কেবল সপ্তম দিনেই তারা বৃটিশ গির্জার দিকে মুখ ফেরায়।"

আল্লাহ্ বিস্মৃতি ও আত্মবিস্মৃতি

ঐ সব লোক যারা অন্য কোন জীবনে বিশ্বাসী নয়, 'খাও-দাও, ফুর্তি কর, জীবনের স্বাদ লুটে নাও' ছাড়া অন্য কোন জীবন-দর্শনে যাদের বিশ্বাস নেই কিংবা ব্যক্তিগত ও জাতীয় সমুন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি ছাড়া যারা আর কোন মহত্তর লক্ষ্যে বিশ্বাস রাখে না এবং আল্লাহ্র সঙ্গে এই নামকা-ওয়াস্তে এই সামান্য কিছু ছাড়া যাদের কোন সম্পর্ক নেই তাদের সম্বন্ধে এই আশা পোষণ করা কতটা সঠিক হবে যে, কোন বিপদ মুহূর্তে তাদের ভেতর সকাতর অনুনয়-বিনয় দেখা দেবে এবং আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তনের অবস্থা সৃষ্টি হবে। কাফির-মুশরিকদের সম্পর্কে কুরআন বলেঃ তারা বিপদ-আপদের সময় কেবল আল্লাহকে ডেকে থাকে এবং এমনতরো মুহূর্তে কেবল আল্লাহ্র কথাই স্মরণ হয়।" কিন্তু য়ূরোপের বস্তুপূজারীরা বস্তুপূজার ক্ষেত্রে এতটা এগিয়ে যায় এবং বাহ্যিক উপায়-উপকরণ ও কার্যকারণ তাদের ওপর এতটা জেঁকে বসে, তাদের জীবনে আল্লাহবিমুখতা এবং হৃদয় এতটা কঠিন ও অনুভূতিশূন্য হয়ে গিয়েছিল যে, তারা এই আয়াতের প্রতিপাদ্যে পরিণত হয়।

---

1. Philosophy for our Times. pp-338-40, ২. প্রাগুক্ত।

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَآ اِلَى اُمَمٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَاَخَذْنٰهُمْ بِالْبَاْسَآءِ وَالضَّرَّآءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُوْنَ - فَلَوْلَآ اِذْ جَآءَهُمْ بَاْسُنَا تَضَرَّعُوْا وَلٰكِنْ قَسَتْ قُلُوْبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ -

"তোমার পূর্বেও বহু জাতির কাছে রসূল পাঠিয়েছি; তারপর তাদেরকে অর্থ-সংকট ও দুঃখ- ক্লেশ দ্বারা পীড়িত করেছি যাতে তারা বিনীত হয়। অনন্তর আমার শাস্তি যখন তাদের ওপর আপতিত হলো তখন তারা কেন বিনীত হলো না? অধিকন্তু তাদের হৃদয় কঠিন হয়েছিল এবং তারা যা করছিল শয়তান তা তাদের দৃষ্টিতে শোভন করেছিল।" (সূরা আনআমঃ ৪২-৪৩)

অন্য সূরায় ঃ

وَلَقَدْ اَخَذْنٰهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوْا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُوْنَ -

"আমি ওদেরকে শাস্তি দ্বারা পাকড়াও করলাম, কিন্তু ওরা ওঁদের প্রতিপালকের প্রতি বিনীত হলো না এবং কাতর প্রার্থনাও করল না।" (মু'মিনুন ঃ ৭৬)

অনন্তর আপনি যুদ্ধের কঠিনতম মুহূর্তেও এবং সঙ্গীনতম সময়ও আল্লাহ্‌র প্রতি মনোনিবেশ, বিনীত অবস্থা, দিলের ভঙ্গুরতা, নমনীয়তা ও বান্দাসুলভ মানসিকতা তাদের ভেতর দেখতে পাবেন না। তেমনি জাতির আচার-আচরণ, কার্যকলাপ, ক্রীড়া- কৌতুক ও হাসি-তামাশার ভেতরও আপনি কোনরূপ পার্থক্য দেখবেন না। পাশ্চাত্যের দার্শনিক ও চিন্তাশীল মহল, লেখক, কবি-সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ এ নিয়ে গর্ব করে থাকে এবং একেই তারা মানসিক স্থৈর্য ও দৃঢ়তা, প্রশংসনীয় মনোবল এবং জাতীয় মর্যাদাবোধ বলে অভিহিত করে থাকে। প্রাচ্যের আল্লাহ্ পূজারী এবং মুসলমানদের দৃষ্টিকোণ থেকে এটা হৃদয়হীনতা, গাফিলতি ও ক্রীড়া-কৌতুকে মেতে থাকা, সংজ্ঞাহীনতা ও আত্মবিস্মৃতি বৈ কিছু নয়।

"লন্ডনে একরাত" শিরোনামে লন্ডনেই বসবাসকারী জনৈক ভারতীয় (পরে পাকিস্তানী) ১৯৪০-৪১ সালের বিশ্বযুদ্ধকালীন বিমান হামলার সময়কার ঘটনা তাঁর নিজের আত্মজীবনীতে এভাবে পেশ করেছেন ঃ

"আমরা সেই রাত্রে সমস্ত বন্ধু-বান্ধব কয়েক দিন কয়েক রাত উপর্যুপরি বিমান হামলার ফলে অতিষ্ঠ হয়ে অবশেষে এক অত্যন্ত আড়ম্বরপূর্ণ সম্মিলিত ইংরেজ-ভারতীয় খানাপিনার আয়োজনে মেতে উঠলাম। গৃহকর্ত্রী যিনি ছিলেন

তিনি তার বাবুর্চিখানা ও তার যাবতীয় সামান আমাদের সোপর্দ করলেন এবং উপরতলার বড় কামরাটিও নাচের জন্য খালি করে দিলেন। আমরা জনা পঁচিশেক নারী-পুরুষ সবাই মিলে নিজের হাতে রান্না করলাম। এরপর খানাপিনা শেষে নাচ-গান শুরু করলাম। এমন সময় অকস্মাৎ বিমান হামলার বিপদ সংকেত হিসাবে সাইরেন বেজে উঠল। প্রথমে তো আমরা সবাই একদম নিশ্চুপ হয়ে গেলাম। কিন্তু আমাদের নাচ অব্যাহত রইল। এমত অবস্থায় একজন বলে উঠল, এখন কি করতে চাও? 'Go on' (চালিয়ে যাও) এই ছিল জনৈক মহিলার উত্তর। তারপর নাচগান পূর্বের মতই অব্যাহত রইল। আমরা নাচতে থাকলাম। আর আমাদের নাচগান ও অট্টহাসির শব্দে বাড়ি তো বাড়ি গোটা মহল্লাটাই কেঁপে উঠতে লাগল।"[১]

উদ্ধৃত অংশেরই কিছু ওপরে তিনি লিখছেন ঃ

"অল্প দিন পরই এটা নিয়মিত অভ্যাসে পরিণত হলো যে, প্রতি দিনই সন্ধ্যা ৭-৮ টার দিকে সাইরেন বাজত। শত্রু বিমানের প্রপেলারের ঘর ঘর আওয়াজ শোনা যেত। সার্চ লাইটের জ্বলন্ত জাল আসমানে নিভে যেত। আর এ দিকে বিমান বিধ্বংসী কামানের আওয়াজে কানে তালা লাগার জোগাড় হতো। আসমান-যমীন কেঁপে উঠত থরথর করে। সে সময় সিনেমা হলগুলোতে সিনেমা প্রদর্শন অব্যাহত থাকলে ছবি কিছুক্ষণের জন্য বন্ধ হয়ে যেত এবং পর্দায় নিম্নোক্ত নির্দেশ ভেসে উঠত ঃ

"এখন বিমান হামলা শুরু হয়েছে। কিন্তু তদ্‌সত্ত্বেও ছবি প্রদর্শন অব্যাহত থাকবে। যেসব দর্শক আশ্রয় কেন্দ্রের নিরাপদ আশ্রয়ে যেতে চান যেতে পারেন। নিচে বাম দিকেই যাবার পথ রয়েছে।

"কিন্তু মজার ব্যাপার হলো, একজনও তার আসন ছেড়ে উঠত না, সবাই যার যার আসনে বসে থাকত, এরপর যথানিয়মে ছবি প্রদর্শন শুরু হয়ে যেত।"[১]

"ক্রীড়া-কৌতুক ও খেল-তামাশার মধ্যে এ ধরনের নিমগ্নতা ও আত্মবিস্মৃতির দৃষ্টান্ত প্রাচীন গ্রীস ও রোমেই কেবল দেখতে পাওয়া যায়। ইতিহাসে বর্ণিত আছে, যে ঐতিহাসিক পম্পেই নগরীর আগ্নেয়গিরিতে যখন বিস্ফোরণ ঘটে এবং আকাশ থেকে যখন অগ্নি শিখা ও জ্বলন্ত অঙ্গার বর্ষিত হয় এবং মাটিতে ভূমিকম্প দেখা দেয় তখন ছিল দিনের বেলা। লোকজন এমফি থিয়েটারে (যেখানে একই সঙ্গে বিশ হাজার দর্শক উপবেশন করতে পারত)

১. আগা মুহাম্মদ আশরাফ দেহলভী এম.এ. কৃত "হাওয়াই হামলা", পৃ.৭১।

বসে সার্কাস দেখছিল যেখানে হিংস্র প্রাণী খাঁচার মধ্যে জীবন্ত মানুষকে ছিঁড়ে ফেড়ে ও কামড়ে খাচ্ছিল। ঠিক এমনি এক নিষ্ঠুর ও লোমহর্ষক খেলতামাশা চলাকালেই ভূমিকম্প শুরু হয়, শুরু হয় আকাশ থেকে অগ্নি বৃষ্টি। যে যেখানে ছিল সেখানে জ্বলে ভস্মীভূত হয়ে যায়। যারা বাইরে বেরিয়ে ছিল তারাও প্রচণ্ড অন্ধকারে পরস্পরের ধাক্কাধাক্কিতে আহত ও নিহত হয়। এভাবে আহত-নিহতদের সংখ্যা যে কত ছিল কে তা নিরূপণ করবে? অল্প সংখ্যক সৌভাগ্যবান লোকই কেবল এই মহাদুর্যোগের হাত থেকে নৌকা ও জাহাজযোগে পালিয়ে জীবন বাঁচাতে সক্ষম হয়েছিল। আঠার শো বছর যাবত এই শহর পৃথিবীর মানচিত্র থেকে হারিয়ে ছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্য ভাগেই কেবল জানা যায়, শহরটি একেবারে হারিয়ে যায় নি, বরং মাটির নিচে চাপা পড়ে আছে। খনন কাজ শুরু হয় এবং কয়েক বছরের নিরন্তর চেষ্টার পর সবক হাসিলের উপকরণরূপী মিউজিয়াম হিসাবে অবিকল শহরটি গোটাই আবিষ্কৃত হয়।"

اَوَ اَمِنَ اَهْلُ الْقُرٰى اَنْ يَّاْتِيَهُمْ بَاْسُنَا ضُحًى وَّهُمْ يَلْعَبُوْنَ۔

"তবে কি জনপদের অধিবাসীরা ভয় রাখে না যে, আমার শাস্তি তাদের ওপর আসবে পূর্বাহ্নে যখন তারা থাকবে ক্রীড়ারত?" (সূরা আল-আ'রাফঃ ৯৮)

আল্লাহ্ পূজারী, আল্লাহ্র পরিচয় সম্পর্কে যারা অবহিত তাদের কর্মপন্থা, জীবনধারা, চরিত্র ও ব্যবহার, যুদ্ধ-বিগ্রহ ও বিপদ মুহূর্তে উপরিউক্ত কর্মপন্থার চাইতে কতটা ভিন্ন ও বিরোধী তার পরিমাপ কুরআন মজীদের নিম্নোক্ত আয়াতের সঙ্গেও করা যেতে পারে ঃ

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِذَا لَقِيْتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوْا وَاذْكُرُوْا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ۔

"হে মু'মিনগণ! তোমরা যখন কোন দলের মুখোমুখি হবে তখন অবিচলিত থাকবে এবং আল্লাহ্কে বেশি স্মরণ করবে যাতে করে তোমরা সফলকাম হও।" (সূরা আনফালঃ ৪৫)

সাহাবায়ে কিরাম (রা) বলেন, যখনই কোন সমসা-সংকুল ও সংকটজনক পরিস্থিতি এসে পড়ত অমনি রসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম নামাযে দাঁড়িয়ে যেতেন। বদর যুদ্ধের সময় নবী করীম (সা) কাতার সোজা করেন সাহাবায়ে কিরাম (রা)-কে কাফিরদের মুকাবিলায় দাঁড় করিয়ে দেন এবং নিজে তাঁবুতে গিয়ে আল্লাহ্র সামনে সিজদায় পড়ে গিয়ে মুনাজাত ও ফরিয়াদ

করতে শুরু করেন। এ সময় তিনি বলছিলেন ঃ হে আল্লাহ! এই দলটি যদি আজ ধ্বংস হয়ে যায় তাহলে দুনিয়ার বুকে তোমার ইবাদত-বন্দেগী করার মত আর কেউই থাকবে না।"

পাশ্চাত্যের মেযাজ ঃ একজন প্রাচ্যবাসীর দৃষ্টিতে

প্রকৃতিগত, ঐতিহাসিক ও তাত্ত্বিক দিক দিয়ে এই বস্তুবাদিতা ইতিহাসের প্রাচীনতম কাল থেকেই পাশ্চাত্য সভ্যতা ও পশ্চিমা জীবন-যিন্দেগীর প্রাণসত্তা ও মেযাজে পরিণত হয়ে গিয়েছে। প্রাচ্যের অন্যতম বিচক্ষণ আলিম ও দার্শনিক বিখ্যাত পর্যটক আবদুর রহমান কাওয়াকিবী (মৃত. ১৩২০হি.) এই শতাব্দীর প্রথম দিকে তাঁর "তাবায়ে-উল-ইস্তিব্দাদ" (طبائع الاستبداد) নামক গ্রন্থে এই সত্য ও বাস্তবতা তুলে ধরেছেন এভাবে ঃ

"পাশ্চাত্যের লোকেরা প্রকতিগতভাবেই বস্তুবাদী তথা বস্তুপূজারী, স্বভাবগতভাবে কঠিন হৃদয় ও লেনদেনের ব্যাপারে কঠোর হয়ে থাকে। তারা স্বভাবত স্বার্থপর, বিদ্বেষপরায়ণ ও প্রতিশোধপরায়ণ। মনে হয়, উন্নত নীতি-নৈতিকতা ও মহৎ প্রেরণার ভেতর থেকে এখন আর তাদের কাছে কিছুই অবশিষ্ট নেই যা প্রাচ্যের খ্রিস্ট ধর্ম তাদেরকে দিয়েছিল। একজন জার্মানের কথাই ধরুনঃ মেযাজগতভাবে শুষ্ক ও প্রকৃতিগতভাবে রূঢ় ও কর্কশ। তার মতে একজন দুর্বল মানুষের বেঁচে থাকার কোনই অধিকার নেই। তার কাছে শক্তি, হ্যাঁ, কেবল শক্তিই শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রাধান্য লাভের একমাত্র হাতিয়ার। আর শক্তির উৎস হলো অর্থ-বিত্ত। তারা জ্ঞান-বিজ্ঞানকে অবশ্যই মর্যাদা দেয়, কিন্তু তা দেয় বিত্তের খাতিরে। তারা সম্মান লাভে আগ্রহী, কিন্তু তাও অর্থ-বিত্তের স্বার্থে। গ্রীক ও ইটালিয়ানরা প্রকৃতিগতভাবে স্বার্থপর ও স্বাধীন মত প্রকাশকারী। তাদের মতে প্রজ্ঞা বা বুদ্ধিবৃত্তি স্বাধীনতা ও বল্গাহীনতার অপর নাম। আর জীবন বলা হয় বেহায়াপনাকে, সৌন্দর্য ও পোশাক-পরিচ্ছদের অপর নাম সম্মান এবং অপরের ওপর প্রাধান্য ও বিজয় লাভ করাই হলো ইজ্জত লাভ।"

পশ্চিমা স্বভাব ও মন-মানসিকতার এটাই হলো সহীহ-শুদ্ধ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ। মরহুম কাওয়াকিবী এই দু'টো জাতিগোষ্ঠীকে কেবল নমুনা হিসেবে বাছাই করেছেন। অন্যথায় আংশিক ও জাতীয় বৈশিষ্ট্যসমূহ ছাড়াও বস্তুপূজা, সীমাহীন সম্পদ প্রীতি, স্বার্থপরতা ও লেনদেনের ক্ষেত্রে কঠোরতার ব্যাপারে পশ্চিমের সমগ্র জাতিগোষ্ঠীই মূলত এক ও অভিন্ন।

আধ্যাত্মিকতার মধ্যে বস্তুবাদ

এই বস্তুবাদী স্পিরিট নতুন প্রাচীন নির্বিশেষে যূরোপের সমস্ত রাজনৈতিক, সামাজিক ও নৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে আপনি দেখতে পাবেন, এমন কি যে আধ্যাত্মিক আন্দোলনের স্পিরিটের প্রতি যূরোপের বিরাট আকর্ষণ সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল তাও ছিল এই বস্তুবাদই। এও পাশ্চাত্যের অপরাপর শিল্প ও কলা-শাস্ত্রের ন্যায় এক প্রকার বিজ্ঞান ও শিল্প-কলাই বটে যার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো আধ্যাত্মিক জগতের মিউজিয়ামগুলো ভ্রমণ করা, তার রহস্যসমূহ অবগত হওয়া, মৃত মানুষগুলোর আত্মার সাথে কথা বলা এবং চিত্ত-বিনোদন ও চিত্ত প্রশান্তির উপকরণ সংগ্রহ করা। প্রাচ্যের ইসলামী রূহানিয়াত ও তাসাওউফের বিপরীতে একে তাযকিয়ায়ে নফ্স তথা আত্মশুদ্ধি, হৃদয়ের সংশোধন, আল্লাহর ভয়, নেক আমল, প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণে রাখার কঠোর কঠিন মুজাহাদা এবং মৃত্যু পরবর্তী জীবন ও তার প্রস্তুতির সঙ্গে এর সামান্যতম সম্পর্কও নেই। তেমনি যেসব কাজে যূরোপের লোকেরা নিজেদের জীবন দিয়ে দেয়, সেগুলোও শুধু বস্তুগত স্বার্থসিদ্ধির জন্যই তারা করে থাকে। যদি এসব কাজের পর্যালোচনা করা হয় তাহলে দেখা যাবে সে সবের পেছনেও কোন না কোন বস্তুস্বার্থ ও উদ্দেশ্য কাজ করছে। উদাহরণস্বরূপ খ্যাতি, লিপ্সা, প্রতিযোগিতায় এগিয়ে যাবার প্রেরণা, জাতীয় ও দেশীয় সম্মান ও গর্ব প্রভৃতির কথা বলা যেতে পারে যেগুলোর কোথাও আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অভীষ্ট হয় না। পক্ষান্তরে একজন মুসলমানের প্রতিটি কাজে আল্লাহর সন্তুষ্টিই কাম্য হয়ে থাকে এবং সে নির্ভেজাল তাঁরই সন্তুষ্টি লাভের আকাঙ্ক্ষায় কাজ করতে চায়। যে জিনিস পাশ্চাত্যে জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, এখানে তা পরিত্যাজ্য ও বর্জনীয়। পাশ্চাত্যে যা গর্ব ও গৌরবের বস্তু, একজন মুসলমানের জন্য তাই লজ্জাকর ও দোষাবহ।

কুরআন মজীদের আয়াত ঃ

قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالاَخْسَرِيْنَ اَعْمَالاً - اَلَّذِيْنَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ يُحْسِنُوْنَ صُنْعًا - اُولٰۤئِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَآئِهٖ فَحَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فَلاَنُقِيْمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَزْنًا -

"বল, 'আমি কি তোমাদেরকে সংবাদ দেব কাজে-কর্মে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্তদের?' ওরাই তারা, পার্থিব জীবনে যাদের প্রচেষ্টা পণ্ড হয় যদিও তারা মনে করে, তারা সৎকাজ করছে। ওরাই তারা, যারা অস্বীকার করে ওদের প্রতিপালকের নিদর্শনাবলী ও তাঁর সাথে ওদের সাক্ষাতের বিষয়। ফলে ওদের

কর্ম নিষ্ফল হয়ে যায়। সুতরাং কিয়ামতের দিন ওদের জন্য ওযনের কোন ব্যবস্থা রাখব না।" (সূরা কাহ্ফ ঃ ১০৩-৫)

وَقَدِمْنَا اِلٰى مَاعَمِلُوْا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنٰهُ هَبَاۤءً مَّنْثُوْرًا ـ

"আমি ওদের কৃতকর্মগুলো বিবেচনা করব, এরপর সেগুলোকে বিক্ষিপ্ত ধূলিকণায় পরিণত করব।" (সূরা ফুরকানঃ ২৩)

রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হলো, একজন বীরত্বের ওপর ভিত্তি করে লড়াই করে, একজন আত্মমর্যাদাবোধের জোশে উদ্দীপ্ত হয়ে এবং আরেকজন বাহাদুরী ফলাবার উদ্দেশে লড়াই করে। এগুলোর মধ্যে কোন্‌টি আল্লাহ্‌র রাস্তায় হয়েছে বলে বিবেচিত হবে? তিনি বললেন, কেবল সেই যুদ্ধ যা এই উদ্দেশে পরিচালিত হয় যেন আল্লাহ্‌র বাণী সমুন্নত হয়, সেটাই আল্লাহ্‌র রাস্তায় হয়েছে বলে বিবেচিত হবে। এই মূলনীতি ও হাকীকতের যারা সমর্থক ছিলেন তারা নিজেদের কাজ ও পুণ্যগুলোকে লোকচক্ষুর আড়ালে রাখার জন্য সযত্ন প্রয়াস চালাতেন। এর পরও তারা সদা শংকিত থাকতেন এবং রিয়া হয়ে গেল কি-না তার ভয় করতেন। হযরত ওমর (রা) -এর একটি বিশেষ দোআ ছিল নিম্নরূপ ঃ

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ عَمَلِیْ كُلَّهٗ صٰلِحًا وَّاجْعَلْهُ كُلَّهٗ لِوَجْهِكَ خَالِصًا وَّلَاتَجْعَلْ لِّغَيْرِكَ فِيْهِ شَيْئًا ـ

অর্থাৎ " হে আল্লাহ! আমার সমস্ত আমলকে তুমি শুদ্ধ বানিয়ে দাও এবং সেগুলোকে নির্ভেজাল তোমার জন্যই বানিয়ে নাও; তুমি ছাড়া আর কারোর অংশ এতে রেখো না।"

অর্থনৈতিক সর্বেশ্বরবাদ (ওয়াহ্‌দাতু'ল-ওজূদ)

বস্তুবাদী দৃষ্টিকোণ ও বস্তুবাদী চিন্তাপদ্ধতি য়ূরোপীয়দেরকে ইস্তিগরাক ও ফানা (আত্মবিলুপ্তি ও আত্মবিসর্জন)-এর এমন এক স্তরে পৌঁছিয়ে দিয়েছে যে, পাশ্চাত্যের লোকেরা ও চিন্তাশীল মহল এর বাইরের সব কিছু একেবারেই ভুলে যায়। সমাজতান্ত্রিক দর্শনের জনক কার্ল মার্কস (১৮১৮-৮৩) এর সর্বোত্তম উদাহরণ। তাঁর মতে, গোটা মানব জাতির ইতিহাস (তার অতি শৈশবকাল ব্যতীত) মানব সমাজের পারস্পরিক শ্রেণী সংগ্রামের ইতিহাস। তিনি মানব জীবনের অর্থনৈতিক দিক ভিন্ন আর সমস্ত দিকের গুরুত্ব ও প্রভাবকেই অস্বীকার করেছেন। তিনি অর্থাৎ কার্ল মার্কস ধর্ম, নীতি-নৈতিকতা হৃদয় আত্মা এমন কি

প্রজ্ঞা ও বুদ্ধিবৃত্তিকেও আদৌ মূল্য দেন নি এবং তাঁর মতে এগুলোর মধ্যে কোনটারই মানব ইতিহাসে কোন বিশেষ গুরুত্ব নেই। ইতিহাসের বুকে সংঘটিত সমস্ত যুদ্ধ-বিগ্রহ, বিদ্রোহ ও বিপ্লব কেবল প্রতিশোধ গ্রহণের নিমিত্তই সংঘটিত হয়েছে যা একজন ক্ষুদ্র ও অন্নহীন ক্ষুধার্ত লোক একজন বিরাট ও ভরপেট লোক থেকে নিতে চায়। এটা ছিল কেবলই এক নিরন্তর সংগ্রাম ও সাধনা যা অর্থনৈতিক ব্যবস্থার নবতর সংগঠন ও শিল্পোৎপাদনের বিভিন্ন পন্থার নবতর সংগঠনের ধারাবাহিকতায় সামনে এসেছে। এরই ওপর ভিত্তি করে এই ফলাফলে উপনীত হওয়া ভুল হবে না যে, তাঁর মতে ধর্মীয় যুদ্ধ, জিহাদও বিভিন্ন অর্থনৈতিক শ্রেণীর মধ্যে পারস্পরিক সংগ্রাম বৈ আর কিছুই নয়। একদল সম্পদের উৎস ও উৎপাদনের উপায়-উপকরণগুলো নানা কৌশলে দখল করে বসেছিল আর অপর দল এসব সম্পদে অংশ দাবি করত এবং অপরিহার্য ভাগ নিতে চাইত কিংবা এসব সম্পদ ও উৎপাদনের উপকরণগুলো (যেমন জমি, মিল ও কল-কারখানা ইত্যাদি) নতুনভাবে সংগঠিত করতে ও ঢেলে সাজাতে চাইত। প্রথমোক্ত দল এর প্রতিরোধে এগিয়ে এলে সেসব যুদ্ধ-বিগ্রহ, হৈ-হাঙ্গামা, বিক্ষোভ ও বিপ্লব সংঘটিত হয়, ইতিহাস যেগুলোকে বিভিন্ন নামে স্মরণ করে। এই একতরফা ও একচোখা দর্শন কোন ধর্মীয় যুদ্ধ-জিহাদ, কোন ধর্মীয় সংস্কারমূলক আন্দোলন, কোন আধ্যাত্মিক সংগ্রাম ও চেষ্টা-সাধনাকেই তাদের এই ব্যাখ্যা থেকে আলাদা বা ভিন্নতর ভাবতে রাজী নয়। আর এই হলো পাশ্চাত্যের বস্তুবাদী তাসাওউফ ও য়ূরোপের অর্থনৈতিক সর্বেশ্বরবাদী দর্শন।

পেট ও যৌনাকাঙ্ক্ষা ছাড়া আর কিছু নেই

যেহেতু প্রাচ্যে আধ্যাত্মিকতা আল্লাহ্‌র প্রতি আকর্ষণ ও তাঁকে একান্ত করে পাবার প্রতি দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষাই এর অধিবাসীদের মন-মানসিকতার ওপর জেঁকে আছে সেজন্য এ ব্যাপারে সে সমস্ত লোকের ওপর আল্লাহকে পাবার আকাঙ্ক্ষা পেয়ে বসে এবং এই তীব্রতার কাছে যারা হার মানে তারাই আল্লাহ ব্যতিরেকে সব কিছুকেই সব কিছুর অস্তিত্বকেই অস্বীকার করেছে এবং আবেগোন্মত্ত অবস্থায় আত্মবিস্মৃত হয়ে لا موجود الا الله 'আল্লাহ ছাড়া আর কিছুর অস্তিত্ব নেই' বলে ধ্বনি তুলেছে। য়ূরোপের চিন্তাশীল দার্শনিকদের ওপর যেহেতু বস্তুবাদ জেঁকে বসে আছে এবং এ ব্যাপারে উক্তরূপ চিন্তা-চেতনা যেহেতু তাদেরকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে সেহেতু তারা আত্মবিস্মৃত অবস্থায় অর্থনৈতিক ও জৈবিক দিক ছাড়া আর সব কিছুর অস্তিত্বকে অস্বীকার করে বসেছে এবং لا موجود الا البطن والشهوة 'পেট ও যৌনাকাঙ্ক্ষা ছাড়া আর কিছু নেই' বলে ঘোষণা দিয়েছে। প্রাচ্যের সূফী-দরবেশরা মানুষকে আল্লাহ্‌র প্রতিচ্ছায়া মনে করতেন এবং কোন কোন

আত্মবিস্মৃত সূফী انا الحق। "আমিই আল্লাহ পরম সত্য" বলে প্রতিধ্বনি তুলেছেন। অপর দিকে পাশ্চাত্যের বস্তুবাদী ও পেটপূজারীরা মানুষকে নিছক জৈব অস্তিত্ব মনে করে , তাই আজ চতুর্দিকে থেকে انا الحيوان। 'আমি পশু 'এই ধ্বনিই ভেসে আসছে।

ডারউইনের বিবর্তনবাদের প্রভাব

এটা কেবল কষ্ট-কল্পনা নয়। খ্রিস্টীয় ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে য়ূরোপে এমন সব মতবাদ ও তত্ত্বগত মতাদর্শ জন্ম নিতে থাকে যার ফলে মানুষ ও তার জীবনের নানাবিধ সমস্যা সম্পর্কে পাশবিক দৃষ্টিভঙ্গি সমর্থিত ও শক্তিশালী হতে থাকে। ১৮৫৯ সালে ডারউইন তাঁর Origin of Species নামক গ্রন্থে প্রমাণ করতে চেষ্টা পান, মানুষ মূলত পশুরই ক্রমবিবর্তিত একটি রূপ মাত্র যা হাজার হাজার বছরের ক্রমউন্নতি ও ক্রমবিবর্তনের মাধ্যমে জীবাণু বিশেষ (Amoeba) থেকে বানর, অতঃপর বানর থেকে মানবাকৃতিতে রূপান্তরিত হয়েছে। এই গ্রন্থটি সমগ্র য়ূরোপের মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয় এবং সময়ের সবচে' বড় আলোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। এই বিবর্তনবাদ মানুষের সমস্যা নিয়ে চিন্তা-ভাবনার মোড়টাই ঘুরিয়ে দেয় এবং জীবজগতের ইতিহাস, জন্ম ও প্রবৃদ্ধি, সে সবের আচার-আচরণ, অভ্যাস ও সমূহ বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আগ্রহ সৃষ্টি করে দেয়। এই মতবাদ এ ধরনের বিশ্বাস সৃষ্টি করে দিয়েছে, এই বিশ্বজগত কোন অতিপ্রাকৃতিক শক্তির হস্তক্ষেপ ছাড়াই পরিচালিত হচ্ছে এবং প্রাকৃতিক বিধান ব্যতিরেকে এর কোন কার্যকারণ নেই।

সূচনা ও পরিণতি, মেধাগত, নৈতিক ও কার্যকর প্রভাবগুলোর মধ্যে এই মতবাদ ধর্মের সঙ্গে সাংঘর্ষিক, বরং বলা যায়, এই মতবাদ একটি স্থায়ী ধর্ম ও জীবনদর্শনের রূপ পরিগ্রহ করেছে যা অপর কোন ধর্ম ও জীবন-দর্শনের নিমিত্ত কোনরূপ অবকাশ রাখে না। তাই ধর্মের অনুসারীদের এর বিরোধিতা এবং এ ব্যাপারে তাদের আশংকা ছিল যথার্থ। অধ্যাপক C.E.M. Joad বলেন ঃ

"এই পেরেশানী ও হতবুদ্ধিকর অবস্থার পরিমাপ করা আমাদের জন্য এ সময় কঠিন বৈকি যা আমাদের পূর্বসূরীদের সামনে এ বইটি (Origin of Species) প্রকাশের পর দেখা দিয়েছিল। সেই সময় সাক্ষ্য-প্রমাণ দ্বারা যার ওপর এর গবেষণার ফলাফল স্থাপিত ছিল, ডারউইন প্রমাণ করেন (কিংবা তিনি প্রমাণ করেন বলে ধরে নেয়া হয়), ভূপৃষ্ঠে জীবনের বিবর্তন জীবাণু বিশেষ (Amoeba) ও জেলী ফিশ (Jelly fish)-এর প্রাথমিক আবির্ভাব থেকে তার চূড়ান্ত অবয়বে উপনীত হওয়া পর্যন্ত অব্যাহতভাবে চলেছে। আমরা জীবনের সর্বোন্নত ও সর্বশেষ অবয়ব।

"এর বিপরীতে ভিক্টোরিয়া যুগের লোকদেরকে বলা হয়েছিল, মানুষ স্বয়ং আল্লাহ্র এক বিশেষ সৃষ্টি এবং সে মূলত ফেরেশতার স্তর থেকে নেমে এসেছে। কিন্তু ডারউইনের মতে মানুষ বানরের উন্নত সংস্করণ মাত্র। ঐ যুগের লোকদের একথা ভাবতে খুব কষ্ট হয়েছে, তারা অধঃপতিত ফেরেশতার পরিবর্তে একটি উন্নত মানের বানর প্রমাণিত হয়েছে। এই মতবাদ তাদের আদৌ পসন্দ হয়নি এবং তারা মানুষকে এই উভয় সংকট থেকে মুক্তি দিতে এবং এই লজ্জা দূর করবার বিভিন্ন রকমের প্রয়াস চালায়।"[১]

জ্ঞানগত ও গবেষণামূলক বিভিন্ন রকমের ত্রুটি-বিচ্যুতি ও শূন্যতা বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও সাধারণ মানুষের অধিকাংশই বুঝে হোক অথবা না বুঝে হোক, এই মতবাদ গ্রহণ করে নেয়। মনে হয়, তাদের মস্তিষ্ক আগে থেকেই এর জন্য তৈরি ছিল। মানুষ এর ভেতর আরেকটি ভাল দিক এও দেখতে পেল, তা ধর্ম ও ধর্মানুসারীদের প্রতিদ্বন্দ্বী ও প্রতিপক্ষ। অতঃপর যারা ধর্মের অনুসারী তাদের পক্ষে নানারূপ ধ্যান-ধারণা ও রুচির এই প্রবাহিত স্রোত এবং প্রকাশিত বই-পুস্তক ও পত্র-পত্রিকার এই প্লাবনের মুকাবিলা করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়াল এবং অবশেষে গির্জা এই যুদ্ধে তাদের পরাজয় স্বীকার করে নিল।

ধ্যান-ধারণা, সভ্যতা-সংস্কৃতি, সাহিত্য ও রাজনীতি, মোট কথা জীবনের সকল শাখায় এই মতবাদ সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলেছে। প্রকৃতির রাজ্যের দিকে প্রত্যাবর্তনের ধারণা, নগ্নতা ও উলঙ্গপনার প্রতি আগ্রহ এবং এ ধরনের বহু কাজ ও আচার-ব্যবহার এ জাতীয় ধ্যান-ধারণার ফল ও ফসল যে, মানুষ মূলত একটি উন্নত পশু বৈ নয়। এ ধরনের মন-মানসিকতারই ফল যে, মি. শেপার্ড-এর ভাষায়, "ইংল্যান্ডে বর্তমানে এক নতুন প্রজন্ম জন্ম নিচ্ছে যারা মানুষের পারিবারিক জীবনের অর্থ সম্পর্কেই সম্পূর্ণ অজ্ঞ ও অপরিচিত। তারা কেবল পশু পালের জীবন সম্পর্কেই জ্ঞাত ও পরিচিত।"

জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ও বিকাশ

আগেই বলা হয়েছে, সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদের ধারণা, জাতীয় গর্ব, অহংকার, ভৌগোলিক বিভাজনের প্রতি অতিরিক্ত সমীহ পশ্চিমা স্বভাবেরই বৈশিষ্ট্য যা পশ্চিমা লোকদের মধ্যে প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে চলে আসছে। খ্রিস্ট ধর্ম যখন যূরোপে গিয়ে পৌঁছল যদিও সে তখন তার নিজস্ব রূপ হারিয়ে ফেলেছিল এবং তার মধ্যে দুর্বলতা সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও তার ভেতর আর যা-ই হোক, হযরত ঈসা আল্লায়হিস সালামের পেশকৃত শিক্ষামালার প্রভাব ও আসমানী ধর্ম হিসাবে এর সমূহ বৈশিষ্ট্য বর্তমান ছিল। ধর্ম তা যতই বিকৃত

১. Guide to Modern Wickedness, p. 235-236.

হোক, দেশ ও জাতির ভিত্তিতে মানুষের মধ্যে পার্থক্য ও বিভাজন সমর্থন করতে পারে না। এজন্য খ্রিস্ট ধর্ম য়ূরোপের বিক্ষিপ্ত জাতিগোষ্ঠীসমূহকে রোমান গির্জার অধীনে ধর্মের পতাকাতলে একত্র করে দেয় এবং খ্রিস্টান জগতকে একই পরিবারে পরিণত করে দেয়। History of Morality-এর লেখকের মতে, স্বদেশপ্রেম ও স্বজাতিপ্রেম সৃষ্টিকুলের প্রতি সাধারণ ভালবাসায় পরিণত হয়ে যায় এবং এই মানসিক পরিবর্তনের পরিমাপ আপনি খ্রিস্টান পণ্ডিতদের কথা থেকেও করতে পারেন। উদাহরণত টারটোলিন বলেন যে, আমরা একটি প্রজাতন্ত্র সম্পর্কেই জানি আর তা হলো সমগ্র বিশ্ব এবং রেজিন বলেন, আমাদের দেশ একটাই যার ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে 'আল্লাহ' শব্দের মাধ্যমে।

কিন্তু মার্টিন লুথার (১৪৮৩-১৫২৬) যখন তাঁর বিখ্যাত সংস্কার আন্দোলন শুরু করলেন এবং রোমান গির্জার বিরোধিতায় জার্মান জাতির সাহায্য পেলেন, অবশেষে রোমান গির্জাধিপতিদের পরাজয় মেনে নিতে বাধ্য করলেন তখন একই শেকলে যুথবদ্ধ বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী পরস্পর বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত হয়ে গেল। এরপর তারা প্রতিদিনই অভ্যন্তরীণ দিক দিয়ে স্বাধীন ও খোদ-মুখতার হতে থাকল। য়ূরোপে খ্রিস্ট ধর্মের পতনের সাথে সাথে জাতীয়তাবাদের উত্থান ঘটতে লাগল অর্থাৎ এ যেন সেই পাল্লার মত যার একদিকে ধর্ম আর অপর দিকে জাতীয়তাবাদ চাপানো! ফলে একদিকের পাল্লা যেই পরিমাণ নিচু হতো, অপর দিকের পাল্লা ঠিক সমপরিমাণ ওপরে উঠে যেত। আর এটা তো জানা কথা, ধর্মের পাল্লা হাল্কা থেকে অধিকতর হাল্কাই হয়েছে বিধায় জাতীয়তাবাদের পাল্লা ভারি থেকে আরো ভারি হয়েছে। বিখ্যাত ইংরেজ মনীষী লর্ড লোথিয়ান এদিকেই ইঙ্গিত করে বলেছিলেন ঃ

"Europe once had the same kind of cultural and religious unity as India in the earlier days of Christianity. But when in the 15th century the new learning of the Renaissance and the new movement for religious reform known as the Reformation began, because it had no constitutional unity, Europe fell into pieces and has since then remained divided into those national sovereign states whose strifes and wars are not only the ruin of Europe itself, but the principal threat to the peace of the world...."

"এক সময় য়ূরোপে একই রকম সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় ঐক্য বিদ্যমান ছিল, যেমনটি ছিল ভারতে খ্রিস্ট ধর্মের প্রাথমিক দিনগুলোতে। কিন্তু ১৫শ শতাব্দীতে লুথারের ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলন যখন য়ূরোপের এই সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় ঐক্য খতম করে দিল তখন সমগ্র মহাদেশ বিভিন্ন জাতীয় সরকারের মধ্যে বিভক্ত হয়ে গেল যাদের পারস্পরিক লড়াই-ঝগড়া কেবল য়ূরোপেরই নয়, বরং সমগ্র বিশ্বেরই শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য স্থায়ী হুমকি হয়ে দেখা দিল।"

ধর্মীয় অধঃপতন এবং ধর্মীয় মূলনীতি ও আচার-ব্যবহারের অবনতির দরুন জাতীয়তাবাদের ধ্যান-ধারণার যে বিকাশ ঘটে এর প্রতিও লেখক অঙ্গুলি সংকেত করেছেন এভাবে ঃ

"........ The decline in the authority of religion, the indispensable guide of man, the one source which can give more purpose and nobility and meaning to life of man, explains, at least in part, why the Western World has given its allegiance in the recent decades to new political gospels based on race or class, or has pinned its faith on a form of science which admittedly is almost wholly concerned with advance in the material plane, with making life more rather than less expensive and complicated. And it explains, also in part, why Europe finds it so difficult to attain to that unity in spirit and life which would enable it to rise above the spirit of exclusive and militant nationalism which is its principal bane today."[1]

"ধর্ম যা মানুষের অনিবার্য ও অপরিহার্য পথ-প্রদর্শক, নৈতিক উদ্দেশ্য হাসিল এবং মানুষের জীবনের ইযযত-সম্মান ও মৌলিকত্ব লাভের একক উপায় ও মাধ্যম। এর ক্ষমতার পতনের ফল দাঁড়াল এই যে, পাশ্চাত্য জগত এমন সব রাজনৈতিক ধর্ম ও ধ্যান-ধারণার প্রতি ঝুঁকে পড়ল যার বুনিয়াদ হলো বংশ ও শ্রেণী-বৈষম্যের ওপর। প্রাকৃতিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রভাবে সে একথা মেনে নিল, বস্তুগত উন্নতি-অগ্রগতিই হলো উচ্চতর ও মহত্তর লক্ষ্য। এরই কারণে জীবনের জটিলতা ও সমস্যা-সংকটগুলো বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফল হলো, য়ূরোপের জন্য স্বীয় রূহ বা আত্মা ও জীবন-যিন্দেগীর মাঝে এখন সামঞ্জস্য বিধান করা কঠিন হয়ে গেল যা তাকে এ যুগের সবচে' বড় বিপদ জাতীয়তাবাদের হাত থেকে মুক্তি দিতে পারে।"[১]

পাশ্চাত্যের অহংকার ও প্রাচ্যের বিরুদ্ধে অন্যায় পক্ষপাতিত্ব

ধর্মীয় বিধি-ব্যবস্থার পরাজয় এবং জাতীয়তাবাদী প্রেরণার উন্নতি ও বিকাশের প্রথম প্রভাব পড়ল। ফলে সমগ্র য়ূরোপ গোটা প্রাচ্যের মুকাবিলায় একটি প্রতিদ্বন্দ্বী শিবিরে পরিণত হলো। সে পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য, আর্য জাতি ও অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে একটি পার্থক্য ও বিভাজন রেখা টেনে দিল এবং সিদ্ধান্ত নিল, এই রেখার মধ্যে যতগুলো জাতিগোষ্ঠী, সভ্যতা-সংস্কৃতি ও সাহিত্য অবস্থিত সেগুলোর দুনিয়ার তাবত জাতিগোষ্ঠী, সভ্যতা-সংস্কৃতি, সাহিত্য ও

১. Convocation Address, Aligarh Muslim University, 29-38.

জ্ঞান-বিজ্ঞানের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রাধান্য রয়েছে। শাসন করা, টিকে থাকা ও ফলে-ফুলে বিকশিত হওয়া তার অধিকার। এতদ্ভিন্ন আর যা কিছু আছে তাকে পরাভূত ও পর্যুদস্ত হয়ে বশ্যতা স্বীকার করে থাকতে হবে এবং বেঁচে থাকার ও উন্নতি করার কোন অধিকার তার নেই। ঠিক এরূপ চিন্তাধারা আপন আপন যুগে গ্রীক ও রোমকদের ছিল। পৃথিবীতে তারা নিজেদেরকেই কেবল সভ্য গণ্য করত এবং বাইরের সব কিছুকেই বিশেষ করে যেসব জিনিস আটলান্টিক সমুদ্রের পূর্বাংশে অবস্থিত সে সবকে অসভ্য ও বর্বর হিসেবে আখ্যায়িত করত।

জাতীয়তাবাদের সীমারেখা

য়ূরোপের সাম্রাজ্য ও জাতিগোষ্ঠীগুলো নিজেদেরকে একটি স্থায়ী জগত ধরে নিয়েছে। আল্লাহ্ পাক পাহাড়-পর্বত ও নদ-নদীর যেই প্রাকৃতিক সীমা কায়েম করে দিয়েছেন এর বাইরে তারা নিজেদের চারপাশে রাজনৈতিক ও সাম্রাজ্যবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃত্ত টেনে দিয়েছে। তাদের দৃষ্টিতে এই বৃত্তের বাইরে অন্য কোন পৃথিবী ও মানুষের অস্তিত্ব নেই। তাদের কাছে এই বৃত্তের বাইরে অবস্থিত কোন কিছুই সম্মান ও মর্যাদাযোগ্য নয়। তারা নিজেরাই নিজেদেরকে এক স্থায়ী উপাস্য দেবতা বানিয়ে নিয়েছে এবং ইবাদত-বন্দেগী ও পবিত্রতার যতগুলো সম্পর্ক আব্দ ও মা'বুদ তথা গোলাম ও উপাস্য প্রভুর মধ্যে হওয়া দরকার বা হওয়া উচিত, তারা এই স্বকপোলকল্পিত মা'বুদের সাথে কায়েম করে নিয়েছে। এরই জন্য তাদের যত সব কুরবানী, এরই নিমিত্ত তাদের যুদ্ধ-বিগ্রহ ও লড়াই-সংঘর্ষ, এরই খাতিরে তাদের বাঁচা ও মরা। একে ভেট দেবার জন্য তারা দেদার ও এন্তার মানুষের খুন ঝরিয়ে থাকে। এই জাতীয়তাবাদী ধর্মের সর্বপ্রথম আকীদা-বিশ্বাস হলো এই জাতি সব কিছুর ওপর অগ্রাধিকার পাবার অধিকার রাখে এবং সব কিছুর ওপর জাতি ঊর্ধ্বে এবং জাতির শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রাধান্য সব কিছুর ওপর। এই জাতি থেকে উত্তম, অভিজাত, মেধার অধিকারী, শক্তিশালী, শাসন করার, নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব করবার, বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর ওপর খবরদারী ফলাবার, অভিভাবকত্ব করবার এবং বিশ্বের রক্ষণাবেক্ষণের অধিকার ভূপৃষ্ঠের বুকে অন্য কোন জাতির নেই। এর নদীর পানি অমৃতের ন্যায়, এর মাটি মাটি নয়, সোনা আর এর কাঁটা কাঁটা নয়, ফুল। এই জাতীয়তাবাদরূপী ধর্ম কোন মানুষকে কোন দেশে থাকার ও বসবাসের ততক্ষণ পর্যন্ত অনুমতি দেয় না যতক্ষণ না সে এর ওপর ঈমান আনে।

জাতি পূজার এই বীজ একই ধরনের চারা, পাতা ও ফল জন্মায়। এটা সম্ভব নয় যে, কোন জাতিগোষ্ঠী জাতি পূজায় বিশ্বাসী, অথচ সে অপর জাতির দিকে হাত বাড়ায় না, কিংবা বাড়াতে চায় না এবং নিজেদের ছাড়া অন্যদের ঘৃণা করে

না, অবজ্ঞার চোখে দেখে না কিংবা অপরকে ছোট ভাবে না। এসবের থেকে তারা মুক্ত ও পবিত্র। যেমন এক ব্যক্তি পেয়ালার পর পেয়ালা মদ পান করবে, অথচ সে মাতাল হবে না, তার নেশা ধরবে না – এটা যেমন অসম্ভব ঠিক তেমনি ওটাও অসম্ভব।

درمیان قعر دریا تختہ بندہ کردہ
بازی گرئ کہ دامن ترمکن ہشیا د باش

"তরঙ্গ-বিক্ষুব্ধ সাগর মাঝে বেঁধে মোরে দিলে তক্তায়
বলে দিলে ফের সাবধান যেন আঁচল ভিজে না যায়।"

বিশেষত যখন জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য, কাব্য, দর্শন, ইতিহাস, এমন কি যখন প্রকৃতি বিজ্ঞান এই জাতীয়তাবাদী নেশাকে আরো শাণিত ও ধারালো এবং এই মদকে আরও উত্তেজক বানাতে থাকে এবং সর্বপ্রকারে জাতির মধ্যে বংশীয় অহংকার ও অহমিকাবোধ, নিজেদের অতীত নিয়ে গর্ব ও অহংকার লালন করতে থাকে এবং কোন ধরনের নৈতিক ও ধর্মীয় বাধা-প্রতিবন্ধকতা থাকে না, আর নেতৃত্বও যখন সে সব লোকের হাতে থাকে যাদের জাতীয় মর্যাদা ও শান-শওকত ভিন্ন আর কোন লক্ষ্য থাকে না, তখন তা যে কী মারাত্মক রূপ ধারণ করে তা বলাই বাহুল্য।

জাতীয়তাবাদের অনিবার্য উপাদান ঘৃণা ও শঙ্কাবোধ

ঘৃণা ও শঙ্কাবোধ হলো আধুনিক জাতীয়তাবাদের অনিবার্য ও অপরিহার্য উপাদান যা ছাড়া সে বাঁচতে পারে না। জাতীয়তাবাদী জোশ ও আবেগ-উদ্দীপনা ততক্ষণ পর্যন্ত সৃষ্টি হয় না আর সৃষ্টি হলেও স্থায়ী থাকে না, যতক্ষণ না জাতির সম্মুখে এমন কিছু থাকে যাকে ঘৃণা করা যায় কিংবা যা ভয় করার মত। অনন্তর জাতীয়তাবাদী নেতা ঘৃণা ও ভীতিবোধ সৃষ্টির মাধ্যমে তার আবেগকে উস্কে দিতে থাকে এবং তার আহত ও ব্যথিত শিরাকে দাবিয়ে দিয়ে তার মধ্যে অস্থিরতা, ক্ষোভ, উত্তেজনা ও আবেগ-উদ্দীপনা সৃষ্টি করে দেয়। সে ঘৃণা ও ভীতির আগুন নিভতে দেয় না, বরং তিলকে তাল বানিয়ে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনৈক্য ও মতপার্থক্যকে বাড়িয়ে চড়িয়ে এবং কোন না কোন প্রকৃত অথবা কল্পিত প্রতিদ্বন্দ্বীকে সামনে এনে দাঁড় করিয়ে জাতির ঘৃণা ও ভীতির আবেগকে জাগিয়ে তোলে এবং তাকে সচল ও সক্রিয় রাখে। এর মধ্যেই নিজেদের হুকুমত ও নেতৃত্বের প্রাণ ও আপন স্থায়িত্ব নির্ভরশীল মনে করে। অধ্যাপক জোড্ এর যেই দার্শনিক ও মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা এভাবে ঃ

"সেই সব সাধারণ ও সম্মিলিত আবেগ যেগুলোকে খুব সহজেই জাগিয়ে তোলা যায় যা দিয়ে সাধারণ গণমানুষের বিরাট বিরাট দলকে সচল ও সক্রিয় করা যায় তা দয়া-মায়া, বদান্যতা ও প্রেম-ভালবাসার আবেগ নয়, বরং তা হলো ঘৃণা ও ভয়-ভীতির আবেগ। যেসব লোক কোন জাতির ওপর নেতৃত্ব করতে চায়, কোন লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের জন্য তারা ততক্ষণ পর্যন্ত সফল ও কৃতকার্য হতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত না এর জন্য এমন কোন জিনিস খুঁজে না নেয় যা দ্বারা সে ঘৃণা করবে এবং এজন্য এমন কোন ব্যক্তিত্ব কিংবা জাতিগোষ্ঠী সৃষ্টি না করবে যাকে সে ভয় পাবে। আমিই যদি বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীকে ঐক্যবদ্ধ করতে চাই তাহলে আমার জন্য দরকার হবে তাদের জন্য অন্য কোন গ্রহে কোন দুশমন আবিষ্কার করা, ধরুন, চাঁদের পৃষ্ঠেই যেই দুশমনকে সব জাতিগোষ্ঠীই ভয় পাবে। অতএব, এতে বিস্ময়ের কিছুই নেই যে, এ যুগের জাতীয় সরকারগুলো তাদের প্রতিবেশী জাতিগুলোর সঙ্গে কায়কারবার ও আচার-আচরণের ক্ষেত্রে ঘৃণা ও ভয়-ভীতিরই আবেগাধীন। এসব আবেগের ওপরই ঐ সব সাম্রাজ্যের ওপর শাসন পরিচালনাকারীদের জীবন নির্ভরশীল এবং ঐসব আবেগের ওপরই জাতীয় ঐক্যের বুনিয়াদ স্থাপিত।"[১]

আসল ঘটনা হলো, নির্ভেজাল জাতীয়তাবাদী মানসিকতা ও কর্মকৌশলই হলো ঘৃণা ও ভীতিবোধ বজায় রাখতে হবে। আর এ দু'টো আবেগের ওপরই অতীত ও বর্তমান জাতীয়বাতাদী সরকারগুলোর ভিত্তি স্থাপিত এবং এ দু'টো আবেগই সেই সব বড় বড় যুদ্ধের জন্ম দিয়েছে, যেসব যুদ্ধের গাঁথা ইতিহাসের পাতায় দেখতে পাওয়া যায় এবং যেসবের চিহ্ন দুনিয়ার বুকে আজও বিদ্যমান। ইসলাম এই জাতীয়তাবাদী ধ্যান-ধারণাকে (যা আপন জাতির প্রতি ন্যায় ও অন্যায় পক্ষপাতিত্ব এবং অপর জাতির প্রতি ঘৃণা ও ভয়-ভীতি ব্যতিরেকে প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারে না এবং যেখানে ন্যায় ও সত্যের কোন প্রশ্নই নেই) 'আসাবিয়াত' (অন্যায় পক্ষপাতিত্ব) ও "হামিয়্যাতে জাহেলিয়্যাত" (জাহিলী যূথবন্দী) হিসাবে আখ্যায়িত করে এবং এমনতরো সর্বপ্রকার সাহায্য-সমর্থন, উৎসাহ প্রদান ও যুদ্ধ-বিগ্রহকে হারাম অভিহিত করে যার বুনিয়াদ স্রেফ জাতীয় কিংবা দলীয় অন্যায় পক্ষপাতিত্বের ওপর হয়। রসূলে আকরাম (সা) পরিষ্কার ভাষায় বলেছেনঃ

ليس منا من دعا الى عصبية وليس منا من قاتل على عصبية وليس منا من مات على عصبية ـ

1. Guide to Modern Wickedness, p. 150-51..

"সে আমাদের কেউ নয় যে অন্যায় পক্ষপাতিত্ব ও যূথবন্দীর দিকে আহ্বান জানায় এবং সে আমাদের ভেতরকার কেউ নয় যে অন্যায় পক্ষপাতিত্ব ও যূথবন্দীর জন্য যুদ্ধ করে এবং সেও আমাদের কেউ নয় অন্যায় যূথবন্দী ও পক্ষপাতিত্বের ওপর যে মারা যায়।" (আবূ দাউদ)

যে ব্যক্তি এই জাতিপূজা ও জাহিলী যূথবন্দীর যুদ্ধে মারা যায় তার মৃত্যুকে জাহিলী তথা অনৈসলামী মৃত্যু হিসাবে অভিহিত করা হয়েছে এবং অন্য এক হাদীসে তাকে এই উম্মাহবহির্ভূত বলা হয়েছে।

من قاتل تحت رائية عمية يغضب بعصبية او يدعوا الى عصبية او ينصر عصبية فقتل فقتلته جاهلية -

"যে ব্যক্তি কোন অন্যায় যূথবন্দীর পতাকাতলে, কোন অন্যায় যূথবন্দীর সমর্থনের আবেগে অথবা কোন অন্যায় যূথবন্দীর সাহায্যে যুদ্ধ করে এবং যুদ্ধ করতে গিয়ে মারা যায় তার মৃত্যু হবে জাহেলিয়াতের মৃত্যু।" (মুসলিম ও নাসাঈ)

ومن قتل داية عصبية يغضب للعصبية ويقاتل للعصبية فليس من امتى -

" যে কোন অন্ধ গোত্রপ্রীতি ও যূথবন্দীর পতাকাতলে, কোন পক্ষপাতমূলক আবেগের বশবর্তী হয়ে কিংবা পক্ষপাতমূলক যুদ্ধে যোগ দিয়ে মারা যায় সে আমার উম্মতভুক্ত নয়।" (মুসলিম)

ইসলাম পৃথিবীর মানব সমাজকে দু'ভাগে ভাগ করেছে। একদল তারা যারা আল্লাহ্‌র অনুসারী ও সত্যের সমর্থক এবং দ্বিতীয় দল তারা যারা শয়তানের অনুসারী ও বাতিল তথা মিথ্যার সমর্থক। ইসলাম কেবল শয়তানের অনুসারী, মিথ্যা ও বাতিলের সমর্থক, যমীনের বুকে অশান্তি ও ফেতনা-ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে এবং যারা দুনিয়ার বুকে জুলুম-নির্যাতন করে, বিদ্রোহ, অন্যায় ও পাপাচারের বিস্তার ঘটায় তাদেরকে ঘৃণা করতে বলে এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে নির্দেশ দেয়– চাই কি তারা যে কোন বংশ ও দেশের অধিবাসীই হোক। ঘৃণা করবার জন্য, যুদ্ধ করবার জন্য তার কাছে জাতীয় ও বংশীয় বুনিয়াদ কোনরূপ ভেদরেখা কিংবা বিভাজন সৃষ্টির ভিত্তি নয় কিংবা সে কোন্ দেশ ও কোন শহরে বসবাস করে তাও নয়, বরং এর ভিত্তি হলো তার নীতি ও আদর্শ, আকীদা-বিশ্বাস, আমল, আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বস্ততা ও অবিশ্বস্ততা, আনুগত্য ও বিদ্রোহ এবং মানুষের জন্য তা উপকারী না ক্ষতিকর সেটা।

জাতীয়তাবাদী অহংবোধ

জাতীয়তাবাদের যারা পূজারী তাদের অভ্যাস হলো, তারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ও দুর্বল জাতিগুলোর মধ্যেও জাতীয়তাবাদের প্রচার চালিয়ে থাকে। তার সাহিত্য, তার ভাষা ও সভ্যতার অনুকূলে প্রশংসার ফুলঝুরি ছড়ায় এবং তার অতীত শান-শওকতকে কল্পনার রঙ চড়িয়ে অতিরঞ্জিত করে প্রকাশ করে, এমন কি একদিন সে সব জাতিগোষ্ঠী জাতীয়তাবাদের আবেগের কাছে পরাভূত এবং এর নেশায় উন্মাতাল হয়ে ওঠে। তাদের ভেতর তখন নিজেদের ওপর অন্যায় ও ভুল আস্থা, গর্ব ও অহংকার সৃষ্টি হয়ে যায় এবং বহির্বিশ্বের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে জাতীয়তাবাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃত্তের মধ্যে আবদ্ধ ও বন্দী হয়ে যায় এবং কোন আন্তর্জাতিক শক্তি ও আন্তর্জাতিক সম্পর্কেরই আর তারা পরওয়া করে না। তারা নিজেদের উপায়-উপকরণ, সম্পদ ও শক্তির ওপরই কেবল নির্ভর করে। ফল হয় এই, কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই তারা কোন বৃহৎ শক্তির গ্রাসে পরিণত হয়ে যায় এবং পৃথিবী দূর থেকে এর তামাশা দেখতে থাকে এবং মৌখিক সহানুভূতি ব্যতিরেকে সে সময়মত কোন সাহায্যই পায় না। জাতীয়তাবাদের দুর্গ বেষ্টনীর প্রতিষ্ঠা করে এবং নিজেদেরকে বিশ্ব থেকে আলাদা ও বিশিষ্ট হিসাবে অভিহিত করে তারা যেন বৃহৎ শক্তিগুলোর লোলুপ দৃষ্টিকেই আহ্বান জানায়।

মধ্য য়ূরোপের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের এই যুদ্ধে যেই পরিণতির সম্মুখীন হতে হয় সারা বিশ্ব তা জানে। কিন্তু আফসোসের বিষয়, সেই মুসলিম দেশগুলো যারা এক বিশ্বজয়ী দাওয়াত ও আন্দোলনের অধিকারী, যাদের কাছে এমন শক্তি আছে যা (যদি তাদের ভেতর এ থেকে উপকৃত হবার ও ফায়দা হাসিলের সামর্থ্য থাকে) য়ূরোপের জাতীয়, দেশীয় ও রাজনৈতিক দর্শন ও আহ্বানের চাইতে অধিকতর শক্তিশালী, সুদূরপ্রসারী ও সাধারণ আহ্বান ও আন্দোলন, তাদের ঝোঁকও সীমিত জাতীয়তাবাদের দিকেই, অথচ তারা নিজেদের উপায়-উপকরণ, সমরসম্ভার ও সংখ্যা শক্তির দিক দিয়ে য়ূরোপের খণ্ড খণ্ড রাজ্যের তুলনায় খুব বেশি ভাল অবস্থায় নেই। এজন্য এই আশা করা বাতুলতা বৈ নয় যে, তারা নিজেদের ঐসব সীমিত উপায়-উপকরণ ও জাতীয়তাবাদের সীমারেখার ভেতর কোন বিপদে বেশি দিন ধরে মুকাবিলা করতে পারবে।

জাতীয়তাবাদী সরকারের সম্মান ও মর্যাদার মাপকাঠি

জাতীয়তাবাদী সরকারের সম্মান ও মর্যাদার মাপকাঠি হলো বিরাট বিরাট আয়তনবিশিষ্ট ভূখণ্ডের ওপর তাদের ক্ষমতা ও আধিপত্য থাকবে, রাষ্ট্রের সীমা ও আয়তন বিশাল ও বিস্তৃত হবে, আয়ের উপায়-উপকরণ প্রচুর থাকবে, আপন

ইচ্ছা ও মর্জি অন্যের ওপর চাপিয়ে দেওয়া এবং প্রতিবেশী দেশ ও জাতি কিংবা প্রতিদ্বন্দ্বী রাষ্ট্রগুলোকে ভীত ও সন্ত্রস্ত করে তুলবার সম্পূর্ণ সামান তার কাছে থাকবে। রাষ্ট্রের নাগরিকদের মধ্যে জাতীয় শ্রেষ্ঠত্ব, বংশীয় প্রাধান্য, নিজেদের প্রাচীন সভ্যতা, সাহিত্য, ভাষা ও অতীত ইতিহাস নিয়ে গর্ব ও অহংকারের প্রেরণা ও আবেগ পাওয়া যায় এবং সমসাময়িক অন্য জাতিগোষ্ঠীগুলোর দুর্বলতা, সভ্যতা ও ভাষাগত অসহায়ত্বের ওপর দৃঢ় বিশ্বাস থাকবে। তারা রাষ্ট্র ও সাম্রাজ্যের সম্মান ও মর্যাদার খাতিরে বিরাট থেকে বিরাটতর অপরাধমূলক ও পাশবিক কাজ যেন অনায়াসে ও অবহেলায় করে ফেলতে পারে এবং নিজ জাতি ও জাতির লোকদের তুচ্ছ থেকে তুচ্ছতর ফায়দার জন্য বৃহৎ থেকে বৃহত্তর অন্যায়-অবিচার ও হক নষ্ট করতে তার মধ্যে যেন সাহসের সামান্যতম অভাবও না ঘটে। এ ধরনের রাষ্ট্রের নৈতিক মানদণ্ড যত নিম্নই হোক, তার নাগরিক ও নৈতিক চেতনা মনুষ্যত্বের সম্মানের মৌল নীতিমালার পাবন্দী থেকে যত অজ্ঞ ও অপরিচিতই হোক, সেই রাষ্ট্র ও তার দায়িত্বশীলরা নৈতিক সীমা ও বাধ্যবাধকতা থেকে যত মুক্তই হোক না কেন, সেই রাষ্ট্র সম্মান ও মর্যাদার সমুন্নত মানদণ্ডের ওপর অধিষ্ঠিত এবং দুনিয়ার এক বিশেষ সম্মান ও মর্যাদা লাভের যোগ্য। অধ্যাপক জোড্ ঠিকই লিখেছেন ঃ

"জাতীয় মর্যাদার অর্থ কেবল এই যে, জাতির কাছে এমন শক্তি থাকবে যার দ্বারা প্রয়োজনের মুহূর্তে নিজের ইচ্ছা-অভিরুচিকে অন্যের ওপর চাপিয়ে দেওয়া যায়। এই জাত্যাভিমান ঐসব জাতিগোষ্ঠীর কাছে আদর্শের মাপকাঠি হিসেবে বিবেচিত। এর অযৌক্তিকতা এ দ্বারা প্রকাশিত যে, এই মাপকাঠি নৈতিক ও চারিত্রিক গুণাবলীর একেবারেই বিপরীত। যদি কোন দেশ এমন হয়, সে কেবল সত্যি কথাই বলে, প্রতিশ্রুতি পালন করে, দুর্বলদের সাথে মানবোচিত আচরণ করে তাহলে ঐ সব জাতির কাছে তার সম্মান নিম্ন পর্যায়ের। মি. বল্ডউইনের মতে সম্মান সেই শক্তির নাম যার সাহায্যে জাতি বিশেষ মর্যাদা ও আস্থার অধিকারী হয় এবং দৃষ্টিগুলোকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করতে সক্ষম হয়। আর এটা তো জানা কথা, এমন শক্তি যার সাহায্যে জাতি এমনতরো সম্মান, গৌরব-বৈশিষ্ট্য লাভ করে তা অগ্নি উদ্‌গিরণকারী গোলা ও বোমার ওপর নির্ভরশীল, নির্ভরশীল সেই সব যুবকের বিশ্বস্ততা ও দেশপ্রেমের ওপর যাদের প্রিয় হবি বা নেশা শহর ও জনপদগুলোর ওপর গোলা নিক্ষেপ ও বোমা বর্ষণ। অনন্তর সেই সম্মানের জন্য কোন জাতির প্রশংসা করা হয় তা সেই সব গুণ চরিত্রের সম্পূর্ণ বিপরীত যার বুনিয়াদের ওপর ভিত্তি করে ব্যক্তির প্রশংসা করা হয়। আমার মতে তো সেই জাতিকে সেই পরিমাণ বন্য ও অসভ্য মনে করা দরকার, মনে করা উচিত যেই পরিমাণ সে এমনতরো সম্মানের মালিক হয়।

ফেরেববাজি, দাগাবাজি, প্রতারণা ও জুলুম-নির্যাতনের সাহায্যে ইজ্জত হাসিল করা কোন মানুষ ও জাতির জন্য আদৌ সম্মানের ব্যাপার নয়।"[১]

হেদায়েত অথবা তেজারত (ব্যবসা-বাণিজ্য)

ধর্মহীন রাষ্ট্র ও হুকুমতগুলো আদতে উন্নত, সুসংহত, সুশৃংখল, সুসংগঠিত ও সুরক্ষিত এবং একটি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান। এসব হুকুমত মৌলিক ও নীতিগতভাবে মানুষের উপকারের নিমিত্ত নয়, বরং মানুষের থেকে ফায়দা লুটবার জন্যই প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথম থেকেই এবং আদতেই তারা কোন নৈতিক পয়গাম ও গঠনমূলক লক্ষ্য পোষণ করে না। তাদের সামনে দেশ কিংবা জাতির নৈতিক, চারিত্রিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি, মানুষের হেদায়েত এবং মানবতার প্রকৃত খেদমত ও কল্যাণ থাকে না। স্বাভাবিকভাবেই তাদের আসল মনোযোগ থাকে আয়ের দরজা, মুনাফা লুটবার কৌশল এবং সরকারী রাজস্ব ও দাবিগুলোর দিকে। এজন্য তারা অবাধে ও নির্দ্বিধায় নীতি-নৈতিকতা ও সভ্যতা-ভব্যতার রীতি বিসর্জন দিয়ে দেয় এবং নৈতিক শিক্ষামালা ও কল্যাণবোধকে পশ্চাতে নিক্ষেপ করে। যখনই কোথাও নীতি-নৈতিকতা ও স্বার্থের মধ্যে সংঘর্ষ দেখা দেয় সেখানে সব সময় এরা মুনাফাকেই অগ্রাধিকার দেয়। যে কোন ব্যাপারে এবং যে কোন বিষয়ে তাদের দৃষ্টি থাকে অর্থনৈতিক স্বার্থের প্রতি। এই ধরনের রাষ্ট্রগুলো নীতি ও চরিত্রহীনতা ও নির্লজ্জতার অনেক প্রকারের মধ্যে কতককে কিছুটা বাধ্যবাধকতা ও শর্তসাপেক্ষে (যা অপরাধের দরজা বন্ধ করে না, বরং সেগুলোকে আইন-শৃংখলা ও বিধি-বিধানের আওতায় আনা হয় মাত্র) জায়েয তথা অনুমোদিত বলে ঘোষণা দেয়। পতিতাবৃত্তি এসব রাষ্ট্রে আইনত অনুমোদিত। এরা স্বয়ং বিশাল আকারে সুসংগঠিত ও সুশৃংখল পন্থায় সুদী কারবার করে থাকে। সভ্য নামের আড়ালে এরা জুয়ার অনুমতি দেয়, নামের পরিবর্তন এবং এমন কতিপয় শর্তসাপেক্ষে যেগুলো রাষ্ট্রের স্বার্থকে নিরাপদ ও সুরক্ষিত রাখে। বহু নৈতিক ও চারিত্রিক অপরাধ এদের কাছে বৈধ ও অনুমোদিত বিবেচিত হয়। মদের কেবল অনুমোদনই দেওয়া হয় না, বরং কোন কোন সময় সরকার মদের ব্যবসা নিজের হাতে রাখে এবং এর বিরুদ্ধে যারা কথা বলে, সোচ্চার প্রতিবাদ তোলে তাদেরকে শাস্তি দেয়।

ফিল্ম নির্মাণ ও চলচ্চিত্র শিল্পকে যা বর্তমান আকারে চলছে তা সর্বপ্রকার অন্যায়-অপকর্মের ও অপরাধের কেন্দ্রবিন্দু এবং জাতির মধ্যে চরিত্রহীনতা ও যৌন উচ্ছৃংলতা সৃষ্টির প্রধান হাতিয়ার, আজ সরকারের রাজস্ব ও আয়ের বিরাট

১. Guide to Modern Wickedness, p. 152-3.

বড় উৎস মনে করা হয় এবং এর কুফল ও নৈতিক ক্ষতি দেখেও এবং জানা থাকা সত্ত্বেও সরকার একে রুখতে পারে না, পারে না প্রতিরোধ করতে। রেডিও টেলিভিশনসহ সরকারী তথ্য বিভাগ জাতির নৈতিক ও চারিত্রিক দিক-নির্দেশনা ও প্রশিক্ষণের পরিবর্তে আমোদ-প্রমোদ ও চিত্তবিনোদনের সেবায় নিয়োজিত থাকে এবং জাতির মধ্যে গাম্ভীর্য রক্ষা ও বিশুদ্ধ রুচি সৃষ্টির পরিবর্তে তার মধ্যে বিকৃত রুচি ও ভাসাভাসা তথা হাল্কা মেযাজ সৃষ্টিতে সহায়তা করে থাকে, বরং নিজস্ব প্রোগ্রামের মাধ্যমে ক্রীড়া-কৌতুকের মানসিকতা সৃষ্টি করে এবং শিক্ষা দান ও প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যম হবার পরিবর্তে ক্রীড়া-কৌতুকের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হয়। প্রকাশনা-মুদ্রণ সংক্রান্ত বিধান ও সরকারী প্রশাসন বিভাগ যেখানে রাজনীতি ও প্রশাসনিক স্বার্থের ক্ষেত্রে অত্যন্ত স্পর্শকাতর, বুদ্ধিমান ও কঠোর হয়ে থাকে এবং সামান্যতম সমালোচনাও যেখানে কোন কোন সময় সহ্য করা হয় না, সেখানে নীতি-নৈতিকতা ও চরিত্রগত বিষয়ে তারা অত্যন্ত উদার, মুক্ত ও দরাজদিল হয়ে থাকে। দায়িত্বহীন সাংবাদিক, অশ্লীল চরিত্রের সাহিত্যিক ও ঔপন্যাসিকেরা তাদের নিকৃষ্টতম বস্তুগত স্বার্থের জন্য জাতির মধ্যে নৈতিক ও চারিত্রিক প্লেগরূপ মহামারীর বিস্তার ঘটায়। কিন্তু যতক্ষণ তা সীমা ছাড়িয়ে না যায় সরকারী প্রশাসন যন্ত্র সক্রিয় ও তৎপর হয় না। এই ধরনের রাষ্ট্রে নীতি-নৈতিকতা ও চরিত্রের সাথে নাগরিকদের স্বাস্থ্যও নিরাপদ থাকে না। কোন কোন বাণিজ্যিক সংস্থা ও প্রতিষ্ঠান তাদের অসুস্থ ও ক্ষতিকর শিল্প-পণ্যের দ্বারা দেশবাসীর সাধারণ স্বাস্থ্যকে অব্যাহতভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করতে থাকে এবং ভবিষ্যত বংশধরদেরকে অসুস্থ ও দুর্বল বানাতে থাকে। কিন্তু শাসকদেরকে তারা ঘুষ দিয়ে কিংবা সরকারী ও জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে বিরাট অংকের আর্থিক সাহায্য প্রদান করে সরকারী চাপ ও অসন্তোষের হাত থেকে বেঁচে যায়। এসব এজন্য হয়, সরকারের দৃষ্টিকোণ ও তাদের চিন্তাধারা নীতি-নৈতিকতা ও চরিত্র এবং হেদায়েত ও ইসলাহ (সংস্কার ও সংশোধন) নয়, বরং তাদের লক্ষ্য থাকে আর্থিক মুনাফা ও বাহ্যিক উন্নতি ও সমৃদ্ধি।

এ ধরনের রাজনীতির অনিবার্য পরিণতি হলো, দেশের সাধারণ মানুষের নৈতিক অবস্থা দিন দিন অবনতির দিকে এগুতে থাকে। এক ভয়াবহ ও বিপজ্জনক নৈতিক অধঃপতন ও চারিত্রিক ব্যাধির প্রাদুর্ভাব ঘটে। গোটা জাতির মধ্যে ও জাতির প্রতিটি শ্রেণীর মধ্যে বেনিয়াসুলভ মুনাফাখোরী ও সুযোগ সন্ধানী মানসিকতার সৃষ্টি হয় এবং সাধারণ লুটপাটের বাজার গরম হয়ে ওঠে। সকলেই একে অন্যকে কতটা লুটপাট ও শোষণ করতে পারে তার জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে এবং নীতি-নৈতিকতা ও চারিত্রিক বিষয়গুলো মানুষের দৃষ্টি থেকে হারিয়ে যায়।

পক্ষান্তরে যেসব সরকার ও হুকুমত 'মিনহাজুন নুবূওয়া' তথা নববী ধারায় প্রতিষ্ঠিত, তার বুনিয়াদ প্রতিষ্ঠিত হয় তেজারতের পরিবর্তে হেদায়েতের ওপর। খলীফাতুল মুসলিমীন হযরত ওমর ইবনুল আবদুল আযীযের একজন গভর্নরকে (যিনি তাঁর সরকারী কর্মপন্থার দরুন রাজস্ব হ্রাস ও হুকুমতের আর্থিক ক্ষতি হচ্ছে বলে অভিযোগ তুলেছিলেন) বলেছিলেন, "মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম 'হাদী' তথা পথপ্রদর্শনকারী হিসেবে প্রেরিত হয়েছিলেন, তহশীলদার তথা ট্যাক্স কালেক্টর হিসেবে নয়।" এই সংক্ষিপ্ত বাক্যের মধ্যে ধর্মীয় হুকুমতের সমগ্র রাষ্ট্রনীতির মৌল নীতিমালা ও শাসন পদ্ধতি এসে গেছে।

ধর্মীয় হুকুমতের বৃহত্তর মনোযোগ সাধারণ গণমানুষের ধর্ম, নৈতিক চরিত্র ও তাদের পারলৌকিক লাভ-ক্ষতির চিন্তায় নিবিষ্ট থাকে। তার আসল কাজ রাজস্ব আদায় ও টোল বৃদ্ধি নয়। এগুলো হয় একেবারেই সাময়িক প্রকৃতির ও দ্বিতীয় পর্যায়ের এবং শুধুই সংস্কার ও সংশোধনমূলক ও ধর্মীয় লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের পূর্ণতা সাধন ও সরকারী ব্যবস্থাপনার হাতিয়ার হিসেবে। এই সরকার রাজনৈতিক ও আর্থিক বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে ভেবে থাকে। ধর্মীয় ও নৈতিক মৌল নীতিমালাগুলোকে বস্তুগত লাভ ও স্বার্থের মুকাবিলায় অগ্রাধিকার দেয়। তার রাষ্ট্রীয় চতুঃসীমার মধ্যে সুদ, জুয়া, মদ, ব্যভিচার, অন্যায়-অনাচার, পাপাচার ও সর্বপ্রকার অশ্লীলতা ও এসবের যাবতীয় প্রেরণাদায়ক বিষয় এবং এমন সব আর্থিক ব্যাপার যদ্দ্বারা ব্যক্তির লাভ হলেও সমাজ সমষ্টির ক্ষতি হয়, নিষিদ্ধ ও বেআইনী ঘোষিত হয়, যদিও এর দরুন রাষ্ট্রকে বিরাট আর্থিক ক্ষতি বরদাশত করতে হয় এবং সরকারকে বিপুল রাজস্ব আয় থেকে বঞ্চিত হতে হয়। সে সমাজ ও রাষ্ট্রে বিভিন্ন রকমের সংস্কার ও সংশোধনমূলক কর্মের প্রচলন ঘটায়। সে জাতির কেবল কর্মের সঙ্গেই সম্পর্ক রাখে না, বরং তার প্রবণতা ও মানসিকতার প্রতিও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখে এজন্য যে, নৈতিক ও চারিত্রিক প্রবণতাই কর্মের জন্ম দেয়। যদি নৈতিক ও চারিত্রিক প্রবণতাই সহীহ-শুদ্ধ না হয় তাহলে কর্মের সংস্কার-সংশোধন, অপরাধ ও নীতি-নৈতিকতাহীন কাজের উৎসাদন কোনভাবেই সম্ভব নয়। এজন্যই সে সেসব বস্তুর ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে, যেগুলো জাতির মধ্যে নীতি-নৈতিকতাবিরোধী, আইন ভঙ্গকারী, আত্মপূজা ও ভোগ-বিলাসপ্রিয়তার প্রবণতা সৃষ্টি করে এবং সেই সমস্ত লোককে অপরাধী ও রাষ্ট্রের দুশমন হিসেবে আখ্যায়িত করে যারা মানুষের মধ্যে নির্লজ্জতা ও অপরাধ প্রবণতা সৃষ্টি করে, চাই কি তারা শিল্পী, সাহিত্যিক, ব্যবসায়ী অথবা কৃষিজীবীই হন না কেন। এই সরকার শান্তি ও নিরাপত্তা কায়েম এবং সাম্রাজ্যে প্রশাসনিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে নৈতিক চরিত্রের দেখাশোনা ও আত্মশুদ্ধির সযত্ন

প্রয়াস নেয়। এজন্য এই রাষ্ট্র ও সরকারের অবস্থানগত মর্যাদা কেবল পুলিশ ও চৌকিদারের নয়, বরং একজন স্নেহশীল মুরুব্বী ও অভিভাবকেরও হয়ে থাকে।

এ ধরনের সরকার ও রাষ্ট্রের স্বাভাবিক পরিণতি হয় তাই যা কুরআন মজীদে প্রথম যুগের মুহাজিরদের আলোচনায় ভবিষ্যদ্বাণী হিসেবে উল্লিখিত হয়েছে ঃ

اَلَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنّٰهُمْ فِى الْاَرْضِ اَقَامُوْا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ وَاَمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ط وَلِلّٰهِ عَاقِبَةُ الْاُمُوْرِ -

"(এসব মজলুম মুসলমান তো তারাই) যাদেরকে আমি পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা দান করলে তারা সালাত কায়েম করবে, যাকাত দেবে এবং সৎ কাজের নির্দেশ দেবে ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করবে; আর সকল কাজের পরিণাম আল্লাহ্‌র এখতিয়ারে।" (সূরা হজ্জ ঃ ৪১)

ব্যবসা-বাণিজ্য ও নীতি-নৈতিকতার মধ্যে অসহযোগিতা ও বিরোধ

উপচে পড়া সম্পদের এই সঙ্কটের যুগে অথবা লর্ড ম্যাকলের অর্থপূর্ণ ভাষায় "স্বল্পতম সময়ে অধিক থেকে অধিকতর সম্পদ আহরণের আকাঙ্ক্ষী এবং যথাসম্ভব সত্বর ধনী হতে আগ্রহী" লোকদের শাসনামলে এক প্রচণ্ড বাণিজ্যিক প্রতিযোগিতা চলছে যার ফল হলো এই, ক্রীড়া ও বিনোদনসামগ্রী, আরাম-আয়েশের উপকরণ, পোশাক-পরিচ্ছদ ও বিবিধ প্রকারের সৌন্দর্যসামগ্রীর এক বিপুল সমাহার প্রতিদিন কল-কারখানায় ও শিল্প প্রতিষ্ঠানে উৎপাদিত হয়ে শহরে এসে আছড়ে পড়ছে। বাজারে নিত্য-নতুন ডিজাইনের পোশাক-পরিচ্ছদ, জুতা ও বিভিন্ন চোখ ধাঁধানো আয়েশ-সামগ্রী দোকানের শেলফে ঝলমল করতে থাকে। এরপর একদিন সেগুলো সেকেলে হিসেবে আখ্যায়িত হয়। তারপর তার স্থলে নামমাত্র ঘষা-মাজার পর সেগুলো নতুন পণ্য ও নতুন সামগ্রী হিসেবে পসার জাঁকিয়ে বসে। রূপ-সৌন্দর্য ও উন্নতি-অগ্রগতির মাপকাঠি প্রতিদিন বদলাতে থাকে এবং তা সমান তালে অগ্রসর হয়। এক্ষেত্রে বিরাট ভূমিকা কারখানাগুলোর এই অপ্রয়োজনীয় খেল-তামাশা ও ক্রীড়া-কৌতুকের উৎপাদন এবং এই প্রতিযোগিতার ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার যা বিপণিকেন্দ্রসমূহ ও কলকারখানাগুলোতে কাজ করছে এবং যা লোকের নৈতিক চরিত্র ও সমাজ, শক্তি, অধিকন্তু ক্রয় ক্ষমতা সম্পর্কে একেবারেই বেপরওয়া। এর ফল হলো এই, জীবন প্রতিদিনই দুর্বিষহ, জীবন মান বিগত দিনের তুলনায় সমুন্নত, জীবনের চাহিদা ও দাবি এবং জীবনের কৃত্রিম অনুষঙ্গসমূহের ক্রমহারে বৃদ্ধি এবং সেগুলো পূরণের জন্য বৃহৎ থেকে বৃহত্তর আয়ও যথেষ্ট নয়। আর এর ফলে অল্পে তুষ্টি একটি অর্থহীন শব্দে পরিণত

হয়। তৃপ্তি ও চিত্তের প্রশান্তি স্বপ্ন ও কল্পনায় পর্যবসিত হয়। সবার সামনেই নিজের তুলনায় উন্নত মানের জীবনের স্বপ্ন এবং সেখান অবধি পৌঁছাকে সবাই নিজের সব চাইতে বড় কর্তব্য মনে করে। পরিবেশও তার কাছে তারই দাবি পেশ করে এবং এরই প্রত্যাশা করে। তা'না হলে সে নিজেকে ছোট ও অবজ্ঞেয় ভাবতে থাকে। এর প্রাণান্তকর প্রয়াসেই তার একটা বিরাট সময় কেটে যায়। যখন সে চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌঁছতে থাকে তখন তার আকাঙ্ক্ষা আরও বৃদ্ধি পায় এবং আরেকটি উন্নত জীবন মান তার সামনে এসে ধরা দেয়। আর এভাবেই জীবন এক অন্তহীন প্রয়াস, এমন এক প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে পরিণত হয় যার কোন আদি নেই, অন্ত নেই। এর মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া হলো, জীবনে তিক্ততা ও যন্ত্রণা খুবই বেড়ে গেছে এবং যেই ঘর খুব সহজেই জান্নাতের নমুনা হতে পারত, সুখ-শান্তির আদর্শ মডেল হতে পারত এবং যার ভেতর জীবনের সর্বপ্রকার স্বাভাবিক ও প্রকৃত আবশ্যকীয় বিষয়গুলো সবই মেলে, কোন না কোন কল্পিত ও ধারণাপ্রসূত জিনিসের ঘাটতির কারণে সাক্ষাৎ জাহান্নামে পরিণত হয়েছে। সেখানে প্রকৃত ও সত্যিকারের সুখ-শান্তি ও হৃদয়ের তৃপ্তি উবে গেছে।

জনৈক মুসলিম পণ্ডিত ব্যক্তি রোমক ও পারসিক সভ্যতা-সংস্কৃতির যেই চিত্র এঁকেছেন যা বর্তমান গ্রন্থের প্রথম দিককার পৃষ্ঠাগুলোতে বর্ণিত হয়েছে তা সামনে রেখে দেখুন, বর্তমান সভ্যতা-সংস্কৃতির চিত্র তা থেকে কি আদৌ ভিন্নতর? এর নৈতিক ও চারিত্রিক প্রভাবে নৈতিক সীমারেখা ও বিধানসমূহ স্থায়ী ও সুস্থির থাকে নি। সীমিত আয়ের মধ্যে সীমাহীন দাবি, চাহিদা ও ফাই-ফরমায়েশ পূরণের জন্য উৎকোচ গ্রহণ এবং অবৈধ ও বেআইনী উপকরণ আমদানী ব্যতিরেকে সম্ভব নয়। এর পরিণতিতে উৎকোচ (বিভিন্ন নামে) ও অপরাধমূলক লেনদেন এবং গোপন আয়-উপার্জনের বাজার আজ গরম। ফলে জীবনে যে সংকট এবং সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থায় আজ যে অরাজকতা ও বিশৃংখলা দেখা দিয়েছে তা দিবালোকের ন্যায় পরিষ্কার।

এই পরিণাম ফল সাধারণত জীবনের স্বাভাবিক ও প্রকৃত প্রয়োজনগুলোর চাহিদা নয়, বরং কৃত্রিম ও মেকী প্রয়োজনগুলোর দাবি থেকে উদ্ভূত। এর বাঁধন শুধুই আইনের প্রয়োগ ও উৎকোচ নির্মূলকরণ প্রয়াসের দ্বারা সম্ভব নয়। এর জন্য দায়ী সেই জীবন-ব্যবস্থা যা এক দীর্ঘকাল ধরে নৈতিক দিক-নির্দেশনা থেকে মাহরূম, পরকালীন পুরস্কার ও শাস্তির ধারণা থেকে মুক্ত এবং সেই শিক্ষা ব্যবস্থা যা তার সার্বিক বস্তুবাদী কাঠামোর দরুন নৈতিক অনুভূতি ও বিবেকবোধ সৃষ্টি করতে এতটাই ব্যর্থ যতটা সূত্রধর ও কর্মকারের পেশা কিংবা চিত্রাংকন ও সঙ্গীত শিল্প হতে পারে। এর জন্য দায়ী সেই রাষ্ট্র ব্যবস্থা যা আয় ও উৎপাদন ব্যবস্থার

উপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখাকে তো আপন দায়িত্ব ও কর্তব্য মনে করে, কিন্তু ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প ও নৈতিক চরিত্রের পারস্পরিক সহযোগিতাকে জরুরী মনে করে না।

বৈজ্ঞানিক উন্নতি ও বর্তমান যুগের আবিষ্কার-উদ্ভাবন

বর্তমান যুগ বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও প্রযুক্তিগত আবিষ্কার-উদ্ভাবনের দিক দিয়ে মানব ইতিহাসের প্রাগ্রসর যুগ হিসেবে পরিচিত এবং তার এই বৈশিষ্ট্যের কারণে সে স্বাভাবিকভাবেই এই দাবি করতে পারে, তাকে আবিষ্কার-উদ্ভাবন, বিদ্যুৎ ও ইস্পাত যুগ হিসাবে অভিহিত করা হবে। য়ূরোপের নেতৃত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব এ ক্ষেত্রে সর্বজনস্বীকৃত এবং তার বিশেষজ্ঞ পণ্ডিত ও আবিষ্কারকদের মেধা ও শিল্প-নৈপুণ্য অকাট্যভাবে প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত।

কিন্তু আমরা এই সব শৈল্পিক সাফল্য ও আবিষ্কার-উদ্ভাবনকে এক বিশেষ সমালোচনামূলক দৃষ্টিকোণ থেকে পর্যালোচনা করব এবং দেখব, এসব আবিষ্কার-উদ্ভাবনের লক্ষ্য কি এবং তা আপন লক্ষ্য অর্জনে কতটা সফল হয়েছে এবং দুনিয়ার জন্য এসব আবিষ্কার-উদ্ভাবন কল্যাণকর ও বরকতময় প্রমাণিত হয়েছে, নাকি সেগুলো পৃথিবীর সমস্যা-সংকট ও দুঃখ-কষ্ট কিছুটা বৃদ্ধিই করেছে।

প্রযুক্তিগত আবিষ্কার-উদ্ভাবন ও ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি

আমাদের মতে এসব তাত্ত্বিক গবেষণা ও প্রযুক্তিগত আবিষ্কার-উদ্ভাবনের সঠিক লক্ষ্য হলো, মানুষকে জীবনের স্বাভাবিক চলার পথে নিজের অজ্ঞতা ও দুর্বলতার কারণে যেসব বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হতে হয় সেগুলোকে নিয়ন্ত্রণে আনা এবং সঠিক ও বিশুদ্ধ লক্ষ্যের আওতাধীনে (যার মধ্যে পৃথিবীর বুকে মাথা উঁচু করা ও ফেতনা-ফাসাদ অন্তর্ভুক্ত নয়) আল্লাহ্‌র অপার কুদরতের সেই সব শক্তি ও সম্পদ থেকে উপকৃত ও লাভবান হওয়া যা এই বিশ্ব জগতে ইতস্তত ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, প্রাচীনকালে মানুষ পায়ে হেঁটে চলত। এরপর তার উপলব্ধিতে ধরা পড়ল, সে জীব-জানোয়ার থেকে উপকৃত হবে। এ উদ্দেশে সে গরুর গাড়ি কাজে লাগাল। এরপর চলার ক্ষেত্রে তার গতিকে সে আরও দ্রুত করতে চাইল। সে বায়ুর গতিবেগসম্পন্ন ঘোড়ার সাহায্যে দিনের পথ ঘণ্টায় অতিক্রম করল। মানব প্রকৃতিতে অল্পে তুষ্টি নেই, তৃপ্তি নেই। প্রতিযোগিতার আবেগ তাকে নির্দিষ্ট কোন মনযিলে থাকতে দেয় না। এছাড়া তার প্রয়োজনও

বৃদ্ধি পেয়েছে এবং আরাম ও দ্রুততার মানও উন্নত থেকে সমুন্নততর হয়ে চলেছে এবং ক্রমান্বয়ে এমন সব বাহনের উদ্ভব ঘটেছে যার ভেতর প্রতিটিই আগের তুলনায় অধিক দ্রুতগতিসম্পন্ন। সামুদ্রিক সফরে সে বায়ু চালিত পালের নৌকা থেকে স্টীম গ্যাসচালিত জাহাজ পর্যন্ত উন্নতি করেছে। স্থল ও আকাশ পথের পরিবহন যন্ত্রপাতি ও উপায়-উপকরণও এই পর্যায়ে গিয়ে উপনীত হয়েছে, আগেকার যুগের লোকদের তা স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। যদি সঠিক উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নিয়ে এ থেকে ফায়দা হাসিল করা হয়, অনাবশ্যক কষ্ট ও শ্রম, সময় ও শক্তির অপ্রয়োজনীয় ব্যবহার থেকে বেঁচে এগুলোকে আরও কোন উত্তম ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যায় তাহলে এটা অবশ্যই আল্লাহ্‌র নেয়ামত। আল্লাহ তা'আলা কুরআন মজীদে সফরের এই আরাম, সহজসাধ্যতা ও দ্রুততাকে পুরস্কার হিসেবে উল্লেখ করেছেন এবং একে মানুষের ওপর তাঁর এমন এক অনুগ্রহ বলে অভিহিত করেছেন যে, সে এসব দ্বারা অর্থাৎ আল্লাহ্‌র অপরাপর সৃষ্টির মাধ্যমে সফর ও পরিবহনের বড় বড় কষ্টকর পরিশ্রমের হাত থেকে বেঁচে যায় এবং একে তাঁর আরাম ও করুণার এক নিদর্শন ও প্রমাণ হিসেবে পেশ করেছেন। তিনি (আল্লাহ পাক) বলেন ঃ

وَالْاَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيْهَا دِفْءٌ وَّمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَاْكُلُوْنَ - وَلَكُمْ فِيْهَا جَمَالٌ حِيْنَ تُرِيْحُوْنَ وَحِيْنَ تَسْرَحُوْنَ - وَتَحْمِلُ اَثْقَالَكُمْ اِلٰى بَلَدٍ لَّمْ تَكُوْنُوْا بٰلِغِيْهِ اِلَّا بِشِقِّ الْاَنْفُسِ - اِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُفٌ رَّحِيْمٌ - وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيْرَ لِتَرْكَبُوْهَا وَزِيْنَةً - وَيَخْلُقُ مَالَا تَعْلَمُوْنَ -

"তিনি আন'আম (অর্থাৎ উট, গরু, মেষ, ছাগল, অন্যান্য অহিংস্র ও রোমন্থনকারী জন্তু, যথাঃ হরিণ, নীল গাঈ, মহিষ ইত্যাদি) সৃষ্টি করেছেন, তোমাদের জন্য ওতে শীতনিবারক উপকরণ ও বহু উপকার রয়েছে এবং ওগুলো থেকে তোমরা আহার্য পেয়ে থাক এবং তোমরা যখন গোধূলি বেলায় ওদেরকে চারণভূমি থেকে ঘরে নিয়ে আস এবং ভোরবেলা যখন ওদেরকে চারণভূমিতে নিয়ে যাও তখন তোমরা সৌন্দর্য উপভোগ কর এবং ওরা তোমাদের ভার বহন করে নিয়ে যায় দূর দেশে যেখানে প্রাণান্তকর কষ্ট-ক্লেশ ব্যতিরেকে তোমরা পৌঁছুতে পারতে না। তোমাদের প্রতিপালক অবশ্যই দয়ার্দ্র, পরম দয়ালু। তোমাদের আরোহণের জন্য ও শোভার জন্য তিনি সৃষ্টি করেছেন ঘোড়া, খচ্চর, গাধা এবং তিনি সৃষ্টি করেন এমন অনেক কিছু যা তোমরা অবগত নও।" (সূরা নাহল ঃ ৫-৮)

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيْٓ اٰدَمَ وَحَمَلْنٰهُمْ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنٰهُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ وَفَضَّلْنٰهُمْ عَلٰى كَثِيْرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيْلاً۔

"আমি তো আদম সন্তানকে মর্যাদা দান করেছি, স্থলে ও সমুদ্রে চলাচলের বাহন দিয়েছি; ওদেরকে উত্তম রিযিক দান করেছি এবং আমি যাদেরকে সৃষ্টি করেছি তাদের অনেকের ওপর ওদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি।" (বনী ইসরাঈল, ৭০)

وَالَّذِىْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنَ الْفُلْكِ وَالْاَنْعَامِ مَا تَرْكَبُوْنَ۔ لِتَسْتَوٗا عَلٰى ظُهُوْرِهٖ ثُمَّ تَذْكُرُوْا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ اِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُوْلُوْا سُبْحٰنَ الَّذِىْ سَخَّرَلَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهٗ مُقْرِنِيْنَ۔ وَاِنَّآ اِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ

"যিনি যুগলসমূহের প্রতিটিকে সৃষ্টি করেন এবং যিনি তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেন এমন নৌযান ও আন'আম যাতে তোমরা আরোহণ কর, যাতে তোমরা ওদের পৃষ্ঠে স্থির হয়ে বসতে পার, তারপর তোমাদের প্রতিপালকের অনুগ্রহ স্মরণ কর যখন তোমরা ওর ওপর স্থির হয়ে বস; এবং বল, পবিত্র ও মহান তিনি, যিনি এদেরকে আমাদের বশীভূত করে দিয়েছেন, যদিও আমরা সমর্থ ছিলাম না এদেরকে বশীভূত করতে। আমরা আমাদের প্রতিপালকের কাছে অবশ্যই প্রত্যাবর্তন করব।" (সূরা যুখরুফঃ ১২-১৪)

হযরত সুলায়মান (আ)-এর ওপর আপন অনুগ্রহের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে আল্লাহ বলেন ঃ

وَلِسُلَيْمٰنَ الرِّيْحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَّرَوَاحُهَا شَهْرٌ۔

"আমি সুলায়মানের অধীন করেছিলাম বায়ুকে যা প্রভাতে এক মাসের পথ অতিক্রম করত এবং সন্ধ্যায় এক মাসের পথ অতিক্রম করত।" (সূরা সাবা, ১২)

فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيْحَ تَجْرِىْ بِاَمْرِهٖ رُخَآءً حَيْثُ اَصَابَ۔

"তখন আমি তার অধীন করে দিলাম বায়ুকে, যা তার আদেশে, সে যেখানে ইচ্ছা করত, সেখানে মৃদুমন্দ গতিতে প্রবাহিত হ'তো।" (সূরা সাদঃ ৩৬)

কিন্তু এই সব নেয়ামত ও আরামপ্রদ সুযোগ-সুবিধা থেকে ফায়দা হাসিলের জ্ঞাত ও আল্লাহর পরিচয় সম্পর্কে অজ্ঞ লোকের মন-মানসিকতার মধ্যে বিরাট পার্থক্য রয়েছে। একজন মু'মিন ও বিশ্বাসী বান্দাকে এর জন্য হেদায়েত দেওয়া হয়েছে এবং তার কাছে আশা করা হয়েছে, সে এসব নেয়ামত থেকে উপকৃত

হবার সময় একথা সব সময় ও সদা সর্বদা মনে রাখবে, এ শুধুই আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রদত্ত পুরস্কার ও তাঁর দান। তিনি এই মুক্ত ও লাগামহীন পশুগুলোকে (অথবা অনুভূতিহীন ও চলচ্ছক্তিহীন লোহা ও কাষ্ঠ-খণ্ডকে) এভাবে তার অনুগত, অধীন ও হাতিয়ার বানিয়ে দিয়েছেন, সে তার হুকুমে ও ইচ্ছায় تَجْرِى بِاَمْرِه رُخَاءً حَيْثُ اَصَابَ প্রবাহিত হয় যেখানে সে ইচ্ছা করে মৃদুমন্দ গতিতে। যদি তাঁর প্রদত্ত জ্ঞান, বুদ্ধি, কৌশল ও শক্তি-সামর্থ্য তার সহগামী না হতো তাহলে এটা তার সাধ্যায়ত্ত ছিল না।

لِتَسْتَوٗا عَلٰى ظُهُوْرِهٖ ثُمَّ تَذْكُرُوْا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ اِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُوْلُوْا سُبْحٰنَ الَّذِى سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهٗ مُقْرِنِيْنَ۔

“যাতে তোমরা ওদের পৃষ্ঠে স্থির হয়ে বসতে পার, তারপর তোমাদের প্রতিপালকের অনুগ্রহ স্মরণ কর যখন তোমরা ওদের ওপর স্থির হয়ে বস এবং বল, পবিত্র ও মহান তিনি, যিনি এদেরকে আমাদের বশীভূত করে দিয়েছেন, যদিও আমরা সমর্থ ছিলাম না এদেরকে বশীভূত করতে” (যুখরুফঃ ১৩) এবং ঠিক উপকার লাভের অবস্থায় একথা যেন চোখের সামনে থাকে, সেই শক্তি ও সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও বস্তুসামগ্রীর আসল স্রষ্টা ও এই বিশ্বজগতের মালিকের দরবারে সে হাজির হতে বাধ্য এবং তাকে একদিন এসবের হিসাব দিতে হবে, সে এসব নেয়ামত থেকে, আল্লাহ্‌র অনুগ্রহরাজি থেকে কি উপকার পেয়েছে, এগুলোকে সে কোথায় ব্যবহার করেছে, কাজে লাগিয়েছে এবং এসবের কী হক সে আদায় করেছে। অনন্তর আয়াতের শেষাংশে বলেছেনঃ وَاِنَّا اِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ “আর আমরা আমাদের প্রতিপালকের কাছে অবশ্যই প্রত্যাবর্তন করব।” (যুখরুফঃ ১৪) একজন মু'মিন তথা বিশ্বাসী বান্দা এসব নেয়ামতকে শুধুই আল্লাহর অবদান, অনুগ্রহ ও পুরস্কার এবং কৃতজ্ঞতা ও অকৃতজ্ঞতার পরীক্ষা মনে করে। হযরত সুলায়মান (আ)-এর ভাষায় ঃ

هٰذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّىْ قف لِيَبْلُوَنِىْٓ ءَاَشْكُرُ اَمْ اَكْفُرُ ط وَمَنْ شَكَرَ فَاِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهٖ وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ رَبِّىْ غَنِىٌّ كَرِيْمٌ۔

“এ আমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ, যাতে তিনি আমাকে পরীক্ষা করতে পারেন, আমি কৃতজ্ঞ, না অকৃতজ্ঞ। যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, সে তা করে নিজের কল্যাণের জন্য এবং যে অকৃতজ্ঞ, সে জেনে রাখুক, আমার প্রতিপালক অভাবমুক্ত, মহানুভব।” (সূরা নামলঃ ৪০)

মু'মিন ও গায়র মু'মিন তথা বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসীর মধ্যে একটি পার্থক্য এই, মু'মিন ঐসব হাতিয়ার ও শক্তিকে যথাস্থানে ব্যবহার করে এবং ঐসবের সাহায্যে আল্লাহ্‌র দীন ও সত্য-সুন্দর ব্যবস্থার সাহায্য-সহযোগিতার কাজ নেয় যা ঐসব বস্তুসামগ্রী সৃষ্টির মূল লক্ষ্য ও আসল উদ্দেশ্য। আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَاَنْزَلْنَا الْحَدِيْدَ فِيْهِ بَأْسٌ شَدِيْدٌ وَّمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللّٰهُ مَنْ يَّنْصُرُهٗ وَرُسُلَهٗ بِالْغَيْبِ ط اِنَّ اللّٰهَ قَوِيٌّ عَزِيْزٌ -

"আমি লোহাও দিয়েছি যাতে রয়েছে প্রচণ্ড শক্তি ও রয়েছে মানুষের জন্য বহুবিধ কল্যাণ এজন্য যে, আল্লাহ্ প্রকাশ করে দেবেন কে প্রত্যক্ষ না করেও তাঁকে ও তাঁর রসূলকে সাহায্য করে। আল্লাহ্ শক্তিমান, পরাক্রমশালী।" (সূরা হাদীদ ঃ ২৫)

আল্লাহ্‌র পরিচয় সম্পর্কে যিনি জানেন এবং যিনি আল্লাহ্‌ভীরু মানুষ, তিনি আল্লাহ্‌প্রদত্ত শক্তি ও আন'আমকে পাপীদের সহযোগী ও সাহায্যের উপকরণ বানান না। হযরত মূসা (আ) বলেন ঃ

رَبِّ بِمَآ اَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ اَكُوْنَ ظَهِيْرًا لِّلْمُجْرِمِيْنَ -

"হে আমার প্রতিপালক! তুমি যেহেতু আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছ, আমি কখনো অপরাধীদের সাহায্যকারী হব না।" (সূরা কাসাসঃ ১৭)

অনন্তর সহীহ্-শুদ্ধ দীন তাই যা আল্লাহ্‌র পরিচয়, জ্ঞান ও আল্লাহ্‌র ভয়ভীতি সৃষ্টি করে, যা গোটা সৃষ্টি জগতের আসল স্রষ্টা এবং বিশ্বজাহানের প্রকৃত শাসকের পরিচয় জ্ঞাপন করে এবং বলে, মানুষ ঐসব শক্তি ও সম্পদের আমানতদার মাত্র। তাকে তাঁর সামনে হাযির হতে হবে এবং ঐসব শক্তি ও সম্পদ সে কোথায় ব্যয় করেছে সে সম্পর্কে তাকে জওয়াব দিতে হবে। ধর্ম তথা দীন তো তাই যা মানুষকে শক্তির নেশায় মত্ত, আপন ক্ষমতা ও এখতিয়ারাধীন শক্তিদৃষ্টে আত্মহারা হতে দেয় না। দীন তো তাই যা ঐসব বস্তুসামগ্রীকে বৈধ, অনুমোদিত ও যথাযথ স্থানে ব্যবহার ও নিয়োগের রাস্তা বাতলে দেয়। সে ঐসব জিনিসকে কার্যকর, মানব জাতির জন্য উপকারী এবং দুনিয়ার অনুকূলে কল্যাণ ও বরকতের হেতু বানায়। দীন তো তাই যা মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধি, তার শক্তি ও তার আখলাকের মধ্যে ভারসাম্য কায়েম রাখে। একমাত্র দীন তথা ধর্মই মানুষের ব্যক্তিগত উপকারিতা ও কল্যাণ চিন্তাকে সমষ্টিগত উপকারিতা ও কল্যাণ চিন্তার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ও ভারসাম্যপূর্ণ রাখে। ধর্মই মানুষের মধ্যে আপন শক্তি ও এখতিয়ারসমূহকে পর্যবেক্ষণ ও অনুভবের সময় নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্যপূর্ণ এবং গর্ব

ও অহংকারের পরিবর্তে নম্রতা, বিনয় ও বান্দাসুলভ শান সৃষ্টি করে। কুরআন মজীদ দু'ধরনের নমুনাই পেশ করেছে। হযরত ইউসুফ আলায়হিস সালাম ঠিক ক্ষমতার মসনদে পরিপূর্ণ দাপটের সঙ্গে আসীন থাকাকালে বলেছিলেন ঃ

رَبِّ قَدْ اٰتَيْتَنِىْ مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِىْ مِنْ تَاْوِيْلِ الْاَحَادِيْثِ ج فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ قف اَنْتَ وَلِىّٖ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ج تَوَفَّنِىْ مُسْلِمًا وَّاَلْحِقْنِىْ بِالصّٰلِحِيْنَ۔

"হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমাকে রাজ্য দান করেছ এবং স্বপ্নের ব্যাখ্যা শিক্ষা দিয়েছ। হে আকাশমণ্ডলি ও পৃথিবীর স্রষ্টা! তুমিই ইহলোক ও পরলোকে আমার অভিভাবক। তুমি আমাকে মুসলিম হিসেবে মৃত্যু দাও এবং আমাকে সৎ কর্মপরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত কর" (সূরা ইউসুফ, ১০১)।

হযরত সুলায়মান আলায়হিস সালামের যখন আপন ক্ষমতা, শক্তি, শৌর্য-বীর্য, প্রভাব-প্রতিপত্তির দিকে চোখ পড়ল অমনি তাঁর মুবারক যবান থেকে বেরিয়ে পড়ল ঃ

رَبِّ اَوْزِعْنِىْٓ اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِىْٓ اَنْعَمْتَ عَلَىَّ وَعَلٰى وَالِدَىَّ وَاَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضٰهُ وَاَدْخِلْنِىْ بِرَحْمَتِكَ فِىْ عِبَادِكَ الصّٰلِحِيْنَ۔

"হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমাকে সামর্থ্য দাও যাতে আমি তোমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারি, আমার প্রতি ও আমার পিতামাতার প্রতি তুমি যে অনুগ্রহ করেছ তার জন্য এবং যাতে আমি সৎ কাজ করতে পারি, যা তুমি পসন্দ কর এবং তোমার অনুগ্রহে আমাকে তোমার সৎ কর্মপরায়ণ বান্দাদের শ্রেণীভুক্ত কর।" (সূরা নাম্ল ঃ ১৯)

পক্ষান্তরে যারা ছিল দীন-ধর্মরূপ সম্পদ থেকে মাহরূম এবং আল্লাহ্‌বিস্মৃত, তারা আপন ক্ষমতা, শক্তি ও সম্পদ নিয়েই গর্বিত আর তারা তাদের চাইতে আর কাউকে বড় বলে মনে করত না।

فَاَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوْا فِى الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوْا مَنْ اَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً لا اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ الَّذِىْ خَلَقَهُمْ هُوَ اَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً ط وَكَانُوْا بِاٰيٰتِنَا يَجْحَدُوْنَ۔

"আর আদ সম্প্রদায়ের ব্যাপার হলো, ওরা পৃথিবীতে অযথা দম্ভ করত এবং বলত, 'আমাদের চাইতে শক্তিশালী কে আছে'? ওরা কি তবে লক্ষ্য করে নি,

আল্লাহ্ যিনি ওদেরকে সৃষ্টি করেছেন, তিনি ওদের চাইতে অধিকতর শক্তিশালী? অথচ ওরা আমার নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার করত" (সূরা হামীম আস-সাজদা, ১৫)।

কুরআন পাক আমাদেরকে অতীত কালের এক বিরাট ধনাঢ্য ব্যক্তির (কারূনের) কাহিনী শুনিয়েছে যাকে কিছু বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন লোক বলেছিল, নিজের ধন-সম্পদ নিয়ে বেশি দম্ভ কর না, আপন ধন-সম্পদ দিয়ে পরকালের পাথেয় সঞ্চয় কর এবং আল্লাহ্ তোমার যেই উপকার করেছেন তুমি প্রত্যুপকার দ্বারা তার বিনিময় দাও। আর যমীনে ফেতনা-ফাসাদ করো না।

اِذْ قَالَ لَهٗ قَوْمُهٗ لَا تَفْرَحْ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِيْنَ - وَابْتَغِ فِيْمَآ اٰتٰكَ اللّٰهُ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيْبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَاَحْسِنْ كَمَا اَحْسَنَ اللّٰهُ اِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِى الْاَرْضِ ط اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِيْنَ -

"স্মরণ কর, তার সম্প্রদায় তাকে বলেছিল, 'দম্ভ কর না, আল্লাহ দাম্ভিকদেরকে পসন্দ করেন না।' আল্লাহ যা তোমাকে দিয়েছেন তা দিয়ে আখিরাতের আবাস অনুসন্ধান কর। দুনিয়া থেকে তোমার অংশ ভুলো না পরোপকার কর যেমন আল্লাহ্ তোমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন এবং পৃথিবীতে ফাসাদ সৃষ্টি করতে চেয়ো না। আল্লাহ্ ফাসাদ সৃষ্টিকারীদেরকে ভালবাসেন না।" (সূরা কাসাস, ৭৬-৭৭)

কারূন এর উত্তরে বলল, আমি এই ধন-সম্পদের ব্যাপারে কারুর অনুগ্রহের কাছে ঋণী নই। এতো কেবল আমার জ্ঞান-বুদ্ধি ও বিচক্ষণতার ফসল। قَالَ اِنَّمَا اُوْتِيْتُهٗ عَلٰى عِلْمٍ عِنْدِىْ "সে বলল, এই সম্পদ আমি আমার জ্ঞান বলে পেয়েছি।"

আপন শক্তির ধারণা ও অনুভূতি এবং নিজের ওপর আর কোন সত্তা ও উর্ধ্বতর শক্তির অস্বীকার করার পরিণাম শক্তির সেই নেশা যা মানুষকে পাগল বানিয়ে দেয় এবং যাকে কোন নৈতিক পথ-নির্দেশনা ও শিক্ষা, মানবতার কোন প্রেরণা ও উপযোগিতাই নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে না। মানুষ তার লৌহ শৃঙ্খলে আষ্টেপৃষ্ঠে অসহায় ও বন্দী থাকে এবং দুর্বল জাতিগুলো তার পদতলে সবুজ ঘাসের ন্যায় পিষ্ট হতে থাকে। আদ সম্প্রদায়কে তাদের পয়গম্বর বলেছিলেন ঃ

وَاِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِيْنَ

"আর তোমরা যখন আঘাত হান তখন আঘাত হেনে থাক কঠোরভাবে" (সূরা শুআরা ঃ ১৩০)। বিদ্রোহ, অহংকার, ফেতনা-ফাসাদ, মানুষকে কষ্ট দেওয়া ও হত্যা করা এরই অনিবার্য পরিণতি।

اِنَّ فِرْعَوْنَ عَلاَفِى الْاَرْضِ وَجَعَلَ اَهْلَهَا شِيَعًا يَّسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ اَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِ نِسَاءَهُمْ ط اِنَّه كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِيْنَ -

"ফেরাউন দেশে পরাক্রমশালী হয়েছিল এবং সেখানকার অধিবাসীদেরকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করে ওদের একটি শ্রেণীকে সে হীনবল করেছিল; ওদের পুত্রদেরকে সে হত্যা করত এবং নারীদেরকে সে জীবিত রাখত। সে তো ছিল বিপর্যয় সৃষ্টিকারী।" (সূরা কাসাসঃ ৪)

বিশুদ্ধ ধর্মের গভীর প্রভাব ও নৈতিক প্রশিক্ষণ ব্যতিরেকে যখন শক্তি, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্প উন্নতি করে তখন তার স্বাভাবিক পরিণতি তাই হয় যা ওপরে বর্ণিত হলো।

য়ূরোপে শক্তি ও নৈতিকতা এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান ও ধর্মের ভারসাম্যহীনতা

দুর্ভাগ্যের বিষয়, য়ূরোপে শক্তি ও নীতিনৈতিকতা এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান ও ধর্মের মধ্যে যে ভারসাম্য থাকা দরকার ছিল, কয়েক শতাব্দী থেকে তা বিগড়ে আছে। রেনেসাঁর পর থেকে বস্তুগত শক্তি ও বাহ্যিক জ্ঞান-বিজ্ঞান বড় দ্রুততার সঙ্গে অগ্রসর হতে থাকে এবং ধর্ম ও নৈতিক চরিত্রের দ্রুত অবনতি হতে থাকে। কিছু কাল পর এ দুয়ের মধ্যে কোনরূপ ভারসাম্য অবশিষ্ট থাকে নি এবং এমন এক প্রজন্ম জন্মলাভ করে যাদের দাঁড়ির এক পাল্লা আসমানের সাথে কথা বলে আর অপর পাল্লা যমীনে (অর্থাৎ তারা এতটা অহংকারী যে, আকাশ ফেড়ে মাথা তুলতে চায়, পক্ষান্তরে নীতি-নৈতিকতা ও চরিত্রের দিক দিয়ে এতটাই অধঃপতিত যে, তারা সাত-তবক যমীনের নিচে হারিয়ে গেছে)। এই প্রজন্ম একদিকে নিজেদের বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত উন্নতি-অগ্রগতি এবং নিজেদের অস্বাভাবিক অভ্যাস ও কর্মকাণ্ডের দিক দিয়ে , অধিকন্তু বস্তুগত ও প্রাকৃতিক শক্তিসমূহকে আয়ত্তাধীন ও বশে আনার ব্যাপারে মনুষ্য-উর্ধ্ব সত্তা তথা 'অতি মানব' মনে হয়। অপর দিকে আপন নৈতিক চরিত্র ও কর্ম, লোভ-লালসা, হৃদয়হীনতা ও নিষ্ঠুরতার দিক দিয়ে সে চতুষ্পদ জন্তু ও হিংস্র প্রাণী থেকে আদৌ ভিন্নতর কিছু নয়। তাদের কাছে জীবনের সর্ববিধ উপকরণই বিদ্যমান কিন্তু তথাপি তাদের বাঁচা হচ্ছে না। তাদের জীবনের চূড়ান্ত ও পরিপূর্ণ জ্ঞান ও সমস্যাদি জানা আছে, কিন্তু তারা মনুষ্য জীবন, সংস্কৃতি ও নীতি- নৈতিকতার প্রাথমিক নীতি ও ধারণাটুকু পর্যন্ত রাখে না। তাদের জ্ঞানগত ও প্রযুক্তিগত সমুন্নতি এবং নৈতিক ও চারিত্রিক অধঃপতনের মধ্যে একেবারেই কোন সামঞ্জস্য

নেই। প্রাকৃতিক জ্ঞান-বিজ্ঞান তাকে যেই বিরাট শক্তি দান করেছে তার ব্যবহারের নিয়ম-রীতি সে জানে না।

অধ্যাপক জোড্ যথাযথ বলেছেন ঃ

প্রকৃতি বিজ্ঞান আমাদেরকে দেবতাসুলভ শক্তি দান করেছে, কিন্তু আমরা তা শিশু ও বন্য অসভ্যদের মস্তিষ্ক দিয়ে ব্যবহার করছি।

অন্য এক জায়গায় তিনি লিখেছেন ঃ

"শিল্পে আমাদের বিস্ময়কর উন্নতি, অগ্রগতি এবং নৈতিক ও চারিত্রিক ক্ষেত্রে আমাদের লজ্জাজনক ছেলেমিপনা ও বালখিল্যতার মাঝে যে দুস্তর ব্যবধান তার সঙ্গে আমাদের প্রতিটি বাঁকেই মুখোমুখি হতে হয়। একদিকে শিল্প ক্ষেত্রে আমাদের উন্নতি ও অগ্রগতির অবস্থা হলো, আমরা ঘরে বসেই সমুদ্রের অপর পার থেকে এবং এক মহাদেশ থেকে আরেক মহাদেশের লোকের সঙ্গে অবলীলায় কথা বলতে পারি। সমুদ্রের ওপর ও যমীনের নিচে আমরা দৌড়ে বেড়াচ্ছি। রেডিওর সাহায্যে শ্রীলঙ্কায় বসে লন্ডনের বৃহত্তম ঘণ্টার (Big Ben) আওয়াজ শুনছি। শিশুরা টেলিফোনের মাধ্যমে একে অপরের সঙ্গে কথা বলছে। বৈদ্যুতিক ছবি আসা শুরু হয়েছে। শব্দহীন টাইপ রাইটার চুপচাপ তার কাজ করছে। কোনরূপ কষ্ট ও ব্যথা-বেদনা ছাড়াই দাঁত ফিলিং করা যাচ্ছে। বিদ্যুতের সাহায্যে রান্না-বান্না চলছে। রাবারের সড়ক নির্মিত হচ্ছে। এক্স-রে-এর সাহায্যে আমরা আমাদের শরীরের ভেতরের অংশ উঁকি দিয়ে দেখতে পাচ্ছি। ছবি কথা বলছে, গান গাচ্ছে। ফিঙ্গার প্রিন্ট বা আঙ্গুলের ছাপের সাহায্যে অপরাধী ও খুনি-ঘাতকের সন্ধান বের করা যাচ্ছে। বৈদ্যুতিক তরঙ্গের সাহায্যে চুল কোঁকড়ানো হচ্ছে। সামুদ্রিক জাহাজ উত্তর মেরু পর্যন্ত এবং উড়োজাহাজ দক্ষিণ মেরু অবধি উড়ে যাচ্ছে। কিন্তু এতসব সত্ত্বেও আমাদের দ্বারা এতটুকু হতে পারে না যে, আমরা বড় বড় শহরে এমন কোন মাঠ বানাই যেখানে দরিদ্র শিশুরা আরামে নিরাপদে খেলতে পারে। ফলে বছরে প্রায় দু'হাজার শিশুকে আমরা হত্যা এবং প্রায় নব্বই হাজার শিশুকে যখম করছি।

"একবার একজন ভারতীয় দার্শনিকের সঙ্গে নিজেদের সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিস্ময়কর সব বস্তুর প্রশংসা করছিলাম। সে সময় একজন মোটরচালক Pending Sands-এর ওপর দিয়ে তিন কিংবা চার শ' মাইল দূরত্ব অতিক্রম করে রেকর্ড সৃষ্টি করেছিল অথবা কোন উড়োজাহাজ চালক মস্কো থেকে নিউ ইয়র্ক পর্যন্ত দূরত্ব, আমার ঠিক মনে নেই, বিশ কিংবা পঞ্চাশ ঘণ্টায় অতিক্রম করেছিল। আমি যখন সব বলে শেষ করলাম তখন সেই ভারতীয় দার্শনিক বললেন, হ্যাঁ, যা বললে তা সবই ঠিক, তোমরা পাখির মত বাতাসে ভর দিয়ে উড়ছ এবং পানিতে

মাছের মত সাঁতার কাটছ, কিন্তু এখন পর্যন্ত মাটির ওপর দিয়ে কেমন করে মানুষের মত হাঁটতে হয় তা তোমাদের জানা হয়ে ওঠেনি।"[১]

জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্প এবং নীতি- নৈতিকতা ও মানবতার মাঝে যে বিরাট ব্যবধান বর্তমান পাশ্চাত্য সভ্যতা সৃষ্টি করে দিয়েছে এবং বর্তমান সভ্যতা তার লক্ষ্য হাসিলে এবং মানবতার সঠিক খেদমত আঞ্জাম দিতে যেভাবে ব্যর্থ হয়েছে এর ওপর মতামত পেশ করতে গিয়ে অপর পাশ্চাত্য মনীষী নোবেল বিজয়ী ফরাসী সার্জন ড. এ্যালেক্সিস ক্যারল তাঁর Man the Unknown নামক গ্রন্থে বলেনঃ

"বর্তমান জীবন মানুষকে সম্ভাব্য যে কোনভাবে সম্পদ অর্জন ও আহরণ করতে উৎসাহিত করে। সম্পদ আহরণের এ সব উপায়-উপকরণ মানুষকে সম্পদের লক্ষ্য পর্যন্ত পৌঁছায় না। এটা মানুষের মধ্যে এক নিরন্তর উত্তেজনা ও জৈবিক কামনা-বাসনা পরিতৃপ্তির একটি ভাসাভাসা আবেগ সৃষ্টি করে। এসবের প্রভাবে ও প্রতিক্রিয়ায় মানুষ ধৈর্য ও সংযম হারিয়ে ফেলে এবং এমন সব কাজ থেকে সে অনীহা প্রকাশ করতে থাকে যা কিছুটা কষ্টকর ও আরামসাপেক্ষ। মনে হয়, আধুনিক সভ্যতা এমন মানুষ সৃষ্টিই করতে পারে না, যাদের ভেতর শৈল্পিক সৃষ্টিকুশলতা, বুদ্ধিমত্তা ও সাহস আছে। প্রতিটি দেশের ক্ষমতাসীন শাসক শ্রেণীর মধ্যে, যাদের হাতে ক্ষমতার চাবিকাঠি রয়েছে —মানসিক ও নৈতিক যোগ্যতার দৃশ্যমান অবনতি দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। আমরা অনুভব করছি, আধুনিক সভ্যতা সেই সব বড় বড় আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে পারেনি যা মানবতা তার প্রতি পোষণ করেছিল এবং সে সেই সমস্ত লোক জন্ম দিতে ব্যর্থ হয়েছে যারা মেধা ও সাহসিকতার অধিকারী হবে এবং সভ্যতাকে সেই কষ্টকর ও দুরতিক্রম্য রাস্তায় নিরাপদ শান্তির সাথে নিয়ে যেতে পারে যার ওপর সে আজ ঠোকর খাচ্ছে। আসল ব্যাপার, ব্যক্তি ততটা দ্রুততার সাথে উন্নতি করেনি যতটা দ্রুততার সাথে করেছে ঐ মনুষ্য মস্তিষ্কপ্রসূত প্রতিষ্ঠানগুলো। এ মূলত রাজনৈতিক নেতাদের মস্তিষ্কজাত ও নৈতিক ত্রুটি-বিচ্যুতির পরিণাম ফল এবং তাদের এই মূর্খতা বর্তমানে জাতিগোষ্ঠীসমূহকে সঙ্কটের মুখে নিক্ষেপ করেছে। প্রাকৃতিক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্প-প্রযুক্তি মানুষের জন্য যেই পরিবেশ সৃষ্টি করেছে তা মনুষ্য উপযোগী নয় এজন্য যে, তা সুপরিকল্পিতভাবে স্থাপিত নয় এবং তার ভেতর মানুষের সত্তার সাথে সামঞ্জস্য রক্ষিত হয়নি। এই পরিবেশ যা শুধুই আমাদের মেধা ও আবিষ্কার-উদ্ভাবনের ফসল, আমাদের আকার-আয়তন ও আমাদের আকার-আকৃতি মুতাবিক নয়। আমরা খুশি নই। আমরা এক অব্যাহত নৈতিক

1. Guide to modern wickedness, p. 263-63.

ও বুদ্ধিবৃত্তিক অধঃপতনের মাঝে নিপতিত। যেসব জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে প্রযুক্তিগত সংস্কৃতি বিকাশ লাভ করেছে এবং চরম উন্নতি লাভ করেছে তারা আগের তুলনায় খুবই দুর্বল এবং খুবই দ্রুততার সাথে অসভ্যতা ও বর্বরতার দিকে অগ্রসর হচ্ছে। কিন্তু তাদের এ অনুভূতি নেই। তাদেরকে এই মুহূর্তে সেই বিদ্রোহী মানবতার দুশমন পরিবেশ থেকে কোন শক্তিই বাঁচাতে পারে না যা প্রাকৃতিক জ্ঞান-বিজ্ঞান তার চারপাশে বেষ্টনীর মত টেনে দিয়েছে।

"বাস্তবতা হলো, আমাদের সভ্যতা বিগত সভ্যতাগুলোর মত জীবন-যিন্দেগীর নিমিত্ত এমন সব শর্ত আরোপ করে দিয়েছে যেগুলো (কতক অজ্ঞাত কারণে) জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলবে। আমরা বস্তুবাদ সম্পর্কে যতটা জানি এর তুলনায় জীবনের জ্ঞান এবং এ সম্পর্কে যে, মানুষকে কিভাবে জীবন অতিবাহিত করা দরকার, খুবই কম জানি এবং আমাদের জ্ঞান এ সম্পর্কে এখন পর্যন্ত খুবই পেছনে পড়ে রয়েছে আর এই কম জানার ফলে আমরাই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছি-এর ফলে আমরাই ভুগছি।"[১]

"আবিষ্কার-উদ্ভাবন যেই দ্রুততার সাথে অগ্রসর হচ্ছে এবং যেভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে, এর থেকে উপকার গ্রহণ করা হচ্ছে না। পদার্থ বিজ্ঞান, জ্যোতির্বিজ্ঞান ও রসায়ন বিজ্ঞানের আবিষ্কারের ওপর অধিক গুরুত্ব প্রদানের দ্বারা কোন লাভ নেই। আরামপ্রিয়তা, বিলাসিতা, সৌন্দর্য, আকার-আয়তন ও জীবনের কৃত্রিম বিলাস-ব্যসনের বৃদ্ধি ও উন্নতি দ্বারা কী লাভ যখন আমাদের দুর্বলতা আমাদেরকে এর থেকে ফায়দা হাসিল করতে দেয় না এবং আমরা একে সঠিক পথে লাগাতে পারি না? এমন জীবন-ব্যবস্থাকে দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর করার দ্বারা কী লাভ যার থেকে নৈতিক দিক একেবারেই বের করে দেওয়া হয় এবং মহান জাতিগোষ্ঠীগুলোর গুণগুলোকে ফেলে দেওয়া হয়? আমাদের জন্য তো এটাই সমীচীন ছিল, দ্রুতগামী জাহাজ, অধিক আরামদায়ক মোটর কার, সুলভ মূল্যের রেডিও ও আধুনিকতম মান-মন্দিরের পরিবর্তে আমরা নিজের দিকে অধিকতর মনোনিবেশ করব, মনোযোগ দেব। যান্ত্রিক, প্রাকৃতিক ও রাসায়নিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাধ্যের ভেতর এটা নেই যে, সে আমাদেরকে মেধা ও বুদ্ধিমত্তা দান করতে পারে, দান করতে পারে নৈতিক শৃংখলা ও চারিত্রিক বিধান, স্বাস্থ্য, স্নায়বিক ভারসাম্য, শান্তি ও নিরাপত্তা।"[২]

বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের অপব্যবহার

প্রকৃত ব্যাপার হলো, এই সব আবিষ্কার-উদ্ভাবন ও বিজ্ঞান-প্রযুক্তি স্বস্থানে সম্পূর্ণ নির্দোষ ও নিরপেক্ষ। সে মানুষের ইচ্ছা-অভিলাষ, তার জ্ঞান-বুদ্ধি ও তার

1. Man, the unknown, pp, ৩৮-৩৯, ; ২. প্রাগুক্ত, ৫০-৫১ পৃ.

নীতি-নৈতিকতাবোধের অধীন। সে নিজে থেকে আবিষ্কৃত জিনিস স্বয়ং ভাল হলেও মানুষের ভুল, অন্যায় অপব্যবহার এবং আপন প্রকৃতি ও প্রশিক্ষণের খারাবী দ্বারা সেগুলোকেও খারাপ বানিয়ে দেয়। এজন্য সব চাইতে বেশি দেখা প্রয়োজন, এসব আবিষ্কৃত যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তিগত উপকরণ ব্যবহারকারী লোকগুলো কেমন, কী রকম নৈতিক চরিত্র ও জীবনাচারের অধিকারী এবং কী ধরনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সে পোষণ করে।

পাশ্চাত্য জাতিগুলো দীর্ঘকাল থেকে এই বিশ্বাস পোষণ করে আসছে, আনন্দ-ফুর্তি, আরাম-আয়েশ, বস্তুগত সুযোগ-সুবিধা ভোগ, মাথা উঁচু করে চলা ও অন্যের ওপর প্রাধান্য লাভ করা ছাড়া পৃথিবীর বুকে মানুষের আর কোন অর্জনযোগ্য লক্ষ্য নেই। ফলে স্বাভাবিকভাবেই তারা নিজেদের সমগ্র শক্তি ও মেধা এসব লক্ষ্য অর্জনে ব্যয় করেছে এবং এমন সব যন্ত্রপাতি ও উপায়-উপকরণ আবিষ্কার করেছে যা দিয়ে এসব লক্ষ্য খুব সহজে ও দ্রুততার সঙ্গে অর্জন করা যায়। ক্রমান্বয়ে উপকরণগুলো নিজেই একদিন লক্ষ্যে পরিণত হয়ে গেল এবং আবিষ্কার-উদ্ভাবন আপন জায়গায় নিজেই এক বিরাট ও মহান লক্ষ্য হিসাবে অভিহিত হলো। যে রকম একজন শিশু স্বভাবতই খেলনা ভালবাসে, ঠিক তেমনি এসব আবিষ্কার-উদ্ভাবনের প্রতি তার ভালবাসা জন্মাল। এ সবের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি হলো। য়ূরোপে মূল্যবোধের পরিবর্তন ঘটতে লাগল। মানদণ্ড গেল বদলে। কিছুকাল আগে তাদের এই ধারণা প্রবল ছিল, আরামের নামই হলো সভ্যতা আর আরাম তথা প্রশান্তি ছিল তাদের সবচাইতে বড় আদর্শ। অতঃপর বিভিন্ন কার্যকারণের ওপর ভিত্তি করে এবং কিছুটা আরাম ও প্রশান্তি লাভের নিমিত্ত দ্রুততা ও দ্রুতগামিতার প্রয়াস গ্রহণ করা হয় এবং জীবনের সকল শাখায় দ্রুততা ও গতি সৃষ্টির প্রতিযোগিতা সৃষ্টি হয়। লোকে এর মাঝে এভাবে মত্ত হয়ে যায় যে, ক্রমান্বয়ে তারা মনে করতে থাকে, গতি ও দ্রুততার নামই হলো সভ্যতা। এখন দ্রুততা তথা গতিই তাদের জীবনের আদর্শে পরিণত হল। অধ্যাপক জোড় বলেনঃ

"ডিজরেলী (Disraeli)-র কথা থেকে মনে হয়, সমসাময়িক যুগের সমাজ ও সোসাইটির বিশ্বাস ছিল, আরামপ্রিয়তার নামই হলো সভ্যতা। কিন্তু আমাদের যুগের সমাজ-সোসাইটির বিশ্বাস হলো, দ্রুততা তথা গতির নাম হলো সভ্যতা। দ্রুততা তথা গতি হলো বর্তমান কালের যুবকদের আরাধ্য। এর মণ্ডপ ও মন্দিরে তারা আরাম, প্রশান্তি, শান্তি এবং অন্যান্যের সাথে দয়ামায়াকে অত্যন্ত নির্দয়ভাবে বলি দেয়।"[১]

---

1. Guide to modern wickedness, p, 241.

আমাদের এখন দেখতে হবে, সেই সব লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কী ছিল যার জন্য এসব যন্ত্রপাতি ও উপকরণ ব্যবহৃত হচ্ছে। এসব থেকে কতটা উপকার লাভ করা হচ্ছে এবং একে মানব জাতির জন্য কতটা উপকারী ও কার্যকর বানানো হচ্ছে। মানুষের অবস্থা ঐসব শক্তি ও উপকরণের বর্তমানে কয়েক শতাব্দী পূর্বের লোকদের চাইতে কতটা উত্তম। এর উত্তর একজন পাশ্চাত্য মনীষী, লেখক ও সমালোচকের ভাষায় দেওয়াই সমীচীন হবে ঃ

"নিঃসন্দেহে আমরা অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে ও দ্রুত গতিতে স্থান থেকে স্থানান্তরে ভ্রমণ করতে পারি। কিন্তু এটাও দেখার বিষয়, যেসব স্থান আমরা ভ্রমণ করি সেগুলোর খুব কমই ভ্রমণ উপযোগী। এতে কোনই সন্দেহ নেই যে, পর্যটকদের জন্য পৃথিবী খুবই সংকীর্ণ ও তার রশি সংকুচিত হয়ে গেছে। এক জাতি অন্য জাতির কাছাকাছি এসে গেছে এবং তাদের পা একে অন্যের দহলিজে। কিন্তু এর ফল এই, জাতি-গোষ্ঠীগুলোর পারস্পরিক সম্পর্ক পূর্বের তুলনায় অনেক বেশী অসুন্দর ও অপ্রস্ফুটিত। সে সব উপকরণ যার সাহায্যে আমরা আমাদের প্রতিবেশী জাতিগোষ্ঠীগুলোর সম্পর্কে সরাসরি ওয়াকিফহাল হতে পারি সেগুলো উল্টো গোটা দুনিয়াটাকেই যুদ্ধের দাবানলের মধ্যে ঠেলে দিয়েছে। আমরা আওয়াজ পৌঁছুবার জন্য যন্ত্র আবিষ্কার করেছি এবং এর সাহায্যে আমরা প্রতিবেশী জাতিগুলোর সঙ্গে কথা বলছি। কিন্তু এর পরিণতি হয়েছে এই, আজ প্রতিটি জাতিগোষ্ঠী বাতাসকে পূর্ণ শক্তিতে প্রতিবেশী জাতিগুলোকে উৎপীড়ন করতে ও বিরক্ত করতে কাজ লাগাচ্ছে। তারা এই চেষ্টায় থাকে যে, এগুলো অপরাপর জাতিগুলোকে তাদের রাজনৈতিক ব্যবস্থার শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রাধান্য মেনে নিতে বাধ্য করুক।"[১]

"উড়ো জাহাজকে দেখুন, বাতাসে ভর করে আসমানের বুকে উড়ে বেড়াচ্ছে। আপনি ধারণা করবেন, এর আবিষ্কারক তাঁর জ্ঞান, নৈপুণ্য ও শিল্প-কুশলতার দিক দিয়ে মানুষ নয়, মনুষ্য-ঊর্ধ্ব কোন সত্তা ছিল এবং যারা এতে প্রথম আরোহণ করে আকাশে উড়েছিল। এতে কোনই সন্দেহ নেই, তাদের উচ্চ মনোবল, অটুট সংকল্প ও ইচ্ছাশক্তি ও দুঃসাহস অত্যন্ত প্রশংসনীয়। কিন্তু এখন আপনি একটু সেই সব লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পর্যালোচনা করুন যার আওতাধীন এই উড়োজাহাজ ব্যবহৃত হয়েছে এবং ভবিষ্যতে ব্যবহৃত হবে। সেসব উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য কী? আকাশ থেকে বোমা বর্ষণ, মানব দেহগুলোকে খণ্ড-বিখণ্ডকরণ, জীবিতদের জীবন হরণ, মানব দেহগুলোকে ভস্মীভূতকরণ, বিমান থেকে বিষাক্ত গ্যাস নিক্ষেপণ এবং প্রতিরক্ষায় অসমর্থ দুর্বলদেরকে ধ্বংস করা। এসব লক্ষ্য

1. Guide to modern wickedness, p. 247.

তো কেবল আহমকদের হতে পারে অথবা শয়তানদের (কোন মানুষের কিছুতেই নয়)।

"এখন দেখতে হবে, ভাবী কালের ঐতিহাসিক এ সম্পর্কে কি রায় দেন, আমরা ধাতব পদার্থ ও স্বর্ণ কিভাবে ব্যবহার করতাম। ঐতিহাসিক লিখবেন, আমরা এমন উন্নতি করেছিলাম, আমরা বেতার টেলিগ্রাফীর মাধ্যমে স্বর্ণ সম্পর্কে তথ্য দিতে পারতাম। তিনি এমন চিত্র পেশ করবেন যা দেখাবে, ব্যাংকের লোকেরা কী নিপুণভাবে স্বর্ণের ওজন করত ও হিসাব রাখত। তিনি এই অস্বাভাবিক ও বিস্ময়কর পন্থা সম্পর্কে আলোচনা করবেন যার সাহায্যে আমরা প্রত্যহ অভিগমন প্রক্রিয়ার আইন ফাঁকি দিয়ে এক রাজধানী থেকে আরেক রাজধানীতে স্বর্ণ স্থানান্তরিত করতে থাকতাম। তিনি লিখবেন, এই অর্ধ বন্যরা শিল্প-প্রযুক্তিতে খুবই দক্ষ ও অভিজ্ঞ ছিল, ছিল দুঃসাহসী। কিন্তু এই আন্তর্জাতিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে ব্যর্থ ছিল যা স্বর্ণের ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখবে এবং একে সঠিকভাবে বণ্টন করতে প্রয়াসী ছিল। তাদের কেবল এতটুকু চিন্তা ছিল, তারা মূল্যবান ধাতুসমূহকে সম্ভাব্য দ্রুততার সঙ্গে প্রোথিত করবে। তারা স্বর্ণ ও অন্যান্য ধাতব পদার্থ আফ্রিকায় যমীনের বুক চিরে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে উত্তোলন করত এবং লন্ডন, নিউ ইয়র্ক ও প্যারিসের পাতাল কুঠরিসমূহে প্রোথিত করত।"[১]

বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ধ্বংসাত্মক প্রকৃতি

পেছনে বর্ণিত বিভিন্ন অবস্থা ও কার্যকারণের প্রেক্ষিতে পাশ্চাত্য জাতিগোষ্ঠীগুলোর মধ্যে কল্যাণ ও মঙ্গলের দিকে আগ্রহ ও ভালোর দিকে প্রবণতা কমে গেছে এবং নৈতিক চরিত্র ও সভ্যতা-সংস্কৃতির সহীহ-শুদ্ধ নীতিমালা ও সূত্র গ্রন্থি তাদের হাত থেকে ছুটে গেছে। দায়িত্বহীন সাহিত্য হৃদয়-মানসে বক্রতা এবং খোদাদ্রোহী দর্শন স্বভাব ও প্রকৃতিতে বিকৃতি সৃষ্টি করে দিয়েছে এবং তাদের রুচি নষ্ট হয়ে গেছে। এর ওপর ভিত্তি করে বলা যায়, যেভাবে খাদ্যে বিষক্রিয়াজনিত বা ওলাওঠা মহামারী জাতীয় রোগে ভাল থেকে ভাল খাবারও রোগীর পেটে গিয়ে বিষ ক্রিয়া সৃষ্টি করে ঠিক তেমনি জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প ও প্রযুক্তিগত আবিষ্কার-উদ্ভাবন ও উন্নতি-অগ্রগতি য়ূরোপে স্বয়ং য়ূরোপের লোকদের জন্যেই কেবল নয়, মানব সভ্যতার জন্য বিপজ্জনক অভিশাপ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বৃটেনের সাবেক প্রধানমন্ত্রী মি. ইডেন ১৯৩৮ সালে প্রদত্ত তাঁর এক বক্তৃতায় কী চমৎকারই না বলেছিলেন ঃ

1. Guide to modern wickedness. p.

"যতদিন না কিছু করা হচ্ছে, এই পৃথিবীর অধিবাসীরা এই শতাব্দীর শেষভাগে আদিম গুহাবাসী ও বন্য লোকদের জীবনধারায় ফিরে যাবে। কী আশ্চর্যের ব্যাপার, পৃথিবীর তাবৎ রাষ্ট্র এমন একটি অস্ত্রের হাত থেকে বাঁচার জন্য কোটি কোটি টাকা ব্যয় করছে যার ভয়ে সবাই ভীত, কিন্তু তা আয়ত্তে আনতে ও নিয়ন্ত্রণে রাখতে কেউ রাজী নয়! কোন কোন সময় আমি বিস্ময়ের সঙ্গে ভাবি, যদি অন্য কোন গ্রহ থেকে কোন ভ্রমণকারী পর্যটক আমাদের পৃথিবী নামক গ্রহে নেমে আসে তাহলে আমাদের পৃথিবী দেখে কি বলবে? সে দেখবে, আমরা সকলে মিলে আমাদেরই ধ্বংসের উপকরণ তৈরি করছি, এমন কি আমরা একে অপরকে তার ব্যবহার পদ্ধতিও বাৎলে দিচ্ছি।"

যে সময় মি. এন্থনী ইডেন একথা বলেছিলেন তখন তাঁর কল্পনায়ও হয়তো আসে নি যে, এই যুদ্ধ চলাকালেই ধর্মের নিয়ন্ত্রণমুক্ত সভ্য মানুষ যাদের নেতৃত্বে কর্তৃত্বে রয়েছে বিশ্বশান্তির প্রবক্তা সভ্যতার ধ্বজাধারী ও নতুন বিশ্বের নেতা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র— প্রযুক্তি ও শিল্পের ধ্বংসাত্মক প্রযুক্তি ও শিল্পের ধ্বংসাত্মক বিজ্ঞান ও মানুষের জীবন হরণকারী ক্ষমতা এই পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছবে যে, স্বয়ং বিজ্ঞানীও তা কল্পনা করতে সক্ষম হবে না।

কয়েক বছরের অবিরাম চেষ্টা-সাধনা ও কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে শেষ পর্যন্ত আমেরিকা পারমাণবিক বোমা আবিষ্কারে সক্ষম হয় যার ওপর এই যুদ্ধের জয়-পরাজয় নির্ভর করছিল এবং ১৯৪৫ সালের ১৬ জুলাই তারিখে সাড়ে পাঁচটার সময় এর শক্তি ও সামর্থ্যের পরীক্ষা করা হয়।

মার্কিনীরা প্রথমে নিউমেক্সিকোর প্রান্তরে, তার পরে জাপানের হিরোশিমা ও নাগাসাকীর মানব সন্তানদের ওপর বর্ষণ করে এর কার্যকারিতার পরীক্ষা চালায়। পারমাণবিক বোমা নিক্ষিপ্ত হতেই হিরোশিমা শহরটি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। জীবন্ত কোন প্রাণীই অবশিষ্ট ছিল না আর না ছিল নিষ্প্রাণ কোন কিছু। চোখের পলকে মানুষ, পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গ, দালানকোঠা একদম নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। তীব্র বিস্ফোরণের ফলে বাতাসের চাপ বৃদ্ধি পায়। ধোঁয়ার কুণ্ডলীর নিচে চাপা পড়ে গোটা শহর। সে এক অবর্ণনীয় কেয়ামতসদৃশ দৃশ্য! উৎক্ষিপ্ত ধূলি-বালির ঝলসানো কুণ্ডলীকৃত ও চতুর্দিকে নিক্ষিপ্ত মাইলের পর মাইল সুউচ্চ এক পাহাড় যেন আর এই পাহাড়ের নিচে জাহান্নামসদৃশ আগুনের কুণ্ডুলী যা মুহূর্তে সব কিছুকে জ্বালিয়ে ছাই করে দেয়। যেই বিমান থেকে এই বোমা নিক্ষেপ করা হয়েছিল সেই বিমানের চালক বোমা নিক্ষেপের পর পরই দ্রুত নিজের নিরাপত্তার জন্য সেখান থেকে পালিয়ে যায়; নইলে সেও বাঁচতে পারত না, ধ্বংস হয়ে যেত। বিস্ফোরণ এত ভয়ংকর ও তীব্র ছিল যে, বোমা নিক্ষেপকারীদেরও হুশ-জ্ঞান ছিল

না। ভয়-ভীতি ও আতংকে তাদের অবস্থা হয়েছিল এমন যে, সকলের মুখ থেকে তখন 'ইয়া নাফসী, ইয়া নাফসী' অর্থাৎ 'হায় আল্লাহ্! আমার কি হবে' আওয়াজ বের হচ্ছিল। কিন্তু তারা যখন তাদের ঘাঁটিতে ফিরে যায় তখন মিত্রশক্তির অন্তর্ভুক্ত দেশগুলোতে আনন্দ ও খুশীর বন্যা বয়ে যায় এবং এসব দেশে তাদের উষ্ণ অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করা হয় এবং বাহ্‌বা দেয়া হয়।"[১]

স্টুয়ার্ট গিল্ডার (Stuart Guilder) তাঁর এক নিবন্ধে এটম তথা পারমাণবিক বোমার বিপজ্জনক ও ধ্বংসকারী ক্ষমতা সম্পর্কে অভিমত দিতে গিয়ে লিখছেন ঃ

"যদিও সমগ্র ব্যাপারটির খুঁটিনাটি ও বিস্তারিত জানাশোনা ছিল না, কিন্তু মোটের ওপর পারমাণবিক বোমার উদ্ভাবনকারী বিজ্ঞানীরা এতটুকু অবশ্যই জানতেন, তারা যেই সমরাস্ত্র ব্যবহার করতে যাচ্ছেন তার পরবর্তী পরিণতি হবে, মানুষ ধ্বংস হবার হাত থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করতে পারবে না। এর পরবর্তী পরিণতি ও ফলাফল সম্পর্কে যদি বিস্তারিত জানতে হয় তাহলে হিরোশিমা শহরের সেসব বিপোর্ট যা বিভিন্ন পত্রিকার রিপোর্টাররা লিখেছিলেন তা দেখতে হবে। রিপোর্টাররা তাদের Atomic plague তথা "পারমাণবিক বোমার মহামারী" শীর্ষক রিপোর্টে লিখেছেন ঃ

"অনেক লোকই যারা বাহ্যত বোমা বিস্ফোরণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি কিংবা এর আগুনে ও তাপে মারা যায় নি বা অব্যাহতভাবে মরছে না বটে, তবে তাদের এই মৃত্যুর কারণ হল, তাদের রক্ত জীর্ণ ও মিশ্রিত হয়ে যায়। প্রথম প্রথম তাদের রক্তের শ্বেতকণিকা ধ্বংস হয়ে যায়। এরপর পালা আসে লোহিত কণিকার। তাদের চুল ঝরে যায়। এরপর তারা যতদিন বাঁচে তাদের শরীরের হাত-পা শুকিয়ে যেতে থাকে। এরপর একদিন সে মারা যায়। এর কারণ হিসেবে জানা যায়, পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণের ফলে বাতাসে কিছুটা তেজস্ক্রিয়া থেকে যায় এবং মানুষের চামড়া তা টেনে নেয় কিংবা শ্বাস-প্রশ্বাসের মাধ্যমে সেগুলো ফুসফুসে গিয়ে পৌছে।"

এই গ্রন্থ উদ্ধৃত করবার পর এই নিবন্ধকার স্টুয়ার্ট গিল্ডারই লিখছেন ঃ

"এই খবর সমগ্র বিশ্বকে ভীত-সন্ত্রস্ত করে তোলার জন্য যথেষ্ট। বিশ্ব আজও এই ভয়াবহ বোমা সম্পর্কে জানত না এবং বোমার তেজস্ক্রিয়াধারী ধাতব পদার্থ সম্পর্কেও ওয়াকিফহাল ছিল না। কিন্তু বিজ্ঞানীরা তিরিশ বছর আগে থেকেই

---

১. হিরোশিমার মিউনিসিপ্যালিটির সভাপতি ১৯৪৯ সালের ২০শে আগস্ট তারিখের ঘোষণায় বলেন যে, ৪৫ সালের ৬ই আগস্ট তারিখে যারা মারা গিয়েছিল তাদের সংখ্যা ছিল ২ লক্ষ ১০ থেকে ৪০ হাজারের মধ্যে।

জানত, এটা এমন এক অস্ত্র হবে যার প্রতিষেধক কোথাও নেই এবং এটা সমগ্র মানবগোষ্ঠীর অস্তিত্বের জন্য মারাত্মক হতে পারে।

"জানা গেছে, জাপানীরা এর প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া থেকে আত্মরক্ষার জন্য ঘরে তৈরী নেকাব ব্যবহার করে। সম্ভবত এগুলো সেই নেকাব যেগুলো জাপানের লোকেরা ভীষণ ঠাণ্ডা ও তীব্র শীতের হাত থেকে বাঁচার জন্য ব্যবহার করত। কিন্তু এটা এতটাই অকার্যকর প্রমাণিত হয়েছে যতটা আবিসিনিয়ার সৈনিকদের সেই সব কাপড় ব্যর্থ ও নিষ্ফল প্রমাণিত হয়েছে যা তারা মুসোলিনীর বোমারু বিমান থেকে তাদের ওপর বিষাক্ত গ্যাস নিক্ষেপের সময় তাদের নাকের চারপাশে জড়িয়ে নিত।

"পারমাণবিক বোমা নিক্ষেপের কাজে যে সব বৈমানিক শরীক ছিল তাদের বক্তব্য এই যে, বোমা নিক্ষেপের পর ধোঁয়া ও ধুলোর মেঘ ন'মাইল পর্যন্ত বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে। অধ্যাপক প্লেচ (Plesch)-এর অভিমত হলো, যে জায়গায় বোমা বিস্ফোরিত হয় তার আশেপাশে শত মাইল এলাকার লোকজনের বৈজ্ঞানিক পন্থায় পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা দরকার এবং তাদের শারীরিক ও দৈহিক অবস্থা খুব গভীরভাবে খুঁটিয়ে দেখা উচিত যে, তাদের ওপর এর কোনরকম আছর তো পড়ল না!

"এটা আদৌ অসম্ভব নয়, পৃথিবী একদিন সকালে উঠে পত্রিকার পাতায় এই খবর পড়বে, সে সব লোক যারা জাপান থেকে হাজার হাজার মাইল দূরে বাস করত তাদের ভেতর সেই সব আলামত ছড়িয়ে পড়েছে যা পারমাণবিক বোমার মহামারীতে দেখা যায়। যদি ছোট্ট একটি পারমাণবিক বোমা নয় মাইল পর্যন্ত বাতাসকে ধূলো ও ধূয়া দ্বারা দূষিত ও বিষাক্ত করে তুলতে পারে তাহলে এটা উপলব্ধি করা অত্যন্ত সঙ্গত হবে, এর থেকে বৃহদাকারের একটি বোমা এর চাইতে কয়েক গুণ বেশি বিস্তৃত জায়গা প্রভাবিত করবে।"[1]

1. The Statesman, September, 16,1945.

ষষ্ঠ অধ্যায়

পাশ্চাত্যের নেতৃত্ব থাকাকালে পৃথিবীর পারিভাষিক ক্ষয়ক্ষতি

এখানে প্রাচ্যের এশীয় জাতিগোষ্ঠীগুলোর বস্তুগত ক্ষয়ক্ষতি নিয়ে আমরা আলোচনা করব না। পশ্চিমাদের বিজয় অভিযান চলাকালে প্রাচ্যের জাতিগোষ্ঠীগুলোকে কত বড় বড় ও বিশাল দেশ হারাতে হয়েছে এবং পশ্চিমা শক্তি কিংবা তাদের বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণতার মুকাবিলায় পিছপা হতে হয়েছে, এ বিতর্কও এ মুহূর্তে আমাদের আলোচ্য নয় এবং এর বিস্তারিত বর্ণনার এখানে স্থান সংকুলান হবে না। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের অনেক লোক ও ঐতিহাসিক এ নিয়ে স্বল্প পরিসরে মধ্যম আকারে ও বড় রকমের প্রচুর পুস্তক রচনা করেছেন। আমরা এক্ষণে অত্যন্ত সংক্ষিপ্তভাবেই নয়, বরং ইশারা-ইঙ্গিতে এটা দেখাতে চাই, পাশ্চাত্যের ক্ষমতার এই প্লাবনে যা বিশ্বের তামাম ভূভাগে ছড়িয়ে পড়েছিল এবং এর প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া থেকে পর্বতশৃঙ্গ, গভীর উপত্যকা, স্বাধীন জাতিগোষ্ঠীর মানস জগত, এমন কি জলবায়ু পর্যন্ত কিছুই নিরাপদ থাকতে পারেনি—পৃথিবীকে এর ফলে অনেক তাৎপর্যপূর্ণ, মৌলিক, আধ্যাত্মিক ও নৈতিক ক্ষতি বরদাশ্‌ত করতে হয়েছে। এই বিশ্বজয়ী ও সর্বগ্রাসী বিপ্লবে সব চাইতে বড় ক্ষতি বরদাশ্‌ত করতে হয়েছে মুসলমানদেরকেই। কেননা জাহিলিয়াতের অনেক বৈপরীত্য ও মতভেদ এই জীবন ব্যবস্থার সঙ্গেই। তাই জাহিলিয়াতের বিজয় অর্জন ও প্রাধান্য বিস্তারে তাকেই সর্বাধিক ক্ষতি সইতে হবে এটাই ছিল স্বাভাবিক। কেননা ইসলাম ও জাহেলিয়াত হচ্ছে পাল্লার দুই প্রান্তের মত। এক পাল্লা যখন ভারী হয়ে উঠবে, তখন তার অপর প্রান্ত হাল্‌কা হয়ে যাওয়াটাই স্বাভাবিক।

ধর্মীয় অনুভূতির অভাব

এই দুনিয়ার পরিণতি কি? এই জীবন গত হয়ে যাওয়ার পর কি আর কোন জীবন আছে? থাকলে তা কী ধরনের এবং তার প্রকৃতিই বা কেমন ? এবং তার জন্য এই জীবনে কি কোন হেদায়েত বা দিক-নির্দেশনা আছে এবং তা কোথা থেকে জানা যাবে ? এই যে পরবর্তী জীবন সেই জীবনকে আরামপ্রদ ও শান্তিদায়ক বানাবার জন্য কী মূলনীতি ও শিক্ষামালা রয়েছে এবং তার উৎসই বা কী ? মানবাত্মাকে চিরস্থায়ী আরাম, সুখ ও হৃদয়-মনকে স্থায়ী ও চিরন্তন শান্তি দেবার পথ কি এবং তা কোথা থেকে জানা যেতে পারে?

এগুলোই সে সব প্রশ্ন যেগুলো প্রাচ্য ভূখণ্ডের মানুষকে শত শত নয়– হাজার হাজার বছর ধরে অস্থির করে রেখেছে, করে রেখেছে প্রশ্নের সম্মুখীন এবং যা তার অত্যন্ত বস্তুগত নিমজ্জমানতা ও আত্মবিস্মৃতির মাঝেও তার দিলের গভীরে থেকে বারবার ঠেলে ওঠে এবং উত্তর চেয়েছে। প্রাচ্য তার কোন যুগেই এই স্বাভাবিক প্রশ্নকে এড়িয়ে যায়নি। দিলের গভীর প্রদেশ থেকে নির্গত এই আওয়াজ সে শুনেছে, উপেক্ষা করেনি, বরং আপন জীবনের সর্বপ্রকার ব্যস্ততা ও মস্তিষ্কের যাবতীয় দ্বন্দ্ব ও অনুসন্ধানের মধ্যে একে প্রথম স্থান দিয়েছে। সে তার সভ্যতার ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের হাজার হাজার বছরের ইতিহাসে বরাবর এসব প্রশ্নের সমাধান করতে এবং এর সন্তোষজনক জওয়াব খুঁজে পেতে দ্যোদুল্যমানতার মাঝে ঝুলতে থাকে। অতিপ্রাকৃতিক দর্শন, ইলমে কালাম, তাসাওউফ, প্রাচ্য দর্শন, রিয়াযত ও মুজাহাদা (আধ্যাত্মিক সাধনা), জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এবং অপরাপর প্রাচ্যের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও অভিজ্ঞতা ছিল এ সবের সমাধানের লক্ষ্যেই পরিচালিত বিভিন্ন প্রয়াস। এজন্য সে ভুল পথও এখতিয়ার করেছে এবং ভুল উপায়-উপকরণও কাজে লাগিয়েছে। এক্ষেত্রে সে সফল হওয়ার চেয়ে ব্যর্থই হয়েছে বেশি। কিন্তু এ দিয়ে এই ঘটনার ওপর এ প্রভাব পড়ে না যে, প্রাচ্যের লোকদের জীবনে এই প্রশ্ন সব সময় বর্তমান থেকেছে এবং এটাই প্রথম গুরুত্ব লাভ করেছে।

এক্ষেত্রে যদি আমরা দর্শনের ভাষাই ব্যবহার করি তাহলে আমরা বলব, প্রাচ্যবাসীদের মধ্যে বাহ্যিক ইন্দ্রিয় ছাড়াও আরও একটি ইন্দ্রিয় আছে যাকে আমরা ধর্মীয় ইন্দ্রিয় বলতে পারি। যে রকম অন্যান্য ইন্দ্রিয় যার যার কাজ করে এবং সে সবের মাধ্যমে অনুভব ও উপলব্ধি করে, ঠিক তেমনি এই ইন্দ্রিয়ের অর্থাৎ ধর্মীয় ইন্দ্রিয়েরও কিছু কিছু অনুভূত ও উপলব্ধ বিষয় আছে যা প্রাচ্য জীবনের প্রয়োজনীয় উপাদান ও অনুষঙ্গ হিসাবে বর্তমান।

এতে সন্দেহ নেই, য়ূরোপীয় রেনেসাঁর প্রাথমিক যুগে এসব প্রশ্ন রীতিমত বিদ্যমান ছিল এবং জ্ঞানী-গুণী ও চিন্তাশীল মহল দীর্ঘকাল ধরে এর ওপর নানারূপ পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছে। কিন্তু পাশ্চাত্য সভ্যতা ও জীবন-দর্শনের অভ্যন্তরীণ বৈশিষ্ট্য যুগের সাথে সাথে যে পরিমাণ প্রকাশিত ও উত্থিত হতে থাকে এবং জীবনে পাশ্চাত্যের যে পরিমাণ চিন্তা-ভাবনা ও লিপ্ততা বেড়েছে সেই পরিমাণ ঐ সব প্রশ্নের গুরুত্বও কমে গেছে এবং তা বাস্তব জীবনে পেছনে নিক্ষিপ্ত হয়েছে। অতি প্রাকৃতিক দর্শনের ব্যাপারে তাত্ত্বিক ও শিক্ষিত মহলে এখনও এসবের ওপর মতামত প্রকাশিত হয়ে থাকবে। কিন্তু জীবন থেকে এসব প্রশ্ন একেবারেই বেরিয়ে গেছে এবং তার সামনে থেকে জিজ্ঞাসার চিহ্ন মুছে

গেছে। এ সম্পর্কে সেই সব খটকা, ক্লেশ, যাতনা এবং সেসব জিজ্ঞেসপ্রবণতা যা হাজার হাজার বছর প্রাচ্যবাসীদেরকে মশগুল রেখেছে এবং এটা কোন ঈমান বা বিশ্বাস, খোলা মন ও প্রশান্ত হৃদয়ের ওপর ভিত্তি করে নয়, বরং এজন্য যে, তা পাশ্চাত্যের লোকদের জীবনে বহুকাল থেকে আপন গুরুত্ব খুইয়ে ফেলেছে এবং অপরাপর ব্যস্ততা ও সমস্যা-সংকটের জায়গা দিয়ে রেখেছে। এ যুগের ব্যস্ত মানুষ ঐসব সমস্যা-সংকটের সঙ্গে পরিপূর্ণ সম্পর্ক ছেদ করেছে এবং নিজেদেরকে এর থেকে মুক্ত করে নিয়েছে। এসব প্রশ্ন নিয়ে মাথা ঘামাবে এমন সময় ও অবকাশ তাদের আদৌ নেই। তাদের পক্ষ থেকে এসব প্রশ্নের উত্তরের কোন একটি দিক নিয়ে ভাববার কিংবা আকর্ষণ বোধ করার কিছু নেই। আর তা এজন্য যে, তাদের কাছে একমাত্র গুরত্বপূর্ণ হলো তাদের বর্তমান জীবন, চলমান জীবন এবং তাদের একমাত্র কাম্য ও কাঙ্ক্ষিত হলো এই জীবন সম্পর্কিত বিস্তারিত দিক ও পথ-নির্দেশনা, আর কিছু নয়।

প্রাচীন প্রাচ্য ও আধুনিক পাশ্চাত্যের মধ্যে এ এক বিরাট মনস্তাত্ত্বিক পার্থক্য– প্রাচ্য ধর্মীয় বোধ ও অনুভূতির ধারক আর পাশ্চাত্য তার সভ্যতার উন্নতি ও অগ্রগতির সাথে সাথে ধর্মীয় বোধ ও অনুভূতি খুইয়ে বসেছে এবং যখন কোন লোকের কোন ইন্দ্রিয় নষ্ট ও নিষ্ক্রিয় হয়ে যায় তখন তার সমগ্র বোধ ও অনুভূতি যা কেবল উক্ত ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত তা বেকার হয়ে যায়, থাকা না থাকা সমান হয়ে যায়। যে ব্যক্তি শ্রবণ শক্তি থেকে বঞ্চিত তার জন্য শব্দের জগত থাকা না থাকা সমান এবং কথা বলার এই বিশাল জগত তার কাছে নীরব কবরস্থান মনে হবে। দৃষ্টিশক্তিহীনের কাছে বর্ণ-বৈচিত্র্যে ভরপুর এই জগত অর্থহীন, রঙের পার্থক্য তার কাছে কোন অর্থই বহন করে না। ঠিক তেমনি যিনি ধর্মীয় বোধরহিত –তার সেসব অনুভূতি, চেতনা, প্রভাব-প্রতিক্রিয়াও নিষ্ফল মনে হবে যা কেবল ধর্মীয় অনুভূতি ও বোধেরই পরিণতি হিসাবে দেখা দেয়। তার কাছে পারলৌকিক জীবন, পরকালীন শাস্তি, পুণ্য, জান্নাত, জাহান্নাম, আল্লাহ্র সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টি, তাকওয়া তথা আল্লাহভীতি ও সংযম, পবিত্রতা, চিরস্থায়ী মুক্তি, ধ্বংস ইত্যাদি সবই অর্থহীন শব্দ বলেই মনে হবে। তার কাছে এমন কোন আহ্বানের মধ্যে আদৌ কোন আকর্ষণ ও দিলের টান থাকবে না যার সম্পর্ক তার অনুভূত বিষয়াদি, নগদ লাভ ও স্ফূর্তি ছাড়া অন্য কোন বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত।

দীনের দাওয়াত প্রদানকারীদেরকে প্রতিটি যুগে ও আম্বিয়ায়ে কিরাম আলায়হিমু'স-সালাত ওয়াস-সালামকে স্ব স্ব দাওয়াতী যুগে যে সব লোকের বেলায় সব চাইতে বেশি কষ্টের সম্মুখীন হতে হয়েছে এবং যে সব লোকের ক্ষেত্রে তাঁদের বিপ্লবাত্মক দাওয়াত, পাহাড় বিচূর্ণকারী ও লৌহ প্রাকারকে মোমের মত

দ্রবীভূতকারী ব্যথা-ভরা ওয়াজ আদৌ কোন ক্রিয়া সৃষ্টি করতে ব্যর্থ হয়েছে, তারা ছিল সেই সব লোক যারা ধর্মীয় বোধ ও অনুভূতি থেকে মাহরূম হয়ে গিয়েছিল এবং যাদের দিলের অঙ্গারধানিকা এমনভাবেই ঠাণ্ডা ও শীতল হয়ে গিয়েছিল যে, কোনভাবেই আর তাতে উত্তাপ সঞ্চারের সম্ভাবনা ছিল না। যারা ধর্ম ও এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছিল, তারা এ সম্পর্কিত কোন কথা শুনবে না, এ নিয়ে ভাববে না, যারা তাদের যুগের দাঈ ও মুবাল্লিগদের পাথরকে মোমের মত গলিয়ে দেবার মত ওয়ায-নসীহত শুনে অত্যন্ত ঠাণ্ডা ও নিরুত্তাপ কণ্ঠে বলেছিল ঃ

اِنْ هِىَ اِلاَّ حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوْتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوْثِيْنَ -

"আমরা তো কেবল পার্থিব জীবনকেই স্বীকার করি। বাঁচা ও মরা ছাড়া আর আছেটাই বা কী? মরার পর আর কেই বা জীবিত হবে" (সূরা মূ'মিনূন, ৩৮) অথবা যাদের দৃষ্টি বস্তুগত সমতল থেকে হাকীকত পর্যন্ত তথা অন্তর্গত সত্য পর্যন্ত পৌঁছুবার যোগ্য নয় এবং যারা পয়গম্বরের সর্বসাধারণের পক্ষে বোধগম্য বক্তৃতা শোনার পর যা তাদেরই ভাষায় করা হয়েছিল, অত্যন্ত সাদামাটা ও সরলভাবে বলেছিল,- مَا نَفْقَهُ كَثِيْرًا مِّمَّا تَقُوْلُ وَاِنَّا لَنَرَاكَ فِيْنَا ضَعِيْفًا - "তোমার অনেক কথাই আমাদের বোধগম্য নয় আর আমরা তো তোমাকে আমাদের মধ্যে দুর্বল ও শক্তিহীন দেখতে পাচ্ছি" (সূরা হূদ, ৯১)।

পাশ্চাত্য সভ্যতার এই উত্থানের যুগে প্রতিটি জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে বিরাট সংখ্যায় এমন একটি শ্রেণী জন্মে যায় যাদের পার্থিব কর্মব্যস্ততা ও মগ্নতা কিংবা দুনিয়ার ভোগের মোহ তাদের জীবনে ধর্মের জন্য এতটুকু জায়গা অবশিষ্ট রাখেনি। অনেক অনুসন্ধান চালাবার পরও যারা ধর্মের দাওয়াত দেন সেই সব দাঈ ও মুবাল্লিগদের জন্য তাদের মন ও মস্তিষ্কে এতটুকু জায়গাও মেলেনি যা দিয়ে ধর্মীয় ও নৈতিক আহ্বান তাদের ভেতর পৌঁছানো যায়। যেমন কোন লোকের যদি গান শোনার মত কান এবং কাব্যের জন্য সূক্ষ্ম রুচিবোধ না থাকে তাহলে তার জন্য গানের সর্ববিধ কলা-কৌশল ও পৃথিবীব্যাপী চিত্ত-চাঞ্চল্য সৃষ্টিকারী কাব্যও বেকার ও নিষ্ফল প্রমাণিত হবে। ঠিক তেমনি যে ধর্মীয় অনুভূতি ও চেতনা হারিয়ে ফেলেছে তার জন্য নবী-রসূলগণের গোটা দাওয়াত এবং শুভাকাঙ্ক্ষীদের যাবতীয় ওয়াজ-নসীহত ও উপদেশ, জ্ঞান ও প্রজ্ঞাপূর্ণ উপমা উৎপ্রেক্ষা ও গল্পকাহিনী সবই নিষ্ফল হবে। এটা মানুষের হৃদয়ভূমির সব চাইতে অনুর্বর অংশ যা কোন বারি বর্ষণই আর সবুজ-শ্যামল করতে পারে না।

یہاں آکے رو دیتا ہے ابر نیساں

"এখানে এসেই বসন্তকালীন বৃষ্টিপাতও কেঁদে ফেলে।" যে সমস্ত লোকের এই শ্রেণীকে সম্বোধন করার, এদের লক্ষ্য করে কিছু বলার এবং এদেরকে ধর্ম ও নৈতিকতার দিকে আহ্বান জানাবার সুযোগ ঘটে তারা কুরআন মজীদের বহু আয়াতের অর্থ বুঝতে পেরে থাকবেন এবং সেই সমস্ত কালামশাস্ত্রীয় সমস্যা ও সংকটের যা কর্মময় জীবন ও দাওয়াতের ময়দান থেকে আলাদা হয়ে বসে خَتَمَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ وَعَلٰى سَمْعِهِمْ وَعَلٰى اَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ "আল্লাহ তাদের হৃদয় ও কানে মোহর করে দিয়েছেন, আর তাদের চোখের ওপর রয়েছে আবরণ" এবং এ জাতীয় সমর্থবোধক আয়াত সম্পর্কে সম্মুখীন হন- সমাধান আপনাআপনিই হয়ে গিয়ে থাকবে এবং এই কুরআনী হাকীকত মূর্তিমান দৃষ্টিগোচর হবে ঃ

وَمَثَلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا كَمَثَلِ الَّذِىْ يَنْعِقُ بِمَا لَايَسْمَعُ اِلاَّ دُعَآءً وَّ نِدَآءً ط صُمٌّ بُكْمٌ عُمْىٌ فَهُمْ لاَ يَعْقِلُوْنَ -

"যারা কুফ্‌রী করে, সত্য প্রত্যাখ্যান করে তাদের উপমা যেমন কোন লোক এমন কিছুকে ডাকে যা হাক-ডাক ছাড়া আর কিছুই শোনে না। বধির, মূক (বোবা), অন্ধ; সুতরাং তারা বুঝবে না" (সূরা বাকারা, ১৭১)।

এই যমানার আসল রোগ হলো দীন-ধর্ম সম্পর্কে অনুভূতিহীনতা, এর প্রতি অনাগ্রহ এবং ধর্মীয় জিজ্ঞাসা সম্পর্কে পরিপূর্ণ সম্পর্কশূন্যতা ও মুখাপেক্ষীহীনতা যার চিকিৎসা সব চাইতে বেশি কঠিন এবং যার বর্তমানে কোন ধর্মীয় দাওয়াতই কার্যকর ও ফলপ্রসূ হতে পারে না। ধর্ম ও নীতি-নৈতিকতার দাওয়াতকে অনাচার ও পাপাচার, অবাধ্যতা ও অলসতার অন্ধকার যুগ এবং অস্বীকার ও বিরোধিতার সর্বাধিক গোলযোগপূর্ণ আমলেও সেই সব জটিলতা ও কাঠিন্য দেখা দেয়নি যা ধর্মের সঙ্গে সম্পর্কহীনতা ও মুখাপেক্ষীহীনতার এই নীরব ও শান্তিপূর্ণ যুগে সামনে এসে দেখা দিচ্ছে। যেখানে আদৌ পিপাসাই নেই, যেখানে পানির চাহিদাই নেই সেখানে পানির সযত্ন ব্যবস্থাপনা ও খিযর-এর পথ-প্রদর্শনের প্রয়োজন কোথায়?

اِنَّكَ لاَ تُسْمِعُ الْمَوْتٰى وَلاَتُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَآءَ اِذَا وَلَّوْمُدْبِرِيْنَ -

"মৃতকে তো তুমি কথা শোনাতে পারবে না, বধিরকেও পারবে না আহ্বান শোনাতে, যখন ওরা পিঠ ফিরিয়ে চলে যায়।" (সূরা নাম্‌ল, ৮০)

পাশ্চাত্যের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন ও মনস্তত্ত্ব বিভাগের একজন অধ্যাপক এই মৌলিক সত্য পরিষ্কার ভাষায় তুলে ধরেছেন এবং এই পার্থক্যের সঠিক কারণ নির্ণয় করেছেন যা প্রাচীন ও আধুনিক মনস্তত্ত্বে পাওয়া যায়। তিনি একটি মাত্র বাক্যে একটি সমগ্র গ্রন্থের বিষয়বস্তু ধারণ করেছেন। তিনি বলেন ঃ

"ধর্মীয় প্রশ্ন ও জিজ্ঞাসা প্রথমে দেখা দিত। সম্ভবত এর সন্তোষজনক জবাব মিলত না। কিন্তু এ যুগের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো এই যে, আজ আর এসব প্রশ্ন আদৌ দেখাই দেয় না।"

আল্লাহ-অনুসন্ধানী মানসিকতার বিশ্বব্যাপী অভাব

ইসলামী সভ্যতা-সংস্কৃতি ও সরকারের বিশ্বব্যাপী প্রভাবের আলোচনায় আমরা বলে এসেছি যে, এর প্রভাবে গোটা বিশ্বে (যা ইসলাম ও মুসলমানদের প্রভাবাধীন ছিল) আল্লাহ-অনুসন্ধানী মানসিকতা ব্যাপকভাবে পাওয়া যেত। হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মানুষ দীন-ধর্মের খোঁজে ও আল্লাহওয়ালা মানুষের তালাশ করতে গিয়ে দুনিয়ার এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত পৌঁছে যেত। দুনিয়াদারী ও বস্তুবাদ সর্বত্র ছড়িয়ে যাবার পর ধর্মীয় প্রবণতা ও আল্লাহ-অনুসন্ধানী মানসিকতার কেন্দ্র ঐ সব মহাপুরুষের সত্তা ও তাঁদের আবাসিক স্থানগুলো ছিল যাঁরা অলসতা ও বস্তুবাদের বিশাল বিস্তৃত সমুদ্রে মনুষ্য জীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ-উপদ্বীপ কায়েম করে রেখেছিলেন যেখানে তাঁরা মানুষকে বস্তুবাদের এই ঘূর্ণাবর্ত থেকে বের করে এনে তাদেরকে ধর্মীয় প্রশিক্ষণ দিতেন এবং তাদের ভেতর প্রলয়-তুফানের মুকাবিলা করার যোগ্যতা, সামর্থ্য ও শক্তি পয়দা করতেন। পরবর্তী শতাব্দীগুলোতে তাঁদেরকে সূফী-দরবেশ ও ওলী-আওলিয়া নামে স্মরণ করা হয়েছে।

ঐসব মহামানব ও মহাপুরুষের দিকে প্রত্যাবর্তন এই শেষ শতাব্দীগুলোতে ধর্মের দিকে ঝোঁক, প্রবণতা ও সাধারণ মুসলমানদের আল্লাহ্-অনুসন্ধানী মানসিকতার একটা সীমা পর্যন্ত মাপকাঠি যার সাহায্যে আমরা জানতে পারি যে, লোকের মধ্যে সেই যুগে বস্তুবাদ ও দুনিয়াদারী থেকে কতটা পরিমাণ পলায়ন এবং ধর্মের ব্যাপারে কতখানি আগ্রহ পাওয়া যেত।

মুসলিম বিশ্বের প্রধান প্রধান ও কেন্দ্রীয় শহরের প্রায় সর্বত্রই এমন সব ব্যক্তি বর্তমান ছিলেন যাঁদের বরকতময় সত্তা ছিল অন্ধকার সমুদ্রে আলোক মিনার (বাতিঘর)। মানুষ পতঙ্গের ন্যায় এই আলোর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ত। পৃথিবীর দূর-দূরান্তের এলাকাসমূহ থেকে আল্লাহপ্রার্থী মানুষ এসে তাঁদের দরবারে সমবেত হতো আর এসব স্থান হতো এক বিরাট আন্তর্জাতিক জনবসতি যেখানে একই সময় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, উত্তর ও দক্ষিণের মুসলমানের সাক্ষাত মিলত এবং ইসলামের বিশাল বিস্তৃত জগত সেখানে জড়ো অবস্থায় দেখতে পাওয়া যেত।

মুসলিম বিশ্বের এক প্রান্তে অবস্থিত আমাদের এই ভারতীয় উপমহাদেশ ধর্মীয় আবেগ-উৎসাহ ও আগ্রহ-উদ্দীপনা এবং আল্লাহসন্ধানী মানুষের এক বিরাট কেন্দ্র। এখানে প্রতিটি যুগে মুসলিম সুলতান ও রাজা-বাদশাহদের সাম্রাজ্যের পাশাপাশি ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক রাজত্বের স্বাধীন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত ছিল যেখানে শত শত নয়, হাজার হাজার মানুষ আপন যুগের সর্বপ্রকার বস্তুগত প্ররোচনা ও আকর্ষণ থেকে মুক্ত থেকে এবং হুকুমত ও সিয়াসত তথা সরকার ও রাজনীতির বিবিধ বিপ্লব উপেক্ষা করে নিজেদের কাজ করতেন।

হযরত নিজামুদ্দীন আওলিয়া (র)-র আধ্যাত্মিক নয়া উপনিবেশ গিয়াছপুর ছিল এর একটি সর্বোত্তম উদাহরণ যিনি ঠিক রাজধানীতে আট জন প্রতাপশালী সুলতানের (গিয়াছুদ্দীন বলবন, ৬৬৪-৬৮৬ খ্রি. থেকে নিয়ে গিয়াছুদ্দীন তুগলক, ৭২০-২৫ খ্রি. পর্যন্ত) শাসনামলে প্রায় পঞ্চাশ বছর পর্যন্ত তাঁর স্বশাসিত ও স্বনিয়ন্ত্রিত হুকুমত কায়েম রেখেছেন [১] এবং যেখানে সিজিস্তান[২] থেকে শুরু করে অযোধ্যা[৩] পর্যন্ত সব জায়গার আল্লাহ-সন্ধানী মানুষ পড়ে থাকত। যদি তরীকতের সমস্ত সিলসিলার বুযুর্গদের কেন্দ্রগুলোর জনসংখ্যা এবং তাঁদের দিকে যেই পরিমাণ লোক গমনাগমন করত তার বিস্তৃত বিবরণ লেখা হয় (যদ্দারা সেই যুগে ধর্মের প্রতি মানুষের আগ্রহ ও ঝোঁক এবং ধর্মের প্রতি মানুষের সম্মান ও শ্রদ্ধাবোধের পরিমাপ করা যায়), তাহলে পুস্তকের পৃষ্ঠায় তা সংকুলান হবে না। এজন্য নমুনাস্বরূপ কেবল একটি সিলসিলার (নকশ্‌বান্দিয়া-মুজাদ্দিদিয়া সিলসিলা) কয়েকজন বুযুর্গের সঙ্গে মুসলমানদের সম্পর্ক এবং তাঁদের দিকে সেই যুগের ধাবমান জনস্রোতের একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র তুলে ধরা হলো যা দিয়ে পরিমাপ করা যাবে, তাঁদের যুগে যে যুগ ছিল বস্তুবাদ ও দুনিয়াদারীর উত্থানের যুগ, আল্লাহ-সন্ধানী মানসিকতার অবস্থা কি ছিল এবং ধর্মের প্রতি আকর্ষণ মানুষকে কোথায় কোথায় চুম্বকের ন্যায় টেনে আনত।

হযরত শায়খ আহমদ সরহিন্দী মুজাদ্দিদ আলফেছানী (মৃ. ১০৩৪ হি.)-র সঙ্গে সম্পর্কিত ভক্ত-অনুরক্তদের তালিকার ওপর যদি দৃষ্টি ক্ষেপণ করা হয় তাহলে আপনি জানতে পারতেন, ভারতবর্ষ ও আফগানিস্তানের কত শত শহর ও পল্লীর কী বিপুল সংখ্যক মানুষ এবং সম্রাট জাহাঙ্গীরের শাসনামলের কত বড়

---

১. হযরত নিজামুদ্দীন আওলিয়া (র) গিয়াছুদ্দীন বলবনের রাজত্বকালে ৬৬৯ হিজরী দিল্লী আগমন করেন। কিছুদিন তিনি বিভিন্ন মহল্লায় অবস্থান করেন। এরপর বস্তি গিয়াছ পুরে (বর্তমানে বস্তি নিজামুদ্দীন) স্থায়ী আবাস গ্রহণ করেন। ৭২৫ হিজরী পর্যন্ত বিভিন্ন সুলতান তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত করতে চেষ্টা করেন। কিন্তু কেউ সফল হন নি। প্রায় ৬০ বছর কাল তিনি ও তাঁর খানকাহর লোকেরা রাজদরবারের ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে চলেন। ২. শায়খ হাসান আলা সিজযী। ৩. শায়খ নাসীরুদ্দীন চেরাগে দিল্লী।

বড় আমীর-অমাত্য তাঁর মুরীদ ও বায়আতভুক্ত ছিলেন এবং কত দূর-দূরান্ত থেকে সরহিন্দে এসে মানুষ তাঁর থেকে উপকৃত হয়েছিল।

তাঁর জলীলুল কদর খলীফা হযরত সাইয়েদ আদম বান্নুরী (মৃ. ১০৫২ হি.)-র খানকায় প্রত্যহ এক হাজার লোক উপস্থিত থাকত এবং দু'বেলা পেট পুরে খানা খেত। তাঁর সওয়ারীর সাথে হাজার হাজার মানুষ ও শত শত আলিম-উলামা থাকত। "তাযকিরায়ে আদমিয়া" নামক গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে, ১০৫২ হিজরীতে তিনি যখন লাহোরে যান তখন নেতৃস্থানীয় সাইয়েদ, ওলী-বুযুর্গ ও বিভিন্ন শ্রেণীর দশ হাজার মানুষ তাঁর সঙ্গী ছিল। প্রার্থীদের ভিড় এত বেশি থাকত যে, সম্রাট শাহজাহান এতে ভড়কে যান। তিনি কিছু টাকা পাঠিয়ে পেছনে বলে পাঠান, তাঁর ওপর হজ্জ ফরয হয়ে গেছে, তিনি যেন হারামায়ন শরীফায়ন গমন করেন। অনন্তর তিনি ভারতবর্ষ থেকে হিজরত করে চলে যান।

মুজাদ্দিদ আলফেছানী (র)-র নামকরা খলীফা ও তাঁর পুত্র হযরত খাজা মুহাম্মদ মা'সূম (মৃ. ১০৭৯ হি.)-এর হাতে নয় লক্ষ মানুষ বায়আত হয় এবং তওবা করে। সাত হাজার মানুষ তাঁর খেলাফত লাভে ধন্য হয়।[১]

তাঁর পুত্র খাজা শায়খ সায়ফুদ্দীন সরহিন্দী (র) [মৃ. ১০৯৬ হি.]-র দিল্লীস্থ খানকায় প্রার্থীদের ভীড়ের পরিমাপ আপনি এথেকে করতে পারবেন যে, "যায়লুর-রাশহাত" নামক গ্রন্থের গ্রন্থকারের বর্ণনা মুতাবিক এক হাজার চার শ' মানুষ দু'বেলা তাঁর দস্তরখানে আপন পসন্দ ও ফরমায়েশ মাফিক খানা খেত।[২]

আমীর-উমারা ও বিত্তবান লোকদের বুযুর্গানে দীনের সঙ্গে (ধর্মের প্রতি ভালবাসা, সম্মান ও শ্রদ্ধাবোধের দরুন) যে সম্পর্ক ছিল তার একটি নমুনা ছিল এই, হযরত খাজা মুহাম্মদ যুবায়র সরহিন্দী (র) [মৃ. ১১৫১ হি.] যখন মসজিদে যাবার উদ্দেশে ঘর থেকে বের হতেন তখন আমীর-উমারা রাস্তায় দোশালা ও রুমাল বিছিয়ে দিতেন যাতে তাঁর পা মাটিতে না পড়ে। কোন রোগীর সেবা-শুশ্রূষা কিংবা অন্য কোন কাজে কোথাও যেতে হলে তাঁর সওয়ারী রাজকীয় কায়দায় বের হতো এবং তাঁর মিছিলে আমীর-উমারা ও বিত্তবান লোকদের পালকি ও সওয়ারী থাকত।[৩]

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর বাণিজ্যিক আমলে বিপ্লবী হুকুমতের কিছু কাল আগ পর্যন্ত এই মানসিকতা ও রুচি পুরোপুরি বিদ্যমান ছিল। মির্যা মাজহার জানে জানাঁর খলীফা হযরত শাহ গোলাম আলী (র) [মৃ. ১২৪০ হি.]-র যুগে দিল্লীর

---

১. নুযহাতুল খাওয়াতির, ৫ম খণ্ড; ২. প্রাগুপ্ত; ৩. দুররুল মাআরিফ, ইরশাদ রহমানিকৃত নু, খা।

মুজাদ্দিদিয়া খানকাহ্ সত্যানুসন্ধানীদের বিরাট বড় কেন্দ্র ছিল। স্যার সৈয়দ আহ্মদ খান তদীয় "আছারুস-সানাদীদ" নামক গ্রন্থে লিখছেন ঃ

"আমি হযরতের খানকায় নিজের চোখে রোম (তুরস্ক), শাম (সিরিয়া, লেবানন, জর্দান ও ফিলিস্তীন যার অন্তর্গত ছিল), বাগদাদ, মিসর, চীন ও আবিসিনিয়ার লোক দেখেছি। তারা দরবারে হাযির হয়ে বায়আত গ্রহণ করত এবং খানকাহ্র খেদমত করাকে চিরস্থায়ী সৌভাগ্য জ্ঞান করত। আর ভারতবর্ষ, পাঞ্জাব ও আফগানিস্তানের মত কাছাকাছি জনপদগুলোর তো কোন কথাই নেই! এসব শহরের লোকেরা পতঙ্গের মত দলে দলে এসে হাযির হতো। হযরতের খানকায় পাঁচ শ' ফকীর-মিসকীনের কম থাকত না এবং এদের অন্নবস্ত্রের দায়-দায়িত্ব তাঁর ওপরই ন্যস্ত ছিল।"[১]

শাহ রউফ আহ্মদ মুজাদ্দিদী তাঁর "দুররুল মা'আরিফ" নামক গ্রন্থে কেবল একদিনের আগত লোকদের স্থান ও শহরগুলোর তালিকা লিখেছেন যারা ২৮শে জুমাদাল-উলা, ১২৩১ হিজরীতে আত্মিক উপকার লাভের আশায় দিল্লীর এই খানকাহ্ উপস্থিত ছিল।

"সমরকন্দ, বুখারা, গযনী, তাশকন্দ, হিসার, কান্দাহার, কাবুল, পেশাওয়ার, কাশ্মীর, মুলতান, লাহোর, সরহিন্দ, আমরোহা, সম্ভল, রামপুর, বেরেলী, লাখনৌ, জায়স, বাহরাইচ, গোরখপুর, আজীমাবাদ, ঢাকা, পুনা, হায়দরাবাদ ইত্যাদি।"[২]

এটা ছিল সেই যুগ যখন রেল ছিল না, ছিল না যাতায়াতের সে সব সুবিধা যা আমরা আজ লাভ করেছি।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর সেই যুগে ব্রিটিশ শাসন জেঁকে বসার কিছুটা আগে হযরত সাইয়েদ আহ্মদ শহীদ ও তাঁর জলীলুল কদর সাথী মাওলানা আবদুল হাই বুরহানভী (মৃ. ১২৪২ হি.), মাওলানা ইসমাঈল শহীদ (শাহাদত ১২৪৬ হি.) এবং তাঁদের একনিষ্ঠ মুবাল্লিগবৃন্দ মুসলমানদেরকে আল্লাহ ও রসূলের দিকে ফিরে আসার আহ্বান জানান, ففروا الى الله "আল্লাহ্র দিকে ধাবিত হও"র আওয়াজ তোলেন এবং অলসতা, গাফিলতি, অবাধ্যতা ও শরীয়তবিরোধী জীবনের বিরুদ্ধে জিহাদ শুরু করেন। মুসলমানেরা যেই আগ্রহ-উদ্দীপনার সঙ্গে এই আহ্বানে সাড়া দেয় এবং যে রকম পতঙ্গের মত এই জামাআতের আমীরের চারপাশে সমবেত হয়, যেই উন্নত মন ও উদার মানসিকতা নিয়ে প্রতিনিধি দলকে অভ্যর্থনা জানিয়েছিল এবং নিজেদের ধর্মপ্রেম ও বিনয়ের প্রমাণ দিয়েছিল, এরপর যেভাবে

১. আছারুস-সানাদীদ, ৪র্থ অধ্যায়; ২. দুররুল মা'আরিফ, ১০৬ পৃ.।

ভারতীয় উপমহাদেশের ইসলামের সকল বাগ-বাগিচার সর্বোত্তম ফুলের নির্যাস তাঁর সমীপে এসে পৌঁছে গিয়েছিল যা ১২৪৬ হিজরীর ঘটনায় বালাকোটের মাটিতে মিশে গিয়েছিল—এ থেকে বেশ ভালভাবেই পরিমাপ করা যায় যে, সেই অধঃপতনের যুগেও মুসলমানদের মধ্যে দীনের প্রতি, ধর্মের প্রতি কতটা আগ্রহ, দিলের টান ও আল্লাহকে পাবার জন্য কতখানি পাগলপারা নেশা, কী পরিমাণ মন-মানসিকতা এবং কতটা ভাল যোগ্যতা ও সামর্থ্য ছিল।

ধর্মের প্রতি মুসলমানদের আগ্রহের পরিমাপ আপনি সেই তাবলীগী সফরের রোয়েদাদ থেকে করতে পারবেন যা সাইয়েদ সাহেব বড় বড় জামাআতসহ দোআবার কসবা ও শহরগুলোতে এবং এর পরে অযোধ্যায় করেছিলেন।[১]

মুসলমানদের আগ্রহ-উদ্দীপনার আরও কিছুটা পরিমাপ আপনি সাইয়েদ সাহেবের হজ্জ সফর থেকে করতে পারবেন যা তিনি ১২৩৬ হিজরীতে করেছিলেন। এই গোটা সফরে ভারতবর্ষের সেই পূর্বাঞ্চল যা বর্তমানে তিন প্রদেশ (যুক্তপ্রদেশ, বিহার ও বাঙলা) নিয়ে গঠিত এবং এই কাফেলার চলার পথ আর এই কাফেলা এ পথ দিয়েই অতিক্রম করত, অব্যাহত নড়াচড়া ও গতির মাঝে ছিল। সর্বত্রই দীনের জন্য পাগলপারা মুসলমানরা পতঙ্গের ন্যায় ঝাঁপিয়ে পড়ত। বিগত জীবনের পাপ ও গাফলতি থেকে তারা তওবা করত এবং আল্লাহ্র কাছে নতুন করে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হতো। গ্রাম-গঞ্জের লোকেরা শত শত সংখ্যায় দলে দলে আসত এবং বায়আত ও তওবা করত। আগ্রহী লোকেরা কাফেলার লোকদেরকে দাওয়াত করে নিজ এলাকা ও বাড়িঘরে নিয়ে যেত। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কিন্তু বুলন্দ হিম্মতের অধিকারী মুসলমানেরা গোটা কাফেলাকে (যার সংখ্যা কলকাতা পৌঁছুতে পৌঁছুতে সাড়ে সাত শ'তে গিয়ে পৌঁছেছিল) এবং সেই সব শত শত মুসলমানকে যারা আশেপাশের এলাকা থেকে আসত, দিল খুলে কয়েক দিনের মেহমানদারী করত। নেতৃস্থানীয় মুসলমানেরা শাহী মনোবল নিয়ে দীনের কাজে নিজেদের সহায়-সম্পদ ব্যয় করত। এলাহাবাদের নেতৃস্থানীয় জনাব শায়খ গোলাম আলী বার থেকে পনেরো দিনে মোটামুটি হিসাব অনুযায়ী বিশ হাজার টাকা খরচ করেন। তাঁর দস্তরখানে দু'বেলা শত শত মানুষ পেট পুরে খানা খেত। কোন কোন লোকের ধারণা, প্রতি দিন এক হাজার টাকা খানাপিনায় খরচ হত।[২]

---

১. সীরাতে সাইয়েদ আহমদ শহীদ, তৃতীয় সংস্করণ।
২. মাখযানে আহমদী (ফারসী), মওলভী মুহাম্মদ আলীকৃত (ম. ১২৬৬ হি.)।

মানুষ সাইয়েদ আহমদ শহীদ (র)-এর দিকে যেভাবে ঝুঁকেছিল এবং সত্যানুসন্ধানী মানুষের ভীড় এভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল যে, সমগ্র শহরগুলোতে খুব কম লোকই এমন ছিল যারা তওবা ও বায়'আত করেনি এবং এই কাফেলার বরকত থেকে মাহরূম হয়ে থাকবে। এলাহাবাদ, মির্যাপুর, বানারস, গাযীপুর, আজীমাবাদ, পাটনা ও কলকাতায় মোটামুটি কয়েক লক্ষ মুসলমান বায়আত হয়, অতীতের গোনাহ্ থেকে তওবা করে। ধর্মের সাধারণ গুরুত্ব ও এর প্রতি আগ্রহের পরিমাপ এর থেকেও করা যাবে যে, বানারসে হাসপাতালের রোগীরা এই পয়গাম পাঠায়, আমরা অসহায় ও অক্ষম। আপনার খেদমতে যাওয়া আমাদের পক্ষে কষ্টকর। আল্লাহ্র ওয়াস্তে আপনি যদি আমাদের কাছে আসতেন তাহ্লে আমরা বায়আত হতে পারতাম। তাদের আবেদনে সাড়া দিয়ে একদিন তিনি কয়েকজন সাথীসহ সেখানে যান এবং ঐসব রোগীকে বায়'আত ও তওবা করান।[১]

কলকাতায় তিনি দু'মাস অবস্থান করেন। দৈনিক এক হাজারের মত মানুষ তাঁর হাতে বায়আত হতো। প্রতিদিনই বায়আত গ্রহণকারীদের ভিড় বেড়ে চলে। বায়আত গ্রহণের জন্য আগত লোকের সংখ্যা এত বেশি ছিল যে, সকাল থেকে রাত দু'টো আড়াইটে পর্যন্ত নারী-পুরুষের ভিড় থাকত। সাইয়েদ আহমদ শহীদ (র) একমাত্র সালাত আদায় ছাড়া খানাপিনা ও মানবীয় প্রয়াজন পূরণের ফুরসত পেতেন না। এক একজন করে পৃথকভাবে বায়আত গ্রহণ করা সম্ভব ছিল না। একটি বিরাট প্রশস্ত হল ঘরে সকলে জমায়েত হতো। তিনি আসতেন। সাত-আটটা পাগড়ী তিনি মানুষের হাতে ধরিয়ে দিতেন। লোকে এগুলো ধরত। এরপর তিনি বায়আতের শব্দগুলো আযানের ন্যায় উচ্চ কণ্ঠে বলতেন। উপস্থিত লোকেরা সেগুলো সাথে সাথে উচ্চারণ করত। দিনে সতেরো-আঠারো বার একইভাবে বায়আত গ্রহণ অনুষ্ঠিত হতো। আর এভাবেই দৈনিক হাজার হাজার মানুষ বায়আতভুক্ত হতো।[২]

ফজর সালাতের পর সাইয়েদ আহমদ শহীদ ১৫-২৯ দিন পর্যন্ত ওয়াজ করেন। দু'দু' হাজার আমীর-উমারা, আলিম-উলামা ও সূফী-দরবেশ প্রতিদিনই তাঁর খেদমতে আসতেন। দরিদ্র শ্রেণীর মানুষের তো কোন সীমা-সংখ্যাই ছিল না! মাওলানা আবদুল হাই সাহেব জুমুআ ও মঙ্গলবার দিন জোহরের সালাতের পর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ওয়াজ করতেন এবং মানুষ পতঙ্গের মত সমবেত হত। দৈনিক ১০-১৫ জন হিন্দু ইসলাম গ্রহণ করত।[৩]

---

২. মাখযানে আহমদী (ফারসী), মওলভী মুহাম্মদ আলীকৃত (ম. ১২৬৬ হি.)।

২. ওয়াকায়ে আহমদী, (পাণ্ডুলিপি)। ৩. প্রাগুক্ত।

সংস্কার-সংশোধন ও দীনদারী, তওবা ও আল্লাহ্র দিকে রুজু'র এই সাধারণ পরিবেশের শুভ ক্রিয়া হলো। একেবারে হঠাৎ করেই মদ তৈরির কারখানাগুলো বন্ধ হয়ে গেল। শুঁড়িখানার মালিকরা বৃটিশ গভর্নমেন্টের কাছে অভিযোগ পেশ করল, আমরা অকারণে সরকারী ট্যাক্স দিয়ে যাচ্ছি। বেচা-বিক্রি না থাকায় আমাদের দোকানগুলো বন্ধ হয়ে গেছে। যেদিন থেকে একজন বুযুর্গ তাঁর কাফেলা নিয়ে এই শহরে এসেছেন, শহর ও গ্রামের সব মুসলমান তাঁর মুরীদ হয়েছে এবং প্রতিদিনই হচ্ছে। এরপর থেকে তারা যাবতীয় মাদক দ্রব্য থেকে তওবা করেছে। এখন আর কেউ আমাদের দোকানের দিকে ফিরেও চায় না।[১]

দীন ও দীনদার লোকদের প্রতি মানুষের ভালবাসার অবস্থা ছিল এরূপ, যখন হাজীদের এই কাফেলা যাদের সংখ্যা ছিল সাত শ', মক্কা মুআজ্জমা থেকে ফেরার পর মুর্শিদাবাদের নিকটবর্তী দেওয়ান গোলাম মুর্তযার বাড়িতে গিয়ে উঠল তখন দেওয়ান সাহেব প্রকাশ্য বাজারে ঘোষণা করে দিলেন, সাইয়েদ সাহেবের কাফেলার কোন লোক বাজার থেকে কোন কিছু কিনলে অথবা কাউকে দিয়ে কোন কাজ করালে তার মূল্য কিংবা মজুরি আমি পরিশোধ করব। সাইয়েদ আহমদ শহীদ তাঁকে বোঝাতে চেষ্টা করলেন, আপনি এতটা দায়বদ্ধ কেন হচ্ছেন? তিনি জওয়াব দিলেন, কোন মুসলমানের ঘরে যখন হাজী সাহেবের আগমন ঘটে তখন তার বড়ই সৌভাগ্য লাভ ঘটে। আপনাদের পদার্পণ আমার জন্য যেই সৌভাগ্য বয়ে এনেছে এর জন্য আমি যতই গর্ব করি না কেন, তা নেহাৎ অকিঞ্চিৎকরই হবে। আমার পরম সৌভাগ্য, এত বিপুল সংখ্যক হাজীর শুভাগমন আমাকে ধন্য করেছে।[২]

এরপর যখন সাইয়েদ আহমদ শহীদ (র) মুসলমানদেরকে জিহাদের দাওয়াত জানালেন তখন মুসলমানরা অত্যন্ত স্যোৎসাহে তা কবুল করে। কৃষক তার লাঙ্গল ছেড়ে, দোকানদার দোকান বন্ধ রেখে, কর্মচারী ও চাকুরীজীবী তার মনিব ও বস্কে সালাম জানিয়ে, নেতৃস্থানীয় লোকেরা তাদের মহল্লা থেকে বেরিয়ে, উলামায়ে কিরাম ও মাশায়েখ-ই-ইজাম স্ব স্ব মাদরাসা-মকতব ও খানকাহ্ ছেড়ে তাঁর সঙ্গী হয়েছেন এবং একবারের জন্যেও ঘরের দিকে ফিরে তাকান নি, এমন কি প্রাণোৎসর্গকারী জানবায মুজাহিদদের শেষ জামাতটি বালাকোটের সংকীর্ণ ও কংকরময় ঘাঁটিতে সেই সব পাথর ও কাঁকরের মাঝে, যার ভেতর দিয়ে পথ চলা পথিকের জন্য মোটেই সহজ নয়, নিজেদের চেয়ে দশ গুণ শত্রুর মুকাবিলায় জীবন বিলিয়ে দিলেন এবং মৃত্যুর মুহূর্তেও ঘরবাড়ির কথা স্মরণে আনেন নি।

---

১. ওয়াকায়ে, আহমদী; ২. মনজুরাতু'স-সুআদা, সাইয়েদ জাফর আলী নকভীকৃত।

এই সব বিস্তারিত বিবরণ এজন্য লিখিত হলো যেন এর পরিমাপ করা যায় মুসলমানদের কর্তৃত্বের শেষ যুগে এবং তাদের অধঃপতনের যৌবনকালেও, কিন্তু পাশ্চাত্য উত্থান ও বিজয় যুগের প্রথম দিকে মুসলমানদের মধ্যে ধর্মের প্রতি আগ্রহ ও সম্মানবোধ, ধর্মীয় চেতনা ও অনুভূতি কতটা প্রবল ছিল এবং তাদের মনোবল কতটা উন্নত ছিল।

ইংরেজ রাজত্বের প্রথম দিকেও যখন পাশ্চাত্য সভ্যতা-সংস্কৃতি ও শিক্ষা. তাদের নীতি-নৈতিকতা, চরিত্র ও রাজনীতির প্রভাব ভারতবর্ষের সাধারণ জনজীবনে তেমন প্রভাব ফেলেনি, প্রথম যুগের আছর বর্তমান ছিল, যদিও তা ছিল মরণ দশায় এবং হযরত মাওলানা ফযলে রহমান গঞ্জে মুরাদাবাদী (র) [১২১৩-১৩০৮ হি.]-র মত বুযুর্গ যিনি এই উভয় যুগই স্বচক্ষে দেখেছিলেন, নিজের যুগের ধর্মীয় দুর্দশাদৃষ্টে আফসোস করতেন এবং বড় ব্যথাভরা কণ্ঠে বলতেন ঃ

جو بیچتے تھے دوائے دل وہ دکان اپنی بڑھا گئے

"একদা যারা দিলের দাওয়াই বিক্রি করত তারা আজ দোকান-পসারী সাজাতে ব্যস্ত।"

যদিও হেমন্তের হিমেল বাতাস বইতে শুরু করেছিল তবুও শীত মৌসুম তখনও জেঁকে বসেনি। আল্লাহ-সন্ধানী মন-মানসিকতা তখনো বিদ্যমান ছিল। আল্লাহওয়ালা লোকদের সঙ্গে সম্পর্ক, আত্মিক পরিশুদ্ধি, জীবনের সংস্কার-সংশোধন ও প্রশিক্ষণকে জীবনের একটি প্রয়োজনীয় ও অপরিহার্য শাখা মনে করা হতো। আলিম-উলামা ও দীনদার লোকদের কথা বাদ দিলে সাধারণ কারবারী মুসলমান ও দুনিয়াদার আমীর-উমারাও এই ধারণা থেকে শূন্য ও এই আগ্রহ থেকে মাহরূম ছিলেন না। বড় বড় কেন্দ্রীয় শহর বাদ দিলে ঐ ছোট ছোট গ্রাম ও কসবাও আল্লাহওয়ালা বুযুর্গ দ্বারা পরিপূর্ণ ছিল। আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বানকারী ও আল্লাহ্‌র নাম শিক্ষা দানকারী মুসলমানদের জনবসতি, শহর, নগর-বন্দর, গ্রামগঞ্জ ও পল্লীগুলোতে এমন অব্যাহতভাবে পাওয়া যেত যে, এমন একটা যুগ পাওয়া যাবে না যখন তাঁরা ছিলেন না। আজ থেকে তিরিশ-চল্লিশ বছর পূর্বের ভারতবর্ষের দিকে তাকান কিংবা কোন বর্ষীয়ান মুরুব্বী থেকে শুনুন, দেশের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত এক সারি আলোকমালা চোখে পড়বে।

ক্রমে ক্রমে এসব ভোরের শুকতারা এক এক করে নিভতে শুরু করে। এক প্রদীপ থেকে আরেক প্রদীপ জ্বলবার চিরাচরিত ধারা থেমে যায়। এই টিমটিমে

প্রদীপটুকুও অবশেষে নিভে যায়। মৌসুম ক্রমান্বয়ে তার পরিপূর্ণ প্রভাব জাঁকিয়ে বসে। হেমন্তকালে গাছপালা হেলাতে এবং শুকনো পাতা ঝরাতে কে দেখেছে? কিন্তু মৌসুম ও আবহাওয়ার প্রভাব-প্রতিক্রিয়ায় পাতা ও ফুল শুকিয়ে শুকিয়ে আপনাআপনিই ঝরে যায়। ইংরেজ শাসকদের পক্ষ থেকে কখনো এ ঘোষণা আসে নি, খানকাহ্গুলো বন্ধ করে দিন এবং সংস্কার-সংশোধন ও পথ প্রদর্শনের কাজ গুটিয়ে ফেলুন। এর বিপরীতে সে যুগে ভ্রমণের রাস্তা খুলে যায়। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির ফলে দূরদরাজ এলাকায় ভ্রমণ পূর্বের তুলনায় খুবই সহজ হয়ে যায়। কিন্তু হলে কী হবে? মানুষের মন থেকে সেই আগ্রহ-উদ্দীপনাই হারিয়ে যায়, যে আগ্রহ-উদ্দীপনা একদিন সুদূর বুখারা ও সমরকন্দ থেকে ইলম পিয়াসীদের পায়ে হাঁটিয়ে এখানে টেনে আনত। তারা এই বৃক্ষের ওপর কখনো কুড়াল মারে নি, কখনো এই বৃক্ষে আগুন লাগায় নি, কিন্তু গাছের গোড়ায় পানি না ঢালায় ও অনুকূল আবহাওয়া ও উপযুক্ত পরিবেশ না পাওয়ায় তার ডালপালাগুলো নিজের থেকেই শুকিয়ে যেতে থাকে এবং ফলে-ফুলে সুশোভিত হওয়া অনেক দিন থেকেই বন্ধ হয়ে যায়।

জীবনে আল্লাহ্কে পাবার কোন ঘর এবং ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর কোন কোণ থাকল না। হৃদয় ও আত্মার জায়গাও পেট ও পাকস্থলী দখল করে নিল। জীবনের সমস্ত উন্নত, পবিত্র ও সূক্ষ্ম হাকীকত চোখের সামনে থেকে অদৃশ্য হয়ে যায়। এখন দীর্ঘকাল থেকেই অদৃশ্য লোক থেকে এই আওয়াজ ভেসে আসছে ঃ

نہ ڈھونڈھ اہل دل کواب کہ جوش قلزم فنا

متاع درد جن میں تھی وہ کشتی ڈبوچکا ۔

"এখন আর তুমি হৃদয়বান মানুষ সন্ধান করো না; কেননা লোহিত সাগরের উত্তাল ঊর্মি থেমে গেছে।

ব্যথার পুঁজি যাদের ভেতর ছিল সেই নৌকাগুলো ডুবে গেছে।"

দুনিয়া কামনার রোগ

বর্তমান যুগ আল্লাহ্কে চাইবার পরিবর্তে দুনিয়া চাইবার যুগ এবং তার চাইতেও অধিক জোরেশোরেই এসেছে এই যুগ। পাশ্চাত্য সভ্যতা ও ক্ষমতায়নের এই যুগে দুনিয়া কামনা ও উদর পূজার যেই তুফান এসেছে তার জন্য রোগ-ব্যাধি ও প্রলাপের চাইতে কমতম কোন শব্দসমষ্টি যথেষ্ট নয়। বিত্ত-সম্পদের এ এক অতৃপ্ত ক্ষুধা ও না মেটবার মত পিপাসা যাকে রাক্ষুসে

ক্ষুধা-তৃষ্ণা বলাই সঙ্গত। চতুর্দিকে কেবল আরও চাই, আরও চাই ধ্বনি। জীবনের কামনা-বাসনা এতটা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং জীবন মান এত উন্নত হয়ে গেছে যে, লোভী পথিকের দু'দণ্ড কোথাও দাঁড়াবার কিংবা বিশ্রাম নেবার ফুরসৎ নেই। লোভী ও অতৃপ্ত এই পাখী কেবলই উর্ধ্বাকাশে ডানা মেলতে চায়, কোথাও একদণ্ড জিড়োবার মত স্থান বা সময় নেই। সম্পদের যত পাহাড়ই সে গড়ুক, সম্মান ও পদমর্যাদার যত শীর্ষেই সে আরোহণ করুক, কোথাও সে তৃপ্ত নয়।

পাশ্চাত্য সভ্যতা ও ক্ষমতার এই যুগে মূলত না প্রকৃত জ্ঞানের প্রতিই মানুষের আগ্রহ আছে, আর না আছে ধর্মের প্রতিই কোন আকর্ষণ অথবা অন্য কোন কিছুর প্রতি কোনরূপ সূক্ষ্ম চাহিদা। একমাত্র পেট যার দৈর্ঘ্য এক বিঘতের বেশী নয়, জীবনের সকল ব্যাপ্তি ও প্রশস্ততাকে ঘিরে রেখেছে। কল্পনার জগতে পুস্তক রচনাকারী সুখ স্বপ্নের অধিকারী লেখক যা খুশী লিখুক, ব্যস্ত জীবনে এই মুহূর্তে কেবল একটিই সক্রিয় শক্তি এবং একটিই জীবন্ত সত্যের সাক্ষাত পাওয়া যায় আর তা হল পেট কিংবা পকেট।

মি. জোডের কথা কেবল য়ূরোপ সম্পর্কেই সঠিক নয়, বরং পাশ্চাত্যের মানস সন্তান গোটা বিশ্ব সম্পর্কেও যথার্থ ও সঠিক।

"যেই জীবন-দৃষ্টি এই যুগের ওপর চেপে বসে আছে, বিজয়ী হিসেবে জেঁকে আছে তা অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি ও আদর্শ এবং প্রতিটি সমস্যা ও প্রতিটি বিষয়কে পেট কিংবা পকেটের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা ও যাচাই-বাছাই করা।"

কোন যুগ ও যমানার রুচি, স্বাদ ও সাধারণ প্রবণতা ও জীবনের সত্যিকার সমস্যার সঠিক পরিমাপ সে সব গ্রন্থ থেকে করা যায় না যে সব গ্রন্থ সেই যুগে লেখা হয় (যদিও সাধারণ রুচি-প্রকৃতি ও প্রবণতার প্রভাব থেকে কোন গ্রন্থই একেবারে মুক্ত হয় না এবং কয়েকটি পর্দার আড়াল থেকেও এর আভা দৃষ্টিগোচর হয়), কিন্তু কোন কোন সময় এসব গ্রন্থের লেখকরাও তাদের একক রুচি কিংবা জাতির কোন ক্ষুদ্র দলের প্রবণতার প্রতিনিধিত্ব করে থাকেন এবং কোন কোন সময় ঘটনাবলীর পরিবর্তে আপন কামনা-বাসনাকেই ঘটনা হিসেবে পেশ করে থাকেন। যুগের রুচি ও প্রবণতার সঠিক পরিমাপ দৈনন্দিন জীবন, খোলামেলা ও অসংকোচ আলাপ-আলোচনা, বৈঠকী আলাপের বিষয়বস্তু এবং লোকের সাথে মেলামেশা ও দেখা-সাক্ষাতের হয়ে থাকে। কবি আকবর ইলাহাবাদীর ভাষায়ঃ

نقشوں کو تم نہ جانچو لوگوں سے مل کے دیکھو

کیا چیز جی رہی ہے کیا چیز مر رہی ہے

"ছবি যাচাই করো না, লোকের সাথে মিলিত হয়ে দেখ, কোন জিনিস জীবিত হচ্ছে আর কি মারা যাচ্ছে।"

এই মূলনীতিকে সামনে রেখে রেলপথের দীর্ঘ সফরে, সকাল-সন্ধ্যার পায়চারীর মুহূর্তে, খানা কিংবা চায়ের টেবিলে, সবুজ পার্ক ও ভ্রমণ কেন্দ্রগুলোর ইতস্তত পদচারণা ও আড্ডার সময় এবং বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে খোলামেলা ও অন্তরঙ্গ আলোচনার মওকায় কান লাগিয়ে শুনুন, কি নিয়ে ও কোন বিষয়ে আলোচনা হচ্ছে, আলোচনার বিষয়বস্তু কী? শুনতে পাবেন, কথা হচ্ছে বেতন বাড়ল কিংবা কমলো, অফিসারদের সন্তুষ্টি কিংবা অসন্তুষ্টি, প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের বদলি, তাদের মেযাজ-মর্জি নিয়ে আলোচনা-সমালোচনা, ব্যবসা-বাণিজ্যের লাভালাভ, ব্যাংকের লেনদেন, সুদের হার, কোম্পানীর শেয়ার, শেয়ার বাজার, বীমা কোম্পানীর পলিসি, পেনশন ও প্রভিডেন্ট ফান্ড, চাকুরী থেকে অব্যাহতি কিংবা অবসর গ্রহণের পরবর্তী অবস্থা, চাকুরীর সম্ভাবনা, জেতার নানা ঘটনা, সৌভাগ্যবানদের নিয়ে ঈর্ষা, ভাগ্যহতদের ব্যাপারে আফসোস এবং এ জাতীয় বিষয় নিয়ে কথা ছাড়া আপনি হাজার চেষ্টা করলেও এর বাইরে অন্য কোন বিষয়ে আলোচনা করতে দেখতে পাবেন না।

অথবা আপনি দেখবেন রাজনীতি নিয়ে আলোচনা-সমালোচনা ও পর্যালোচনা হচ্ছে, কিন্তু কোন নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে নয়। কোন ভ্রান্ত সমাজ ব্যবস্থার ওপর নীতিগত সমালোচনা এবং কোন সুস্থ সমাজ ব্যবস্থা সম্পর্কে আকাঙ্ক্ষা ও আশাবাদ এতে আপনি পাবেন না। পাশ্চাত্যের লোকেরা এ ব্যাপারে অগ্রণী এবং ভারতের হিন্দুরা প্রতিটি পদক্ষেপে তাদের হুবহু অনুসারী। দুঃখের ব্যাপার হলো, মুসলমানরাও এখন তাদের পদাংক অনুসরণ করছে।

নৈতিক অধঃপতন

য়ূরোপিয়ানরা এদেশে যখন প্রথমে বণিক, অতঃপর বিজয়ীর বেশে প্রবেশ করল তার বেশ কিছুকাল আগে থেকেই এখানে অধঃপতন শুরু হয়ে গেছে। প্রাচ্যের ও ইসলামী সভ্যতার বৈশিষ্ট্যগুলো হয় তো পতনের দিকে দ্রুতগতিতে অগ্রসরমান অথবা এর মধ্যে বাড়াবাড়ি ও বিকৃতি শুরু হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু এরপরও এমন কতকগুলো নৈতিক বৈশিষ্ট্য এতে পাওয়া যেত এবং এতে এমন উন্নতি হয়েছিল যার কল্পনা করাও এ যুগে দুরূহ। প্রাচ্যের লোকেরা কতক চরিত্র ও বৈশিষ্ট্যকে উন্নত করতে করতে এমন এক পর্যায়ে নিয়ে গেছে যে, তা একটি স্বতন্ত্র শাস্ত্রের রূপ পরিগ্রহ করেছে এবং এর মধ্যে এমন সূক্ষ্মতা ও পেলবতা দান করেছিল পাশ্চাত্যে যা কেবল কাব্য, সাহিত্য ও শিল্পকলারই অংশ।

মুসলিম প্রাচ্যে সমাজের সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক এতটা দৃঢ়, মযবুত, স্থায়ী ও গভীর ছিল আজকে তা কল্পনা করাও কঠিন। পিতামাতার প্রতি সন্তানের শ্রদ্ধা ও ভালবাসা, সন্তানের ও ছোটদের প্রতি পিতামাতা ও গুরুজনদের বাৎসল্য ও স্নেহ, বড়দের প্রতি ছোটদের ভক্তি-শ্রদ্ধা, নারীদের সতীত্ব, সম্ভ্রমবোধ, স্বামীর আনুগত্য ও তার প্রতি বিশ্বস্ততা, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আমানতদারী ও নেমক হালালী, যুবকদের চারিত্রিক সততা ও দৃঢ়তা, অভিজাত ও শরীফ লোকদের আচার-আচরণ, ব্যবহার, আত্মীয়তা সম্পর্ক রক্ষা, দেখা-সাক্ষাত, সময়ানুবর্তিতা, নিয়মিত আমলসমূহ আদায়, পোশাক-পরিচ্ছদ ও সামাজিক ক্ষেত্রে পরিপূর্ণ সাম্য ও বৈশিষ্ট্য রক্ষা, বন্ধু-বান্ধবদের জন্য ত্যাগ, কুরবানী ও সংবেদনশীলতা ইত্যাদি। এর এক একটি শিরোনামের আওতায় এত ব্যাপক ও বিস্তৃত ঘটনা বর্ণিত আছে যা কালের বিবর্তনে আজ সহজে বিশ্বাস করা কঠিন। কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও এর এত প্রচুর কারণ রয়েছে যে, বিশ্বাস না করে উপায় থাকে না।

পিতার প্রতি সন্তানের আনুগত্যবোধ মুসলিম প্রাচ্যে এই কিছুকাল আগে পর্যন্ত (এবং কোথাও কোথাও এখন পর্যন্ত) রসূলুল্লাহ (সা)-র নির্দেশ পালনার্থে বিদ্যমান ছিল, যে নির্দেশ তিনি জনৈক ব্যক্তিকে দিয়েছিলেন আর তা ছিল এই ঃ انت ومالك لابيك 'তুমি ও তোমার সম্পদের মালিক তোমার পিতা'। পিতামাতার প্রতি সন্তানের ভক্তি-শ্রদ্ধা এবং তাদের প্রাপ্য হক আদায়ের এই প্রেরণা পিতামাতা জীবিত থাকা পর্যন্তই সীমিত ছিল না, বরং তাদের মৃত্যুর পরও তা অব্যাহত থাকত। পিতামাতার বন্ধু-বান্ধব ও পরিচিত একান্ত জনদের প্রতি আচার-ব্যবহার, সাহায্য-সহযোগিতা, উপহার-উপঢৌকন ও হাদিয়া-তোহফা প্রদানের মাধ্যমে ভক্তি-শ্রদ্ধা ও ঘনিষ্ঠতা প্রকাশ করা সৌভাগ্যবান সন্তানের নৈতিক দায়িত্ব ও কর্তব্যের অন্তর্গত ছিল। বস্তুতপক্ষে এটাও ছিল নববী তা'লীমেরই ফলশ্রুতি। এই তা'লীমে বলা হয়েছিল ঃ

من ابرء البر حلة الرجل اهل ابيه بعدان يوفى -

"সর্বোত্তম নেকীর আমলসমূহের অন্যতম হল পিতার ইনতিকালের পর তাঁর বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার ও উত্তম আচরণ করা" (আল-হাদীস)

অপর দিকে সন্তান-সন্ততির প্রতি পিতামাতার আচরণও ছিল বিশুদ্ধ কল্যাণ কামনার ওপর নির্ভরশীল এবং তাদের এই আচরণ ছিল মুসলিম প্রাচ্যের ত্যাগ ও আত্মোৎসর্গের প্রকৃষ্টতম নমুনা। সন্তানের কল্যাণ কামনায় তারা নিজেদের জীবনের যাবতীয় স্বাদ-আহ্লাদ, আনন্দ, সুখ-শান্তি ও চাওয়া-পাওয়া বিসর্জন

দিতেন এবং তাদের সুশিক্ষা ও বিশুদ্ধ প্রশিক্ষণ দেওয়া তাদের মৌলিক কর্তব্য জ্ঞান করতেন। তাদের সুশিক্ষা, নৈতিক সতর্কতা ও উস্তাদ কর্তৃক প্রয়োজনীয় শাস্তি প্রদানের সময় পিতামাতা তাদের দিলকে পাথর বানিয়ে নিতেন। এমত ক্ষেত্রগুলোতে সন্তানের পক্ষ গ্রহণ ও উস্তাদের গৃহীত পদক্ষেপের প্রতি অসন্তোষ প্রকাশকে আভিজাত্য ও ভদ্রতার পরিপন্থী মনে করা হতো যার জন্য কোন শরীফ পিতাই প্রস্তুত হতেন না, এমন কি এক্ষেত্রে অনেক সময় অশিক্ষিত পিতামাতা পর্যন্ত উস্তাদের বাড়াবাড়িকে সমর্থন করতেন এবং সন্তানকেই বরং উল্টো ধমক দিতেন এবং ভবিষ্যতের জন্য সতর্ক করতেন। সাধারণত সকল পিতামাতার মুখেই একথা ফিরত, "উস্তাদের হক পিতামাতার চাইতে বেশী।"

মুসলিম সমাজে বড়-ছোটর সম্পর্ক এই হাদীসের আলোকে নির্ণীত হতোঃ من لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا فليس منا "যে ছোটদের স্নেহ করে না এবং বড়দের শ্রদ্ধা করে না সে আমাদের কেউ নয়।"

প্রাচ্যের নৈতিকতা ও সভ্যতার মূল সম্পদ হলো এর স্থিরচিত্ততা, দৃঢ়তা ও জীবন-যিন্দেগীর একই রকম হওয়া। বিগত যুগে এই পতনোন্মুখ সমাজেও এ সম্পর্কিত অত্যাশ্চর্য সব দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। যে লোক একবার যে কাজ শুরু করত বছরের পর বছর সেই কাজ করত। যে পেশা একবার নির্ধারণ করে নিত তা মৌসুমী পরিবর্তন, স্বাস্থ্যগত উত্থান-পতন সত্ত্বেও এতে এতটুকু ফাঁক-ফোকর, মামুলী সুযোগ ও অলসতাবশত পার্থক্য সৃষ্টি হতে দিত না। যার সঙ্গে যেমনতরো ব্যবসায়িক লেনদেন শুরু করা হতো শেষ পর্যন্ত তা রক্ষা করা হতো, তা এতে যা-ই কিছু ঘটুক না কেন এবং অবস্থার যতই পরিবর্তন সাধিত হোক না কেন।

সে যুগে খান্দানী ও গোত্রীয় জীবনে ব্যক্তির সম্মান-শ্রদ্ধা ও প্রভাব-প্রতিপত্তির মাপকাঠি ও সম্পর্কের যোগসূত্রের শর্ত কেবল ধন-সম্পদ ও প্রাচুর্যই ছিল না। একই খান্দান ও একই পরিবারে বিভিন্ন সদস্য অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নানা স্তরের হয়ে থাকে। কেউ হয় ধনী, কেউ হয় নিঃস্ব গরীব। কিন্তু পারিবারিক সমাবেশ ও মিলন মেলাগুলোতে কারোর এ ক্ষমতা বা দুঃসাহস হতো না যে, আর্থিক পার্থক্যের কারণে একই খান্দান ও পরিবারের লোকদের মাঝে আচার-ব্যবহারে পার্থক্য করবে। কদাচিৎ এ ধরনের ভুল হয়ে গেলে এর বিরুদ্ধে সমগ্র খান্দান ও গোটা পরিবার প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠত। কখনো তা সম্পর্ক ছেদের পর্যায় পর্যন্ত গিয়ে গড়াত। একজন গরীব অভিজাত পরিবারের সন্তান অন্য সচ্ছল ভাইয়ের সঙ্গে চোখে চোখ রেখে স্বচ্ছন্দে কথা বলত এবং সচ্ছল ভাইও গরীব ভাইয়ের

সঙ্গে তার পারিবারিক আভিজাত্য ও আত্মীয়তার দরুন সমান আচরণ করত। এ ব্যাপারেও সযত্ন প্রয়াস চালানো হতো যাতে করে দারিদ্র্য ও অসচ্ছলতার কথা নিকটতম ও ঘনিষ্ঠতম আত্মীয়-স্বজন ছাড়া বাইরের লোকেরা জানতে না পারে, অন্যের সামনে যেন তা প্রকাশ না পায়।

ইসলামী পরিবেশের শেষ যুগ পর্যন্ত অভিজাত, ভদ্র ও নীতিবান লোকদের বিবেক তার সম্মান-সম্ভ্রম, তথা ইজ্জত-আব্রু ও ধর্মীয় বিশ্বাসের মতই এমন এক সম্পদ মনে করা হতো যা বিক্রয়যোগ্য নয়, এমন কি এর বিনিময়ে যত মূল্যই প্রদান করা হোক না কেন। ১৮৫৭ সালের মহাবিপ্লবের আগে পিছে মুসলিম অভিজাতদের অনেক দৃষ্টান্ত মিলবে যেখানে তারা নিজদের মৃত্যুকে কবুল করে নিয়েছে, কিন্তু বিবেককে খুন করা পসন্দ করে নি। তারা এজন্য গুলী খেয়েছে কিংবা ফাঁসি কাষ্ঠে জীবন দিয়েছে, তবুও মিথ্যা বলতে রাজী হয় নি। তার সামনে প্রস্তাব পেশ করা হয়েছে, মিথ্যা বলে সে নিজেকে অভিযোগ থেকে মুক্ত করতে পারে এবং সে এই বিপ্লবে যোগ দেয়নি কিংবা কোনভাবেই সে এর সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিল না, এই বলে সাফাই পেশ করে সে মৃত্যুদণ্ডের হাত থেকে অব্যাহতি পেতে পারে। কিন্তু না, তা তারা করে নি। কেননা তা ছিল প্রকৃত সত্যের পরিপন্থী এবং তার বিবেকের বিরোধী।

মিল্লাত ও জাতির স্বার্থেও সে এভাবে নিজেকে সাচ্চা ও সত্যবাদী প্রমাণ করত যেভাবে প্রমাণ করত ব্যক্তি ও পারিবারিক স্বার্থের ক্ষেত্রে। জাতীয় ও সাম্প্রদায়িক স্বার্থপূজার যে নগ্ন হাওয়া আজ পাশ্চাত্যের জাতিগুলোর মধ্যে প্রবাহিত হচ্ছে তখন পর্যন্ত তা এদেশে দেখা দেয় নি। তারা জাতির স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলোতেও মিথ্যা বলা ও মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়াকে তেমনি পাপ ও অপরাধ মনে করত যেমন মনে করত নিজের ব্যক্তিগত ব্যাপারে। শরীয়তের হুকুম-আহকামকে তারা ব্যক্তিগত ও জাতীয় সকল বিষয়ে ও সমস্ত ব্যাপারে সমভাবে প্রযোজ্য ভাবত। তাদের সামনে ছিল কুরআন মজীদের নিম্নোক্ত হেদায়েতসমূহ ঃ

يَآ اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلٰٓى اَنْفُسِكُمْ اَوِالْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ۔

"হে মু'মিনগণ! তোমরা ন্যায় ও ইনসাফের পতাকাবাহী ও আল্লাহ্‌র পক্ষে সাক্ষ্য প্রদানকারী হিসেবে দাঁড়িয়ে যাও যদিও তা তোমাদের নিজেদের কিংবা পিতামাতা ও আত্মীয়-পরিজনের বিরুদ্ধেও হয়।" (সূরা নিসা ঃ ১৩৫)

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَنْ لَّا تَعْدِلُوْا ط اِعْدِلُوْا قف هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى - وَاتَّقُوا اللّٰهَ ط

"কোন জাতিগোষ্ঠীর প্রতি শত্রুতা ও বিদ্বেষ যেন তোমাদেরকে অন্যায় বিচারে প্ররোচিত না করে। ন্যায় বিচার করবে; এটাই তাকওয়ার নিকটবর্তী। আল্লাহকে ভয় করবে।" (সূরা মায়েদা ঃ ৮)

وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ ط

"যখন তোমরা বিবদমান গোষ্ঠীর মধ্যে সালিশ নিযুক্ত হও তখন ন্যায়বিচার করবে।" (সূরা নিসা ঃ ৫৮)

وَاِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوْا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبٰى ج

"যখন তোমরা কথা বল তখন ইনসাফের ভিত্তিতে বল, যদি তা তোমাদের আত্মীয়-স্বজনের বিরুদ্ধেও যায়।" (সূরা আনআম ঃ ১৫৩)

ইংরেজ শাসনামলের প্রথম দিকের ঘটনা। মুজাফফর নগর জেলার কান্দেহ্লা নামক কসবার এক স্থানে একটি জায়গা নিয়ে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা দেয়, জায়গাটি হিন্দুদের মন্দিরের, নাকি মুসলমানদের মসজিদের। ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট উভয় পক্ষের বক্তব্য শোনার পর মুসলমানদের কিছু লোককে একান্তে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা! হিন্দুদের মধ্যে কি এমন কোন লোক আছে যার সত্যবাদিতার ওপর আপনারা আস্থা রাখতে পারেন এবং যার সাক্ষ্যের ওপর ফয়সালা দেওয়া যায়? তারা জানাল, তাদের নজরে এমন কোন লোক নেই। এরপর তিনি হিন্দুদের ডেকে জিজ্ঞেস করলে তারা বলল, বড় মুশকিলের ব্যাপার! কেননা ব্যাপারটা সাম্প্রদায়িক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট। তারপরও মুসলমানদের মধ্যে একজন বুযুর্গ আছেন যিনি কখনো মিথ্যা বলেন না। আমাদের বিশ্বাস, এ সময়ও তিনি সত্যই বলবেন।

এই বুযুর্গ ছিলেন হযরত শাহ আবদুল আযীয দেহলভীর শাগরিদ এবং স্যাইয়েদ আহমদ শহীদ (র)-এর খলীফা মুফতী ইলাহী বখ্শ সাহেবের খান্দানের। ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট বুযুর্গের খেদমতে চাপরাশী পাঠিয়ে তাঁকে আদালতে ডেকে পাঠালেন। বুযুর্গ বললেন, আমি কসম খেয়েছি কখনো ইংরেজের মুখ দেখব না। ম্যাজিস্ট্রেট এরপর বলে পাঠালেন, আমার মুখ দেখার দরকার নেই। তবুও আপনি মেহেরবানী করে আসুন। ব্যাপারটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আপনি না আসলে ফয়সালা হচ্ছে না।

অবশেষে বুযুর্গ এলেন এবং ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেটের দিকে পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে গেলেন। গোটা বিষয়টি বুযুর্গের সামনে পেশ করা হলো এবং এ বিষয়ে তিনি যা জানেন তা বলতে বলা হলো। হিন্দু মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের লোকের দৃষ্টি বুযুর্গের প্রতি নিবদ্ধ এবং সকলের কান তাঁর জওয়াব শোনার জন্য উদ্‌গ্রীব যেই জওয়াবের ওপর এই গুরুত্বপূর্ণ সাম্প্রদায়িক সংঘাতপূর্ণ বিষয়টির ফয়সালা নির্ভর করছে। এমন সময় বুযুর্গ বললেন, আসল কথা হলো, জায়গাটা হিন্দুদের। মুসলমানদের এই জায়গার সঙ্গে আদৌ কোন সম্বন্ধ নেই। ব্যস! আদালতের ফয়সালা হয়ে গেল। জায়গা হিন্দুরা পেল আর মুসলমানরা মোকদ্দমায় গেল হেরে। কিন্তু মুসলমানরা হারলেও ইসলামের নৈতিক বিজয় হলো। সত্যবাদিতা ও ইসলামী আখলাক প্রকাশ কয়েক হাত মাটি হারিয়ে বহু অমুসলিমের বিবেক-বিবেচনা ও মন-মস্তিষ্ক জিতে নেয়। অনেক হিন্দু সেদিনই বুযুর্গের হাতে ইসলাম গ্রহণ করে মুসলমান হয়ে যায়।

বিবেক-বুদ্ধি ছাড়াও জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও মেধাশক্তিকে এমন এক পবিত্র ও মূল্যবান সম্পদ মনে করা হতো যা ইতর-ভদ্র-নির্বিশেষে যে কোন মানুষের কাছে বিক্রি করা হতো না। যারা এ ব্যাপারে সমুন্নত মর্যাদার অধিকারী ছিলেন তারা কোনক্রমেই তা বিক্রয় করা পসন্দ করতেন না এবং একে আল্লাহ্‌তাআলার মূল্যবান অনুগ্রহ ও আমানত মনে করতেন। বিশেষত তা কুফর ও পাপকর্মে প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে সাহায্য-সহযোগিতায় ও শক্তি বৃদ্ধিতে একে কাজে লাগানো কিংবা কোনরূপ ভ্রান্ত মতাদর্শের ধারক-বাহক সাজাকে বড় রকমের খেয়ানত ও ঈমান বিক্রয় মনে করতেন।

এই একই মানসিকতা ও চরিত্রের বুযুর্গ ছিলেন মাওলানা আবদুর রহীম রামপুরী (মৃ, ১২৩৪ হি.)। রোহিলা খণ্ডের ইংরেজ শাসক মি. হকিন্স তাঁকে বেরেলী কলেজে (প্রভাষক হিসেবে) অধ্যাপনার জন্য প্রস্তাব দেন এবং মাসে ২৫০ টাকা বেতন দেওয়া হবে বলে জানান (আজ থেকে প্রায় দেড় শত বছর পূর্বের ২৫০ টাকার বর্তমান মান যে কয়েক হাজার টাকা হবে তা সহজেই অনুমান করা যায়) এবং অল্পদিনেই উল্লিখিত বেতন বৃদ্ধি করা হবে বলে তাঁকে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। তিনি এই বলে তাঁর ওযর পেশ করেন, রামপুর রাজ্য সরকার থেকে তাঁকে প্রতি মাসে যে দশ টাকা মাসোহারা দেওয়া হয় তা বন্ধ হয়ে যাবে। মি. হকিন্স তাঁকে বলে পাঠান, আপনি রাজ্য সরকার থেকে যা পান আমি তো তার চেয়ে পঁচিশ গুণ বেশি বেতন দিতে চাচ্ছি। অতএব, এই বিরাট অংকের বেতনের মুকাবিলায় রাজ্য সরকারের মাসোহারা তো নিতান্তই তুচ্ছ! এরপর মাওলানা আবদুর রহীম পরবর্তী ওযর পেশ করলেন, আমার বাড়িতে একটি কুল

গাছ আছে। এর ফল খুব মিষ্টি যা আমি খুব পসন্দ করি। বেরেলী গেলে আমি কুল খেতে পারব না। বোঝা যায়, ইংরেজ শাসক তখনও মাওলানার মনের কথাটি ধরতে পারেন নি। তিনি বললেন, রামপুর থেকে কুল আনাবার ব্যবস্থা করা হবে। আপনি বেরেলীতে বসেই আপনার বাড়ির ফল খেতে পারবেন। এবার মাওলানা বললেন, আমার আরেকটি অসুবিধা আছে। আমার যেসব ছাত্র রামপুরে আমার কাছে পড়ে তারা মাহরূম হবে এবং আমিও তাদের খেদমত থেকে মাহরূম হব। ইংরেজ শাসক এরপরও হার মানতে রাজী নন। তিনি বললেন, আপনার ছাত্রদের জন্য বৃত্তির ব্যবস্থা করা হবে। ফলে তারা বেরেলীতে আপনার কাছে থেকেই পড়াশোনা চালিয়ে যেতে পারবে। এবার মুসলমান আলেম এমন তীর নিক্ষেপ করলেন যার জওয়াব ইংরেজ শাসক মি. হকিন্সের কাছে ছিল না। মাওলানা বললেন, ঠিক আছে। কিন্তু আমি যদি লেখাপড়া শেখাবার বিনিময়ে বেতন গ্রহণ করি তবে কাল কেয়ামতে যখন আমাকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে তখন আল্লাহ্‌র দরবারে কী জওয়াব দেব? ভারতবর্ষ বিজেতা ইংরেজ শাসককে অবশেষে হার মানতে হলো। অপর দিকে মাওলানা আবদুর রহীম রামপুরী রামপুর রাজ্যের শাসক নওয়াব আহমদ আলী খান প্রদত্ত দশ টাকা মাসোহারার ওপর তাঁর অবশিষ্ট জীবন কাটিয়ে দেন। আল্লাহ্ পাক মরহুমের ওপর রহমত বর্ষণ করুন।[১] (নুযহাতুল খাওয়াতির)

এই নৈতিক শক্তি ও কীর্তির মুকাবিলা এ যুগের বিদ্যাবুদ্ধি বিক্রির সঙ্গে করুন। এ যুগের বুদ্ধিজীবীরা তাদের বিদ্যা-বুদ্ধি, মেধা ও যোগ্যতাকে নিলামে চড়িয়েছে। যে সর্বোচ্চ দাম দিতে স্বীকৃত হবে তার হাতে বিক্রি করবে। যদি কোন ইসলামী কিংবা মুসলিম প্রতিষ্ঠান এক শ' টাকা দেয়, পক্ষান্তরে কোন খ্রিস্টান প্রতিষ্ঠান এর মুকাবিলায় ১০৫ টাকা দিতে রাযী থাকে, তখুনি সে তার ওখানে চলে যাবে। আবার কোন য়াহূদী রাষ্ট্র বা প্রতিষ্ঠান যদি আরও পাঁচ টাকা বাড়িয়ে দেয় অমনি সে তার হাতেই নিজেকে বিক্রি করে দেবে। সে এটা দেখবে না প্রস্তাবিত প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তার মন-মানসিকতা, রুচি-প্রকৃতি ও বিষয়ের মিল আছে কিনা। অবস্থা যদি অনুমতি দেয় তবে দেখা যাবে, শিক্ষা বিভাগের একজন কর্মকর্তা কেবল নামকাওয়াস্তে প্রমোশন কিংবা বর্ধিত বেতনের নিশ্চয়তা পেয়ে পুলিশ বিভাগে অথবা নৌচলাচল বিভাগে হৃষ্ট চিত্তে বদলি হয়ে যাবে। একজন পণ্ডিত ব্যক্তি যিনি কোন জ্ঞানগর্ভ বিষয়ের ওপর ডক্টরেট ডিগ্রী অর্জন করেছেন, তাত্ত্বিক ও জ্ঞানগত বিষয়ে যিনি গবেষণামূলক নিবন্ধ লিখে থাকেন, একদিন হঠাৎ করেই শুনতে পারেন, তিনি সামান্য উচ্চ বেতনের লোভে এমন এক সামরিক কিংবা প্রশাসনিক চাকরীতে যোগ দিয়েছেন যার সঙ্গে তার মানসিক ও জ্ঞানগত আদৌ কোন সম্পর্ক নেই।

আজ কোন নিবন্ধকার এতে আদৌ কোন কষ্ট অনুভব করে না যে, সে যেই কলম দিয়ে কীর্তিমান মহাপুরুষের জীবন-চরিত লিখছে, আগামীকাল সেই একই কলম দিয়ে একজন জাতীয় বেঈমান ও গাদ্দারের প্রশংসা গাঁথা লিখছে।

জনৈক গ্রন্থ প্রেমিক উচ্চ মূল্যে যখন কোন দুর্লভ পুস্তক ক্রয় করতেন তখন আনন্দের আতিশয্যে নিম্নোক্ত কবিতাটি পাঠ করতেন। কিছুটা সংশোধন করে আজও তা পাঠ করা যায় ঃ

جمادے چند دادم جاں خریدم

بسے نازاں کوبس ارزاں خریدم

"কয়েকটি কড়ির মূল্যে আমি জীবন খরিদ করলাম; নগণ্য জিনিসের বিনিময়ে আমি মূল্যবান জিনিস খরিদ করলাম।"

এখানে "জীবন"-এর পরিবর্তে যদি "ঈমান" পাঠ করা হয় তাহলে বাস্তবতার নিরিখে তা ভুল হবে না। পারস্পরিক সম্পর্ক ও অধিকারের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল এও যে, সে সবের বুনিয়াদ সাধারণ অবস্থায় অধিকাংশই অবস্তুবাদী এবং নির্ভেজাল বুদ্ধিবৃত্তিক ও আধ্যাত্মিক কিংবা আত্মিক হতো এবং সে সবের মধ্যে নিজের স্বার্থ ও কামনা-বাসনার নাম-গন্ধ খুব কমই থাকত। এর ফলে কোন কোন সময় এমন সম্পর্কেরও সন্ধান মিলত এবং এর শেকড় দিল ও দিমাগের এত গভীরে প্রোথিত হতো যার কোন বস্তুগত ও বাণিজ্যিক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ সম্ভব নয়। উস্তাদ-শাগরিদের সম্পর্ক এমন ছিল যার সামনে এ যুগের পিতা-পুত্রের ও প্রেমিক-প্রেমিকার সম্পর্কও গৌণ ও নিষ্প্রভ। বর্তমান যুগের মানুষ এটা জেনে বিস্ময়ে হতবাক হবে যে, ভারতীয় উপমহাদেশের বিখ্যাত আলেম ও খ্যাতনামা উস্তাদ দরসে নিজামীর প্রতিষ্ঠাতা মোল্লা নিজামুদ্দীন লাখনবী (মৃ. ১১৬১ হি.)-র ইনতিকালের খবর শুনে শোকাহত হয়ে তদীয় শাগরিদ সাইয়েদ কামালুদ্দীন আযীমাবাদী ইনতিকাল করেন এবং অপর শাগরিদ সাইয়েদ যরীফ আযীমাবাদী কাঁদতে কাঁদতে চোখ নষ্ট করে ফেলেন। অবশ্য পরে জানা যায়, ইনতিকালের খবর সঠিক ছিল না।[১]

য়ূরোপে ভোগ-বিলাস তথা আনন্দ-ফুর্তি ও ফায়দা হাসিলের দু'টো নৈতিক দর্শন ও চিন্তাধারা ফলে-ফুলে বিকশিত হতে থাকে। প্রাচ্যীয় ও ইসলামী নৈতিকতার ওপর দু'টোরই প্রভাব পড়েছে। প্রাচ্যের ইসলামের নৈতিক দর্শন এই উভয় দর্শন ও চিন্তাধারার চেয়ে অনেক উন্নত। উদ্দেশ্য, অভিসন্ধি ও স্বার্থপরতা, সুবিধাবাদী মানসিকতা ও ধ্যান-ধারণা থেকেও তা মুক্ত।

১. নুযহাতুল খাওয়াতির, ৬ষ্ঠ খণ্ড

খ্রি. ১৭শ শতাব্দী থেকে লাভালাভের ধারণা প্রবল হতে থাকে। পাশ্চাত্যের নীতিশাস্ত্রবিদগণ বুক ফুলিয়ে বলতে শুরু করলেন, নৈতিকতার মধ্য থেকে যে বস্তুর উপকারিতা বা লাভ প্রকাশ পাবে না তা বিবেচনাযোগ্য নয়। তার প্রতি ভ্রূক্ষেপ করার প্রয়োজন নেই। কিন্তু এই লাভ বা উপকারিতার সংজ্ঞা নির্ধারণের জন্য যেই মানসিকতা তুলাদণ্ডের ভূমিকা পালন করত, দুঃখের বিষয়, তা আগাগোড়া বস্তুবাদী ধারণায় রূপ লাভ করে চলেছিল। এর কাঠামো ও অনুর্বর ভূমি দিনকে দিন এমন হতে চলেছিল যে, কোন অবস্তুবাদী ও অপার্থিব লাভের ধারণা করতেও তা অক্ষম ছিল এবং এ ব্যাপারে তাদের অনুভূতি ও মেধা ছিল সীমিত ও নির্ধারিত। ফল হলো, এই নৈতিকতার সীমা নির্ধারণ ও লাভের রূপ বা প্রকৃতি নির্বাচন থেকে কৃত এই নাযুক কাজই বিচারক ও সালিশের কাছে সোপর্দ করা হলো তিনি তার প্রকৃতিগত পতিত মেযাজের কারণে কোন অবস্তুবাদী ও অপার্থিব লাভকে মেনে নেবার যোগ্যই ছিলেন না। এভাবেই লাভের সীমা নির্ধারণ স্বাভাবিক ও অবচেতনভাবেই বস্তুবাদী হয়ে যায় এবং কার্যত নৈতিক দর্শন বা নীতিশাস্ত্রের এমন কোন বস্তুর সঙ্গে আদৌ কোন সম্বন্ধই রইল না যার কোন বস্তুগত ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য লাভ নেই। ক্রমান্বয়ে এই বস্তুবাদী মানসিকতা ও লাভের ধারণা গোটা জীবনকেই ছেয়ে ফেলে।

বিগত শতাব্দীগুলোতে য়ূরোপের সাহিত্যে যেসব শব্দ সর্বাধিক ব্যবহৃত হয়েছে এবং যেসব শব্দ য়ূরোপের জন্য সর্বাধিক আকর্ষণীয় সেসব শব্দের অন্যতম "ফিতরত তথা প্রকৃতি"। কিন্তু যেসব জিনিস বা বস্তুর মুকাবিলায় এবং যেসব মওকায় এই শব্দটি বলা হতো তা থেকে পরিষ্কার বোঝা যায়, "প্রকৃতি" বলতে একান্তই পশু প্রকৃতি বোঝানো হয়েছে যা সর্বপ্রকার সূক্ষ্ম অনুভূতি, নৈতিক বিবেক, প্রশান্ত হৃদয় ও বুদ্ধি এই উভয়টি থেকে মুক্ত, যা সব ধরনের বাধ্যবাধ্যকতা ও সীমারেখাকে ভয় পায় যার দাবি হলো কেবল 'খাও, দাও, ফুর্তি কর, বাধা-বন্ধনহীন মুক্ত জীবন যাপন কর'। এজন্য কোন প্রকার হক বা অধিকার, দাবি ও মানবীয় দায়িত্ব বা কর্তব্য নেই। উনবিংশ শতাব্দীতে মানুষের উৎস বা উৎপত্তি সম্পর্কে যে গবেষণা করা হয় এবং যে মতবাদ সাধারণভাবে সকলেই মেনে নিয়েছ (অর্থাৎ জীববিজ্ঞানী ডারউইনের Theory of Evolution বা বিবর্তনবাদতত্ত্ব পরবর্তীকালে যা অসার বা ভুল প্রমাণিত হয়েছে।–অনুবাদক) তা জীবনের সকল শাখাকে প্রভাবিত করে, নৈতিকতার ওপরও এর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও ইন্দ্রিয়াতীত প্রভাব পড়ে।

অতঃপর ঐ যুগে য়ূরোপে যান্ত্রিক যুগ শুরু হয়। মানুষের ধ্যান-ধারণা নির্ভেজাল জড়বাদী হয়ে যায়। ফলে যেই ছিটেফোঁটা নমনীয়তা ও জীবন-যিন্দেগী পশুসুলভ ধ্যান-ধারণাতেও অবশিষ্ট ছিল এ যুগে তাও বিদায় নেয়।

প্রখ্যাত য়ূরোপীয় নও মুসলিম মুহাম্মদ আসাদ য়ূরোপের এই নৈতিক ও চারিত্রিক পরিবর্তনের ওপর গভীর ও বিবেচনাপ্রসূত পর্যালোচনা পেশ করেছেন। যদি প্রাচ্যের ওপর পাশ্চাত্যের এই মানসিক ও রাজনৈতিক আধিপত্য এভাবেই বজায় থাকে এবং খোদ য়ূরোপের বুকেই যদি বড় রকমের কোন বিপ্লব না সাধিত হয় তাহলে আজ পাশ্চাত্য সম্পর্কে যা বলা হচ্ছে আগামী কাল প্রাচ্য সম্পর্কেও তাই বাস্তব হয়ে দেখা দেবে এবং এর লক্ষণও এখন থেকেই দেখা যাচ্ছে। জীবনের প্রতিটি শাখা ও বিভাগের ন্যায় প্রাচ্যের নৈতিকতাও আধুনিক পাশ্চাত্য ছাঁচে রূপ নিতে যাচ্ছে। যে মহলটি পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতা-সংস্কৃতি দ্বারা পুরোপুরি প্রভাবিত, তাদের নৈতিকতা পাশ্চাত্য নৈতিক দর্শন ও চিন্তা-চেতনার সর্বোত্তম নমুনা। মুহাম্মদ আসাদ লিখছেন ঃ

"(য়ূরোপে) মানুষের এমন একটি দল সৃষ্টি হয়ে গেছে যাদের নীতিবোধ ও নৈতিকতা নিছক উপযোগবাদের প্রশ্নে সীমাবদ্ধ, যাদের কাছে ভাল-মন্দের সর্বোচ্চ মাপকাঠি হচ্ছে একমাত্র বস্তুবাদী সাফল্য।

"পশ্চিমের সামাজিক জীবনে বর্তমানে যেই নিগূঢ় পরিবর্তন ঘটছে তাতে দিনের পর দিন উপযোগবাদী নীতিবোধ সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কারিগরী যোগ্যতা, দেশাত্মবোধ, জাতীয়বাদী দলীয় বোধের মত বস্তুবাদী সমাজ কল্যাণের সাথে প্রত্যক্ষ সংশ্লিষ্ট সকল দিককে দেয়া হচ্ছে উচ্চ মর্যাদা এবং কখনো কখনো তার মূল্য অহেতুক অতিরঞ্জিত করে দেখানো হচ্ছে; সন্তান বাৎসল্য বা দাম্পত্য জীবনের বিশ্বস্ততার মত যেসব গুণকে সাম্প্রতিককাল পর্যন্ত নিছক নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার করা হতো সে সবের গুরুত্ব দ্রুত লোপ পেয়ে যাচ্ছে। কারণ সমাজের ওপর সেসবের নির্দিষ্ট বস্তুবাদী কল্যাণ দেখা যাচ্ছে না। শ্রেণী বা গোষ্ঠীর কল্যাণের জন্য বলিষ্ঠ পারিবারিক বন্ধনের চূড়ান্ত প্রয়োজন অনুভূত হতো যে যুগে, আধুনিক পাশ্চাত্যে তার স্থান অধিকার করেছে ব্যাপকতরো শিরোনামযুক্ত এক নতুন সমাজ সংহতির যুগ। যে সমাজ অপরিহার্যরূপে শিল্প বিজ্ঞান প্রভাবিত এবং যা দ্রুত ক্রমবর্ধমান গতিতে স্রেফ যান্ত্রিক ধারায় গড়ে উঠছে, সেখানে পিতার প্রতি পুত্রের আচরণের কোন বিশেষ সামাজিক গুরুত্ব থাকতে পারে না, যতক্ষণ ব্যক্তি বিশেষ তার আচরণে পারস্পরিক সংযোগ সম্পর্কে সমাজের নির্ধারিত সাধারণ শালীনতার সীমার মধ্যে থেকে কাজ করে। ফলে পাশ্চাত্যের পিতা প্রতিদিন পুত্রের ওপর তার কর্তৃত্ব ক্রমাগত হারিয়ে ফেলছে এবং সম্পূর্ণ ন্যায়সংগতভাবে পুত্র পিতার প্রতি শ্রদ্ধা হারাচ্ছে। যে যান্ত্রিক সমাজের অন্তর্নিহিত প্রবণতা রয়েছে ব্যক্তি বিশেষের ওপর অপরের প্রাপ্ত সুযোগ-সুবিধা লোপ করার, তার বিধান তাদের পারস্পরিক সম্পর্কের ওপর ধীরে ধীরে প্রাধান্য বিস্তার করছে এবং

প্রকৃতপক্ষে তাকে অচল করে দিচ্ছে। কারণ উপরিউক্ত ধারণার ন্যায়সঙ্গত বিকাশের খাতিরে পারিবারিক সম্পর্কের সুযোগ-সুবিধাও লোপ পেতে বাধ্য।”[১]

হীনমন্যতা

মুসলিম প্রাচ্যে মানুষের উন্নতি-অগ্রগতি ও চরমোৎকর্ষের মান ছিল খুবই উন্নত। এজন্য দীন ও দুনিয়া এবং ইলম ও আমলের সমন্বয়ে বহুবিধ মানবীয় গুণ দ্বারা ভূষিত এবং মানবীয় উৎকর্ষ এমন বহু বিক্ষিপ্ত শাখা-প্রশাখার সম্মিলন অনিবার্য ছিল যার মধ্যে এ যুগের হীনমন্যতা ও সংকীর্ণ দৃষ্টি পরস্পরবিরোধী মনে করে থাকে এবং কোন মানুষের মধ্যে একই সময় এসব গুণের যে সমাবেশ ঘটতে পারে তা কল্পনা করতেও অধিকাংশ অক্ষম। সমগ্র মুসলিম বিশ্বে কেবল ভারতীয় উপমহাদেশের মুসলিম রাজা-বাদশাহ, তাদের উযীর-নাযীর ও আমীর-উমারার জীবন-চরিতের ওপরই দৃষ্টিক্ষেপণ করুন। আপনি দেখবেন বুলন্দ হিম্মতি, উন্নত মনোবল, চরমোৎকর্ষ ও নিত্য-নতুন বৈশিষ্ট্য, রাজকীয় পোশাকের নিচে দরবেশী আলখাল্লা, রাজনৈতিক অভিযান মগ্নতার সঙ্গেই ইবাদত-বন্দেগীতেও মশগুল ও তৎপর, সেই সাথে লেখাপড়া ও জ্ঞান চর্চার এমন সব দুর্লভ নমুনা মিলবে যার নজীর সাধারণ মানব ইতিহাসে মেলা ভার এবং যার সত্যতা এ যুগের সংকীর্ণ মানসিকতা ও মানবীয় উন্নতি ও চরমোৎকর্ষ সম্পর্কে সীমিত ধারণা বিশ্বাস করতে বারবার পীড়া অনুভব করবে।

সুলতান শামসুদ্দীন আলতামাশের সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি ও এর রাষ্ট্রীয় প্রশাসন ও রাজনীতি বিষয়ক ব্যস্ততার অবস্থা ভারতীয় ইতিহাসের ছাত্র মাত্রেরই জানা। কিন্তু এই সাথে এটাও লক্ষ্য রাখতে হবে, তাঁর ইন্তিজামী ব্যস্ততা, রাজকীয় প্রয়োজন, এর চাহিদা ও দাবি এবং যুদ্ধ-বিগ্রহ ও ভ্রমণের আধিক্য তাঁর ধর্মীয় বাধ্যবাধকতা ও নিয়মিত আমলসমূহ পালনের ক্ষেত্রে এতটুকু ব্যত্যয় সৃষ্টি করতে পারে নি। হযরত কুতবুদ্দীন বখতিয়ার কাকী(র) ইনতিকালের সময় ওসিয়ত করে গিয়েছিলেন, আমার জানাযা তিনি পড়াবেন যাঁর আসরের সুন্নত ও তকবীরে উলা কখনো ফওত হয়নি। অতঃপর এই ওসিয়ত ঘোষিত হলে সুলতান স্বয়ং সম্মুখে অগ্রসর হন এবং তাঁর জানাযা পড়ান।

---

1. Islam at the Crossroads, the tragedy of Europe, (অনুবাদ 'সংঘাতের মুখে ইসলাম' নামক পুস্তক থেকে গৃহীত, পৃ. ৩১, ইফাবা প্রকাশিত, তৃতীয় মুদ্রণ। অনুবাদঃ আবদুল মান্নান সৈয়দ।

সুলতান গিয়াসুদ্দীন বলবন, নাসিরুদ্দীন মাহমূদ, ফীরোয শাহ তুগলক প্রমুখের ধর্মীয় জীবন ও মযহাবী আনুগত্যের অবস্থা সম্পর্কে সকলেই অবগত। গুজরাটের সুলতানগণ, বিশেষভাবে দীন ও দুনিয়ার সমন্বয়কারী এবং এক একজন বাহ্যত প্রভাবশালী শাসক হলেও স্বভাবগতভাবে যুগের "জুনায়দ বাগদাদী" তুল্য দরবেশ ছিলেন। মাহমুদ শাহ ১ম ও তদীয় পুত্র সুলতান মুজাফফর শাহ হালীম-এর জীবন কাহিনী এর সর্বোত্তম সাক্ষ্য। ভারতীয় ঐতিহাসিক মাওলানা হাকীম সাইয়েদ আবদুল হাই(র) মুজাফফর শাহ হালীম-এর জীবন কাহিনী লিখতে গিয়ে তদীয় "ইয়াদে আয়্যাম" নামক গ্রন্থে বলেন ঃ

"মাহমুদ শাহ্র পর তদীয় উপযুক্ত সন্তান মুজাফফর শাহ হালীম পিতৃ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। জ্ঞান ও বিদ্যাবত্তার ক্ষেত্রে তিনি আল্লামা মুহাম্মদ ইব্ন মুহাম্মদ এলায়েজীর শাগরিদ ছিলেন এবং হাদীস পড়েছিলেন আল্লামা জামালুদ্দীন মুহাম্মদ ইব্ন ওমর বাহরুকের কাছে। তিনি এমন বয়সে কুরআন মজীদ হেফজ করার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন যেই বয়স সম্পর্কে শেখ সাদী বলেন ঃ

درایام جوانی چناں که افتد دانی

"এই ইলমী যোগ্যতার সাথে তাকওয়া ও আযীমতরূপ সম্পদও তিনি আল্লাহ্র পক্ষ থেকে লাভ করেছিলেন। গোটা জীবনটাই কুরআন ও হাদীসের ওপর আমল করেছেন। সব সময় ওযূ অবস্থায় থাকতেন। জামাআতের সাথে সালাত আদায় করতেন। সমগ্র জীবনে একদিনের জন্যেও সিয়াম পরিত্যাগ করেন নি। কখনো মদ স্পর্শ করেন নি, কখনো কারোর প্রতি অহেতুক কঠোরতা প্রদর্শন করেন নি। অশ্রাব্য ভাষা ব্যবহার করে কখনো নিজের মুখ কলুষিত করেন নি। বিস্ময়ের ব্যাপার হলো, পবিত্রতার এই প্রতিমূর্তির মধ্যে সৈনিকসুলভ গুণাবলী ও রাজ্য পরিচালনার কুশলতার সর্বোত্তম মাত্রায় সমন্বয় ঘটেছিল। মালব বিজয়ের কাহিনী ইতিহাসে পাঠ করুন। এ থেকেই তাঁর চরিত্রের মহত্ত্ব পরিমাপ করুন। যে সময় মালবের সুলতান মাহমুদ শাহ্র অলসতা ও ভুল ব্যবস্থাপনার দরুন তদীয় মন্ত্রী মন্দলে রায় রাজ্যভার নিজের হাতে তুলে নেন এবং মাহমুদ শাহকে উৎখাত করে রাজ্য থেকে ইসলামের যাবতীয় নিদর্শন নিশ্চিহ্ন করে পৌত্তলিক প্রথার প্রচলন ঘটাতে সচেষ্ট হন, তখন মুজাফফর শাহ হালীমের ইসলামী মর্যাদাবোধ মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। তিনি এক বিশাল বাহিনী নিয়ে মালব অভিমুখে যাত্রা করেন এবং মাণ্ডো পৌঁছে তা অবরোধ করেন। মন্দলে রায় সে একা এই বাহিনীর মুকাবিলা করতে পারবে না ভেবে রানা সংঘকে মূল্যবান উপহার-উপঢৌকনের প্রলোভন দিয়ে তাকে সাহায্যের জন্য ডেকে পাঠান। রানা সংঘ তখনো সারেঙ্গপুর অবধি পৌঁছে নি, ওদিকে সুলতান মুজাফফর শাহ হালীম

তাকে সৌজন্য প্রদর্শনের উদ্দেশে ফৌজের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ আগেই পাঠিয়ে দেন। ফলে রানা সংঘ আর সামনে অগ্রসর হতে সাহস পায় নি। এদিকে মন্দলে রায় চতুর্দিক থেকে সামরিক সাহায্য পাবার পূর্বেই সুলতান দুর্গ দখল করে নেন।

"অতঃপর দুর্গ দখলের পর যেই মুহূর্তে সুলতান মুজাফফর শাহ হালীম দুর্গের ভেতর প্রবেশ করেন এবং সঙ্গী আমীর-উমারা সুলতান সমভিব্যাহারে মালব সুলতানের রাজকীয় শোভা-সমৃদ্ধি, রাজকোষ ও গুপ্ত ধনভাণ্ডার পরিদর্শন করেন এবং রাজ্যের সমৃদ্ধি সম্পর্কে অবহিত হন, তখন তারা সাহস করে সুলতান মুজাফফর শাহ সমীপে নিবেদন করেন, এই যুদ্ধে প্রায় দু'হাজার বীর সেনানী আমাদের শাহাদত লাভ করেছে। এত বিপুল ক্ষয়-ক্ষতির পর এই দেশ আবার সেই সুলতানকে প্রত্যর্পণ করা সমীচীন নয় যাঁর ভ্রান্ত ব্যবস্থাপনার দরুন মন্দলে রায় এই রাজ্য দখল করতে সক্ষম হয়েছিল। সুলতান মুজাফফর শাহ একথা শুনতেই পরিদর্শনে সেখানেই ক্ষান্ত দেন এবং দুর্গের বাইরে বেরিয়ে গিয়ে মাহ্মুদ শাহকে বললেন, আমার সঙ্গী-সাথীদের কাউকেই আর দুর্গের ভেতর যেতে দেবেন না। মাহমুদ শাহ অনেক পীড়াপীড়ি করলেন এবং আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করলেন, সুলতান কয়েকটা দিন দুর্গের ভেতর বিশ্রাম করুন। কিন্তু সুলতান মুজাফফর তাঁর এই অনুরোধ কবুল করেন নি। তিনি পরে নিজেই এই রহস্য প্রকাশ করেছিলেন, আমি এই জিহাদ কেবল আল্লাহ্র রেযামন্দী হাসিলের জন্যই করেছিলাম। কিন্তু আমীর-উমারার প্রকাশিত বক্তব্য থেকে আমার আশংকা হলো, আল্লাহ না করুন, কোন খারাপ নিয়ত আমার দিলে সৃষ্টি হয়ে যায় এবং আমার নিয়তের সততা ও ইখলাস নষ্ট না হয়ে যায়। আমি সুলতান মাহমুদের ওপর কোন অনুগ্রহ করিনি, বরং মাহমুদই আমার ওপর অনুগ্রহ করেছেন। ফলে তাঁর কারণেই এই (জিহাদে অংশ গ্রহণের মাধ্যমে) মহামূল্যবান সৌভাগ্য লাভ হলো।

"ইনতিকালের মুহূর্ত ঘনিয়ে আসতেই সুলতান উলামায়ে কিরাম ও সাম্রাজ্যের অমাত্যবর্গের এক মজলিসে নে'মতের শুকরিয়া হিসেবে বলেছিলেন, আল্লাহ্র অপার অনুগ্রহ ও কৃপায় আমি কুরআন হেফ্জ করার সাথে সাথে প্রতিটি আয়াত সংশ্লিষ্ট জরুরী মসলা-মাসাইল, হুকুম-আহকাম, শানে নযূল ও তাজবীদ সংক্রান্ত মূলনীতির ইল্ম হাসিল করি। স্বীয় উস্তাদ আল্লামা জামালুদ্দীন মুহাম্মদ ইব্ন ওমর বাহরুক থেকে যেসব হাদীসের সনদ নিয়েছি সেসব হাদীস সনদ ও মতন (মূল পাঠ ও এর বর্ণনাসূত্র) বর্ণনাকারী রাবীদের হালতসহ আমার মুখস্থ আছে। আল্লাহ্র ফযলে ফিক্হ বিষয়ে আমার সেই জ্ঞান আছে যেই জ্ঞান

সম্পর্কে হাদীস পাকে বর্ণিত من يرد الله به خيرا يفقهه فى الدين "আল্লাহ তা'আলা যার কল্যাণ কামনা করেন তাকে দীনের সমঝ (ফিক্হ) তথা জ্ঞান দান করেন। তাকে ফকীহ বানিয়ে দেন।" আর বর্তমানে কয়েক মাস থেকে সূফিয়ায়ে কেরাম ও মাশায়েখে ইজামের তরীকায় আত্মশুদ্ধির সাধনায় (তাযকিয়ায়ে নফ্স) মশগুল এবং من تشبه بقوم فهو منهم (যে যেই কওম বা সম্প্রদায়ের সাদৃশ্য অনুসরণ করবে সে সেই সম্প্রদায়ের অন্তর্গত হবে)-এর ভিত্তিতে তাঁদের বরকত লাভের ব্যাপারেও আশাবাদী। আল্লামা বাগাবীর তফসীর 'মাআলিমু'ত-তানযীল' একবার খতম করেছি। এরপর দ্বিতীয়বার শুরু করেছি। অর্ধেক পর্যন্ত পৌঁছে গেছি। বাকীটুকু আশা করছি, ইনশাআল্লাহ্ জান্নাতে গিয়ে শেষ করব।

"জুমুআর নামাযের নিকটবর্তী হতে মৃত্যুর লক্ষণ প্রকাশ পেতে শুরু করে। তিনি উপস্থিত লোকদের মসজিদে যাবার হুকুম করলেন এবং নিজে জোহর সালাত আদায় করলেন এবং বললেন ঃ সালাতুজ্জোহর তোমাদের এখানে আদায় করলাম, আসর আল্লাহ্ চাহেত জান্নাতে গিয়ে আদায় করব। ইনতিকালের সময় তাঁর যবানে হযরত ইউসুফ আলায়হি'স -সালামের এই দোআ উচ্চারিত হচ্ছিল যা ছিল স্বয়ং সুলতানের নিজের অবস্থারই প্রতিচ্ছবি ঃ

رَبِّ قَدْ اٰتَيْتَنِىْ مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِىْ مِنْ تَاْوِيْلِ الاَحَادِيْثِ ج فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ قف اَنْتَ وَلِيٌّ فِى الدُّنْيَا وَ الْاٰخِرَةِ ج تَوَفَّنِىْ مُسْلِمًا وَّاَلْحِقْنِىْ بِالصّٰلِحِيْنَ-

"হে আমার রব! তুমি আমাকে রাজ্য দান করেছ এবং স্বপ্নের ব্যাখ্যা শিক্ষা দিয়েছ। হে আকাশমণ্ডলি ও পৃথিবীর স্রষ্টা! তুমিই ইহলোক ও পরলোকে আমার অভিভাবক। তুমি আমাকে মুসলিম হিসেবে মৃত্যু দাও এবং আমাকে নেককারদের অন্তর্ভুক্ত কর।" (সূরা ইউসুফ, ১০১ আয়াত)

শের শাহ সূরীর (মৃ. ৮৫২ হি.) সময়ানুবর্তিতা ও নিয়মিত আমলসমূহের তালিকাসূচী যা ঐতিহাসিকগণ তাদের ইতিহাস গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন, দেখা যেতে পারে। এ যুগের একজন মধ্যম শ্রেণীর ব্যস্ত মানুষের পক্ষেও যেখানে এই সময়সূচী অনুসরণ করা কঠিন সেখানে এরকম একজন ব্যস্ত-সমস্ত বাদশাহ্র পক্ষে যাঁকে মাত্র পাঁচ বছরের স্বল্পতম মুদ্দতে শত বছরের কাজ করতে হবে এবং বাহ্যত যাঁকে আপন প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক ব্যস্ততা এক মুহূর্তের জন্যও অবকাশ দিতে প্রস্তুত ছিল না, দেওয়া সম্ভবও ছিল না —এটা কারামতই বলতে হবে।

"শের শাহ রাত্রির এক-তৃতীয়াংশ বাকী থাকতেই ঘুম থেকে জেগে যেতেন। এরপর তিনি গোসল করতেন এবং নফল পড়তেন। ফজর নামাযের পূর্বেই নিয়মিত ওজীফা ও তসবীহসমূহ আদায় শেষ করতেন। এরপর বিভিন্ন শ্রেণী ও বিভাগের হিসাবাদি দেখতেন এবং দিনের গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো সম্পর্কে সাম্রাজ্যের বিভিন্ন কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দান করতেন এবং রোজকার করণীয় কাজ সম্পর্কে বলে দিতেন যাতে দিনের বেলা নানাবিধ প্রশ্ন তাঁকে পীড়িত না করে। এই সব থেকে মুক্ত হয়ে তিনি সালাতুল ফজরের জন্য ওযূ করতেন এবং জামাআতের সঙ্গে ফজরের সালাত আদায় করতেন। অতঃপর যিকির-আযকার ও বিভিন্ন ওজীফা আদায়ের মধ্যে মশগুল হয়ে যেতেন। ইতোমধ্যে প্রশাসনিক কর্মকর্তারা সম্রাটকে সালাম দেবার জন্য হাযির হতেন। সম্রাট সালাতুল ইশরাক থেকে ফারেগ হয়ে আগত লোকদের কার কি প্রয়োজন জেনে নিতেন এবং ঘোড়া, এলাকা কিংবা জায়গীর ও ধন-সম্পদ যার যেমন প্রয়োজন পড়ত দিতেন। অতঃপর মামলা-মোকদ্দমার বাদী-বিবাদীর দিকে মনোযোগ দিতেন, উপস্থিত অভিযোগের প্রতিকার করতেন এবং তাদের অভাব পূরণ করতেন। এরপর শাহী ফৌজ ও অস্ত্রশস্ত্র পরিদর্শন করতেন এবং ফৌজে ভর্তি হতে ইচ্ছুক প্রার্থীর যোগ্যতা পরিমাপপূর্বক যোগ্য প্রার্থীকে নিয়োগ দানের নির্দেশ দিতেন। অতঃপর রাষ্ট্রের দৈনন্দিন আমদানী ও অর্থ পরিদর্শন করতেন। এরপর সাম্রাজ্যের প্রধান অমাত্যবর্গ, আমীর-উমারা, রাষ্ট্রদূত ও আইনজীবিগণ হাযির হতেন। সম্রাট তাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করতেন। এরপর প্রশাসনিক কর্মকর্তা ও কর্মীবৃন্দের আর্জি পেশ করা হত। তিনি তা শুনতেন এবং প্রয়োজনীয় নির্দেশ লেখাতেন। এরপর দুপুরের খানা খেতেন। উলামায়ে কিরাম ও মাশায়েখ দস্তরখানে তাঁর সঙ্গে শরীক হতেন। এরপর জোহরের সালাত পর্যন্ত দু'ঘন্টা তিনি ব্যক্তিগত কাজকর্ম করতেন এবং খাবারের পর সামান্য বিশ্রাম (কায়লূলা) করতেন। অতঃপর জামা'আতের সঙ্গে জোহরের সালাত আদায় করতেন। এরপর কুরআন মজীদ তেলাওয়াত করতেন। এর থেকে মুক্ত হয়ে তিনি পুনরায় রাষ্ট্রীয় কাজে মশগুল হয়ে যেতেন। ঘরে কিংবা বাইরে যেখানেই তিনি থাকুন না কেন, এই নিয়মের কোন ব্যত্যয় হতো না। তিনি বলতেন, বড় মানুষ তো তিনি যিনি তাঁর গোটা সময় জরুরী ও প্রয়োজনীয় কাজে ব্যয় করেন।"

সম্রাট আওরঙ্গযীব আলমগীরের বিস্তারিত জীবন-ইতিহাস পাঠ করলে জানতে পারবেন, এই দুনিয়াদার বাদশাহ যিনি কাবুল ও কান্দাহার থেকে নিয়ে সুদূর দাক্ষিণাত্য পর্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগে রাজ্য পরিচালনা করতেন এবং এই সমগ্র বিস্তৃত সাম্রাজ্য স্বয়ং দেখাশোনা করতেন, তত্ত্বাবধান করতেন, তিনি তাঁর বুলন্দ

হিম্মত ও অটুট ইচ্ছাশক্তির সাহায্যে এতটা সময় বের করে নিতেন যে, তামাম রাষ্ট্রীয় ব্যস্ততা সত্ত্বেও আওয়াল ওয়াক্তেই তিনি জামা'আতের সাথে সালাত আদায় করতেন। জুমুআর সালাত জামে মসজিদে গিয়ে আদায় করতেন। সুন্নত ও নফলের পাবন্দী করতেন। ভীষণ গ্রীষ্মেও তিনি রমযানের পুরো রোযাই রাখতেন এবং রাত্রে তারাবীহ পড়তেন। রমযানের শেষ দশকে মসজিদে ই'তিকাফ করতেন। সোমবার, বৃহস্পতিবার ও জুমুআর দিন নিয়মিত সিয়াম পালন করতেন। সর্বদাই ওযূ অবস্থায় থাকতেন। যিকর-আযকার ও দো'আ মাছূরার পাবন্দ ছিলেন। প্রতিদিন সকালে কুরআন মজীদ তেলাওয়াত করতেন এবং শতাধিক রকমের রাষ্ট্রীয় ও প্রশাসনিক ব্যস্ততা ও বিক্ষিপ্ত তবিয়ত সত্ত্বেও এমন পরিপূর্ণ একাগ্রতার সঙ্গে হযরত মুজাদ্দিদ আলফে ছানী (র)-র পৌত্র হযরত খাজা সায়ফুদ্দীন থেকে আধ্যাত্মিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতেন যে, তিনি অর্থাৎ খাজা সায়ফুদ্দীন তদীয় পিতা খাজা মুহাম্মদ মা'সূম (র)-কে সম্রাটের মধ্যে যিকরে ইলাহীর আছর জাহির হবার কথা লিখে জানান। দৈনন্দিন ব্যস্ততা সত্ত্বেও আরও এতটা সময় তিনি বের করে নিতেন যাতে করে 'ফাতাওয়ায়ে আলমগীরি' নামক সুপ্রসিদ্ধ ফতওয়ার কিতাব সংকলনের কাজে যা তাঁর নির্দেশে সে যুগের উলামায়ে কেরাম সংকলিত ও বিন্যস্ত করছিলেন, সময় দিতে পারেন। প্রতিদিন সংকলনের কাজ যতদূর অগ্রসর হতো তিনি সেটুকু শুনতেন এবং প্রয়োজনীয় পরামর্শ দান করতেন।

সম্রাট আলমগীরের সিংহাসন আরোহণের কাল কতটা ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ ও ঝটিকাসংকুল ছিল ইতিহাস পাঠক মাত্রেরই তা জানা। এ যুগেই তাঁকে সাম্রাজ্যের আমূল পুনর্গঠন করতে হয়। উত্থিত ফেতনা তাঁকে দমন করতে হয়। কিন্তু এটা সম্রাট আলমগীরেরই অদম্য মনোবল ও অটুট ইচ্ছাশক্তির পরিচায়ক ছিল যে, তিনি এরূপ উত্তাল তরঙ্গবিক্ষুব্ধ যুগেও যখন তাঁর মাথা তোলার অবকাশ ছিল না তখন তিনি কুরআন মজীদ হেফ্‌জ করবার জন্য সময় বের করেছিলেন এবং তদীয় "হাদীসে আরবাঈন"-এর ভাষ্য লিখেছিলেন। আলমগীরেরই একটি স্বরচিত কবিতা এরূপ ঃ

غم عالم فراوان است ومن يك غنچه دل دارم
چنان درشیشه ساعت کنم ریگ بیابان را

'কিন্তু তিনি এই شیشه ساعت-এর মধ্যে যেভাবে ریگ بیا با ن বন্ধ করেছেন তা তাঁর উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যসমূহ থেকেই পরিষ্কারভাবে প্রতিভাত।

আমীর-উমারা ও উযীরদের মধ্যে দেখলে আপনি আবদুর রহীম বৈরাম খান খানান, জুমলাতু'ল মালিক সা'দুল্লাহ খান আল্লামী, মাজদুদ্দীন মুহাম্মদ ইব্‌ন

মুহাম্মদ এলায়েজী, ইখতিয়ার খান, আফযাল খান ও মসনদে আলী আবদুল আযীয আসিফ খানের মত সর্বগুণসম্পন্ন বুযুর্গ দেখতে পাবেন। এঁদের মধ্যে কেবল দু'জনের (আবদুর রহীম খান খানান ও আসিফ খান) সংক্ষিপ্ত আলোচনা এখানে করা হলো।

আবদুর রহীম খান পাঠ্য কিতাব মাওলানা মুহাম্মদ আমীন ইব্ন জানী ও কাযী নিজামুদ্দীন বাদাখশানীর কাছে পড়েন এবং হাকীম আলী গীলানী ও আল্লামা ফতহুল্লাহ শীরাযী থেকেও তিনি বিশেষভাবে উপকৃত হন। অতঃপর গুজরাটে অবস্থানকালে আল্লামা ওয়াজীহুদ্দীন ইবন নসরুল্লাহ গুজরাটী থেকে আরও অধিক ইল্‌ম হাসিল করেন। এসব খ্যাতনামা শিক্ষক ছাড়াও তাঁর দরবার বিজ্ঞ, প্রাজ্ঞ ও শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতদের কেন্দ্র ছিল। এসব পণ্ডিতের সঙ্গে কৃত আগাগোড়া জ্ঞানগর্ভ আলোচনা দ্বারা তিনি উপকৃত হতেন, এমন কি তিনি সব ধরনের বিষয়ে গভীর পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। জ্ঞানের অধিকাংশ শাখায় ও সাহিত্যের ময়দানে সুন্দর রুচি, সমালোচনামূলক দৃষ্টি ও চূড়ান্ত মতামত প্রদানের অধিকার রাখতেন। তিনি ভাষাবিদ ছিলেন, বিশেষত সাতটি ভাষায় তাঁর পাণ্ডিত্য ছিল স্বীকৃত। আবদুর রাযযাক খানী "মা'আছিরু'ল-উমারা" নামক গ্রন্থে লিখেন, আরবী, ফারসী, তুর্কী ও হিন্দী ভাষায় তাঁর পরিপূর্ণ দখল ছিল। এসব ভাষায় তিনি অলংকারপূর্ণ ও ওজস্বী কণ্ঠে কথা বলতেন এবং অবলীলায় কবিতা রচনা করতেন।

জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের সাথে সাথে যুদ্ধবিদ্যা ও সৈনিকবৃত্তির ক্ষেত্রেও তিনি ছিলেন অনন্য এবং শৌর্যবীর্য ও বীরত্বের ক্ষেত্রেও ছিলেন যশ ও খ্যাতির অধিকারী। গুজরাট, সিন্ধু ও দাক্ষিণাত্য বিজয় তাঁর বীরত্ব ও সুশাসনের স্মৃতিবাহী।

আচার-ব্যবহার ও দয়া-দাক্ষিণ্যের দিক দিয়ে দেখলে দেখতে পাবেন, সমস্ত ঐতিহাসিক তাঁর উত্তম চরিত্র, কোমল ব্যবহার, ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা, বিনয় ও নম্রতার প্রশংসায় মুখর।

যদি আপনি তাঁর বদান্যতার দিকে তাকান তবে সেক্ষেত্রে সাইয়েদ গোলাম আলী বিলগিরামীর সাক্ষ্য নিন। তিনি বলেন, যদি আবদুর রহীম খানখানাঁর প্রতিদান ও পারিতোষিক দাঁড়িপাল্লার একদিকে রাখা হয় আর অন্য দিকে রাখা হয় সাফাবী বাদশাহদের প্রতিদান ও পারিতোষিক তাহলে আবদুর রহীম খান-খানাঁর পাল্লাই ভারী হবে।[১]

---

১. খাযানায়ে আমেরা;

লেখাপড়ার প্রতি দুর্নিবার আগ্রহ ও অধ্যয়নের ক্ষেত্রে মগ্নতার অবস্থা ছিল এই যে, ঠিক যুদ্ধক্ষেত্রেও অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করে বইয়ের পাতা খুলে রাখতেন যাতে পড়তে পারেন। গোসলের সময়ও কিতাব হাতে থাকত। খাদেমগণ সামনে দাঁড়িয়ে থাকত বই খুলে। গোসল করবার সাথে সাথে তাঁর বই পড়াও অব্যাহত থাকত।

ধর্মের প্রতি ঝোঁক ও স্বভাব-প্রকৃতির সামর্থ্যের অবস্থার পরিমাপ আপনি এ থেকে করতে পারবেন হযরত মুজাদ্দিদ আলফেছানী (র)-র মনোযোগ ও দৃষ্টি আকর্ষণের দ্বারা তিনি ধন্য ছিলেন এবং তিনি সেই সব সৌভাগ্যবানের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যাঁদেরকে হযরত মুজাদ্দিদ আলফেছানী (র) চিঠি লিখেছিলেন এবং যাঁরা তাঁর আস্থাধন্য ছিলেন। তাঁকে লিখিত মুজাদ্দিদ সাহেবের পত্রাদি থেকে তাঁর প্রতি তাঁর হৃদয়ের টান ও গভীর সম্পর্কের কথা জানা যায়।

গুজরাটের উযীর আসিফ খানের অবস্থা সম্পর্কে আপনি পড়লে দেখবেন, সামগ্রিকতা ও চরম উৎকর্ষের অন্য আরেকটি চিত্র দৃষ্টিগোচর হবে।

আসিফ খানের আসল নাম ছিল আবদুল আযীয। তিনি ছিলেন পিতা হামীদুল মুল্ক-এর জ্যেষ্ঠ পুত্র। কিছু কিতাব তিনি তাঁর পিতা থেকেই পাঠ করেন এবং হাদীস ও ফিক্হ কাযী বুরহানুদ্দীন নহরওয়ালে থেকে হাসিল করেন। দর্শনশাস্ত্রে উস্তাদ আবুল ফযল গাযারূনী ও আবুল ফযল আস্ত্রাবাদীর ছাত্র ছিলেন। লেখাপড়ার পাট চুকাবার পর শাহী দরবারে গমন করেন। বাহাদুর শাহর যুগে মন্ত্রিত্ব লাভ করেন। মাহমুদ শাহর যুগে এটর্নী জেনারেল-এর পদে অধিষ্ঠিত হন। এত সব পদে অধিষ্ঠিত হওয়া সত্ত্বেও তিনি পঠন-পাঠন ও জ্ঞানগত আলোচনার ধারা শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত কায়েম রাখেন।

বেশ কয়েকটি রাজনৈতিক বিপ্লবের দরুন দীর্ঘকাল তিনি মক্কা মুআজ্জমায় অবস্থান করেন। সেখানে হারামায়ন শারীফায়ন-এর উলামায়ে কিরাম ও অপরাপর শহর নগরের জ্ঞানী-গুণী তাঁর ইলমী ও আমলী যোগ্যতা, ধর্মীয় দৃঢ়তা ও মযবুতী এবং ইবাদত-বন্দেগীর ক্ষেত্রে গভীর মগ্নতাদৃষ্টে অত্যন্ত অভিভূত হন। সে যুগের বিখ্যাত আলেম আল্লামা ইবনে হাজার মক্কী আসিফ খানের মর্যাদা ও প্রশংসায় একটি স্বতন্ত্র পুস্তকই লিখেছেন এবং সম্ভবত কোন উপমহাদেশীয় আলেমের প্রশংসা বর্ণনায় একজন স্বীকৃত আরব আলেমের এটাই সর্বপ্রথম লিখিত পুস্তক যেখানে তাঁর মর্যাদাগত শ্রেষ্ঠত্ব, তাকওয়া-পরহেযগারী ও পবিত্রতার বিরাট স্তব-স্তুতি গাওয়া হয়েছে।

হারামায়ন শারীফায়ন-এর উলামায়ে কিরামের সাক্ষ্য যে, আশপাশের প্রতিবেশী, খাদেমকুল ও উচ্চ পদমর্যাদা সত্ত্বেও তাঁর মক্কা মুআজ্জমায় অবস্থানকালীন জীবন ছিল একেবারেই দরবেশসুলভ। তাহাজ্জুদ নামাযে দশ পারা কুরআন শরীফ তেলাওয়াত করতেন। ইবনে হাজার মক্কীর সাক্ষ্য এই যে, মক্কা মুআজ্জমায় দশ বছর অবস্থানকালীন মসজিদে হারামে তাঁর কোন জামা'আত কাযা হয়নি। মাতাফের একেবারে সামনেই ছিল তাঁর আবাস। সব সময় তাঁকে নফল সালাত, যিক্‌র-আযকার, তসবীহ-তাহলীল, মুরাকাবা কিংবা অধ্যয়নের মধ্যেই ডুবে থাকতে দেখা গেছে। বড় বড় কিতাবের দরস ও উলামায়ে কিরামের সঙ্গে ইলমী আলোচনা-সমালোচনা ও গবেষণার ধারা অব্যাহত থাকত। হারাম শরীফের উলামায়ে কিরাম অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে তাঁর ইল্‌মী মাহফিলগুলোতে শরীক হতেন। সর্বোচ্চ দর্জার পাঠ্য কিতাব ও ধর্মীয় সর্বোন্নত মানের কিতাবাদির জটিল বিষয়গুলোর ওপর জ্ঞানগর্ভ ও তাত্ত্বিক আলোচনা হতো এবং এসবের ওপর গবেষণা চলত।

জ্ঞানের পৃষ্ঠপোষকতা ও মর্যাদা প্রদানের অবস্থা ছিল এরূপ, ইবনে হাজার মক্কী বলেনঃ যে যুগে আসিফ খান মক্কায় এসে বসবাস করছিলেন সে সময় মক্কায় বিস্ময়কর রকমের রওনক সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল। উলামায়ে কিরাম ও ফুকাহায়ে ইজাম তাঁর সান্নিধ্য ও সাহচর্যকে দুর্লভ সম্পদ মনে করতেন। জ্ঞানের চর্চা বৃদ্ধি পেয়েছিল। মক্কার লোকেরা ইল্‌ম হাসিলের জন্য বিরাট প্রয়াস চালিয়েছিল। চতুর্দিক থেকে ছাত্ররা ছুটে এসেছিল, তারা ইল্‌ম হাসিলের ওপর স্থায়ীভাবে মনোনিবেশ করেছিল এবং জ্ঞানের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম রহস্যসমূহকে এই উদ্দেশে অনুসন্ধান চালাত যাতে সেগুলোকে আসিফ খানের সামনে পেশ করতে পারে, দৃঢ়তা জন্মাতে পারে এবং কঠিন বিষয়গুলোকে আত্মস্থ করে যাতে করে এর মাধ্যমে তাঁর নৈকট্য লাভ করতে পারে। এসবই এই উদ্দেশে ছিল যে, তিনি জ্ঞানী-গুণীদের ওপর অনুগ্রহ ও বদান্যতার বৃত্তকে এতটা বিস্তৃত করে দিয়েছিলেন যার নজীর তাঁর সমকালে বরং দীর্ঘকাল থেকেই মেলা ছিল ভার, এমন কি মক্কা মুআজ্জমার প্রতিটি অলি-গলিতে তাঁর জন্য এভাবে দুআ উচ্চারিত হতো যেভাবে হজ্জ মৌসুমে 'লাব্বায়েক আল্লাহুম্মা লাব্বায়েক' আওয়াজ উত্থিত হয়।

আসিফ খানের খ্যাতি ও গুণাবলীর চর্চা এত দূর গিয়ে পৌঁছে ছিল যে, তুরস্কের সুলতান তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের আগ্রহ প্রকাশ করেন এবং মক্কার শরীফের মাধ্যমে শাহী সম্মান ও মর্যাদা সহকারে তাঁকে কনস্টান্টিনোপলে ডেকে পাঠান এবং অত্যন্ত মনোযোগ ও ভক্তি-শ্রদ্ধার সাথে ব্যাপক গুণাবলীর আধার এই গুণী মনীষীর সাথে কথা বলেন।

একজন সফর সঙ্গী, যিনি মক্কা মু'আজ্জমা থেকে কনস্টান্টিনোপল পর্যন্ত আসিফ খানের সঙ্গে সফর করেছিলেন, বর্ণনা করেছেন, এই গোটা সফরে আসিফ খান কখনো কোন রুখসতের ওপর আমল করেন নি, বরং সর্বদাই তিনি আযীমতের ওপর আমল করেছেন যেমনটি তিনি ঘরে থাকা অবস্থায় করতেন। মিসরের শাসনকর্তা খসরু পাশা আসিফ খানের জন্য খেলাত প্রেরণ করেন। কিন্তু তিনি তা গ্রহণে তাঁর অপারগতা প্রকাশ করলে মিসরীয় দূত এই বলে গ্রহণ করতে পীড়াপীড়ি করেন, শাসনকর্তার সন্তুষ্টির নিমিত্ত আপনি একবারের জন্য গায়ে দিন যাতে বলা যায়, আপনি তা গ্রহণ করেছেন। কিন্তু আসিফ খান এই বলে আবারও তা গ্রহণে তাঁর আপত্তি জ্ঞাপন করেন, খেলাত হিসেবে প্রেরিত কুবাটি রেশমের তৈরি বিধায় কোনভাবেই আমি তা গায়ে চড়াতে পারি না।

এতে কোনই সন্দেহ নেই, সব রাজা-বাদশাহ্ই মুজাফফর শাহ হালীম কিংবা আলমগীর আওঙ্গযীব নন এবং সকল আমীর ও উযীরই আবদুর রহীম খান খানান ও আসিফ খান ছিলেন না। কিন্তু এতেও সন্দেহ নেই, মানুষের মহত্ত্ব ও উৎকর্ষের মাপকাঠি সে যুগে সাধারণভাবে অনেক উন্নত ছিল। তার বড়ত্ব ও সফলতার জন্য এমন বহু গুণ ও উৎকর্ষ অপরিহার্য ভাবা হতো যা পরবর্তীকালে, বিশেষ করে পাশ্চাত্যের বস্তুবাদী শাসন কর্তৃত্বের যুগে মর্যাদার আবশ্যকীয় শর্তবহির্ভূত হয়ে গেছে। যে মাপকাঠি লোকের দৃষ্টির সামনে সব সময় থাকত, সাধারণ মানুষও তা আশা করত এবং হিম্মতের অধিকারী লোকেরাও নিজেদেরকে এর এতটা পাবন্দ মনে করত যে, সব সময় এর সাধ্য-সাধনা করত এবং এ ব্যাপারে অলসতা প্রদর্শনকে ক্ষমার অযোগ্য ভাবত। পার্থিব উন্নতি ও মর্যাদার উন্নত থেকে উন্নততর সিঁড়িও তাদের মধ্যে ধর্মের ব্যাপারে দোটানা ভাব সৃষ্টি করতে পারত না। জাগতিক ও বৈষয়িক কর্মব্যস্ততার ভীড় এবং রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক দায়িত্ব অপরিহার্য ধর্মীয় কর্তব্য, এমন কি সুন্নত ও নফলের মত ইবাদতের ব্যাপারেও সামান্যতম অলসতা সৃষ্টি হবার অবকাশ দিত না। আরাম-আয়েশ ও ভোগ-বিলাসের উপকরণ ও সম্পদ তাদের ভেতর দৈহিক আরাম-আয়েশ কামনা সৃষ্টি হতে দিত না। অপরাপর বিষয় ও শাখার অধঃপতনের সাথে এই উন্নত মানসিকতা ও সামগ্রিকতার মধ্যেও অবনতি দেখা দেয় এবং সেই নমুনা যা প্রতিটি যুগেই অধিক হারে দৃষ্টিগোচর হয় তা কুত্রাপি দৃষ্টিগোচর হতে থাকে। কিন্তু তারপরও সেই মানদণ্ড অবশিষ্ট ছিল এবং মানুষের দিল ও দিমাগ তথা মন ও মস্তিষ্কের ওপর এরই রাজত্ব ছিল। স্ব স্ব যুগের উন্নত মনোবল ও অটুট ইচ্ছাশক্তির অধিকারী লোকেরা এই মানদণ্ডে উত্তীর্ণ হবার জন্যে সচেষ্ট থাকতেন এবং এজন্য নিজেদের আরাম-আয়েশ, ভোগ-বিলাস ও কামনা-বাসনাকে কুরবান করতেন। ১৮৫৭ সালের বিপ্লবের কিছু আগের এবং এরপর ভারতবর্ষের প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী ও জ্ঞানী-গুণী লোকদের দিকে তাকান।

আপনি মুফতী সদরুদ্দীন খান, নওয়াব কুতুবুদ্দীন খান, টুংকের শাসনকর্তা নওয়াব উযীরুদ্দৌলা মরহুম, রামপুর রাজ্যের শাসনকর্তা নওয়াব কাল্‌বে আলী খান, প্রধান সচিব মুনশী জামালুদ্দীন খান, ভুপাল রাজ্যের মন্ত্রী নওয়াব সাইয়েদ সিদ্দীক হাসান খান প্রমুখের মত সামগ্রিক গুণাবলীর অধিকারী এমন সব বুযুর্গের সাক্ষাৎ মিলবে যাঁদের মধ্যে রাজ্য ও প্রশাসন এবং জ্ঞান ও গরিমার সাথে সাথে সংসারবিরাগীর বৈরাগ্য তথা যুহ্‌দ, ইবাদতগুযারদের তৎপরতা, শিক্ষার্থীদের ন্যায় গভীর একাগ্রতা ও অধ্যয়নের প্রতি আগ্রহ এবং সৈনিকদের ন্যায় স্ফূর্তির সমাবেশ ঘটেছিল এবং এ তারই পরিণতি ছিল, জীবনের আদর্শ ও মানদণ্ড সমুন্নত ছিল এবং সর্বকালে দিল্‌ ও দিমাগের ওপর আদর্শেরই রাজত্ব চলে।

পাশ্চাত্যের বস্তুগত ও অর্থনৈতিক কর্তৃত্ব ও সভ্যতা-সংস্কৃতির যুগে মানুষের জীবনের অনুসরণীয় ও অনুকরণীয় আদর্শ এবং দৃষ্টান্তমূলক কল্পনা অনেক নীচে নেমে গেছে। কেবলই ভাল খাবার, ভাল বেশ-ভূষা ও পোশাক-পরিচ্ছদ পরিধান, সমাজে সম্মানিত ও বিশিষ্ট লোকদের মধ্যে পরিগণিত হওয়া এবং সমশ্রেণীর লোকদের মধ্যে সম্মান ও পদমর্যাদা লাভই জীবনের একমাত্র আদর্শে পরিণত হয়েছে। নবী-রসূলদের জীবন-চরিত আজ মানুষের দৃষ্টি থেকে উধাও হয়ে গেছে। দীন ও দুনিয়ার সমন্বয়, মেধা ও জ্ঞানগত, আধ্যাত্মিক ও ব্যবস্থাপনাগত উৎকর্ষ, হালাল রুযী উপার্জন প্রভৃতির ন্যায় গুণে গুণান্বিত লোকদের মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব ও প্রাধান্য লোপ পেয়েছে এবং এমন সব লোকের প্রভাব তাদের মস্তিষ্কের ওপর জেঁকে বসেছে এবং আদর্শ, নমুনা ও জীবনে সফলতা লাভের চূড়ান্ত কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে দৃষ্টি ও কল্পনার সামনে পাহাড়সম দাঁড়িয়ে গেছে যারা নৈতিক চরিত্র ও মেধাগত দিক দিয়ে ত্রুটিযুক্ত এবং কীর্তিকাণ্ডের দিক দিয়ে অত্যন্ত অধঃপতিত, জ্ঞানগত উৎকর্ষ ও যথার্থ গুণাবলী থেকে মাহরূম, চারিত্রিক মানের দিক দিয়ে নীচ ও সাধারণ পর্যায়ের, নীচু শ্রেণীর মানুষ কিংবা অর্থনৈতিক জীব এবং টাকা উপার্জনের চেতনাহীন ও নিষ্প্রাণ মেশিন। দৈহিক আরাম-আয়েশপ্রিয়তা এতটা প্রাধান্য লাভ করে এবং ক্রীড়া-কৌতুক জীবনের এমন এক বিরাট অংশ জুড়ে বসে যে, ইবাদতবন্দেগী, ধর্মীয় অবধারিত কর্তব্যসমূহ পালন ও আধ্যাত্মিক প্রয়োজনাদির দিকে মনোনিবেশ দেবার জন্য আর কোন অবকাশ থাকেনি। এই মুহূর্তে আপনি যদি প্রগতিশীল ও সংস্কৃতিবান লোকদের সময়সূচীর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন তাহলে প্রাচীন ইসলামী সভ্যতা-সংস্কৃতির ধারক ঐসব লোকের সময়সূচী এবং বিংশ শতাব্দীর বর্তমান সময়সূচীর মধ্যে এত বিরাট ফারাক দেখতে পাবেন, মনে হবে এরা একই দেশ ও জাতিগোষ্ঠীর সদস্য নন এবং এ দুয়ের মধ্যে বছরের নয়, শতাব্দীর দূরত্ব ও বিশাল সাগরের ব্যবধান রয়েছে।

সপ্তম অধ্যায়

জীবনের ময়দানে মুসলিম বিশ্ব

অতীত মুসলিম নেতৃত্বের প্রভাব

পেছনের পৃষ্ঠাগুলোতে এ সত্য দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে গেছে, খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে যখন বিশ্ব দ্রুত গতিতে ধ্বংসের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল এবং পৃথিবীর বুকে এমন কোন শক্তি ছিল না যা পতনোন্মুখ মানবতাকে হাত ধরে বাঁচাতে পারে, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের আবির্ভাব পৃথিবীকে এমন একটি দলের নেতৃত্ব প্রদান করে যাঁরা ছিলেন আসমানী গ্রন্থ ও একটি শরীয়ত ও বিধানের মালিক, যাঁদের প্রতিটি পদক্ষেপ আল্লাহ-প্রদত্ত রৌশনীর আলোকে পরিচালিত হতো, যাঁরা দুনিয়ার বুকে হক ও ইনসাফের পতাকাবাহী ছিলেন, যাঁরা রাজত্ব ও নেতৃত্বের আসনে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন নবুওত ও রিসালতের সুদৃঢ় নৈতিক ও চারিত্রিক প্রশিক্ষণ ও ইসলামের পূর্ণাঙ্গ আত্মশুদ্ধি লাভের পর, যাঁরা কোন জাতির খেদমতগুযার এবং কোন বংশ ও দেশের প্রতিনিধি ছিলেন না, যাঁদেরকে ভারসাম্যময় মেযাজ ও উপযোগী স্বভাব-প্রকৃতি দান করা হয়েছিল। এই দলের অস্তিত্ব মানব জাতির সার্বিক ধ্বংসের রাস্তায় তাৎক্ষণিক প্রতিবন্ধক হিসাবে দেখা দেয় এবং ক্রমান্বয়ে মানবতাকে কয়েক শতাব্দীর জন্য সেই সব ফেতনা-ফাসাদ ও সমূহ বিপদ থেকে বাঁচিয়ে দেয় যা বিশ্বের বুকে ছেয়ে ছিল। সে মানুষকে সাথে নিয়ে সহীহ মনযিলের দিকে অগ্রসর হতে শুরু করে। তাঁদের শাসনামলে মানুষ সমান্তরাল গতিতে উন্নতি করে এবং মানুষের সর্বপ্রকার প্রকাশ্য ও প্রচ্ছন্ন শক্তি একই রূপ ইচ্ছা-অভিপ্রায় ও সৌষ্ঠবসহকারে ক্রমোন্নতি ও অগ্রগতি লাভ করে এবং এমন এক পরিবেশ কায়েম হয় যেখানে মানুষের জন্য খুব সহজেই আপন পরিপূর্ণতায় উপনীত হওয়া সম্ভব হয়।

এই দলটির প্রভাবে জীবনের ধারা ও পৃথিবীর গতিপথ পাল্টে যায়। বিপুল বিস্তৃত আকারের আত্মহত্যা এবং বিশ্বব্যাপী গতিধারা আল্লাহ-বিস্মৃতি ও আত্মবিস্মৃতির দিক থেকে সর্বব্যাপী আল্লাহ-পরস্তী ও আত্মপরিচিতির দিকে বদলে যায়। মানুষের মেযাজ, বোধ-বুদ্ধি ও দিল্ যায় পাল্টে। ভ্রান্ত নৈতিক মূল্যবোধ ও মিথ্যা পরিমাপের পরিবর্তন ঘটে। উন্নত নৈতিক ও চারিত্রিক আদর্শ মানদণ্ড হিসাবে বিবেচিত হতে থাকে। জীবন-যিন্দেগী ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার নিমিত্ত নির্ভেজাল

ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষামালা তুলাদণ্ডের মর্যাদা লাভ করে। এই সভ্যতার যুগে ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পের সাথে নৈতিক চরিত্র ও প্রকৃষ্টতারও উত্থান ঘটে এবং বিজয়ের বিস্তৃতি ও সভ্যতা-সংস্কৃতির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে নৈতিকতা ও আধ্যাত্মিকতারও একইভাবে বিস্তার ঘটে। ধর্মীয় সম্বন্ধ, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের ঐক্য এবং সমঝোতা-সম্প্রীতি ও প্রেমপ্রীতি পৃথিবীটাকে সাক্ষাত বেহেশ্‌তে পরিণত করে যেখানে পারস্পরিক শক্তি পরীক্ষা ও লড়াই-ঝগড়া ছিল না। খোদাপরস্তী ও পাক-পবিত্রতার রাস্তা যা জাহিলিয়াত যুগে কাঁটায় ভর্তি ছিল এবং দীর্ঘকাল থেকে নির্জন ও জনশূন্য অবস্থায় পড়েছিল, বিপদমুক্ত রাজপথে পরিণত হয় যেই পথের ওপর দিয়ে কাফেলা নির্ভয়ে পথ চলত। আল্লাহ্‌র আনুগত্য যা প্রথমে মুশকিল ছিল এখন তা সহজ এবং নাফরমানী যা প্রথমে সহজ ছিল এখন তা কঠিন হয়ে গেল। দীনের প্রতি দাওয়াতের মধ্যে চুম্বকের ন্যায় আকর্ষণ এবং নৈতিক প্রশিক্ষণ ও সংস্কার-সংশোধনের মধ্যে ক্রেনের শক্তি সৃষ্টি হয়ে যায় যা লক্ষ কোটি মানুষকে পশু জীবন ও চারিত্রিক অধঃপতনের হাত থেকে বাঁচিয়ে আধ্যাত্মিক ও নৈতিক উন্নতির শীর্ষ বিন্দুতে পৌছিয়ে দেয়। মানুষের মেধা, জ্ঞানের চরমোৎকর্ষ ও স্বভাব-প্রকৃতির উদ্দাম গতি যা দীর্ঘকাল থেকে নষ্ট হচ্ছিল কিংবা অপাত্রে ব্যয়িত হচ্ছিল তা সঠিক দিক অবলম্বনপূর্বক পৃথিবীকে প্রকৃত উন্নতি ও অগ্রগতি দান করে। মোটকথা, মনুষ্য কাফেলা মনযিলে মকসূদের নিকটবর্তী হয় এবং এর সম্মুখ ভাগ মনযিলে পৌছে যায়।

পাশ্চাত্য নেতৃত্ব ও এর প্রভাব-প্রতিক্রিয়া

কিন্তু পেছনের মুসাফির মনযিলে পৌছুবার পূর্বেই হঠাৎ কাফেলা থেমে গেল। মনে হলো, কাফেলার নেতৃত্বের পরিবর্তন ঘটেছে। কাফেলার সালারকে এজন্যই নেতৃত্ব হারাতে হয়, তিনি কাফেলার নিরাপত্তার পরিপূর্ণ ও উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণে করেন নি।[১] এক অপরিচিত মুসাফির[২] যাকে কাফেলার কেউ চিনত না, জানত না, তলোয়ারের জোরে ও শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে নেতৃত্বের বাগডোর হাতে তুলে নিল।

নতুন দলপতি এই অসহায় মনুষ্য কাফেলাকে এমন এক রাস্তার দিকে নিয়ে যায় যে রাস্তা ছিল অত্যন্ত দুর্গম ও বন্ধুর, চড়াই-উৎরাইয়ে পরিপূর্ণ, দিনের বেলায়ও[৩] যেখানে রাত্রির ঘন অন্ধকার। কাফেলার যাত্রীরা যেখানে বারবার

১. মুসলমানদের বস্তুগত দুর্বলতা ও শক্তির উপকরণের ব্যাপারে অলসতা ও অসতর্কতার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যদ্দরুন কার্যকারণ এই পৃথিবীতে শাস্তি হিসাবে তাদেরকে নেতৃত্ব হারাতে হয়।

২. পাশ্চাত্য জাতিগোষ্ঠী;

৩. বৈদ্যুতিক আলোয়।

হোঁচট খেত, হুমড়ি খেয়ে পড়ত এবং আর্তস্বরে ফরিয়াদ জ্ঞাপন করত। কিন্তু কাফেলার অধিনায়ক শক্তির দম্ভে, নেশায় ও দ্রুত পৌঁছুবার তাগিদে কাফেলা হাঁকিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

এটা কোন রূপকথা নয়, বরং বাস্তব সত্য। দুনিয়ার নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের বাগডোর মুসলমানদের পর পাশ্চাত্যের সেই সব জাতিগোষ্ঠী নিজেদের হাতে তুলে নেয় যাদের কাছে প্রথম থেকেই হিকমতে ইলাহীর কোন পুঁজি ও সহীহ্-শুদ্ধ ইলম-এর কোন স্বচ্ছ-সুন্দর ঝর্ণাধারা ছিল না। নবূওতের আলোক-শিখা সেখানে মূলত পৌঁছেই নি, পৌঁছুতে পারেনি। হযরত ঈসা মসীহ (আ)-র শিক্ষামালার আলোক-শিখা যা সেখানে পৌঁছে ছিল তা বিকৃতি ও মনগড়া ব্যাখ্যা-বিবৃতির অন্ধকার আবর্তে হারিয়ে যায়। তারা সেই আসমানী আলোর শূন্য স্থান রোম ও গ্রীসের দফতরে রক্ষিত অন্ধকার দ্বারা পূরণ করে। অজ্ঞ ও মূর্খ গ্রীস ও রোমের জাহিলী পরিত্যক্ত সম্পদ তাদের উত্তরাধিকার হিসেবে হস্তগত হয় এবং বংশগতভাবে তাদের সকল প্রকৃতিগত, মেধাগত, নৈতিক ও মেযাজগত বৈশিষ্ট্যসমূহ তাদের ভেতর স্থানান্তরিত হয়। ইন্দ্রিয় পূজা, আধ্যাত্মিকতা থেকে দূরত্ব, ভোগ-বিলাসপ্রবণতা, স্বদেশ নিয়ে বাড়াবাড়ি, সীমাহীন ব্যক্তিস্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা গ্রীস থেকে এবং ঈমানী দুর্বলতা, আগ্রাসী জাতীয়তাবাদ, শক্তি সম্পর্কে পবিত্রতার ধারণা এবং সাম্রাজ্যবাদের প্রেতাত্মা রোম থেকে স্থানান্তরিত হয়। খ্রিস্টীয় শিক্ষামালার ছিটে-ফোঁটা পুঁজিটুকু (যা সম্ভবত মূলের এক-দশমাংশও নয়) রোমান মূর্তিপূজা এবং সেন্ট পল ও সম্রাট কন্‌স্টান্টাইনের মুনাফিকী ডুবিয়ে দেয়। আর যদি কিছু অবশিষ্ট থাকেও সেটুকু ধর্মীয় পণ্ডিতদের বিকৃতি ও মনগড়া ব্যাখ্যার ধূম্রজালের আড়ালে হারিয়ে যায়। বৈরাগ্যবাদের পাগলামী বস্তুবাদের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। গির্জাধিপতিদের ভোগ-বিলাস ও দুনিয়াদারী ধর্মাধিকারীদের প্রতি মানুষের অনাস্থা ও ঘৃণা সৃষ্টি করে। সরকার ও গির্জার মধ্যকার টানাটানি ও টানাপোড়েন জাতীয় মেযাজের মধ্যে বিদ্রোহ ও ভারসাম্যহীনতা সৃষ্টি করে এবং ধর্ম ও রাজনীতির মধ্যে পার্থক্য সূচিত করে। ধর্ম ও বুদ্ধিবৃত্তির রক্তাক্ত দ্বন্দ্ব-সংঘাত, ধর্মীয় মহলের স্থবিরতা ও স্বল্প-বুদ্ধিতা এবং গির্জাধিপতি পোপ ও পাদরীদের লোমহর্ষক জুলুম-নিপীড়ন নামেমাত্র ধর্মের বিরুদ্ধে বংশীয় ও মৌরসী শত্রুতার বীজ বপন করে। অপক্ব ও অপরিণত প্রগতিবাদীদের তাড়াহুড়া, গোড়ামি ও পক্ষপাতিত্ব ধর্মের শেষ তসমা তথা অবশেষটুকু কেটে দেয় এবং ধর্মের ছিটেফোঁটা কল্যাণটুকু থেকেও মানুষকে মাহরূম করে দেয়। শেষ পর্যন্ত সমগ্র পাশ্চাত্য জাতিগোষ্ঠীর ওপর বস্তুবাদের যুগ এসে হাযির হয় এবং গোটা

পাশ্চাত্যের ওপর আল্লাহ্-বিস্মৃতি ও এর স্বাভাবিক পরিণতি হিসেবে আত্মবিস্মৃতির জগত ছেয়ে যায়। অর্থপূজা ও বিত্তপূজা ধর্মের আসন গ্রহণ করে। বস্তুবাদের নির্ভেজাল অর্থনৈতিক ওয়াহদাতুল ওজূদের দর্শন জন্ম দেয় যার শ্লোগান হলো–

لا الـه الا الـخـبـز لامـوجـود الا الـبـطـن "(ভাত) রুটি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই এবং পেট ব্যতিরেকে আর কিছুর অস্তিত্ব নেই।"

অন্যদিকে জীবনের সঠিক লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, মিশন ও বিশ্বজয়ী কোন পয়গাম না থাকায় আগ্রাসী জাতীয়তাবাদ জীবনের লক্ষ্যে পরিণত হয়, পরিণত হয় জাতীয় বৃত্তি ও পেশায়। জাতীয় জীবন স্থায়ী রাখবার জন্য অপর জাতির প্রতি ঘৃণা ও ভীতির আবেগ প্রকাশ পায় এবং একদিকে সমগ্র প্রাচ্যকে পাশ্চাত্যের মুকাবিলায় প্রতিদ্বন্দ্বী শিবির হিসাবে ধরে নেওয়া হয়। অপরপক্ষে অভ্যন্তরীণ জাতীয়তার সীমারেখা গোটা পাশ্চাত্যকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খেলাঘরে রূপ দেয় এবং এক প্রতিবেশী আরেক প্রতিবেশীর মাঝে একটি সীমারেখা টেনে দেয়। এর বাইরে যে মানুষ থাকতে পারে তার কল্পনাও করা যেত না। সাম্রাজ্যবাদ সমগ্র বিশ্বকেই দাস বিক্রির এক বাজার (যেখানে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর কেনাবেচা হতো) এবং বিভিন্ন সাম্রাজ্যের মধ্যকার প্রতিদ্বন্দ্বিতা দুনিয়াটাকে কামারের চুলা বানিয়ে দেয় যেখানে সব সময় আগুনের খেলা চলে, লোহা উত্তপ্ত করে ও পিটিয়ে প্রয়োজনীয় অস্ত্র বানানো হয়।

নৈতিক ও ধর্মীয় শিক্ষা থেকে বঞ্চিত ও শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে প্রশিক্ষণবিহীনভাবে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্পের গবেষণা ও আবিষ্কার-উদ্ভাবনের ক্রমোন্নতির ফলে শক্তি ও নীতি-নৈতিকতার মধ্যে কোনরূপ ভারসাম্য বজায় থাকে নি। মানুষ পাখীর মত বাতাসের বুকে ভর দিয়ে আকাশে উড়তে শিখেছে আর মাছের মত পানিতে সাঁতার কাটতে শিখেছে বটে, কিন্তু যমীনের বুকে মানুষের মত চলা ভুলে গেছে। লাগামহীন ও বোধহীন বিদ্যা-বুদ্ধি চোর-ডাকাতের হাতে তালা ভাঙার হাতিয়ার এবং সকল মস্তানের হাতে অস্ত্র তুলে দিয়েছে। বিংশ শতাব্দীর বখাটে ও অবুঝ পোলাপানের কাছে বিজ্ঞান খেলার জন্য শাণিত ও বিপজ্জনক হাতিয়ার বণ্টন করেছে যা দিয়ে সে নিজেকে যেমন ক্ষত-বিক্ষত করছে, তেমনি ক্ষত-বিক্ষত করছে নিজের ভাইকেও। অবশেষে অন্ধ ও বধির এই বিজ্ঞান পারমাণবিক ও হাইড্রোজেন বোমার আকারে মানুষের হাতে আত্মহত্যার হাতিয়ার তুলে দিয়েছে।

এই সব ধর্মহীন জাতিগোষ্ঠীর রাজত্বকালে মানুষ সেই ধর্মীয় অনুভূতি থেকেও মাহরূম হতে থাকে যা অপরাপর মানবীয় অনুভূতির সঙ্গে প্রাচ্যের হাজারো বছরের জীবনে অপরিহার্য প্রয়োজন হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। আল্লাহ্প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষার সাধারণ রুচির স্থলে জাগতিক কামনার ব্যাধি বাসা বাঁধে। আচার-ব্যবহার, মৌলিক ও সত্যিকার মানবিক গুণাবলী ও উৎকর্ষের ক্ষেত্রে বিরাট রকমের অধঃপতন দেখা দেয়। মোটকথা, লোহা-লক্কড় ও ধাতব পদার্থের সর্বপ্রকার উন্নতি ঘটে আর মনুষ্যত্বের ঘটে সার্বিক অধঃপতন।

বিশ্বব্যাপী জাহিলিয়াত

এ সময় এমন কোন শক্তিশালী জাতিগোষ্ঠী, সম্প্রদায় কিংবা দল সাধারণ মানুষের সামনে নেই যে এ সব পাশ্চাত্য জাতিগোষ্ঠীর সঙ্গে আকীদাগত ও দৃষ্টিভঙ্গীগত মতপার্থক্য পোষণ করে এবং তাদের জাহিলী দর্শন ও বস্তুবাদী জীবন-ব্যবস্থার বিরোধী। এমন জাতি, সম্প্রদায় কিংবা দল এই মুহূর্তে না য়ূরোপে আছে আর না আছে এশিয়া কিংবা আফ্রিকায়। য়ূরোপের জার্মান হোক কিংবা এশিয়া মহাদেশের কোন জাপানী অথবা কোন ভারতীয় অধিবাসী, সকলেই এই জাহিলী দর্শন ও এই বস্তুবাদী জীবন-ব্যবস্থার সমর্থক ও ভক্ত বিশ্বাসী। আর তা না হলেও বিশ্বাসী সমর্থকে পরিণত হতে যাচ্ছে। থাকল সেই সব রাজনৈতিক মতপার্থক্য এবং বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মধ্যকার রাজনৈতিক সংঘাত-সংঘর্ষ যা এই মুহূর্তে বিভিন্ন দর্শন কিংবা যুদ্ধের আকারে দৃষ্টিগোচর হচ্ছে তা শুধুই এ নিয়ে যে, এই বস্তুপূজার অভীষ্ট লক্ষ্যের দিকে নিয়ে যাবার নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব কার হাতে থাকবে। এক জাতির পৌরুষ ও জাতীয় মর্যাদাবোধ এটা সইতে রাজী নয়, অন্য জাতি দীর্ঘকাল ধরে দুনিয়ার বুকে নেতৃত্বের আসনে অধিষ্ঠিত থাকবে, জীবন-সমস্যা ও সমূহ কল্যাণ থেকে ফায়দা লুটবে এবং বিশ্বের বাজার ও নয়া নয়া উপনিবেশের ওপর নিয়ন্ত্রণ জাঁকিয়ে বসবে, অথচ শক্তি-সামর্থ্য, বিদ্যা-বুদ্ধি ও যোগ্যতার দিক দিয়ে সে কারুর পেছনে নয় কিংবা কারুর চেয়ে কম নয়। থাকল এই যে, সে স্বয়ং অপর কোন মনযিলের দিকে অগ্রসর হতে এবং অন্য জাতিগোষ্ঠীগুলোকে নিয়ে যেতে চায়, পৃথিবীর বুকে ন্যায়নীতি, শান্তি ও ইনসাফ কায়েম করতে চায় এবং দুনিয়ার গতিমুখ ধর্মহীনতা ও বস্তুবাদিতার দিকে থেকে ঘুরিয়ে ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতার দিকে, চরিত্রহীনতা থেকে আখলাক-চরিত্রের দিকে এবং নফস-পরস্তী ও শয়তান পূজার দিক থেকে আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগীর দিকে পাল্টে দিতে চায়। তা এই গরীব এর দাবিদার যেমন নয়, তেমনি কখনো এর আকাঙ্ক্ষীও নয়।

সমাজতান্ত্রিক রাশিয়া ও পুঁজিবাদী পশ্চিমা দেশগুলোর মধ্যে পার্থক্য

এখন থাকল সমাজতান্ত্রিক রাশিয়া, যার জীবন-দর্শন যদিও দৃশ্যত বর্তমান পাশ্চাত্য জাতিগুলো থেকে পৃথক মনে হয়, তা জাহিলী পাশ্চাত্য সভ্যতার এমন এক ফল যা পেকে গেছে। সমাজতান্ত্রিক রাশিয়া ও অন্যান্য পাশ্চাত্য দেশগুলোর মধ্যে পার্থক্য কেবল এতটুকুই, সে মুনাফেকী, ভণ্ডামি ও প্রতারণার মুখোশ তার মুখের ওপর থেকে সরিয়ে দিয়েছে এবং যে দর্শন, নৈতিক চরিত্র ও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গিগুলোকে পশ্চিমা জাতিগুলোর চিন্তাবিদ, লেখক, দার্শনিক, সাহিত্যিক ও রাজনীতিবিদরা শতাব্দীকাল থেকে লিখছে এবং ঐ সব জাতি সেগুলো মনেপ্রাণে মানছে সেই দর্শন এবং ঐ সব নীতি ও আদর্শ রাশিয়া একবার সাহস করে নিজেদের দেশে বাস্তবায়িত করেছে এবং কার্যত তা করে দেখিয়েছে। সমাজতান্ত্রিক নেতারা এ গতিতে সন্তুষ্ট ছিল না যে গতিতে য়ূরোপীয় জাতিগোষ্ঠী ধর্মদ্রোহিতা, ধর্মহীনতা, বল্গাহীন স্বাধীনতা ও পাশবিক বস্তুবাদের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল। তারা দ্রুতগতিতে অভীষ্ট লক্ষ্যের দিকে যাত্রা শুরু করে এবং সেই মনযিলে পৌঁছে এখন তারা দুনিয়ার নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের চাবিকাঠি নিজেদের হাতে তুলে নিতে চাচ্ছে এবং বিশ্বের অপরাপর জাতিগুলোকেও তারা সেই মনযিলে নিয়ে যেতে চাচ্ছে যেই মনযিলে তারা পৌঁছে গেছে।[১]

এশীয় ও প্রাচ্যের জাতিগোষ্ঠীসমূহ

এশীয় ও প্রাচ্যের জাতিগুলো ও বিভিন্ন সাম্রাজ্য বিভিন্ন গতিতে সভ্যতা ও রাজনীতির সেই মনযিলের দিকে ধাবমান যার ওপর তারা পাশ্চাত্যের জাতিগুলোকে দূর থেকে দেখছে। তারা সভ্যতা-সংস্কৃতি, নীতি-নৈতিকতা ও সামাজিকতার সেই নীতিমালা ও দর্শন এবং জীবন ও জগত সম্পর্কে সেই দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করতে যাচ্ছে যা ঐসব পশ্চিমা জাতিগুলোর পরিচয়জ্ঞাপক চিহ্নে পরিণত হয়েছে। তাদের লোকদের জীবনাদর্শ পশ্চিমা জাতিগোষ্ঠীগুলোর লোকদের থেকে খুব একটা বেশি ভিন্নতর নয়। কেবল এতটুকু ভিন্ন, তারা রাজনৈতিক সচেতনতা ও জাতিপূজার ওপর ভিত্তি করে বিদেশী হুকুমতের নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব মানতে এখন আর রাজী নয় এবং তারা এটা চায় না, পাশ্চাত্য জাতিগুলোর বড় বড় সাম্রাজ্য ও শাহানশাহী কায়েম থাকুক, ঐ সব বিজয়ী জাতিগোষ্ঠীর লোকেরা তাদের সাম্রাজ্যের প্রভাব-প্রতিপত্তির দরুন বস্তুগত লাভ ও স্বার্থ দ্বারা লাভবান হোক এবং আড়ম্বর ও জাঁকজমকপূর্ণ ও ভোগ-বিলাসের

---

১. আল্লাহর শোকর এবং তাঁর অপার কুদরতের এ এক বিস্ময়কর নিদর্শন, এই লাইনগুলো লেখার কয়েক বছর পর কল্পনার বিপরীত রাশিয়ায় বিপ্লব সংঘটিত হয় এবং সেখানকার মুসলমানরা অনেকখানি ধর্মীয় স্বাধীনতা এবং নতুন প্রজন্মের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ, হজ্জ গমন ও মুসলিম দেশগুলো ভ্রমণের স্বাধীনতা পেয়েছে যে সম্পর্কে কয়েক বছর আগেও ভবিষ্যদ্বাণী করা কঠিন ছিল। আল্লাহতাআলা এ অবস্থা কায়েম রাখুন এবং এর উন্নতি ঘটুক।

জীবন যাপন করুক। ঐসব মজলুম প্রাচ্য জাতিগোষ্ঠীর স্বয়ং নিজেদের ভূখণ্ডেই এসব ফায়দা জুটুক। মূলত ঐসব পাশ্চাত্য জাতিগোষ্ঠীর জীবন-দর্শন ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার সঙ্গে তাদের মৌলিক ও নীতিগত কোন মতপার্থক্য বা বিরোধ নেই। গোটা জাতীয়তাবাদী সাহিত্যে এর প্রতি সামান্যতম ইশারা-ইঙ্গিত পর্যন্ত পাবেন না। ঐসব প্রাচ্য ও এশীয় জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে কেবল এ নিয়ে মতভেদ যে, এই রাজনৈতিক ব্যবস্থা তাদের দেশে বিদেশীরা পরিচালনা করবে। তারা এতটুকু কাটছাঁট না করে এবং এর ব্যাপক ও খুঁটিনাটির মধ্যে আদৌ কোন পরিবর্তন-পরিবর্ধন না করে এই ব্যবস্থাই নিজেরাই নিজেদের দেশে চালাতে চায়। ব্যাপারটা যেন এরকম, তারা দাবার বোর্ড পাল্টাতে চায় না, কেবল খেলোয়াড়ের পরিবর্তন ঘটাতে চায়। অতঃপর তাদের মধ্যে বহু জাতিগোষ্ঠীর স্বয়ং নিজেদের প্রাচীন জাহিলিয়াত রয়েছে যা সহকারে তাদের ভেতরকার বহু জাতিই ফিরিঙ্গী জাহিলিয়াত এখতিয়ার করেছে এবং তারা যদি কখনো কিংবা যখনই ক্ষমতার আসনে অধিষ্ঠিত হবে ঐ দুই জাহিলিয়াতের সর্বোত্তম উপাদান ও অংশগুলোর বাস্তবায়ন করবে।

মুসলমান জাহিলিয়াতের মিত্র

মজার ব্যাপার হলো এই যে, জাহিলয়াতের প্রাচীন ও বংশগতসূত্রে প্রতিদ্বন্দ্বী হওয়া সত্ত্বেও মুসলমান এই যুগে দুনিয়ার অনেক প্রান্তেই জাহিলিয়াতের মিত্রে পরিণত হয়েছে। তারা নিজেদের বন্ধুত্ব ও বিশ্বস্ততার ব্যাপারে তাদেরকে আশ্বস্ত করেছে এবং দুনিয়ার কোন কোন অংশে তারা ঐ সব পাশ্চাত্য জাহিলী জাতিগোষ্ঠীর নিমিত্ত স্বেচ্ছাপ্রণোদিত খেদমত আঞ্জাম দিয়েছে এবং দিচ্ছে। জাহিলিয়াতের এর চেয়ে বড় সাফল্য আর কী হতে পারে যে, কোন কোন মুসলিম জাতি ও সাম্রাজ্য এবং কতকগুলো মুসলিম দল ঐ সব জাতিগোষ্ঠী ও সাম্রাজ্যকে নিজেদের সাহায্যকারী, সমর্থক ও অভিভাবক এবং সত্য, ন্যায় ও ইনসাফের পতাকাবাহী মনে করতে শুরু করেছে, যারা এ যুগে জাহিলী আন্দোলনের নিশানবরদার এবং যারা জাহিলিয়াতের মরা লাশে জীবনের নতুন প্রাণ স্পন্দনের সঞ্চার করেছে। সাধারণ মুসলমানরা দুনিয়ার নেতৃত্ব দানের ধারণাই পরিত্যাগ করেছে এবং মুসলিম জনতার নেতা হবার পরিবর্তে জাহিলিয়াতের কাফেলার সর্দার হবার ধারণাতেই তুষ্ট এবং এতেই তারা গর্ব অনুভব করছে।

সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে পাশ্চাত্যের জাহিলী নীতি-নৈতিকতা ও আচার-আচরণ এভাবে দ্রুত বিস্তার লাভ করছে যেভাবে গাছের শিরা-উপশিরার মধ্যে পানি ও তারের মধ্যে বিদ্যুৎ দ্রুতবেগে প্রবাহিত হয়। মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে পাশ্চাত্যের বস্তুবাদ তার পরিপূর্ণ শান-শওকতের সঙ্গে দেখতে পাওয়া যায়।

প্রবৃত্তিজাত কামনা-বাসনার অন্ধ আনুগত্য জীবনের এমন এক পিপাসা যা মেটার নয় এবং এমন এক ক্ষুধা যা দূর হবার নয়, সৃষ্টি হতে চলেছে এমন এক জাতির মধ্যে যার কাছে পারলৌকিক জীবনই আসল জীবন। পাশ্চাত্যের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সভ্যতার প্রভাবে পরকালের ধারণা প্রতিদিনই দুর্বল থেকে দুর্বলতর হয়ে চলেছে এবং ইহলৌকিক জীবনের গুরুত্ব ও আকর্ষণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। সম্মান, গৌরব, গর্ব, অহংকার ও উচ্চ পদমর্যাদা লাভের প্রতিযোগিতায়, সমুন্নতি ও নেতৃত্ব লাভের প্রয়াসে উৎসাহী ও প্রগতিশীল মুসলমানেরা য়ূরোপের উন্নত লোকদের পদাংক অনুসারী। নীতি-নৈতিকতা ও চরিত্রের ওপর স্বার্থ ও কল্যাণ চিন্তাকে প্রাধান্য দেবার ব্যাধি ছড়িয়ে পড়েছে এবং বস্তুপূজারী জাতিগুলোর অনুকরণে বাহ্যিক ও ফাঁকা প্রদর্শনীর বাতিক বৃদ্ধি পেয়েছে। মানুষের গোলামী, শক্তি ও সম্পদের সামনে মস্তকাবনতি ও শাহপরস্তীর ক্ষেত্রে কোথাও কোথাও এই তৌহীদবাদী ও মুজাহিদ উম্মাহ অংশীবাদী কাফের মুশরিক ও দাসসুলভ মনোবৃত্তিসম্পন্ন জাতিগুলো থেকে খুব বেশি আলাদা হিসাবে দেখতে পাওয়া যায় না।

আশার আলোক শিখা

এসব কিছুর পরেও এবং এই ঘন ঘোর অন্ধকারেও এখানেই আশার আলোক-শিখা দৃষ্টিগোচর হচ্ছে। অপরাপর জাতিগোষ্ঠীসমূহ আসমানী হেদায়েত ও নবী-রসূলগণের শিক্ষামালা ও প্রজ্ঞার পুঁজি একেবারেই হারিয়ে বসেছে এবং শত শত বছর পূর্বেই তাদের কিশতী ও তাদের বক্ষের ভেতরকার এই আলো হারিয়ে গেছে। অতীত ও বর্তমানের মধ্যে যোগসূত্র রক্ষাকারী সম্পর্কের একটি সূত্রকে কালের হাত কেটে ফেলেছে। ঐসব জাতিগোষ্ঠীর ধর্মীয় সংস্কারের ইতিহাস আমাদেরকে বলে দেয় যে, তাদের মধ্যে ধর্মীয় সংস্কার ও পুনর্জাগরণের আহ্বান কোন ব্যাপক ও বিস্তৃত বিপ্লব সৃষ্টি করতে পারত না এবং বড় রকমের কোন পরিবর্তনও আনতে পারত না। গো-শাবকের এই মৃতদেহে কোন সামেরী ধর্মীয় ও নৈতিক জীবনের কোন নতুন প্রাণের সঞ্চার করতে পরেনি। বস্তুপূজা, সম্পদ ও শক্তি পূজা পুরোপুরিভাবেই তাদের ওপর জেঁকে বসেছে। জাহিলিয়াতের কর্তিত পোশাক একের পর আরেকটি তাদের শরীরে খাপ খেতে পারে, কিন্তু ধর্মের পোশাক এখন আর তাদের শরীরে ফিট হয় না। জাহিলিয়াতের একেবারে বিরোধী ও সমান্তরাল ধর্মীয় ও নৈতিক ব্যবস্থা, সমাজ-সম্মেলন ও রাজনীতিকে তাদের শত শত বছরের গঠিত মস্তিষ্কজাত কাঠামো এখন আর কবুল করে না।

এর বিপরীতে মুসলমানদের ধর্মীয় পুঁজি, আসমানী হেদায়েত ও হেকমতের উৎস নিরাপদ ও সুরক্ষিত। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের সীরাত

তথা জীবন-চরিত ও সাহাবায়ে কিরামের জীবন ও যিন্দেগী যার ভেতর পরিপূর্ণ উম্মাহ সৃষ্টির শক্তি নিহিত রয়েছে, তাদের কাছে বিদ্যমান। এরপর ইসলামী রেনেসাঁর অগ্রপথিক (মুজাদ্দিদ)-দের এক অবিচ্ছিন্ন ধারা এবং সংস্কার ও বিপ্লবের ধর্মীয় দাওয়াতের এমন এক ধারাবাহিকতা রয়েছে যা এই উম্মাহকে কোন যুগেই জাহিলিয়াতের মধ্যে হারিয়ে যাবার সুযোগ দেয়নি। জাহিলিয়াতের নির্ভেজাল বস্তুবাদী ব্যবস্থা এই উম্মাহর মেধা ও মনন (যত দিন পর্যন্ত তার অবয়ব বা কাঠামো ভেঙে গোড়া থেকে নতুন করে না বানানো হয়) পুরোপুরিভাবে হযম করতে পারে না এবং মুসলমান জাহিলিয়াতের মেশিনারীর ভেতর এভাবে খাপ খেতে পারে না যেভাবে একটি ঢিলাঢালা যন্ত্র খাপ খেয়ে যায়।

খোদায়ী দীনের পতাকাবাহী ও দুনিয়ার তত্ত্বাবধায়ক

আল্লাহ্র রসূল (সা) বদর প্রান্তরে বলেছিলেনঃ

اللهم ان تهلك هذه العصابة لا تعبد

"আয় আল্লাহ! আজ যদি তুমি এই ক্ষুদ্র দলটিকে ধ্বংস করে দাও তাহলে আর দুনিয়ার বুকে তোমার ইবাদত হবে না।"

মুসলমানদের যাবতীয় ত্রুটি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও এই বাস্তব সত্য আজও দিবালোকের ন্যায় অব্যাহতভাবে ভাস্বর। জাহিলিয়াত বিশ্বের জন্য যেই চিত্র লালন-পোষণ করে এবং যেই চিত্রের ওপর সে আজ দুনিয়াকে পরিচালিত করছে তার বিপরীতে যদি কোন চিত্র থেকে থাকে তবে তা কেবল মুসলমানদের কাছেই আছে, যদিও মুসলমান নিজেরাই তা ভুলে গেছে। কিন্তু এই চিত্র আজও নষ্ট হয় নি এবং কখনো তা নষ্ট হবে না, হতে পারে না। মুসলমান তার ধর্মের দিক দিয়ে দুনিয়ার ন্যায়পাল তথা তত্ত্বাবধায়ক ও খোদায়ী ফৌজদার। যেদিন সে জাগবে এবং আপন দায়িত্ব পালন করবে সেদিন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জাতিগুলোর জন্য হবে হিসাব-কিতাবের দিন। মুসলিম উম্মাহ্র ধ্বংসস্তূপের মধ্যে সেই অগ্নিস্ফুলিঙ্গ চাপা পড়ে আছে যা কোন না কোন দিন জ্বলে উঠে জাহিলিয়াতের খড়কুটো জ্বালিয়ে ছাই করে দেবে।

আল্লামা ইকবাল মরহুম এই বাস্তব সত্যকেই জাহিলী জীবন-ব্যবস্থার পতাকাবাহী ও এর নেতৃত্বের আসনে অধিষ্ঠিত ইবলীসের মুখ দিয়ে উচ্চারণ করিয়েছেন। ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দের পরামর্শ সভায় বিশ্বের শয়তানগুলো একত্র হয়ে ঐসব সমূহ বিপদ উত্থাপন করে যা ইবলীসী জীবন-ব্যবস্থার জন্য গভীর উদ্বেগ ও পেরেশানীর কারণ এবং যেগুলোর দিকে যথাসত্বর মনোনিবেশ করা ছিল অত্যন্ত জরুরী। একজন পরামর্শক গণতন্ত্রের নাম নিল এবং একে নতুন বিশ্বের জন্য

জীবন্ত ফেতনা হিসেবে উল্লেখ করল। অপরজন সমাজতন্ত্রকেই বিরাট বিপদ হিসেবে আখ্যায়িত করল এবং তাদের সর্দার ইবলীসকে সম্বোধন করে বলল ঃ

فتنه فردا کی ہیبت کایہ عالم ہے کہ اج

کانپتے ہیں کوہسار ومرغزار وجوئبار

میرے اقا! ولاجہاں زیر وزبر ہونے کوہے

جس جہاں کاہے فقط تیری سیادت پرمدار

অনাগত যুগ কাঁপে দুরু দুরু অজানা আশঙ্কায়,
হায় হায় আজ পাহাড়ে-পাথারে প্রতি নদী মোহনায়।
মনিব সে সব ওলট-পালট হওয়ার ভীষণ ভয়,
যেথায় চলিত শুধু তব রাজ সেথা হবে পরাজয়।

অধিবেশনের সভাপতি (ইবলীস) তার পরামর্শকদের ঐসব ফেতনা সম্পর্কে আশ্বস্ত করল এবং তার গভীর ও অভ্যন্তরীণ অবস্থা জানাশোনার ভিত্তিতে আসল সত্য তাদের সামনে তুলে ধরল যা তাদের বাহ্যিক দৃষ্টিতে ধরা পড়েনি এবং ঐসব ফেতনা নির্মূলের পথ বাত্‌লে দিল যা সে প্রথম থেকেই ব্যবস্থা করে রেখেছিল।

শেষে সে তার নিজস্ব দৃষ্টিকোণ থেকে আসল বিপদ্ব সম্প্রর্কে বলল যার ব্যবস্থা সম্পর্কে সে ভেবে রেখেছিল। কিন্তু ভবিষ্যতের ভয়াবহতা সম্পর্কে ভাবতে গিয়ে তার শরীরে কাঁপন দেখা দিত এবং তার রাতের ঘুম হারাম হয়ে যেত। সে বলছে ঃ

ہے اگر مجھ کو خطر کوئی تواس امت سے ہے

.... یہ کتاب اللہ کی تاویلات میں الجھارہے

খৎরা কিছু থাকলে আমার কেবল এই উম্মা থেকে,
পোড়া ছাইয়ের মাঝে যাহার সম্ভাবনার আগুন জ্বলে।
এখনো এই উম্মা মাঝে বিরল কিছু ব্যক্তি আছে,
চোখের জলে ওযু করে জালেম রাতের শেষের ভাগে।
তত্ত্বজ্ঞানী দিব্যজ্ঞানে দেখতে পারে পরিষ্কার,
সমাজতন্ত্র নয় কো চ্যালেঞ্জ, ইসলামেই আছে ধার।
জানি প্রবল আঁধার রাতে নেই সে মূসার উজল হাত
কিন্তু নবীর তথ্য ফাঁসে হবে মোদের বদ-বরাত।

এ যে কেমন আইন রে বাবা বাঁচায় সবায় অধিকার
নারী-পুরুষ, শ্রমিক-মজুর সকলে পায় যা পাওয়ার।
দাসত্বের যম মৃত্যুসমন, এ-আইনে সব সমান
এ আইনে ফকীর নয় কেউ, নহে কেহ রাজ খাকান।
বিত্তে কর শুদ্ধ বিমল চিত্তে করে পরিষ্কার
ধনীরে কয় 'আমীন' তুমি আমানতের যিম্মাদার।
ইহার চেয়ে বিপ্লব বড় কী-ই বা বলো হতে পারে
যমীন কেবল আল্লাহ্ তা'আলার নয় তা কোন শাহানশার
বিশ্ববাসীর চোখে গোপন থাকলে এটা চমৎকার
আল্লার ভয় খোদ মুমিনই হারিয়েছে একীন তার
দিবস রাত কাটুক এদের 'এলাহিয়াতের' ধান্ধা নিয়ে
প্রতিপাদ্য থাক এদের কুরআন ব্যাখ্যার বাছ-বিচার।

এরপর সে তার পরামর্শকদের নিম্নরূপ পরামর্শ দেয় ঃ

توڑ ڈالیں جس کے تکبیر یں طلسم شش جہات
ہے حقیقت جس کے دیں کی احتساب کائنات

মুসলিম বিশ্বের পয়গাম

দুনিয়ার জন্য মুসলিম বিশ্বের কাছে এখনও নতুন পয়গাম এবং জীবনের নতুন আহ্বান আছে, আছে দাওয়াত। সেই পয়গাম যে পয়গাম মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম চৌদ্দ শ' বছর আগে তাকে সোপর্দ করেছিলেন। এ এক শক্তিশালী, সুস্পষ্ট ও আলোকোজ্জ্বল পয়গাম যার চেয়ে অধিক ইনসাফপূর্ণ, সমুন্নত, শ্রেষ্ঠ ও বরকতময় পয়গাম এই সমগ্র সময় পর্বে আর কারো মুখ থেকে বিশ্ব শোনে নি।

এ হুবহু সেই পয়গাম যা শুনে মুসলমানরা মদীনা থেকে বেরিয়ে তামাম বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছিল এবং যে পয়গাম একজন মুসলিম দূত পারস্য সাম্রাজ্যে সেই প্রশ্নের উত্তরে যে, তোমরা আমাদের দেশে কোন্ উদ্দেশে এসেছ, সংক্ষিপ্ত বাক্যে এভাবে বলেছিলেন ঃ

الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد الى عبادة الله وحده ومن ضيق
الدنيا الى سعتها ومن جور الاديان الى عدل الاسلام

যে তকবীর দেয় করে দশদিকের কিস্তিমাত,
তা না বুঝুক ধার্মিকেরা না পোহাক তার অমা-রাত।
কর্মকাণ্ডের জগৎ থেকে রেখো তারে অনেক দূরে
জীবন জগত থেকে দূরে অনেক দূরে পগার পার।
মুমিন রবে গোলাম হয়ে এই তো খুব-চমৎকার।
দুনিয়ার কাজ অন্যে করুক, নশ্বর ধরায় কী কাজ তার?
তাহার তরে কাব্য-গজল তাসাওউফ বেশ মানায়
যাতে চোখে না পড়ে তার দুনিয়াদারীর ধুন্ধুমায়রা।
প্রতি পলে ভয় যে আমার উম্মাহ্ কখন উঠে জেগে–
দীনের যাহার মর্মকথা চলবে কেমনে এ সংসার।
(কারণ, সে যে খলীফা খোদার নেতৃত্বই কাজটি তার।)

অনুবাদ ঃ ইবনে সাঈদ

"আল্লাহ্ আমাদেরকে এজন্য পাঠিয়েছেন যেন আমরা তাঁর অভিপ্রায় মাফিক মানুষকে বান্দার গোলামী থেকে মুক্ত করে সেই ওয়াহ্দাহু লা-শারীকা লাহুর গোলামীতে, দুনিয়ার সংকীর্ণতা থেকে বের করে তার প্রশস্ততার মাঝে এবং নানা ধর্মের জুলুম-নিপীড়ন ও অন্যায়-অবিচার থেকে মুক্তি দিয়ে ইসলামের ন্যায় ও ইনসাফের মধ্যে দাখিল করি।"

এই পয়গামে আজও একটি হরফের পরিবর্তন-পরিবর্ধনের কিংবা কমবেশি করবার প্রয়োজন নেই। আজ একবিংশ শতাব্দীর পৃথিবীর নিমিত্ত তা তেমনি নতুন, জীবন্ত ও উপযোগী যেমন ছিল খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর পৃথিবীর জন্য।

আজও মানুষ হাতে গড়া না গড়া মূর্তির সামনে তার মস্তক অবনত করছে, প্রণতিপাত করছে। আজও একক স্রষ্টার বন্দেগী অচেনা ও অপরিচিত হয়ে যাচ্ছে। আজও গায়রুল্লাহ (আল্লাহ ভিন্ন অন্য কিছু)-র বন্দনা গীতি ও শক্তির বাজার গরম। আজও প্রবৃত্তিজাত কামনা-বাসনার মূর্তি প্রকাশ্য রাজপথে পূজিত হচ্ছে। আজও সাধু-সন্তু, রাজা-বাদশাহ, মন্ত্রী-মিনিস্টার, ক্ষমতাদর্পী শাসক ও বিত্ত-সম্পদের অধিকারী পুঁজিপতি, জননায়ক অধিপতি, রাজনৈতিক দল ও তার নেতৃবৃন্দ আল্লাহ্কে ফেলে প্রভু প্রতিপালক সেজে বসে আছে। এদের জন্য আজ তেমনি নযরানা পেশ করা হচ্ছে, নৈবেদ্য সাজানো হচ্ছে, ভেট চড়ানো হচ্ছে এবং তাদের আস্তানায় তেমনি বন্দনা গীতি গাওয়া হচ্ছে যেমনটি হয়ে থাকে বাতিল দেবমূর্তিগুলোর সামনে।

আজ মনুষ্য জগত আপন ব্যাপ্তি ও বিস্তৃতি, সফর উপকরণের প্রাচুর্য, যাতায়াতের সহজসাধ্যতা এবং বিভিন্ন দেশ ও জাতির মধ্যে নিকট সম্পর্ক সত্ত্বেও পূর্বের তুলনায় অনেক বেশি সংকীর্ণ হয়ে গেছে। এই মুহূর্তে বস্তুবাদী মানুষ এই দুনিয়ার বুকে অপর কোন সত্তার স্বীকৃতি দিচ্ছে না, মানছে না এবং নিজের কল্যাণ, প্রবৃত্তিজাত কামনা-বাসনা ও আত্মপূজা ছাড়া অন্য কিছুর প্রতি তাঁর আদৌ আকর্ষণ নেই। স্বার্থপরতা আজ এই পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছে যে, বিশাল বিস্তৃত এই ভূখণ্ডে দু'জন মানুষ পাশাপাশি হাত ধরাধরি করে যে জীবন যাপন করবে, এতটুকু অবকাশও তার রাখেনি। সংকীর্ণ দৃষ্টি ও দেশপূজা এমন প্রত্যেক মানুষকে যার জন্ম দেশের বাইরে, অপরাধী ভাবছে এবং তাকে ঘৃণা ও অবজ্ঞার চোখে দেখছে। ফলে তার সকল গুণ ও নৈপুণ্যই অস্বীকৃত হচ্ছে এবং তাকে সর্বপ্রকার অধিকার থেকে বঞ্চিত করছে। অতঃপর এই জীবনের ছিটেফোঁটার যেটুকু ব্যাপ্তি ও বিস্তৃতি রয়েছে ঐসব রাজনীতিবিদ ও সরকারী লোকেরা তা আরও সংকীর্ণ করে দিয়েছে যারা জীবন-যিন্দেগী, অর্থনৈতিক ও সামাজিক উপায়-উপকরণ ও রুটি-রুযীর উৎস ও ভাণ্ডারের ওপর নিয়ন্ত্রণ জাঁকিয়ে বসে রয়েছে। তারা যাকে ইচ্ছা ও যার নিমিত্ত ইচ্ছা এই জীবনকে সংকীর্ণ ও দুর্বিষহ করে তোলে এবং যার জন্য চায় ব্যাপক ও বিস্তৃত করে দেয়। বড় বড় বিশাল বিস্তৃত শহর ও সবুজ শ্যামল ভূখণ্ড মানুষের জন্য বরকতশূন্য ও শ্রীহীন হয়ে গেছে এবং গোটা আবাদী ও জনবসতি নাবালক শিশু ও অবুঝ এতিমের ন্যায় অন্যের তত্ত্বাবধানে করুণা ভিখারী হয়ে জীবন যাপন করছে। মানুষের ওপর মানুষের বিশ্বাস নেই। প্রত্যেকেই একে অন্যকে সন্দেহ ও সংশয়ের দৃষ্টিতে দেখছে এবং প্রতিপক্ষ ও প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবছে। কুরআন মজীদের অলংকারিক ও অলৌকিক শব্দসমষ্টি মুতাবিক 'যমীন তার সকল বিস্তৃতি সত্ত্বেও সংকীর্ণ হয়ে গেছে' এবং স্বভাব-তবিয়ত ভেতর ভেতরেই নিভতে শুরু করেছে। সভ্যতা ও সরকারের নিত্য-নতুন বেড়ি ও গোলামীর শেকল লোকের ওপর বোঝা হয়ে চেপে বসছে। প্রতিনিয়ত ট্যাক্স ও নিত্য-নতুন করভারে কৃত্রিম দুর্ভিক্ষের আশংকা বিরাজ করছে। বাইরের ও অভ্যন্তরীণ যুদ্ধ মাথার ওপর ঘুরপাক খাচ্ছে, গোলযোগ ও অরাজকতা, ধর্মঘট, হরতাল জীবনের অপরিহার্য অনুষঙ্গে পরিণত হয়ে গেছে।

নিঃসন্দেহে আজও মানুষকে বিভিন্ন ধর্মের জুলুম-নিপীড়ন ও বেইনসাফী থেকে ইসলামের ন্যায় ও সুবিচারের দিকে টেনে আনার প্রয়োজন রয়েছে। এই উদার ও প্রগতির যুগেও এমন অনেক ধর্মের সাক্ষাত মেলে যেসব ধর্মের আকীদা-বিশ্বাস ও শিক্ষামালা খুবই হাস্যকর যা তার অনুসারীদের নির্বোধ ও

চেতনাহীন পশুর মত জোয়ালে বেঁধে রেখেছে এবং তাদেরকে নিজেদের বুদ্ধি-বিবেচনা ও চিন্তা-ভাবনা করে কাজ করার অনুমতি দেয় না। এরপর এমন কিছু ধর্ম ও বিধি-ব্যবস্থাও আছে যেগুলো ধর্ম নামে কথিত হবার উপযোগী নয় বটে, কিন্তু আপন নিয়ন্ত্রণ ও ক্ষমতার আওতায়, স্বীয় অপরিসীম শক্তি ও সরকারের মধ্যে এবং আপন অনুসারীদের অন্ধ আনুগত্য ও ভক্তির আবেগাতিশয্যে প্রাচীন ধর্মগুলো থেকে কোনক্রমেই কম নয়। এগুলো সেই সব রাজনৈতিক ব্যবস্থা ও অর্থনৈতিক দর্শন যেগুলোর ওপর আজকে মানুষ ঠিক তেমনি বিশ্বাস পোষণ করছে যেমনটি আগে বিভিন্ন ধর্ম ও জীবন-দর্শনের ওপর পোষণ করত। এগুলো হচ্ছে এ যুগের জাতীয়তাবাদ, ভৌগোলিক ও আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, সমাজবাদ বা সমাজতন্ত্র, সমূহবাদ ইত্যাদি। এসব নতুন ধর্ম নিজেদের একচোখা নীতি, সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী ও হৃদয়হীনতার ক্ষেত্রে প্রাচীন জাহিলী যুগের বিভিন্ন ধর্ম ও মযহাবের চাইতেও এক ডিগ্রী বেশি। কোন রাজনৈতিক বিশ্বাস ও অর্থনৈতিক মতাদর্শের সঙ্গে দ্বিমত পোষণের শাস্তি আজ তার চেয়েও অধিক ভয়াবহ যতটা ভয়াবহ ছিল প্রাচীন যুগে কোন ধর্ম ও জীবন-দর্শনের সঙ্গে মতভেদের ক্ষেত্রে। আজ যখন কোন দল বা পার্টির কিংবা নীতির শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় তখন বিরোধী দলের বেঁচে থাকার অধিকারটুকু পর্যন্ত কেড়ে নেওয়া হয় এবং তাকে তার মতভেদ পোষণের কঠিন শাস্তি পেতে হয়। এ যুগের দু'দুটো বিশ্বযুদ্ধ কোন ধর্মীয় মতানৈক্যের ভিত্তিতে কিংবা কোন ধর্মীয় দল-উপদলের আন্দোলনের পরিণতিতে সংঘটিত হয়নি, বরং তা হয়েছে রাজনৈতিক স্বার্থের সংঘাত ও জাতীয় স্বার্থের ওপর ভিত্তি করে। স্পেন ও চীনের গৃহযুদ্ধ যার সামনে খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর খ্রিস্টান জগতের ধর্মীয় গৃহযুদ্ধ এবং মধ্যযুগের গীর্জা ও রেনেসাঁর অগ্রপথিক বিজ্ঞানী ও দার্শনিকদের সংঘাত-সংঘর্ষও নিষ্প্রভ মনে হবে, তা কোন ধর্মীয় মতানৈক্যের কারণে ছিল না, বরং তা ছিল শুধুই একটি রাজনৈতিক মূলনীতি কেন্দ্রিক মতভেদ এবং ক্ষমতাভিলাষী দল-উপদলগুলোর মধ্যে সংঘাত-সংঘর্ষ।

আজও মুসলিম বিশ্বের পয়গাম এক আল্লাহ্‌র ইবাদত-বন্দেগী ও একমাত্র তাঁরই আনুগত্য এবং আল্লাহ কর্তৃক প্রেরিত নবী-রাসূলদের নবুওত ও রিসালত, বিশেষত শেষ পয়গম্বর ও শ্রেষ্ঠতম রসূল মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা)-র নবূওত ও রিসালতের ওপর ঈমান আনয়ন এবং পারলৌকিক জীবনের প্রতি গভীর বিশ্বাস স্থাপনের দাওয়াত জ্ঞাপন। এই দাওয়াত কবুলের পুরস্কার ও বিনিময় হবে এই, এই বিশ্ব ঘন ঘোর অন্ধকার থেকে বেরিয়ে যেই অন্ধকারের মধ্যে সে শত শত

বছর থেকে হাত-পা ছুঁড়ছে, আলোর দিকে এসে যাবে, তারই মত মানুষের দাসত্ব ও গোলামী থেকে মুক্তি পেয়ে এক আল্লাহ্‌র বন্দেগী ও গোলামীরূপ মহামূল্যবান নে'মত পাবে, জীবনের এই বদ্ধ কারাগার থেকে যেখানে সে শতাব্দীকাল থেকে বন্দী জীবন যাপন করছে, মুক্তি পেয়ে জীবনের উন্মুক্ত প্রান্তরে ও খোলা ময়দানে এবং দুনিয়ার উন্মুক্ত আকাশে ও মুক্ত বাতাসে পা ফেলতে পারবে, বিশ্বাসগত ও রাজনৈতিক ধর্মসমূহের নিগড় থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে সে প্রকৃতির ধর্ম, স্বভাব-ধর্ম ও শরীয়তের ইলাহীর ন্যায় ও ইনসাফের ছায়াতলে স্থান পাবে।

এই পয়গামের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব, এর শ্রেষ্ঠত্ব ও সমুন্নতি সম্পর্কে যতটা স্বচ্ছ ও স্পষ্ট ধারণা লাভ আজ সম্ভব হয়েছে এবং এ সম্পর্কে উপলব্ধি আজ যতখানি সহজ হয়ে গেছে এর আগে তেমনটি আর কখনো হয়নি। জাহিলিয়াত আজ জনসমক্ষে অবমানিত। এর নেকাবঢাকা গোপন চেহারা আজ সবার সামনে নগ্নভাবে উদ্ভাসিত। মানুষ আজ জীবন সম্পর্কে অসহায়ত্ব প্রকাশ করছে এবং এই মুহূর্তের জাহাজের কাপ্তানদের সম্পর্কে হতাশ। দুনিয়ার নেতৃত্বের মধ্যে মৌলিক পরিবর্তনের এটাই প্রকৃষ্ট সময় ও উপযোগী মুহূর্ত। এই মুহূর্তটি পর্যন্ত দুনিয়ার নেতৃত্বে যতটুকু পরিবর্তন সাধিত হয়েছে তা এর চেয়ে বেশি ছিল না যে, যখন নৌকার মাঝি এক হাতে বৈঠা বাইতে বাইতে তার হাত ক্লান্ত হয়ে পড়ে তখন সে বৈঠা তার অন্য হাতে নেয়। এরপর সে হাত ক্লান্ত হলে আবার আগের হাতে বৈঠা ফিরিয়ে নেয়। ব্রিটেন থেকে আমেরিকা কিংবা আমেরিকা থেকে রাশিয়ার দিকে বিশ্ব নেতৃত্বের এই যে হাত বদল অথবা আন্তর্জাতিক প্রভাব ও ক্ষমতা বলয়ের এই যে পরিবর্তন এর বেশি কিছু নয়; মাঝি নৌকার বৈঠা এক হাতে থেকে অন্য হাতে নিয়েছে। এটা কাপ্তানের পরিবর্তন কিংবা জাহাজ পরিচালনার মূলনীতির পরিবর্তন অথবা সফরের দিক পরিবর্তন নয়, বরং এ তো ডান হাত বাম হাতের খেলা মাত্র!

মানুষের যাবতীয় সমস্যা ও সংকটের আজ একটাই সমাধান আর তা হলো এই, বিশ্বের নেতৃত্ব ও জীবনরূপী জাহাজের পরিচালন ভার ঐসব অপরাধী ও মানুষের রক্তে রঞ্জিত খুনীদের হাত থেকে বের করে যারা মানুষের এই কাফেলাকে ডুবিয়ে দেবার স্থির সিদ্ধান্ত নিয়েছে, ঐ সব আমানতদার, দায়িত্বশীল ও আল্লাহভীরু অভিজ্ঞ মানুষগুলোর হাতে তুলে দেওয়া যাদেরকে সৃষ্টির আদিতেই মানুষের এই বিশাল কাফেলা পরিচালনার জন্যই বানানো হয়েছিল। কার্যকর ও ফলপ্রসূ বিপ্লব কেবল এই, দুনিয়ার পথ প্রদর্শন ও মানুষের নেতৃত্বভার জাহিলিয়াতের শিবির থেকে, যার মধ্যে রয়েছে ব্রিটেন, আমেরিকা ও রাশিয়া ও তাদের পদলেহী ও তল্পীবাহী প্রাচ্য ও এশীয় জাতিগোষ্ঠীসমূহ এবং যার নেতৃত্বের বাগডোর রয়েছে আয়েশী ও বিলাসী পুঁজিবাদী ধনিক বণিক অপরাধী চক্রের

হাতে, স্থানান্তরিত হয়ে সেই উম্মাহ্র হাতে তা আসুক যার নেতৃত্ব রয়েছে মানবতার মহান নির্মাতা রহমতে আলম, সাইয়েদে বনী আদম মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের হাতে এবং যাদের এই দুনিয়ার নবতর বিনির্মাণ ও মানবতার নবজাগরণের নিমিত্ত রয়েছে সুদৃঢ় ও সুস্পষ্ট মৌলনীতি ও শিক্ষামালা এবং যাদের ঈমান বর্তমান বিশ্বকে এই সময়কার জাহিলিয়াতের থেকে ঠিক সেভাবে বের করে আনতে পারে যেভাবে সে বের করে এনেছিল চৌদ্দ শ' বছর আগে।

নবতর ঈমান

কিন্তু এই মহান দায়িত্ব ও কর্ম সম্পাদনের জন্য মুসলিম বিশ্বকে আত্মপ্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে, প্রয়োজন দেখা দেবে তার নিজের মধ্যে পরিবর্তন সৃষ্টির। প্রথম প্রস্তুতি হবে এই, মুসলিম বিশ্ব ইসলামের ওপর নতুন ও জীবন্ত ঈমান আনবে। মুসলিম বিশ্বের জন্য নতুন ধর্ম, নতুন জীবন-দর্শন, নতুন পয়গম্বর, নতুন শরীয়ত ও নতুন তা'লীম বা শিক্ষামালার আদৌ কোন প্রয়োজন নেই। ইসলাম চিরশাশ্বত। সেতো সূর্যের মত, না কখনো পুরানো ছিল আর না সে এখনই পুরানো। রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের নবুওত চিরস্থায়ী এবং আখেরী নবুওত। তাঁর আনীত দীন সুরক্ষিত এবং তাঁর প্রদত্ত শিক্ষামালাও জীবিত ও জীবন্ত। কিন্তু এতে কোন সন্দেহ নেই, মুসলিম বিশ্বের জন্য নতুন ঈমানের আবশ্যক। নতুন ফেতনা, নতুন শক্তি, নতুন উৎসাহ-উদ্দীপনা ও প্রেরণা ও নতুন আহ্বান মুকাবিলা কমযোর ঈমান ও কেবল রসম-রেওয়াজ ও আচার-অভ্যাস দিয়ে করা যাবে না। কোন জরাজীর্ণ ও দশাপ্রাপ্ত প্রাসাদ নতুন সাইক্লোন ও নতুন কোন প্লাবনের ধাক্কা সইতে পারে না। অতঃপর যারা এর আহ্বায়ক হবেন, হবেন দাঈ তাদের জন্য অপরিহার্য হলো, তাকে তার আহ্বান তথা দাওয়াতের ওপর অটল ও স্থির প্রত্যয় থাকতে হবে। তার ভেতর এমন একজন মানুষের জোশ থাকবে যিনি কোন নতুন আকীদা-বিশ্বাসের ওপর নতুন ঈমান এনেছেন। এমন এক মানুষের হাসিখুশী ও আনন্দ থাকবে যিনি কোন নতুন ধনভাণ্ডারের সন্ধান পেয়েছেন কিংবা নতুন দেশ আবিষ্কার করেছেন। মুসলিম বিশ্ব যদি মনুষ্য জগতে নবতর রূহ ও নতুন জীবন সৃষ্টি করতে চায় এবং দুনিয়ার বর্তমানের বস্তুবাদিতা এবং সন্দেহ-সংশয় ও অস্থিরতার ওপর জয় লাভ করতে চায় তাহলে তাকে তার ভেতর নতুন ঈমানী রূহ, জীবন্ত একীন ও নতুন উৎসাহ-উদ্দীপনা সৃষ্টি করতে হবে।

অর্থপূর্ণ প্রস্তুতি

মুসলিম বিশ্বকে এই পবিত্র দায়িত্ব পালনের জন্য অর্থপূর্ণ প্রস্তুতি ও অভ্যন্তরীণ পরিবর্তনের আবশ্যকতা দেখা দেবে। প্রকাশ থাকে, মুসলিম বিশ্ব

আল্লাহ্‌র পরিচয় সম্পর্কে অজ্ঞ য়ূরোপের মুকাবিলা সভ্যতা-সংস্কৃতির শূন্যগর্ভ প্রদর্শনী, পাশ্চাত্য ভাষাগুলোর নৈপুণ্য ও জীবন-যিন্দেগীর সেই রঙঢঙ এখতিয়ার করে করতে পারে না, জাতির উন্নতি ও অগ্রগতির ক্ষেত্রে যে সবের কোন ভূমিকা নেই। মুকাবিলা সে তার পয়গাম, সেই রূহ ও অর্থপূর্ণ শক্তির সাহায্যেই করতে পারে যেক্ষেত্রে য়ূরোপ প্রতি দিন দেউলিয়া হয়ে চলেছে। মুসলিম বিশ্ব তার প্রতিপক্ষের ওপর কেবল সেই ক্ষেত্রেই প্রাধান্য ও বিজয় লাভ করতে পারে যখন সে তার প্রতিদ্বন্দ্বী থেকে ঈমানের ক্ষেত্রে অগ্রবর্তী হবে, জীবনের প্রতি ভালবাসা যখন তার দিল থেকে বেরিয়ে যাবে, প্রবৃত্তিজাত কামনা-বাসনার শেকল থেকে মুক্ত হবে, তার লোকেরা শাহাদতের প্রতি লোভাতুর হবে, জান্নাতের প্রতি আগ্রহ তার দিলের গভীরে দোলা দিতে থাকবে, দুনিয়ার নশ্বর ধন-সম্পদ ও মালমাত্তা তার দৃষ্টিতে আদৌ কোন গুরুত্ব বহন করবে না, আল্লাহ্‌র রাস্তায় দুঃখ-কষ্ট, জ্বালা-যন্ত্রণা, বিপদাপদ ও বালা-মুসীবত হাসি মুখে বরদাশ্‌ত করবে। বাস্তবে এগুলোই হলো আল্লাহ্‌র পরিচয় সম্পর্কে অজ্ঞ ও অপরিচিতের মুকাবিলায়, যে পারলৌকিক জীবনে বিশ্বাসী নয়, বরং তা অস্বীকার করে, মু'মিনের হাতিয়ার আর এটাই মু'মিনের বৈশিষ্ট্য। আর এরই ওপর ভিত্তি করে তার থেকে আশা করা হয়েছে, তার মধ্যে সহ্য শক্তি বেশি হবে। কুরআন মজীদে বলা হয়েছে ঃ

وَلاَ تَهِنُوْا فِى ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ ط اِنْ تَكُوْنُوْا تَأْلَمُوْنَ فَاِنَّهُمْ يَأْلَمُوْنَ كَمَا تَأْلَمُوْنَ ج وَتَرْجُوْنَ مِنَ اللّٰهِ مَالاَ يَرْجُوْنَ -

"শত্রু সম্প্রদায়ের সন্ধানে তোমরা হতোদ্যম হয়ো না। যদি তোমরা যন্ত্রণা পাও তবে তারাও তো তোমাদের মতই যন্ত্রণা পায় এবং আল্লাহ্‌র নিকট তোমরা যা আশা কর ওরা তা আশা করে না" (সূরা নিসা, ১০৪ আয়াত)।

প্রকৃত ঘটনা হলো, মুমিনের শক্তি, প্রতিপক্ষের ওপর বিজয় ও প্রাধান্য লাভের পেছনে গূঢ় রহস্য হলো, পারলৌকিক জীবনের প্রতি সুদৃঢ় প্রত্যয় ও আল্লাহ্‌র কাছ থেকে বিনিময় ও সওয়াব প্রাপ্তির প্রত্যাশা। যদি মুসলিম বিশ্বের সামনেও সেই সব পার্থিব ও জাগতিক উদ্দেশ্য ও বস্তুগত স্বার্থই কাঙ্ক্ষিত হয় এবং সেও যদি কেবল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও বস্তুগত উপকরণাদির কেন্দ্রজালে বন্দী হয়ে পড়ে তাহলে য়ূরোপের তার বস্তুগত শক্তি, কয়েক শতাব্দীর প্রস্তুতি ও বিপুল বিস্তৃত সাজ-সরঞ্জামের ভিত্তিতে বিজয় লাভ ও ক্ষমতা অর্জনের অধিকার বেশি থাকবে।

মুসলিম বিশ্ব এক সুদীর্ঘ কাল এমনভাবে অতিবাহিত করেছে, তার অর্থপূর্ণ শক্তির মূল্য যে কি সে সম্পর্কে তার কোন ধারণা ছিল না এবং সে শক্তিকে সংরক্ষণেরও চিন্তা-ভাবনা ছিল না এবং তাকে প্রয়োজনীয় খোরাক জোগাবার দিকেও তার কোনরূপ মনোযোগ ছিল না। ফল হলো এই, তার স্রোতধারা শুকিয়ে যেতে থাকে, খুব দ্রুত বেগে তার শক্তিতে ভাটা দেখা দেয়। ঠিক সেই সময়েই মুসলিম বিশ্বকে বিভিন্ন জায়গায় ও বিভিন্ন মুহূর্তে এমন অনেক যুদ্ধের সম্মুখীন হতে হয় যেসব যুদ্ধে তাকে ঈমান ও একীন, ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা এবং দৃঢ়তা ও সংহতির প্রয়োজনীয়তা গভীরভাবে অনুভূত হয় যা উল্লিখিত গুণাবলী ব্যতিরেকে জেতা যেত না। যখন মুসলিম শক্তিগুলোতে ধাক্কা লাগল এবং তারা এই অর্থপূর্ণ শক্তির ওপর নির্ভর করতে চাইল যার জায়গায় মুসলমানদের দিল্ সংস্থাপিত ছিল তখন সে অকস্মাৎ জানতে পারল, এই শক্তি বহুকাল হয় হারিয়ে গেছে এবং দিলের অঙ্গারধানিকা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। সে সময় মুসলিম বিশ্ব অনুভব করল, সে সেই রূহানী ও আধ্যাত্মিক শক্তির অসম্মান করে এবং এর প্রতি অবহেলা ও উপেক্ষা প্রদর্শন করে নিজের ওপর বিরাট জুলুম করেছে। এ সময় সে মজুদ ভাণ্ডারের হিসাব পরীক্ষা করে যখন দেখল তখন দেখতে পেল সেখানে এমন কোন জিনিস নেই যা তার শূন্য স্থান পূরণ করতে পারে এবং সেই ক্ষতির ক্ষতিপূরণ করতে পারে।

এই সময়পর্বে মুসলিম বিশ্বকে এমন সব যুদ্ধের সম্মুখীন হতে হয় যেসব যুদ্ধে ইসলামের সম্মান ও সম্ভ্রমের প্রশ্ন জড়িত ছিল। তার ধারণা ছিল, এই যুদ্ধের প্রতিক্রিয়ায় সমগ্র বিশ্বের মুসলমানরা বিক্ষোভে ফেটে পড়বে, তারা ইসলামের পক্ষ থেকে প্রতিরোধ, পবিত্র স্থানগুলোর হেফাজত এবং ধর্মীয় উৎসাহ-উদ্দীপনায় স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে এবং সমগ্র মুসলিম দেশ অগ্নিবৎ জ্বলে উঠবে। কিন্তু মুসলিম বিশ্বে এসব ঘটনার যেমনটি আশা করা গিয়েছিল তেমন কোন বিশেষ প্রতিক্রিয়া দেখা যায় নি। জীবনের গতি পূর্বের মতই অব্যাহত থাকে। কোথাও কোথাও কিছু আওয়াজ উঠেছিল বটে, কিন্তু পরক্ষণেই তা বুদবুদের মত মিলিয়ে যায়। এরপর দুনিয়া আবার তার নিজের কাজে লেগে যায়। সে সময় মুসলিম বিশ্বের দূরদর্শী চিন্তাবিদগণ জানতে পারলেন, মুসলমানদের ধর্মীয় মর্যাদাবোধ ও ইসলামী অনুভূতি দুর্বল হয়ে গেছে এবং ঈমানের অগ্নিশিখা একেবারে নিভে না গেলেও তা নিভু নিভু হয়ে গেছে। সে সময় মুসলিম বিশ্বের এই দুর্বলতার কথা অন্যেরাও জেনে যায় এবং অভ্যন্তরীণ অধঃপতিত অবস্থা ও ভগ্নদশা সম্পর্কে অনুভব করে। ফলে মুসলিম বিশ্বের ভীতিকর প্রভাব তাদের মন থেকে মিইয়ে যেতে থাকে যেই প্রভাব তার

মুজাহিদদের বীরত্বপূর্ণ গৌরব-গাঁথা পড়ে পড়ে তাদের মন-মস্তিষ্কে গেঁথে গিয়েছিল।

আজ মুসলিম বিশ্বের নেতৃবৃন্দ ও চিন্তাশীল ব্যক্তিবর্গ এবং তার দল ও সরকারগুলোকে যা করতে হবে তা হলো এই, মুসলমানদের হৃদয়রাজ্যে ঈমানের বীজ দ্বিতীয়বারের মত বপন করতে হবে, বপনের প্রয়াস চালাতে হবে, তাদের ধর্মীয় জোশ-জযবা ও উৎসাহ-উদ্দীপনা পুনরায় সক্রিয় ও গতিশীল করতে হবে এবং প্রাথমিক যুগের ইসলামের দাওয়াতের মূলনীতি ও কর্মপন্থা মুতাবিক মুসলমানদেরকে ঈমানের দাওয়াত দিতে হবে এবং আল্লাহ, তদীয় রসূল ও পারলৌকিক জীবনের আকীদা-বিশ্বাসের প্রতি সমগ্র শক্তি দিয়ে পুনর্বার তাবলীগ ও তালকীন করতে হবে, শেখাতে হবে এবং প্রচার চালাতে হবে। এজন্য সে সব পন্থাই কাজে লাগাতে হবে যে সব পন্থা ইসলামের প্রথম দিককার দাঈগণ গ্রহণ করেছিলেন। অধিকন্তু সে সমস্ত উপায়-উপকরণ ও শক্তি কাজে লাগাতে হবে যা বর্তমান যুগ সৃষ্টি করে দিয়েছে।

কুরআন মজীদ ও রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর সীরাত তথা জীবন-চরিত এখনও জীবন-যিন্দেগী ও শক্তির এমনই এক উৎস যদ্দ্বারা মুসলিম বিশ্বের শুষ্ক ও মৃতপ্রায় শিরা-উপশিরায় জীবনের উষ্ণ ও তাজা রক্ত পুনরায় সঞ্চারিত হতে পারে। তার অধ্যয়ন ও প্রভাবে এই জাহিলী জগতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের আবেগ মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে এবং তার প্রতিক্রিয়ায় একটি নিদ্রালু ও তন্দ্রালু জাতি একটি উৎসাহী, উদ্যমী, অস্থির ও কর্মচঞ্চল জাতিতে পরিণত হয়। এর প্রভাবে (যদি তার প্রভাব সৃষ্টির মওকা দেওয়া হয়) একবার পুনরায় ঈমান ও নিফাক, দৃঢ় প্রত্যয় ও সন্দেহ-সংশয়, সাময়িক সুযোগ-সুবিধা, কল্যাণচিন্তা ও দৃঢ় আকীদা-বিশ্বাস, সুবিধাবাদী ও সুযোগ-সন্ধানী মানসিকতা ও হক পরস্ত তথা সত্যানুসারী বিবেক, বুদ্ধিবৃত্তিক উপযোগিতা ও উপযোগিতা দাহের মধ্যে আবার তাহলে যুদ্ধ শুরু হয়ে যাবে। এরপর আবার দৈহিক আরাম-আয়েশ ও মানসিক প্রশান্তি এবং দৈহিক ভোগ-বিলাস ও শহীদী মৃত্যুর মধ্যে দ্বন্দ্ব শুরু হয়ে যাবে। সেই বরকতময় দ্বন্দ্ব যা সকল নবী-রসূল স্ব স্ব যুগে সৃষ্টি করেছিলেন এবং যা ছাড়া হক ও বাতিলের তথা সত্য ও মিথ্যার ফয়সালা এবং এই দুনিয়ার সংস্কার-সংশোধন ও বিপ্লবের কোন কাজই হতে পারে না। এই মুহূর্তে মুসলিম বিশ্বের কোণে কোণে এবং মুসলমানদের প্রতিটি ঘরে ও প্রতিটি খান্দান ও পরিবারে এমন ঈমান দীপ্ত নওজোয়ান জন্ম নেবে যাঁদের প্রশংসা কুরআন মজীদে এভাবে করা হয়েছে ঃ

اِنَّـهُمْ فِتْـيَةٌ اٰمَـنُـوْا بِـرَبِّـهِمْ وَزِدْنٰـهُـمْ هُدًى - وَرَبَـطْـنَـا عَلٰى قُلُوْبِـهِـمْ اِذْ قَـامُـوْا فَـقَـالُـوْا رَبُّنَـا رَبُّ السَّـمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ لَنْ نَّـدْعُوَاْ مِـنْ دُوْنِـهٖٓ اِلٰـهًـا لَّقَدْ قُـلْنَـآ اِذًا شَـطَـطًا -

"ওরা ছিল কয়েকজন যুবক, ওরা ওদের প্রতিপালকের ওপর ঈমান এনেছিল এবং আমি ওদের সৎ পথে চলার শক্তি বৃদ্ধি করেছিলাম এবং আমি ওদের চিত্ত দৃঢ় করে দিলাম; ওরা যখন উঠে দাঁড়াল তখন বলল, আমাদের প্রতিপালক আসমানরাজি ও যমীনের প্রতিপালক; আমরা কখনোই তাঁর পরিবর্তে অন্য কোন ইলাহ্কে আহ্বান করব না; যদি করে বসি তবে তা হবে অত্যন্ত গর্হিত" (সূরা কাহ্ফঃ ১৩-১৪)।

তখন দুনিয়াতে আরেকবার বেলাল ও আম্মার, খাব্বাব ও খুবায়ব, সুহায়ব ও মুসআব ইবন উমায়ের, উসমান ইবনে মাযঊন ও আনাস ইব্ন নাদ্র-এর ঈমানী জোশ, আত্মোৎসর্গ ও কুরবানীর নমুনা চোখের সামনে দেখা দেবে। জান্নাতের বাতাস ও ইসলামের প্রথম শতাব্দীতে প্রবাহিত ঈমানী বায়ু প্রবাহ পুনর্বার প্রবাহিত হবে এবং এক নতুন মুসলিম বিশ্বের আবির্ভাব ঘটবে যার সঙ্গে বর্তমান মুসলিম বিশ্বের কোন সম্বন্ধ নেই।

বর্তমান মুসলিম বিশ্বে অসুস্থতা, পেরেশানী ও অশান্তি নেই, বরং সীমাতিরিক্ত প্রশান্তি ও তৃপ্তি, দুনিয়ার যিন্দেগীর ব্যাপারে তুষ্টি এবং অবস্থার সঙ্গে সন্ধি ও সমঝোতা রয়েছে। আজ বিশ্বব্যাপী ফাসাদ, মানবতার অধঃপতন এবং পরিবেশের খারাবী তার ভেতর কোন অস্থিরতা সৃষ্টি করে না। জীবনের এই ছবিতে তার কোন জিনিস ভুল ও অজায়গায় চোখে পড়ে না। তার দৃষ্টি ব্যক্তিগত সমস্যা-সংকট ও বস্তুগত সুযোগ-সুবিধার আগে অগ্রসর হয় না। তার বর্তমান নিরুত্তাপ উদাসীনতা, নির্জীবতা ও নিষ্প্রাণতার কারণ স্রেফ এই, তার পার্শ্ব দেশ বেদনাহীন এবং তার দিল্ উত্তাপশূন্য।

طبیب عشق نے دیکھا مجھے توفرمایا

تیرا مرض ہے فقط ارزو بےنیشی

অর্থঃ "প্রেমের চিকিৎসক আমাকে দেখে বলল, তোমার অসুখ আর কিছু নয়, কেবল তোমার আকাঙ্ক্ষার কণ্টকশূন্যতা।"

এজন্যই প্রয়োজন সেই বরকতময় দ্বন্দ্ব-সংঘাত পুনরায় সৃষ্টি করা এবং এই উম্মাহর শান্তি ও তৃপ্তি লণ্ডভণ্ড করা। তার মধ্যে তার আপন সত্তা ও আপন

সমস্যা-সংকট নিয়ে চিন্তা-ভাবনার পরিবর্তে (যা কেবল জাহিলী জাতিগোষ্ঠীগুলোর প্রতীক চিহ্ন) মানবতার ব্যথা- বেদনা ও শোক-দুঃখ, হেদায়েত ও রহমতের ভাবনা এবং পারলৌকিক জীবন ও সেই জীবনে আল্লাহ্র সামনে জওয়াবদিহির ভীতি সৃষ্টি করা। এই উম্মাহ্র জন্য তৃপ্তি ও প্রশান্তির দোআ করার মধ্যে তার কল্যাণ নেই, বরং তার কল্যাণ তো এতে নিহিত যে, তার জন্য ব্যথা-বেদনা ও অস্থিরতার দোআ করা এবং খোলাখুলি ও প্রকাশ্যে বলা,

خدا تجھے کسی طوفان سے اشنا کردے

کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں

অর্থঃ "আল্লাহ তোমাকে কোন ঝঞ্ঝা কিংবা তুফানের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিন। কেননা তোমার সমুদ্রের তরঙ্গমালাতে অস্থিরতা নেই।"

চেতনাবোধের প্রশিক্ষণ

কোন জাতির জন্য সর্বাধিক বিপজ্জনক বিষয় হলো, সে জাতি সঠিক জ্ঞান-বুদ্ধি ও চেতনাবোধ থেকে মুক্ত। এমন একটি জাতি, যে সর্বপ্রকার যোগ্যতা ও সামর্থ্যের অধিকারী এবং যে ধর্মীয় ও জাগতিক সম্পদ দ্বারা সম্পদশালী, কিন্তু সে ভাল-মন্দ ও পাপ-পুণ্যের মধ্যে পার্থক্য করতে পারে না, দোস্ত-দুশমন চেনে না, পেছনের অভিজ্ঞতা থেকে ফায়দা লাভের সামর্থ্য তার ভেতর নেই, তার নেতাদের কর্মকাণ্ডের হিসাব গ্রহণ ও খতিয়ান নেবার এবং জাতীয় অপরাধীদের শাস্তি দেবার তার ভেতর সাহস নেই তারা স্বার্থপর নেতাদের মৃদু মোলায়েম ও মিষ্টি কথায় অভিভূত হয়ে যায় এবং প্রতিবার নতুন করে ধোঁকা খাওয়া ও প্রতারিত হবার জন্য তৈরি থাকে, সেই জাতি তার যাবতীয় ধর্মীয় উন্নতি-অগ্রগতি ও পার্থিব সাফল্য সত্ত্বেও আস্থাযোগ্য নয়। সেই জাতি পেশাদার, স্বার্থপর ও মুনাফিক নেতাদের হাতের ক্রীড়নকে পরিণত হয়, খেলনায় পরিণত হয়, জাতির সরলতা ও চেতনাহীনতার সুযোগে তাদের যা খুশী তাই করার সুযোগ মেলে। কারণ তারা জানে এবং নিশ্চিন্ত থাকে, তাদেরকে তাদের কৃত কর্মের কখনো হিসাব দেওয়া কিংবা জওয়াবদিহি করতে হবে না।

মুসলিম দেশগুলো সম্পর্কে যদি আমরা একথা বলতে নাও চাই, তারা জাগ্রত ও সচেতন নয়, তাদের বোধ-বুদ্ধি ও চেতনাবোধ খুবই দুর্বল এবং তারা চেতনার একেবারে প্রাথমিক স্তরে অবস্থান করছে, কিন্তু আফসোসের সাথে বলতেই হয়, শুভাকাঙ্ক্ষী ও অশুভাকাঙ্ক্ষী উভয়ের সাথে তাদের আচার-ব্যবহার প্রায় একই

রকম, বরং কোন কোন সময় অশুভাকাঙ্ক্ষী ও অনিষ্ঠাবান ভণ্ড লোকেরা মুসলমানদের মধ্যে খুব বেশি প্রিয় ও বিশ্বস্ত হয়ে যায়। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেন, "সাপের একই গর্ত থেকে মু'মিন দু'বার দংশিত হয় না।" কিন্তু মুসলিম দেশগুলোর বাসিন্দারা শত সহস্রবার দংশিত হবার জন্য প্রস্তুত থাকে। তাদের স্মৃতিশক্তি নেহায়েত দুর্বল। তারা তদের নেতা ও শাসকদের অতীত ও নিকট অতীতের ঘটনাবলী খুব তাড়াতাড়ি ভুলে যায়। তাদের ধর্মীয় ও নাগরিক চেতনা খুবই দুর্বল এবং রাজনৈতিক সচেতনতা প্রায় নেই বললেই চলে। এটাই কারণ, তারা বিজয়ী জাতিগোষ্ঠী এবং স্বার্থপর ও স্বার্থশিকারী নেতাদের হাতের ক্রীড়নকে পরিণত হয় এবং খুব সহজেই তাদেরকে ইচ্ছেমতো যেদিক খুশী ঘোরানো যায়। সরকারগুলো তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ফয়সালা করতে থাকে এবং যেদিকে চায় লাঠির সাহায্যে ভেড়ার পালের মত হাঁকিয়ে নিয়ে যায়।

পক্ষান্তরে পাশ্চাত্যের জাতিগুলো তাদের আধ্যাত্মিক ও নৈতিক দারিদ্র্য এবং তাদের যাবতীয় খারাবী সত্ত্বেও যার বিস্তারিত বিবরণ আমরা এই পুস্তকেই বিবৃত করেছি, নাগরিক ও রাজনৈতিক চেতনার অধিকারী। তারা পরিপক্ক রাজনৈতিক জ্ঞানের শীর্ষে পৌঁছে গেছে। তারা নিজেদের লাভ-ক্ষতি চেনে এবং জানে। তারা এও জানে, কে নিষ্ঠাবান আর কে ভণ্ড মুনাফিক, কে যোগ্য আর কে অযোগ্য। এ সবের মধ্যে পার্থক্য করতেও তারা জানে। তারা তাদের নেতৃত্ব এমন সব লোকের হাতে সোপর্দ করে না যারা অযোগ্য, দুর্বল ও আত্মসাৎকারী, খেয়ানতকারী এবং যখন নিজেদের ব্যাপারগুলো কাউকে সোপর্দ করে তখন ভয়-ভীতি ও সতর্কতার সাথেই সোপর্দ করে। যখনই তাদের অযোগ্যতা ও আত্মসাতের ব্যাপার ধরা পড়ে এবং দেখতে পায়, তারা তাদের যিম্মাদারী আদায় করেছে, তাদের কাজ শেষ হয়ে গেছে, অমনি তাদেরকে তাদের পদ থেকে, তাদের দায়িত্ব থেকে অপসারণ করে এবং তাদের জায়গায় এমন সব লোক নিয়ে আসে যারা পূর্বের লোকদের তুলনায় অধিকতর যোগ্য ও সেই সময়কার জন্য উপযোগী। এ সময় কোন নেতা কিংবা আস্থাভাজন ও বিশ্বস্ত লোকের পূর্বেকার খেদমত, গৌরবময় অতীত কিংবা কোন যুদ্ধে উল্লেখযোগ্য সাফল্য এই জাতীয় সিদ্ধান্তে বাধা হয়ে দাঁড়ায় না। এটাই কারণ, ঐ সব জাতিগোষ্ঠী পেশাদার রাজনীতিবিদ, অযোগ্য ও আত্মসাতকারী নেতাদের হাত থেকে মুক্ত ও নিরাপদ। তাদের রাজনৈতিক নেতা ও তাদের জনপ্রতিনিধিরা অত্যন্ত সতর্ক, সাবধানী ও আমানতদার হতে বাধ্য হয়। তারা মেপে মেপে পা ফেলে। জাতির ভর্ৎসনা, জনগণের ক্রোধ, অসন্তোষ, জওয়াবদিহির ভয় ও জনমতের ক্রোধাগ্নি আপতিত হবার ভয়ে তারা ভীত-সন্ত্রস্ত থাকে।

মুসলিম বিশ্বের এক বিরাট বড় প্রয়োজন এবং তার এক বিরাট বড় খেদমত এই যে, উম্মাহ্র বিভিন্ন শ্রেণী ও জনগণের মাঝে সঠিক চেতনা সৃষ্টি করা এবং সাধারণ মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিক, নাগরিক ও রাজনৈতিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা। মনে রাখতে হবে, শিক্ষার প্রচার-প্রসার ও শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর আধিক্যের দ্বারা এটা বোঝায় না, জাতির মধ্যে চেতনাবোধও বিদ্যমান। যদিও এতে কোনই সন্দেহ নেই, সাধারণ শিক্ষা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রচার-প্রসার দ্বারা চেতনাবোধ জাগ্রত করতে বিরাট সাহায্য পাওয়া যায়, কিন্তু চেতনাবোধ সৃষ্টি করার জন্য সাধারণভাবে স্থায়ী চেষ্টা-সাধনা ও প্রয়াস চালানো আবশ্যক। মুসলিম নেতৃবৃন্দ ও মুসলমানদের মধ্যে যারা সংস্কারমূলক কাজ করতে চান তাদের বেশ ভালভাবে বোঝা দরকার, যেই জাতির মধ্যে গভীর চিন্তা-ভাবনার কমতি রয়েছে সেই জাতি আস্থার যোগ্য নয়, চাই কি তাদের নিজেদের নেতাদের ওপর যতই আস্থা থাকুক এবং তারা তাদের আনুগত্য ও অনুসরণের ক্ষেত্রে যতই চোস্ত ও তৎপর কেন না হোক, তাদের আহ্বানে যত বড় বিরাট কুরবানীই তারা দিক। এজন্য, যতক্ষণ পর্যন্ত না তাদের চেতনাবোধ তৈরি হচ্ছে এবং দৃষ্টি যতদিন না পরিণত ও ধারণা পাকাপোক্ত হচ্ছে ততদিন এই বিপদাশংকা থেকেই যাবে, তারা অন্য কোন আহ্বান ও আন্দোলনের হাতিয়ারে পরিণত হবে এবং দেখতে না দেখতেই শত শত বছরের শ্রম ও সাধনাকে ব্যর্থ ও নিষ্ফল করে দেবে। যে জাতির চেতনাবোধ জাগে নি এবং যাদের মধ্যে নিজের সম্পর্কে চিন্তা করার ও ভাল-মন্দ বোঝার যোগ্যতা সৃষ্টি হয়নি তার দৃষ্টান্ত খড়-কুটো কিংবা মাঠের মধ্যে পড়ে থাকা পাখনার মত যা বিভিন্ন দিক থেকে বাতাস এসে ইচ্ছে মত এদিক থেকে ওদিক এবং ওদিক থেকে এদিক উড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়।

ইসলাম যদিও একটি আসমানী ধর্ম এবং এর বুনিয়াদ ওহী ও নবুওতের ওপর প্রতিষ্ঠিত, কিন্তু সেও তার অনুসারীদের ভেতর এমন এক বিশেষ চেতনা সৃষ্টি করেছে যা সমস্ত প্রকারের চেতনার মধ্যে অধিকতর পরিপূর্ণ, বিস্তৃত ও ব্যাপক এবং অনেক বেশি গভীর। সে তার অনুসারীদের মধ্যে এক বিশেষ প্রকারের চিন্তাধারা সৃষ্টি করে যা জাহিলী চিন্তাধারা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। সে তার অনুসারীদেরকে একটি জাগ্রত, সচেতন ও আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন চেতনা প্রদান করে যা স্বীয় বিস্তৃতি ও কুদরতী স্থিতিস্থাপকতা সত্ত্বেও ঐ সব চিন্তা- চেতনা ও দৃষ্টিভঙ্গিকে কারক করতে পারে না যা তার স্বীকৃত বিষয়বস্তুর সঙ্গে মিল খায় না এবং সে সব মৌলিক উপাদান ও অঙ্গসমূহকে হযম করতে পারে না যা তার রূহ (প্রাণসত্তা) ও মুলনীতির বিপরীত।

এই ইসলামী চেতনার একটি দৃষ্টান্ত হলো এই, ইসলামের দাওয়াত ও নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর প্রশিক্ষণ ও সাহচর্যের দ্বারা সাহাবায়ে কিরামের মন-মস্তিষ্কে একথা বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল, জুলুম এক নিকৃষ্ট জিনিস এবং তা ধর্মীয় ও নৈতিক অপরাধ যা কারুর জন্যই জায়েয নয় এবং এর ওপর তারা বিশ্বাস স্থাপন করেছিল, একজন মুসলমানকে সকলের সঙ্গেই ইনসাফ করা উচিত, চাই সে কাছের হোক অথবা দূরের, আপন হোক অথবা পর, দোস্ত অথবা দুশমন, পরিচিত অথবা অপরিচিত। তাঁরা জাহিলীসুলভ মর্যাদাবোধ ও জাতীয়, গোত্রীয়, পারিবারিক বা বংশীয় সাম্প্রদায়িকতা থেকে চিরদিনের মতো তওবা করে নিয়েছিলেন এবং বুঝে ফেলেছিলেন, ইসলামে এই অন্ধ জাতীয়তা অথবা সাম্প্রদায়িকতার কোন স্থান নেই। মুসলমানের জন্য আবশ্যক, তারা সত্যের সাথী ও সহযোগী হবে, তা সত্য যে পক্ষেই থাকুক না কেন। এটা তাঁদের বদ্ধমূল আকীদা ও বিশ্বাসে পরিণত হয়ে গিয়েছিল এবং এটা তাঁদের অস্থি-মজ্জায় মিশে গিয়েছিল, অনুপ্রবেশ করেছিল তাঁদের শিরায়-উপশিরায়।

একদিন আকস্মিকভাবে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম-এর মুখ থেকে তাঁরা শুনতে পেলেন, "তোমাদের ভাইকে সাহায্য কর, চাই সে জালেম হোক অথবা মজলুম।" যদি তাঁদের প্রশিক্ষণের ভেতর সামান্যতম ত্রুটিও থাকত এবং তাঁদের মস্তিষ্ক যদি এতটুকু বিক্ষিপ্ত ও বিস্রস্ত হত তাহলে তাঁরা চুপ করে একথা শুনতেন এবং এই কথাকে তাঁরা জাহিলী অর্থে গ্রহণ করে নিতেন যে মাফিক তাঁরা লালিত-পালিত হয়েছিলেন এবং সমগ্র জীবন এর ওপর আমল করার মধ্যেই অতিবাহিত হয়েছিল। তাঁরা এও জানতেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম (ধর্ম সংক্রান্ত) কোন কথাই নিজের খাহিশ মাফিক বলেন না। তিনি যা বলেন বা করেন তা সরাসরি ওহী হয়ে থাকে। তাঁদের চেয়ে বেশি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের প্রতি সম্মান প্রদর্শনকারী এবং তাঁর সকল কথা বিনা প্রশ্নে মেনে নেবার মত আর কেউ ছিলেন না। কিন্তু তারপরও তাঁরা নিশ্চুপ থাকতে পারলেন না। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের এই উক্তি তাঁদের আকীদাগত বিশ্বাস, চিন্তা-চেতনা ও উপলব্ধির সঙ্গে ছিল সাংঘর্ষিক যা ছিল তৎকর্তৃক প্রদত্ত শিক্ষামালা ও প্রশিক্ষণেরই ফল-ফসল। এর দ্বারা তাঁদের ইসলামী চেতনায় আঘাত লাগল এবং তাঁদের মস্তিষ্কের আল নড়বড়ে হয়ে গেল। তাঁরা তাঁদের এই কষ্টের কথা লুকোতে পারলেন না। তাঁরা বিস্ময়ের সঙ্গে জিজ্ঞেস করলেন, "আমরা মজলুমকে তো সাহায্য করব, কিন্তু জালেমকে সাহায্য করব কিভাবে?" এতে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাঁর কথার ব্যাখ্যায় বললেন, জালেম ভাইকে সাহায্য হলো, তার জুলুমের হাত ধরে তাকে তার কৃত থেকে বিরত রাখা। একথা শুনতেই তাঁদের মনের যাবতীয়

গিঁট খুলে গেল এবং তাঁদের ইসলামী মানস চেতনা এই বাণীকে এভাবে কবুল করে নিল যেমনটি কবুল করে একটি জানাশোনা সত্যকে। এটাই ইসলামী চেতনাবোধের কমনীয়তা ও মাধুর্য এবং ইসলামী তীক্ষ্ণ অনুভূতির সুস্পষ্ট উদাহরণ।

এর আরেকটি দৃষ্টান্ত নিন। একবার রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম একটি সেনাদল পাঠালেন এবং একজন সাহাবীকে তাদের আমীর নিযুক্ত করলেন। অতঃপর তাদেরকে আমীরের আনুগত্যের ব্যাপারে তাকীদ করলেন। সেখানে একটি ঘটনায় আমীর তাদের ওপর নারায হলেন যদ্দরুন তিনি একটি আগুনের কুণ্ড জ্বালিয়ে সকলকে তাতে ঝাঁপিয়ে পড়বার নির্দেশ দেন। সৈনিকেরা এ নির্দেশ মানতে অস্বীকার করল এবং বলল, আমরা তো আগুনের হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্যই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের আনুগত্য করেছিলাম। এখন কি আমরা আবার তাতেই প্রবেশ করব? নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ঘটনা আনুপূর্বিক শোনার পর সৈনিকদের নির্দেশ পালনের অস্বীকৃতিকে যথার্থ বলে সমর্থন করেন এবং বলেন, যদি সৈনিকেরা আমীরের নির্দেশ পালন করতে গিয়ে আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়ত তাহলে আর কখনো তা থেকে বেরিয়ে আসতে পারত না।

সাহাবায়ে কিরাম (রা)-এর এই অস্বীকৃতির ভিত্তি ছিল এই, তাঁরা এই উসূলের ওপর ঈমান এনেছিলেন যে, لاطاعة لمخلوق فى معصية الخالق স্রষ্টার নির্দেশ অমান্য করতে হয় সৃষ্টির এমন কোন নির্দেশ মান্য করা যাবে না। (হাদীস) আনুগত্য কেবল তখনই বাধ্যতামূলক হবে যখন তা বৈধ ক্ষেত্রে হবে।

ইসলামী চেতনা ও ইসলামী প্রশিক্ষণের ফলে সাহাবায়ে কিরাম (রা) কোন অন্যায় ও ভুল কথা কিংবা কাজ ও বেইনসাফী বরদাশত করতে পারতেন না আর তা যদি সমকালীন খলীফার দ্বারাও সংঘটিত হতো। যদি খলীফার মধ্যেও কখনো সীমা অতিক্রম দেখতেন তবে প্রকাশ্যে সমালোচনা করতে ও ত্রুটির প্রতি অঙ্গুলি সংকেত করতে তাঁরা আদৌ ইতস্তত করতেন না। একবার খলীফা ওমর (রা) খুতবা দিতে দাঁড়িয়েছেন। এ সময় তাঁর দেহে ছিল এক জোড়া কাপড়। খুতবার শুরুতেই তিনি " লোকসকল! তোমরা শোন" বলতেই জনৈক মুসলমান উঠে বলল, "না, আমরা শুনব না।" খলীফা ওমর (রা) বললেন, "শুনবে না কেন?" মুসলমান লোকটি বলল, "আপনি তো আমাদের মাঝে একটি করে কাপড় বণ্টন করেছেন, অথচ আপনার শরীরে দেখতে পাচ্ছি এক জোড়া। খলীফা হিসেবে তো আপনাকে বেশি দেওয়া হয়নি।" ওমর (রা) বললেন, "ভাই! তাড়াহুড়ো না করে

এই মজলিসে আমারই পুত্র আবদুল্লাহ আছে, সে কি বলে তা শোন।" এই বলে তিনি আবদুল্লাহকে ডাকলেন। দ্বিতীয় ডাকে জওয়াব মিলতেই তিনি আবদুল্লাহকে সম্বোধন করে বললেন, "লুঙ্গি হিসেবে যেই কাপড়টি আমি পরিধান করেছি তা কি তোমার দেয়া নয়?" পুত্র 'হাঁ' বলে জওয়াব দিতেই মুসলমান লোকটি বলে উঠল, "হাঁ, আমীরুল মু'মিনীন! এবার আপনি বলতে পারেন। এখন আমরা শুনব।"

এই ইসলামী চেতনা ও ইসলামী প্রশিক্ষণের ফল ছিল এই, বনী উমায়্যাকে তাদের বংশীয় আধিপত্য ও রাজকীয় শাসন ক্ষমতা ধরে রাখতে বিরাট বেগ পেতে হয়েছে। ইসলামী রূহ তথা ইসলামী প্রাণসত্তা বারবার এই রাজকীয় শাসনের বিরুদ্ধে কঠোর প্রতিবাদ করেছে, বিক্ষোভ করেছে এবং বারবার এই আরব শাহীর বিরুদ্ধে জিহাদী পতাকা তুলে ধরেছে। উমায়্যা শাসকরা ততক্ষণ পর্যন্ত স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে পারেনি যতদিন পর্যন্ত নির্ভীক ও প্রতিবাদী কণ্ঠগুলোর বংশধারা শেষ না হয়েছে, যাঁদের ইসলামী মূলনীতির আলোকে প্রশিক্ষণ লাভ ঘটেছিল এবং যাঁরা ইসলামী খেলাফত, ইসলামী রাষ্ট্রনীতি ও শাসন ব্যবস্থাকে অন্তর-মন দিয়ে ভালবাসতেন এবং এর থেকে চুল পরিমাণ বিচ্যুত হওয়াকেও যাঁরা বেদআত ও বিকৃতির সমার্থক মনে করতেন।

কেবল তাই নয়, বরং প্রকৃত ঘটনা হলো এই, কোন রকমের সংস্কার ও সংশোধন এবং কোন সামাজিক ও রাজনৈতিক বিপ্লব চেতনার জাগরণ ও মানসিক প্রস্তুতি ব্যতিরেকে সংঘটিত হয় না, যদিও ফরাসী বিপ্লবের আলোচনা ইসলামী দাওয়াত ও বিপ্লবের আলোচনার ধারাবাহিকতায় বেয়াদবী হবে বলে মনে করি। কেননা ফরাসী বিপ্লব ছিল একটি অসম্পূর্ণ, সীমিত ও ত্রুটিপূর্ণ বিপ্লব যা আবেগপূর্ণ জোশ ও ভারসাম্যহীনতা থেকে মুক্ত ছিল না। তদ্‌সত্ত্বেও আমরা তা থেকে এই ফলগত অর্থ বের করতে পারি, যখন কোন সমাজ কিংবা দেশের চেতনা জেগে যায় এবং মানসিক গতি কোন বিশেষ দিকে মোড় নেয় তখন সেই প্লাবনকে থামিয়ে রাখা বিরাট থেকে বিরাটতর পাথর খণ্ডের পক্ষেও দুঃসাধ্য ও অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। ফরাসী বিপ্লবের নেতৃবৃন্দ যাদের মধ্যে অনেকেই বেশ ভাল মন-মানসিকতা, বিদ্যা-বুদ্ধি ও সাহিত্য প্রতিভার অধিকারী ছিলেন এবং যাদের দলে সাহিত্যিক, ঔপন্যাসিক ও লেখকদের এক বড় বাহিনী ছিল, এক বিশেষ উদ্দেশে ও লক্ষ্যে ফরাসী জনগণের চেতনার প্রশিক্ষণ দিয়েছিল। তারা জনগণের মনে দেশের পুরনো ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের প্রেরণা সৃষ্টি করেছিল। পুরনো নৈতিক ও চারিত্রিক মুল্যবোধ, ধ্যান-ধারণা ও প্রথার বিরুদ্ধে এক সাধারণ

অশান্তি, অস্থিরতা ও অসন্তোষ সৃষ্টি করে দেয় এবং পরিবেশ-পরিস্থিতি ও বহির্বিশ্বের থেকে আগেই তাদের চিত্তের মাঝে ক্ষোভ, ক্রোধ, ঘৃণা ও অবজ্ঞার আগুন জ্বেলে দেয়। ফল হলো এই, সেই সময়কার রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থা মানুষের জন্য অসহনীয় হয়ে যায়। "স্বাধীনতা, সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব" প্রিয় শ্লোগানে পরিণত হয়। প্রত্যেক ফরাসী নাগরিকের এটাই ছিল তপজপের একমাত্র মন্ত্র। সেই সময় এই বিদ্রোহের বিস্ফোরণ ঘটল, আবেগ-উৎসাহ ও ক্রোধের আগ্নেয়গিরি লাভা উদ্গিরণ করল এবং পুরাতন সমাজ ব্যবস্থার প্রাসাদ-সৌধ ধুলিসাৎ হলো। যদিও এই বিপ্লবের নেতা ও পথ-নির্দেশকরা একে মানবতার জন্য খুব বেশি উপকারী বানাতে পারেন নি আর সম্ভবত এটা তাদের সামনে ছিলও না; কিন্তু তারা দেশের মধ্যে বিপ্লব সৃষ্টি করে দেন এবং এই বিপ্লবকে কোন শক্তিই রুখতে পারে নি। এজন্য পারেনি, এই বিপ্লবের উৎসধারা জনগণের মন ও মস্তিষ্ক থেকে উৎসারিত হয়েছিল এবং এর পেছনে ছিল জাতির সাধারণ জনমত ও জনগণের ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা এবং তাদের চেতনাবোধ এজন্য প্রস্তুত হয়েছিল।

আজ য়ূরোপ যেসব জিনিসকে অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে আছে এবং সে সমস্ত দুর্বলতাসহ যেগুলো নিয়ে কোন জাতিই বাঁচতে পারে না, অথচ আজ তারা কেবল বেঁচেই নেই, বরং তারা আজ নেতৃত্বের আসনে সমাসীন। আর তা হলো নাগরিক জীবনের দায়িত্বশীলতার অনুভূতি ও রাজনৈতিক চেতনা। আজ পর্যন্ত ইংরেজ ও আমেরিকানদের মধ্যে এমন লোকের উদাহরণ খুব কমই মিলবে যারা জাতীয় খেয়ানতের দায়ে অভিযুক্ত কিংবা নিজের দেশকে খুব সস্তা দামে বিক্রি করেছে অথবা রাষ্ট্রীয় গোপনীয়তা ফাঁস করে দিচ্ছে কিংবা খারাপ ও অচল অস্ত্র ও সমরাস্ত্র ক্রয় করার দায়ে অপরাধী। এ ধরনের উদাহরণ প্রাচ্যে প্রচুর, কিন্তু য়ূরোপে খুবই কম, বলতে গেলে নেই বললেই চলে। য়ূরোপে নৈতিক ও চারিত্রিক বিকৃতি ব্যক্তিগত পর্যায়ে সীমিত। এর যিম্মাদার অবশ্য বড় থেকে বড় মিথ্যা বলতে পারে, বিভিন্ন জাতিকে ধোঁকা দিতে পারে, পৃথিবীর বড় বড় জাতিগোষ্ঠীকে ধ্বংস ও বরবাদ করে দিতে পারে, তাদের অস্তিত্বকে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে পারে, কিন্তু তা নিজের ব্যক্তিস্বার্থের জন্য নয়, বরং জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় স্বার্থে। এটা সুনিশ্চিত, ইসলামে এ জাতীয় অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের অবকাশ নেই এবং অসৎ ক্রিয়া-কর্ম চাই তা ব্যক্তির সাথে হোক অথবা দলের সাথে, চাই তা ব্যক্তিগত উস্কানিতেই ঘটুক অথবা সামাজিক ও জাতীয় উস্কানির ভিত্তিতেই সংঘটিত হোক, অপরাধ অপরাধই, অন্যায় অন্যায়ই। কিন্তু পশ্চিমারা যা-ই কিছু করে বুঝে শুনে করে, সচেতনভাবে করে এবং সুনির্দিষ্ট নৈতিক দর্শনের আওতায় করে। প্রাচ্যের

লোকেরা যা করে না বুঝে করে, অবচেতনভাবে করে এবং ব্যক্তিগত স্বার্থ ও উস্কানি বশে করে।

মুসলিম দেশগুলোর নেতৃবৃন্দ ও ক্ষমতাসীন শাসকবর্গের পক্ষে এমনটা অসম্ভব নয়, তারা কখনো নিজেদের নগণ্য ফায়দা, আনন্দ ও আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করার স্বার্থে নিজেদের দেশকে বন্ধক দেবে কিংবা বিক্রির দলীল সম্পাদন করবে অথবা নিজের জাতিকে ছাগল-ভেড়ার মত বিক্রিই করে দেবে কিংবা নিজের জাতিকে এমন কোন যুদ্ধের মুখে ঠেলে দেবে যা তার জাতির মর্জির খেলাফ, তার স্বার্থের পরিপন্থী। এর চেয়েও বেশি বিস্ময়কর কথা হলো এই, এতদ্‌সত্ত্বেও জাতি তাদের নেতৃত্বের পতাকা বহন করে চলেছে, তাদের পক্ষে শ্লোগান দিচ্ছে এবং তাদের প্রশংসায় মুখে খৈ ফোটে। এই অবস্থা এছাড়া আর কিসের প্রমাণ বহন করে যে, জাতির বিবেক মরে গেছে, তার চিন্তাশক্তি স্থবির ও নিষ্ক্রিয় হয়ে গেছে এবং তাদের চেতনা ভোতা হয়ে গেছে। জাতি তার চেতনাবোধ থেকে মাহরূম।

বহু মুসলিম দেশ এমন আছে যেখানে জনগণের সঙ্গে চতুষ্পদ জন্তুর ন্যায় আচরণ করা হয়। যেখানে সাধারণ মানুষ কেবল গতর খাটার জন্য, কেবলই পরিশ্রম করবার জন্য আর ওপরতলার লোকেরা কেবল ভোগ-বিলাস আর আনন্দ-ফুর্তির জন্য বাঁচে। সেখানে প্রকাশ্যে আল্লাহর নাফরমানী হয় এবং হৃদয়হীন কর্মকাণ্ড ও বিবিধ অপরাধ সংঘটিত হয়। শরীয়তের বিধানসমূহকে পদদলিত করা হয়। কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও না জনগণের মধ্যে আর না সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে কোন প্রকার ক্ষোভ ও ক্রোধ পরিলক্ষিত হয় আর না সাধারণ কষ্টই তারা হৃদয়ে অনুভব করে। আর এ সবই মূলত মানবীয় পৌরুষ ও ইসলামী আত্মমর্যাবোধের অভাবের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয় এবং এ অত্যন্ত বিপজ্জনক অবস্থার ইঙ্গিতবাহী।

কোন বিপ্লব ও কোন বিদ্রোহেরই কোন মুল্য নেই (বাহ্যত তা দেশ ও জাতির জন্য যত উপকারীই হোক) যতক্ষণ পর্যন্ত না তার ভিত্তির মাঝে কোন দৃঢ় আকীদা-বিশ্বাস, বিশুদ্ধ চিন্তা-চেতনা এবং প্রশিক্ষিত ও বুদ্ধিবৃত্তিক চেতনা থাকে, যতক্ষণ পর্যন্ত না জনমত পুরোপুরি গড়ে ওঠে, ততক্ষণ পর্যন্ত কোন রাজা-বাদশাহ কিংবা সম্রাটের নির্বাসন, কোন বিপ্লবী হুকুমত ও মন্ত্রীসভার পরিবর্তন কোন প্রকার গুরুত্ব বহন করে না এবং এর ওপর নির্ভর করা যায় না। যদি জাতির মধ্যে ঐসব কাজ ও আচার-আচরণের প্রতি ঘৃণা না থাকে তাহলে এই বিপ্লব ও পরিবর্তনের দ্বারা একজন ভুল মানুষ কিংবা ভ্রান্ত দল বা পার্টির জায়গায় আরেক ভুল মানুষ বা ভ্রান্ত দল ও পার্টি আসতে পারে এবং হতে পারে,

জাতি তা অনুভবও করতে পারবে না। এজন্যই আসলে নির্ভরযোগ্য বিষয় হলো জাতির বিবেক ও চেতনাবোধ এতখানি জাগ্রত ও সচেতন হবে যে, সে কোন ভুল জিনিস ও পাপ কর্মকে কোন অবস্থাতেই এবং কোন ব্যক্তির নিমিত্তই বরদাশ্‌ত করবে না।

এজন্য মুসলিম বিশ্বের সবচে' বড় খেদমত হলো, তার ভেতর সঠিক ও সহীহ-শুদ্ধ চেতনাবোধ সৃষ্টি করা, এমন চেতনা যা কোন রকমের জুলুম ও বেইনসাফী রদাশ্‌ত করে না, ধর্ম ও নৈতিকতার বিকৃতি সহ্য করে না, যা সহীহ-শুদ্ধ ও ভুল-ভ্রান্তি, অকপটতা ও কপটতা, দোস্ত-দুশমন তথা শত্রু-মিত্র, শান্তিকামী ও অশান্তি সৃষ্টিকারীর মধ্যে খুব সহজেই পার্থক্য করতে পারে। অপরাধী ও অন্যায়কারী যেন তার অসন্তোষ ও ক্রোধের হাত থেকে বাঁচতে না পারে এবং অকপট ও নিষ্ঠাবান মানুষ যেন তার উপযুক্ত কদর ও স্বীকৃতি পাওয়া থেকে মাহরূম না হয়। সে যেন তার সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় সমস্যা-সংকট ও বিষয়াদির ক্ষেত্রে একজন বুদ্ধিমান ও পূর্ণ বয়স্ক মানুষের মত গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করতে পারে এবং ফয়সালা করার সামর্থ্য রাখে। যতদিন এই চেতনাবোধের উন্মেষ না ঘটবে, কোন মুসলিম দেশ ও জাতির কর্ম-প্রেরণা, কাজের সামর্থ্য ও যোগ্যতা, ধর্মীয় আবেগ ও মযহাবী জীবনের প্রদর্শনী ও দৃশ্যাবলী খুব বেশি একটা গুরুত্ব বহন করে না।

স্বার্থপরতা ও প্রবৃত্তি পূজার অবকাশ নেই

'আল্‌ফ লায়লা' নামক বিখ্যাত আরব্য উপন্যাস সেই যুগের প্রতিনিধিত্ব করে যে যুগে জীবন কেবল একজন মানুষ ও একজন ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হতো যাকে খলীফা কিংবা বাদশাহ বলা হতো অথবা কয়েকজন মানুষের একটি ক্ষুদ্র দলের চারপাশকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হতো যাদেরকে উযীর ও শাহযাদা বলা হতো। যমীন সেই সব খোশনসীব ব্যক্তিদের মালিকানা মনে করা হতো আর জাতি বলতে বোঝাত ক্রীতদাস ও মেহনতী মানুষের দঙ্গলকে। এই মানুষটিকে তাদের ধন-সম্পদ, জমি-জিরাত, ক্ষেত-খামার ও মান-সম্ভ্রমের মালিক মনে করা হতো এবং সমগ্র জাতি ছিল মূলত সেই এক ব্যক্তির ছায়া। গোটা জীবন, তার ইতিহাস, জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য, কাব্য-কবিতা সব তারই চারপাশে চক্রাকারে ঘুরত। যদি কেউ সেই যুগের ওপর চোখ বুলাত এবং সেই যুগের সাহিত্য পর্যালোচনা করত তাহলে সে দেখতে পেত, সেই লোকটি সেই কালের সমাজ ও সোসাইটির ওপর এভাবে কর্তৃত্ব জমিয়ে জেঁকে বসে আছে যেভাবে কোন্ বিরাটকায় বৃক্ষ তার ছায়ায় উদ্‌গত ছোট ছোট চারা গাছ ও লতাপাতার ওপর ডালপালা বিস্তার করে থাকে এবং বায়ু ও সূর্য তাপ প্রতিরোধ করে। ঠিক তেমনি

সমগ্র জাতি সেই একজনের মধ্যে হারিয়ে যায়। এরপর না ছিল তাদের কোন স্থায়ী ব্যক্তিত্ব, না ছিল ইচ্ছা বা আশা-আকাঙ্ক্ষা, না ছিল স্বাধীনতা আর না ছিল আত্মমর্যাদাবোধের অনুভূতি।

এই ব্যক্তি তিনি হতেন যাকে কেন্দ্র করে এবং যার জন্য জীবনের চাকা চক্রাকারে আবর্তিত হতো। তার জন্য চাষী হাল বইত, তারই জন্য ব্যবসায়ী পরিশ্রম করত, তারই নিমিত্ত শিল্পী ও কারিগর তার শিল্প- নৈপুণ্য প্রদর্শন করত, তারই খাতিরে লেখক বই-পুস্তক লিখত, গ্রন্থকার গ্রন্থ রচনা করত এবং কবি তার বাকশক্তির পারঙ্গমতা প্রদর্শন করত। তারই জন্য বাচ্চার জন্ম হতো এবং তার পথেই সেনাবাহিনী আক্রমণ পরিচালনা করত, এমন কি তারই খাতিরে যমীন তার ভাণ্ডার তুলে ধরত এবং সমুদ্র তার সম্পদরাজি নিক্ষেপ করত। আর জনগণ যারা মূলত এই সব সম্পদ ও প্রভাব-প্রাচুর্য, সবুজ শ্যামলিমা ও উর্বরতার কারণ হতো এবং এসবের ভিত্তি তাদের ওপর করেই হতো তারা ক্রীতদাসের মত দিন কাটাত। বাদশাহ্র দস্তরখানে এঁটোকাঁটা যা কিছু বাঁচত তারা তা পেয়েই খুশী থাকত। আর শাহী লোকজনের পক্ষ থেকে কিছু মিললে সেজন্য শোকর আদায় করত। আর যদি নাও পেত তবু ধৈর্য ধারণ করত এবং আল্লাহ্র ওপর নির্ভর করত। তাদের মানবতা ও মনুষ্যত্ব মরে গেলেও তাদের আফসোস হতো না। তারা মোসাহেবী, চাটুকারিতা ও সুবিধাবাদিতার পথ ধরত।

এটা ছিল ইতিহাসের সেই আমল যখন প্রাচ্য খুব ফুলে ফেঁপে উঠেছে এবং সমাজের ওপর প্রভাব ফেলেছে। কাব্য, সাহিত্য, সমাজ ও সংস্কৃতি সব কিছুর ওপর প্রভাব ফেলেছে। আরবী গ্রন্থাগারগুলোর ওপরও এর গভীর প্রভাব পড়ে। আর এসব প্রভাবেরই একটি জীবন্ত এ্যালবাম হল 'আল্ফ লায়লা' নামক বিখ্যাত গ্রন্থ যা সেই যুগের ছবি এঁকেছে যখন বাগদাদের কোন খলীফা অথবা দামিশ্ক ও কায়রোর কোন সুলতান কিংবা বাদশাহ সব কিছু হতেন। তাঁর অবস্থানগত মর্যাদা হতো রূপকথার নায়ক এবং এর কেন্দ্রীয় চরিত্র।

এই যে যুগ যার চিত্র আঁকা হয়েছে আল্ফ-লায়লা-র কিসসা-কাহিনীতে এবং 'কিতাবুল আগানী'র ইতিহাস ও সাহিত্যে তা ইসলামী যুগ যেমন ছিল না, তেমনি তা যুক্তি-বুদ্ধির কষ্টিপাথরেও টেকে না। ইসলামের দৃষ্টিতেও গ্রহণযোগ্য নয় তা। জ্ঞান-বুদ্ধিও তা মানতে অস্বীকার করে। ইসলাম ছিল এই অস্বাভাবিক যুগের পতনের পয়গাম। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এই যুগের নাম রেখেছেন জাহিলিয়াত যুগ। এ যুগকে তিনি ভর্ৎসনা করেছেন ও অভিশাপ দিয়েছেন। এর পতাকাবাহী ও শাসক কিসরা ও কায়সার (কাইজার)-এর পতনের সংবাদ জানিয়েছেন।

এই যুগ কোন কালে ও পৃথিবীর কোন অংশেই জীবনের যোগ্যতা ও টিকে থাকার অধিকার রাখে না। এ কেবল তখনই টিকে থাকতে পারে যখন মানুষ অবস্থার অসহায় শিকার অথবা জাগ্রত অবস্থা ও চেতনাবোধের মত সম্পদ থেকে মাহরূম হবে এবং তার প্রাণ বায়ু বেরিয়ে যাবে।

এই অবস্থা জ্ঞান-বুদ্ধি বরদাশ্ত করতে পারে না। এমন কে আছে যে এই অবস্থা পসন্দ করতে পারে, হাতে গোণা গুটি কয়েক মানুষ উদর পূর্তি করে খাবে, পান করবে, অতিরিক্ত পান-ভোজনের ফলে পেটে বদহজম হবে, অপর দিকে হাজার হাজার মানুষ অনাহারে, অর্ধাহারে ও ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর হয়ে ধুকে ধুকে জীবন দেবে? কার এ দৃশ্য ভাল লাগবে যে, একজন সম্রাট ও তার পুত্র-পরিজন ধন-সম্পদ নিয়ে পাগলের ন্যায় খেলবে, অপর দিকে লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবন ধারণের জন্য দু' বেলা দু'মুঠো মোটা ভাত ও সতর ঢাকার জন্য এক টুকরো কাপড় জুটবে না? এ অবস্থা কে মেনে নিতে পারে, এক শ্রেণীর মানুষ যারাই সমাজ ও রাষ্ট্রের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী, তারা কেবলই ফসল ফলাবে, উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত বলদের মত খাটবে, হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করবে, আর অপর দিকে হাতে গোণা কয়েক জন মানুষ রক্ত পানি করা ও ঘাম ঝরানো শ্রমের ফসল ভোগ করবে এবং এদের ওপর ছড়ি ঘোরাবে, অথচ ওদের মুখে তাদের জন্য কৃতজ্ঞতার সামান্য বাক্যটিও উচ্চারিত হবে না, এই মানুষগুলোর জন্য সামান্যতম সহানুভূতি ও দরদবোধও থাকবে না? এ অবস্থা কে সইতে পারে, কৃষক, শ্রমিক, কামার-কুমার, শিল্পী, জ্ঞানী-গুণীসহ সমাজের নানা স্তরের বিভিন্ন প্রকারের যোগ্যতার অধিকারী মানুষ যাদের কায়িক ও মানসিক শ্রমে ও অবদানে সমাজ ও রাষ্ট্র ধন্য ও সমৃদ্ধ, তারা সর্বদাই দুঃখ-কষ্টের ভার বইবে, নিত্য-নতুন যাতনা সইবে, অপর দিকে কিছু সংখ্যক লোক আরাম-আয়েশ ও ভোগ-বিলাসে গা ভাসিয়ে দেবে, মজা মারবে, ফুর্তি ওড়াবে, যারা অপব্যয় ও অপচয় ছাড়া আর কিছু জানে না, চেনে না, যারা অহরহ অন্যায় আর পাপচারের মধ্যে নিজেদেরকে আকণ্ঠ ডুবিয়ে রেখেছে, মদ পান ছাড়া যাদের আর কোন কাজ নেই? কার চোখ এই দৃশ্য দেখা পসন্দ করতে পারে, যোগ্যতাসম্পন্ন, জ্ঞান-গুণী, বিশ্বস্ত ও আমানতদার, উন্নত মস্তিষ্ক ও সূক্ষ্ম দৃষ্টির অধিকারী লোকদের সঙ্গে অস্পৃশ্যের ন্যায় আচরণ করা হবে, পক্ষান্তরে রাষ্ট্রপতি, মন্ত্রীসহ শাসকবর্গের চারপাশে এমন একদল লোক ঘুর ঘুর করবে যারা প্রবঞ্চক ও বাটপার প্রকৃতির, খল স্বভাবের, মাথামুণ্ডুহীন, বিবেক বিক্রেতা, যাদের সবচে' বড় চিন্তা যেনতেন প্রকারে সম্পদ হাসিল ও প্রবৃত্তিজাত কামনা-বাসনার নিবৃত্তি, যারা এই দুনিয়াতে চাটুকারিতা ও মোসাহেবী করা এবং নির্দোষ ও নিরপরাধ লোকদের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করা ছাড়া

আর কিছু শেখেনি, যাদের চোখের পানি শুকিয়ে গেছে এবং চেতনা ও অনুভূতি যাদের নিঃশেষ হয়ে গেছে?

এ এক অস্বাভাবিক অবস্থা যা এক দিনের জন্যও টিকে থাকা উচিত নয়, বছরের পর বছর তো নয়ই। যদি ইতিহাসের কোন যুগে এ ধরনের অবস্থা সৃষ্টি হয়ে থাকে এবং দীর্ঘকাল এ অবস্থা কয়েম থাকে তবে তা ছিল জাতির অলসতা, গাফিলতি ও বেপরোয়া মানসিকতারই ফল অথবা সে অবস্থা তাদের মর্জি ও পসন্দের বিরুদ্ধে জোরপূর্বক তাদের মাথার ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল এবং ইসলামের দুর্বলতা ও জাহিলিয়াতের শক্তির দরুন এমনটি হয়েছিল। কিন্তু যখন ইসলামের প্রভাত সূর্যের উদয় ঘটল, চেতনাবোধের উন্মেষ ঘটল এবং জাতির মধ্যে হিসাব গ্রহণ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার শান সৃষ্টি হলো তখন মিথ্যার এসব প্রাসাদ তাৎক্ষণিকভাবে ভেঙেচুরে চুরমার হয়ে গেল।

আজ যেসব লোক আল্‌ফ লায়লা'র জগতে বাস করছে তারা স্বপ্নের জগতে বাস করছে। তারা এমন ঘরে ডেরা গেড়েছে যা মাকড়সার জালের চাইতেও দুর্বল। তারা এমন ঘরে জীবন অতিবাহিত করছে যা সব সময় বিপদ-আপদ দ্বারা বেষ্টিত। কেউ বলতে পারে না, এর ওপর কখন কোদাল এসে পড়বে এবং কখন এর ছাদ ধসে পড়বে।

আল্‌ফ লায়লা'র যুগ সেই কবে চলে গেছে এবং তার দাবার বোর্ড কবে উল্টে গেছে। মুসলিম বিশ্বের আজ নিজেকে ধোঁকা দেওয়া উচিত নয় এবং গাড়ির সেই পায়ার সাথে নিজের ভাগ্যকে জড়ানো উচিত নয় যা ভেঙে গেছে। স্বার্থপরতা ও প্রবৃত্তি পূজা সেই ভোর রাতের প্রদীপের মত যার তেল ফুরিয়ে গেছে, তার সলতে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। সে নিভে যাবে, তা দমকা বাতাস আসুক আর নাই আসুক।

ইসলামে এ ধরনের আত্মম্ভরিতা ও স্বার্থপরতার কোন সুযোগ কিংবা অবকাশ নেই। তার ভেতর ব্যক্তিগত প্রাধান্য বা শ্রেষ্ঠত্ব কিংবা খান্দানী শ্রেষ্ঠত্ব বিস্তারের ও স্বার্থপরতার পা রাখারও জায়গা নেই যা আজ কোন কোন প্রাচ্য জাতিগোষ্ঠী ও মুসলিম দেশের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়। এর মধ্যে সেই ব্যাপক বিস্তৃত ও সুসংবদ্ধ স্বার্থপরতারও কোন জায়গা নেই যা আজ য়ূরোপ, আমেরিকা ও রাশিয়ায় দেখা যাচ্ছে। য়ূরোপে এর রূপ ও আকৃতি একটি পার্টি ও দলের ক্ষমতা ও প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার মধ্যে এবং আমেরিকায় পুঁজিবাদের অবয়বের ভেতর দিয়ে প্রকাশিত আর রাশিয়ায় তা সেই ছোট্ট দলের আকৃতিতে সামনে এসে হাজির হয় যারা কম্যুনিজমে বিশ্বাসী। তা অধিকাংশ মানুষের ওপর যবরদস্তি পূর্বক জেঁকে

বসে আছে এবং কৃষক, শ্রমিক ও কয়েদীদের সঙ্গে এমন নির্মম, নিষ্ঠুর ও হৃদয়হীন আচরণ করে যার উদাহরণ ইতিহাসে মেলা ভার।

এই আত্মম্ভরিতা ও স্বার্থপরতা তার সকল আকার-আকৃতি নিয়ে নির্মূল ও নিঃশেষ হবেই। আহত মানবতা এর নির্মম প্রতিশোধ নেবেই। দুনিয়ার ভবিষ্যত ইনসাফ পসন্দ, রহম দিল, ভারসাম্যপূর্ণ ইসলামের সঙ্গে জড়িত। তা স্বার্থপরতা ও আত্মসর্বস্বতা যদি আরও কিছু কালের অবকাশ পেয়েও যায় তাতেও অবস্থার হেরফের হবে না, চাই কি এর লাগাম কিছুটা ঢিলাও দেওয়া হয় এবং বিদ্রোহাত্মক কার্যকলাপ, গোমরাহী ও সীমা লংঘনের মাঝে আরও কিছুদিন অতিবাহিত করার সুযোগ তার মিলেও যায়।

স্বার্থপরতা ও আত্মম্ভরিতা তা সে ব্যক্তিকেন্দ্রিক হোক অথবা খান্দানী ও পারিবারিক, দলীয় হোক অথবা শ্রেণীগত, জাতির জীবনে এক অস্বাভাবিক জিনিস যার হাত থেকে জাতিকে প্রথম সুযোগেই মুক্তি পেতে হবে। ইসলামে এর কোন স্থান নেই, স্থান নেই সেই সমাজেও যে সমাজ সাবালকত্বে ও ভালমন্দ চেনার বয়সে পৌঁছে গেছে। মুসলমানদের জন্য, আরবদের জন্য এবং তাদের নেতৃবৃন্দ ও শাসকদের জন্য এটাই ভাল হবে, তারা এর থেকে মুক্ত হবে, স্বাধীন হবে এবং তারা এর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করবে আর তা এর সাথে ডুবে মরার আগেই।

প্রাচ্যেও আজ সংকীর্ণ দৃষ্টির রাজত্ব চলছে। এরও বিদায় নেবার পালা এসে গেছে। তার সৌভাগ্য তারকা অস্তমিত হওয়া শুরু হয়ে গেছে। এটা যায়দ, আমর ও বকরের সমস্যা নয়। এটা একটা যুগের সমস্যা, যা শেষ হয়ে যাচ্ছে। এ একটা স্কুল অব থটের সমস্যা, যার মৃত্যু ঘণ্টা বেজে গেছে। যারা এখনও এর আশ্রয় ও প্রশ্রয়ে বেঁচে রয়েছে তাদের এটা বোঝা দরকার, এই জাহাজ এখন ডুবতে বসেছে।

শিল্প-প্রযুক্তিগত ও সামরিক প্রস্তুতি

মুসলিম বিশ্বের কাজ এখানেই শেষ হচ্ছে না। যদি তার ইসলামের পয়গাম প্রচারের আকাঙ্ক্ষা থাকে এবং সে যদি দুনিয়ার নেতৃত্ব ও পথ প্রদর্শনের অপরিহার্য দায়িত্ব পালন করতে চায় তাহলে তাকে বিশিষ্ট শক্তি ও প্রশিক্ষণ, জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প-প্রযুক্তি, ব্যবসা-বাণিজ্য ও সমরশাস্ত্রে পূর্ণাঙ্গ প্রস্তুতি নিতে হবে। তাকে জীবনের প্রতিটি শাখায়, প্রতিটি বিভাগে ও নিজের প্রতিটি প্রয়োজনে পাশ্চাত্যের হাত থেকে মুক্ত ও আত্মনির্ভরশীল হতে হবে এবং তা এই পর্যায়ের হতে হবে, নিজের পরিধানের বস্ত্র ও জীবন ধারণের খাদ্যে সে যেন স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়। নিজেদের প্রয়োজনীয় অস্ত্র যেন সে নিজেই তৈরি করতে পারে। নিজেদের

জীবনের যাবতীয় ব্যাপারের এন্তেজাম সে যেন নিজেই করতে পারে এবং তা যেন নিজেদের হাতেই থাকে।

নিজেদের যমীনের বুকে লুক্কায়িত খনিজ সম্পদ নিজেরাই যেন উত্তোলন করতে পারে এবং তা থেকে উপকৃত হতে পারে। নিজেদের সরকার নিজেদের সম্পদ ও নিজেদের লোক দিয়েই যেন পরিচালনা করে। তার চতুর্দিকে বিশাল বিস্তৃত সমুদ্রগুলোতে তাদেরই সামুদ্রিক জাহাজ ও নৌবহর যেন বিচরণ করে। শত্রুর মুকাবিলা নিজেদের ডকইয়ার্ডে নির্মিত যুদ্ধ জাহাজ, কামান ও অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে করবে। তাদের আমদানীর চেয়ে রফতানী যেন বেশি হয় এবং পাশ্চাত্যের দেশগুলোর কাছে ঋণ গ্রহণের জন্য যেন হাত পাততে না হয় আর তাদের কারোর পতাকাতলে যেন না যেতে হয় এবং কোন ব্লক কিংবা শিবিরে যোগ দিতে যেন বাধ্য না হয়।

যতদিন পর্যন্ত মুসলিম বিশ্ব জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, রাজনীতি, শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যে পাশ্চাত্যের মুখাপেক্ষী থাকবে পাশ্চাত্য তাদের রক্ত শোষণ করতে থাকবে, তাদেরই ভূখণ্ডের জীবনী-শক্তি তারা বের করে নেবে, তাদের ব্যবসা-উপকরণ ও শিল্পজাত দ্রব্যাদি প্রতিদিন মুসলিম দেশগুলোর বাজার ও পকেটগুলোতে হানা দিতে থাকবে এবং নিজেদের সরকার চালাতে, গুরুত্বপূর্ণ পদগুলো পূরণ করতে, নিজেদের সেনাবাহিনীকে ট্রেনিং দিতে পাশ্চাত্যের লোকগুলোর দ্বারস্থ হতে থাকবে, সেখানকার বাণিজ্য ও শিল্পজাত দ্রব্যাদি চাইতে থাকবে, তাদেরকে নিজেদের অভিভাবক, উস্তাদ, মুরুব্বী, শাসক ও সর্দার মনে করবে, তাদের নির্দেশ ও তাদের মতামত ছাড়া কোন কাজ করবে না ততদিন পর্যন্ত তারা পাশ্চাত্যের মুকাবিলা করা তো দূরের কথা, তাদের চোখের দিকে তাকিয়ে কথাও বলতে পারবে না।

এই জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্প-প্রযুক্তি ছিল জীবনের সেই শাখা যে সম্পর্কে মুসলিম বিশ্ব অতীতে অলসতা ও গাফিলতির আশ্রয় গ্রহণ করেছিল যার শাস্তি হিসেবে তাকে দীর্ঘ ও অবমাননাকর জীবনের স্বাদ ভোগ করতে হয় এবং তার ওপর পাশ্চাত্যের নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব চাপিয়ে দেওয়া হয় যারা পৃথিবীর বুকে ধ্বংস ও বরবাদী, হত্যা, খুন-খারাবী ও আত্মহত্যার রাজত্ব কায়েম করে। এখন আবার এই সময়ও যদি মুসলিম বিশ্ব জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প-প্রযুক্তির আবিষ্কার-উদ্ভাবনে ও নিজেদের ব্যাপারগুলোতে স্বাধীনতা সম্পর্কে গাফিলতির আশ্রয় নেয় এবং এবারও যদি তার দ্বারা এই ভুল সংঘটিত হয়ে যায় তাহলে দুনিয়ার ভাগ্যে দুর্ভাগ্য লিখে দেওয়া হবে এবং মানবতার পরীক্ষার মুদ্দতকাল আরও দীর্ঘ হয়ে যাবে।

নতুন শিক্ষা ব্যবস্থা সংগঠন

মুসলিম বিশ্বের জন্য জরুরী হলো, শিক্ষা ব্যবস্থা এভাবে নতুন করে ঢেলে সাজানো যা হবে তার রূহ ও তার পয়গামের সঙ্গে সঙ্গতিশীল। মুসলিম বিশ্ব প্রাচীন পৃথিবীর (ইসলামের প্রথম কয়েক শতাব্দীর) ওপর তার জ্ঞানগত নেতৃত্ব কায়েম করেছিল এবং দুনিয়ার বুদ্ধিবৃত্তি ও সভ্যতা-সংস্কৃতি (কালচার)-র অস্থি-মজ্জায় মিশে গিয়েছিল। সে দুনিয়ার সাহিত্য ও দর্শনের হৃৎপিণ্ডে তার বাসা বানিয়েছিল। শতাব্দীর পর শতাব্দী সভ্য দুনিয়া তার বুদ্ধি দিয়ে চিন্তা করেছে, তার কলম দিয়ে লিখেছে এবং তারই ভাষায় লেখালেখি করেছে, গ্রন্থ প্রণয়ন করেছে। অনন্তর ইরান, তুর্কিস্তান, আফগানিস্তান ও ভারতবর্ষের জ্ঞানী-গুণী লেখক যদি কোন গুরুত্বপূর্ণ বই-পুস্তক লিখতে চাইতেন তাহলে তা আরবী ভাষাতেই লিখতেন। কোন কোন লেখক মূল কিতাব আরবীতে লিখতেন এবং এর সংক্ষিপ্তসার ফারসী ভাষাতে লিখতেন। ইমাম গাযালী (র) তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ "কিমিয়াই-সা'আদত"-এর ক্ষেত্রে এটাই করেছেন। যদিও জ্ঞান-বিজ্ঞানের এই আন্দোলন যা আব্বাসী শাসনামলের সূচনায় শুরু হয়েছিল, গ্রীস ও অনারব এলাকার জ্ঞান-বিজ্ঞান দ্বারা প্রভাবিত ছিল এবং তা ইসলামী স্পিরিট ও ইসলামী চিন্তা-চেতনার ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল না এবং এর মধ্যে জ্ঞানগত ও ধর্মীয় দিক দিয়ে কতিপয় ত্রুটি ও দুর্বলতা ছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও আপন শক্তি ও সজীবতার কারণে গোটা দুনিয়ার ওপর বানের পানির মত তা ছেয়ে যায় এবং প্রাচীন শিক্ষা ব্যবস্থা এর সামনে অবশ ও বিবশ হয়ে থেকে যায়।

এরপর য়ূরোপের উন্নতি ও উত্থানের যুগ এল। সে তার প্রাচীন ব্যবস্থাকে আপন অভিজ্ঞতা ও তাত্ত্বিক সমালোচনা দ্বারা পুরাতন বর্ষপঞ্জী বানিয়ে দিল এবং সে স্থানে শিক্ষা ও পাঠ দানের নতুন ব্যবস্থা প্রণয়ন করল যা তার রূহ তথা প্রাণসত্তা, বুদ্ধিবৃত্তি ও মনস্তত্ত্বের ছিল সার্থক নমুনা। যেই শিক্ষার্থী এই শিক্ষার ও জ্ঞানগত পরিবেশ থেকে শিক্ষা সমাপনের পর বেরিয়ে আসত তার প্রতিটি শিরায় শিরায় এই স্পিরিট কাজ করত। দুনিয়া দ্বিতীয়বার এই শিক্ষা ব্যবস্থার সামনে আত্মসমর্পণ করল এবং মুসলিম বিশ্বকেও স্বাভাবিকভাবেই এর সামনে মস্তক অবনত করতে হলো যারা দীর্ঘকাল থেকে জ্ঞানগত অধঃপতন ও চিন্তার জগতে জড়তা ও স্থবিরতার শিকার ছিল এবং হীনমন্যতাবোধের কারণে নিজেদের মুক্তি কেবল য়ূরোপের অন্ধ অনুকরণের মধ্যেই নিহিত বলে মনে করত। সে এই শিক্ষা ব্যবস্থাকে তার যাবতীয় দুর্বলতা ও ত্রুটি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও কবুল করে নেয় এবং সেই শিক্ষা ব্যবস্থাই আজ মুসলিম বিশ্বের প্রতিটি প্রান্তে জেঁকে বসে আছে।

এই ব্যবস্থার স্বাভাবিক পরিণতি হলো, ইসলামী মনস্তত্ত্ব ও আধুনিক মনস্তত্ত্বের মধ্যে সংঘাত দেখা দিল। ইসলামী নীতি ও নৈতিকতাবোধ এবং পাশ্চাত্য নীতি-নৈতিকতাবোধের মধ্যে দ্বন্দ্ব শুরু হলো। বস্তুসামগ্রী ও এর মূল্য ও মান নিরূপণের নতুন-পুরাতন নিক্তির মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। এই ব্যবস্থার একটি ফল বের হলো, শিক্ষিত ও সভ্য শ্রেণীর মধ্যে সন্দেহ-সংশয় ও কপটতা, ধৈর্যহীনতা, জীবনের প্রতি ভালবাসা ও লোভ, বাকীর তুলনায় নগদকে অগ্রাধিকার প্রদানের মানসিকতা সৃষ্টি হয়ে গেল, আর এভাবেই অপরাপর দোষ-ত্রুটিও সৃষ্টি হয়ে যায় যা পাশ্চাত্য সভ্যতার আবশ্যকীয় উপাদান।

যদি মুসলিম বিশ্বের খাহেশ থাকে, সে নতুনভাবে আবার গোড়া থেকে তার জীবন শুরু করবে এবং অন্যদের গোলামী থেকে মুক্তি লাভ করবে, যদি সে বিশ্বের নেতৃত্ব লাভ করতে চায় তাহলে কেবল শিক্ষার ক্ষেত্রে স্বশাসিত ও স্বায়ত্তশাসিত হলেই চলবে না, তাকে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রেও নেতৃত্ব নিতে হবে এবং এটা খুবই জরুর আর এ খুব সহজও নয়। এ বিষয়টি নিয়ে গভীরভাবে ভেবে দেখার ও চিন্তা করার প্রয়োজন রয়েছে। এজন্য প্রয়োজন ব্যাপকভাবে বই-পুস্তক রচনা করা এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ময়দানে নতুনভাবে কাজ শুরু করা। এ কাজে যারা নেতৃত্ব দেবেন তারা সমকালীন জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সম্পর্কে এতটাই ওয়াকিফহাল ও গভীর অন্তর্দৃষ্টির অধিকারী হবেন যা গবেষণা ও সমালোচনার স্তরে গিয়ে পৌঁছে এবং এরই সাথে সাথে ইসলামের মূল উৎস থেকে পরিপূর্ণ প্লাবিত ও ইসলামী রূহ তথা প্রাণসত্তা দ্বারা তার দিল্ ও দৃষ্টি পূর্ণ ও সমৃদ্ধ হবে। এটা সেই অভিযান যার পরিপূর্ণতা কোন দল কিংবা সংগঠনের জন্য কঠিন হবে। এ কাজ ইসলামী হুকুমতের, মুসলমানদের সরকারের। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তাকে সুসংগঠিত ও সুশৃঙ্খল দল ও পূর্ণাঙ্গ প্রতিষ্ঠান কায়েম করতে হবে এবং এমন সব বিশেষজ্ঞ বাছাই করতে হবে যারা প্রতিটি বিষয়ে অভিজ্ঞ এবং এমন শিক্ষাক্রম ও সিলেবাস তৈরি করতে হবে যা একদিকে যেমন কুরআন-সুন্নাহ্‌র অটুট বিধান (محكمات) ও ধর্মের অপরিবর্তনীয় হাকীকতসম্বলিত হবে, অপর দিকে কল্যাণকর সমকালীন জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, এসবের বিশ্লেষণ, পৃথক পৃথকভাবে বিভিন্ন অংশের পর্যবেক্ষণের ব্যাপারে হবে পরিবেষ্টনকারী। তারা মুসলিম তরুণ ও যুবকদের নিমিত্ত আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে একেবারে গোড়া থেকে বিন্যস্ত করবেন যা হবে ইসলামের মূলনীতি ও ইসলামী প্রাণসত্তার বুনিয়াদের ওপর প্রতিষ্ঠিত। এতে এমন সব জিনিস থাকবে যা হবে যুবক শ্রেণীর জন্য জরুরী, যা

দিয়ে তারা নিজেদের জীবনকে সংগঠিত করতে পারে এবং নিজেদের নিরাপত্তার হেফাজত করতে পারে। তারা পাশ্চাত্যের মুখাপেক্ষী হবে না, বরং তারা হবে আত্মনির্ভরশীল। তারা বস্তুগত ও মেধার যুদ্ধে পাশ্চাত্যের মুকাবিলায় যেন দাঁড়াতে পারে। তারা নিজেদের মাটির তলে লুক্কায়িত খনিজ সম্পদ থেকে যেন উপকৃত হতে পারে এবং নিজেদের দেশের সম্পদ কাজে লাগাতে পারে, ব্যবহারে আনতে পারে। তারা মুসলিম দেশগুলোর অর্থনীতি নতুনভাবে ঢেলে সাজাবেন এবং একে ইসলামী শিক্ষামালার আওতায় এভাবে পরিচালনা করবেন যে, সরকার পদ্ধতি ও অর্থনৈতিক বিষয়াদির সংগঠনে য়ূরোপের ওপর ইসলামী ব্যবস্থার শ্রেষ্ঠত্ব যেন পরিষ্কারভাবে ফুটে ওঠে এবং এর দ্বারা সেই সব অর্থনৈতিক সমস্যা ও সংকটের যেন সমাধান ঘটে যা সমাধান করতে না পেরে য়ূরোপ হাল ছেড়ে দিয়ে তার ব্যর্থতা স্বীকার করে নিয়েছে।

এই আধ্যাত্মিক, শিল্প-প্রযুক্তিগত, সামরিক প্রস্তুতি ও শিক্ষার স্বাধীনতার সাথেই মুসলিম বিশ্বের উত্থান ঘটতে পারে, নিজেদের পয়গাম পৌঁছাতে পারে এবং পৃথিবীকে সেই ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাতে পারে, মুক্তি দিতে পারে যা তার মাথার ওপর ঘুরে বেড়াচ্ছে। নেতৃত্ব হাসি ও খেল-তামাশার বস্তু নয়। এ খুবই গুরু-গম্ভীর বিষয়। এর জন্য প্রয়োজন সুশৃঙ্খল চেষ্টা-সাধনা, পরিপূর্ণ প্রস্তুতি, বিরাট কুরবানী এবং কঠোর কঠিন ও প্রাণান্তকর সাধনা।

অষ্টম অধ্যায়

আরব বিশ্বের নেতৃত্ব

আরব বিশ্বের গুরুত্ব

বিশ্বের রাজনৈতিক মানচিত্রে আরব জাহানের গুরুত্ব অপরিসীম। আরব বিশ্ব সেই সব জাতিগোষ্ঠীর লালন ক্ষেত্র ও দোলনা বিশেষ যারা মানব ইতিহাসে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। তার বুকে শক্তি ও সম্পদের এক বিপুল ভাণ্ডার সংরক্ষিত। তার আছে পেট্রোল যা আজ সামরিক ও শিল্পক্ষেত্রে সেই ভূমিকা পালন করে যেমনটি পালন করে শরীরের ক্ষেত্রে রক্ত এবং য়ুরোপ, আমেরিকা ও দূরপ্রাচ্যের মাঝে সংযোগ সেতু হিসেবে বিরাজ করছে।

আরব জাহান মুসলিম বিশ্বের স্পন্দিত হৃৎপিণ্ড যার দিকে আধ্যাত্মিক ও ধর্মীয় (دم بهرنا) দিক দিয়ে গোটা মুসলিম বিশ্বের গতি পরিচালিত হয়, যারা সব সময় তার আলোচনায় মুখর এবং তার প্রতি ভালবাসায় ও বিশ্বস্ততায় আপ্লুত। তার গুরুত্ব এজন্য আরও বৃদ্ধি পায়, এর পূর্ণ সম্ভাবনা বিদ্যমান, আল্লাহ্ না করুন, তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের এ যেন রণক্ষেত্রে পরিণত না হয়! কেননা সেখানে শক্তিশালী বাহু আছে চিন্তা-ভাবনা করার মত, উপলব্ধি করার মত বুদ্ধি-বিবেচনা আছে, যুদ্ধ করার মত শক্তিশালী দেহ আছে, আছে বড় বড় বাণিজ্য কেন্দ্র ও কর্ষণযোগ্য উর্বর ভূমি।

মিসর আরব জাহানের বুকেই অবস্থিত যা উৎপদিত খাদ্যশস্যে, আয়-আমদানীতে, শ্যামল সবুজে ও উর্বরতায়, সম্পদে ও উন্নতি-অগ্রগতিতে এবং সভ্যতা-সংস্কৃতির ময়দানে এক বিশেষ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত যার কোল দিয়ে নীলনদ প্রবাহিত। এখানেই আছে ফিলিস্তীন ও তার প্রতিবেশী দেশগুলো যা আবহাওয়ার শোভা-সৌন্দর্য ও দৃষ্টিনন্দন দৃশ্যের অপূর্ব সমাহারে ও সামরিক গুরুত্বে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে।

তার আছে ইরাকের মত দেশ যা আপন শৌর্যে-বীর্যে, কষ্ট সহিষ্ণুতায়, বীরত্বে, অটুট ইচ্ছাশক্তি ও মনোবলে অদ্বিতীয়। তদুপরি পেট্রোলের ভাণ্ডার হিসেবেও সে মশহূর।

এখানেই আছে আরব উপদ্বীপ (জযীরায়ে আরব) যা স্বীয় আধ্যাত্মিক কেন্দ্র ও ধর্মীয় প্রভাবের দিক দিয়ে একক ও অনন্য যার হজ্জের মত বার্ষিক সমাবেশের

নজীর বিশ্বের বুকে আর নেই, যেখানকার তেল খনি সর্বাধিক পরিমাণ তেল উৎপাদন করে থাকে।

এসব জিনিসের কারণেই আরব জাহানকে পাশ্চাত্যের অধিবাসীদের দৃষ্টিকেন্দ্র, তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার কেন্দ্রস্থল এবং নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের নিমিত্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্রে পরিণত করেছে যার প্রতিক্রিয়া হয়েছে, এসব দেশে আরব জাতীয়তাবাদ ও দেশপূজার তীব্র মানসিকতা সৃষ্টি হয়ে গেছে।

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা) আরব জাহানের প্রাণ (রূহ)

একজন মুসলমান আরব জাহানকে যেই দৃষ্টিতে দেখে তার ভেতর এবং একজন য়ূরোপীয়ের দৃষ্টির মধ্যে আসমান যমীন পার্থক্য রয়েছে, বরং একজন দেশপূজারী আরব জাহানকে যে চোখে দেখে থাকে তা একজন মুসলমানের দৃষ্টি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন।

একজন মুসলমান আরব জাহানকে দেখে থাকে ইসলামের লালন ক্ষেত্র হিসেবে, দোলনা হিসেবে, ইসলামের আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে, বিশ্ব নেতৃত্বের মারকায হিসেবে, আলোর মিনার হিসেবে। সে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে, মুহাম্মাদ আরাবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম আরব জাহানের জান-প্রাণ, তার সম্মান ও গর্বের শিরোনাম এবং তার ভিত্তি-প্রস্তর। যদি এর থেকে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে আলাদা ও পৃথক করে দেওয়া হয় তাহলে যাবতীয় শক্তির ভাণ্ডার ও সম্পদের উৎস সত্ত্বেও তার অবস্থানগত মর্যাদা একটি নিষ্প্রাণ লাশ ও রঙহীন বর্ণহীন ছবির চেয়ে বেশি হবে না। মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামেরই বরকতময় সত্তা যদ্দরুন আরব জাহানের অস্তিত্ব লাভ ঘটেছে। এর আগে এই দুনিয়া বণ্টিত, খণ্ডিত ও বিক্ষিপ্ত একক সমষ্টি, পরস্পরের সঙ্গে বিবদমান গোত্র, গোলাম জাতিসমষ্টি এবং যোগ্যতা ও সামর্থ্যের অপচয়কারীর আরেক নাম মাত্র ছিল। এর আকাশে অজ্ঞতা, মূর্খতা ও গোমরাহীর ভরা মেঘ ছেয়ে ছিল। আরবরা কোনদিন রোমান সাম্রাজ্যের সঙ্গে সংঘর্ষে প্রবৃত্ত হবে, এমন স্বপ্ন কস্মিনকালেও কেউ দেখেনি, দেখত না, দেখতে পারত না। এর কল্পনাও তাদের জন্য কঠিন ছিল। শাম (আজকের সিরিয়া, লেবানন, ফিলিস্তীন ও জর্দানসহ) যা পরবর্তীকালে আরব জাহানের এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে অভিহিত হয়, একটি রোমান উপনিবেশ ছিল যা স্বেচ্ছাচারী স্বৈরতান্ত্রিক হুকুমত ও কঠোর একনায়কতন্ত্রের যাতাকলে শোষিত ও নিষ্পেষিত হতো। তারা তখন পর্যন্ত স্বাধীনতা ও সুবিচারের অর্থ কিংবা মর্ম কোনটাই বোঝেনি।

ইরাক ছিল কায়ানী রাজবংশের ইচ্ছা-অভিরুচি ও কামনা-বাসনার শিকার। নিত্য-নতুন ট্যাক্স ও করভারে সেখানকার সাধারণ মানুষের কোমর গিয়েছিল

বেঁকে। রোমকরা মিসরের সঙ্গে গরুর সাথে কৃত আচরণের মতই আচরণ করত। দুধ দোহন ও ফায়দা লোটার ক্ষেত্রে কোন কমতি ছিল না, কিন্তু প্রয়োজনীয় খাবার জোগাবার ক্ষেত্রে তারা বখিলী করত। এছাড়া রাজনৈতিক জোর-যবরদস্তি ও জুলুম-নিপীড়নের সাথে ধর্মীয় জোর-যবরদস্তি ও নিপীড়নও সমান তালেই চলত। এরপর হঠাৎ করেই বিভক্ত, বিক্ষিপ্ত ও নির্যাতিত পৃথিবীর বুকে ইসলামের বসন্ত সমীরণের একটি দমকা প্রবাহিত হলো। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম আগমন করলেন। সে সময় এই আরবী বিশ্ব ধ্বংসের দ্বার প্রান্তে পৌঁছে গিয়েছিল তিনি তাদেরকে বাঁচতে সহায়তা করলেন। তাদের নাড়ির স্পন্দন স্তিমিত হতে চলেছিল, তিনি জীবন দান করলেন, নতুন আলো দিলেন, কিতাব ও হিকমতের তা'লীম দিলেন, আত্মিক পরিশুদ্ধির সবক শেখালেন। তাঁর আবির্ভাবের পর এই পৃথিবীর চেহারাটাই পাল্টে গেল। এখন আরব জাহান ইসলামের দূত। শান্তি ও নিরাপত্তার বার্তাবাহক। সভ্যতা ও সংস্কৃতির পতাকাবাহী। পৃথিবীর তাবৎ জাতিগোষ্ঠীর জন্য দয়া ও করুণার পয়গাম। এখন আমরা সিরিয়ার নাম নিতে পারি। ইরাকের কথা উল্লেখ করতে পারি। আমরা মিসর নিয়েও গর্ব করতে পারি। যদি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম না হতেন আর যদি তাঁর পয়গাম না হ'ত, না হ'ত তাঁর দাওয়াত, তাহলে আজ যেমন সিরিয়ার কোন পাত্তা থাকত না, তেমনি ইরাকেরও কোন উল্লেখ পাওয়া যেত না। তেমনি ইতিহাসের পাতায় মিসরকেও খুঁজে পাওয়া যেত না। আরব জাহানই থাকত না। কেবল তাই নয়, দুনিয়াও সভ্যতা-ভদ্রতা, শালীনতা ও শিষ্টাচার, জ্ঞান-বিজ্ঞান, কৃষ্টি-কালচার ও উন্নতি-অগ্রগতির এই পর্যায়ে এসে পৌঁছুত না। এখন যদি আরব জাতিগোষ্ঠী ও সরকারগুলোর মধ্যে কেউ ইসলাম ধর্মের হাত থেকে মুক্ত হতে চায় এবং নিজেদের মুখ পশ্চিমা দেশগুলোর দিকে ঘুরিয়ে নিতে ইচ্ছুক হয় কিংবা ইসলাম-পূর্ব প্রাচীন আরবের দিকে লোভাতুর দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে চায় অথবা নিজেদের জীবন-ব্যবস্থা, রাজনীতি ও সরকার পদ্ধতিতে পশ্চিমা সংবিধান ও পাশ্চাত্যের আইন-কানুন ও বিধি-বিধান বলবৎ করতে চায়, অনুসরণ করতে আগ্রহী হয় এবং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে নিজেদের ইমাম, সর্দার, পথ-প্রদর্শক, আদর্শ ও মানদণ্ড হিসেবে মেনে নিতে না চায় তাহলে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম নে'মত হিসেবে তাদের যা দিয়েছেন তা তাৎক্ষণিকভাবে তারা ফিরিয়ে দিক এবং ইসলাম-পূর্ব জাহিলী যুগে তারা ফিরে যাক যেখানে রোমক ও পারসিকদের রাজত্ব চলত, যেখানে জুলুম-নিপীড়নের বাজার ছিল গরম, যেখানে সাম্রাজ্যবাদের কর্তৃত্ব চলত, যেখানে অজ্ঞতা, মূর্খতা ও গোমরাহী চলত, যেখানে ছিল গাফিলতি ও নিষ্ক্রিয় জীবন, যেখানে দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন অজানা অচেনা

এক কোণে এক অজ্ঞাত জীবন অতিবাহিত হচ্ছিল। এজন্য যে, এই শানদার ও আলোকোজ্জ্বল ইতিহাস, এই দীপ্তিমান সভ্যতা, এই সাহিত্যের সরগরম মাহফিল, এইসব আরব সাম্রাজ্য ও সরকার সে শুধুই মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের মুবারক আবির্ভাবের অবদান এবং তাঁরই শুভাগমনের ফল-ফসল।

ঈমানই আরব জাহানের শক্তি

ইসলাম আরব জাহানের জাতীয়তা, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম তার ইমাম ও নেতা আর ঈমান হলো তার শক্তির উৎস ও ভাণ্ডার যার ওপর ভরসা করে সে অপরাপর জাতিগোষ্ঠীর মুকাবিলা করেছে এবং বিজয়ী হয়েছে। তার শক্তির রহস্য, তার কার্যকর অস্ত্র ও মোক্ষম হাতিয়ার কাল যা ছিল, আজও তাই আছে যা নিয়ে সে শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করতে পারে, নিজের অস্তিত্ব রক্ষা করতে পারে এবং অন্যদের পর্যন্ত নিজের পয়গাম পৌঁছুতে পারে।

আরব জাহানকে যদি কম্যুনিজম ও ইয়াহূদীবাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয় কিংবা অন্য কোন শত্রুর সঙ্গে মুকাবিলা করতে হয় তাহলে সে সেই সম্পদের ওপর নির্ভর করে যুদ্ধ করতে পারে না যা ব্রিটেন তাকে দেয় কিংবা আমেরিকা তাকে খয়রাত করে কিংবা পেট্রোলের বিনিময়ে সে লাভ করে। সে তার শত্রুর মুকাবিলা কেবল সেই ঈমান, সেই অর্থপূর্ণ শক্তি, সেই রূহ তথা প্রাণসত্তা ও স্পিরিটকে সাথে নিয়েই করতে পারে যেই স্পিরিটের সাথে কখনো তারা একই সঙ্গে রোম ও পারস্য সরকারকে যুদ্ধের আহ্বান জানিয়েছিল এবং জয় লাভ করেছিল। সে সেই হৃদয় নিয়ে যুদ্ধ করতে পারে না যে জীবনকে গভীরভাবে ভালবাসে এবং মৃত্যুকে ঘৃণা করে। সেই শরীর নিয়ে মুকাবিলা করতে পারে না যা আরাম-আয়েশ ও বিলাস-ব্যসনে প্রিয় ও অভ্যস্ত। সেই বুদ্ধি-বোধ নিয়েও মুকাবিলা করতে পারে না যাতে সন্দেহ ও সংশয়ের ঘুন লেগেছে এবং যার চিন্তা-চেতনা ও কামনা-বাসনা পরস্পরের সঙ্গে সংঘর্ষরত। তাকে মনে রাখতে হবে, দুর্বল ঈমান, সন্দেহযুক্ত দিল্ ও ময়দানের সঙ্গ পরিত্যাগকারী শক্তি সাথে নিয়ে আর যা-ই হোক, যুদ্ধের ময়দান কখনো জেতা যায় না। আরবের নেতৃবৃন্দ ও আরব লীগের দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গের জন্য সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো, তারা আরবী ফৌজ, কৃষক, ব্যবসায়ী ও জনগণের প্রতিটি স্তরে ঈমানের বীজ বপন করুন, চারা রোপণ করুন। তাদের মধ্যে জিহাদী প্রেরণা, জান্নাতের প্রতি আগ্রহ এবং বাহ্যিক বসন-ভূষণ ও সাজ-সজ্জার প্রতি ঘৃণা ও অবজ্ঞা সৃষ্টি করুন। তাদেরকে প্রবৃত্তিজাত কামনা-বাসনা ও জীবনের কাঙ্ক্ষিত বস্তুসমূহের ওপর নিয়ন্ত্রণ লাভ করা, আল্লাহ্র পথে বিপদ-আপদ ও দুঃখ-কষ্ট সহ্য করা এবং হাসিমুখে মৃত্যুকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন ও মৃত্যুর মুখে পতঙ্গের ন্যায় ঝাঁপিয়ে পড়ার সবক দিন।

অশ্বারোহণ ঃ সৈনিক জীবনে এর গুরুত্ব

এ এক দুঃখজনক সত্য যে, আরব জাতিগুলো তাদের বহু সৈনিকসুলভ বৈশিষ্ট্য নষ্ট করে ফেলেছে, বিশেষ করে অশ্বারোহণ তাদের জীবন থেকে একেবারে বিদায় নিয়েছে যা এক বিরাট বড় ক্ষতি এবং যুদ্ধ ক্ষেত্রে পরাজয় বরণ ও দুর্বলতার খুবই গুরত্বপূর্ণ কারণ। এর ফল হয়েছে এই, ঐসব জাতিগোষ্ঠীর ফৌজী স্পিরিট যা তাদের অনন্য জাতীয় বৈশিষ্ট্য ছিল তা খতম হয়ে গেছে। শরীর দুর্বল ও শক্তিহীন হয়ে গেছে। লোকে নায-নে'মতের মধ্যে জীবন যাপন করতে শুরু করেছে। ঘোড়ার স্থান দখল করেছে মোটর যান। ফলে যেই আরবীয় অশ্বের দুনিয়া জোড়া নাম তার অস্তিত্ব আজ আরব দেশগুলো থেকে মুছে যেতে বসেছে। মানুষ কুস্তি খেলা, অশ্বারোহণ, সামরিক অনুশীলন ও অন্যান্য দৈহিক ব্যয়াম ছেড়ে দিয়েছে এবং এমন সব খেলাধুলা গ্রহণ করেছে যার কোন উপকারিতা নেই। এজন্য শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের জগতে যারা নেতৃত্ব দিচ্ছেন তাদের জন্য জরুরী হলো, আরব তরুণ ও যুবকদের মধ্যে অশ্বারোহণ, সৈনিক জীবন, অনাড়ম্বর ও সহজ সরল জীবন, স্থৈর্য ও অটুট সংকল্প ও দুঃখ-কষ্টকে ধৈর্য ও স্থৈর্যের সঙ্গে মুকাবিলা করার যোগ্যতা সৃষ্টি করা।

আমীরুল মু'মিনীন হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা) অনারব দেশগুলোতে নিযুক্ত কর্মকর্তাদেরকে লিখেছিলেন ঃ

اياكم والتنعم وزى العجم وعليكم بالشمس فانها حمام العرب وتمعددوا واخشوا شنوا واخلو لقوا واعطوا الركب اسنتها وانزوا نزوا وارموا الاغراض ـ

"অলস ও আরামপ্রিয় জীবন এবং অনারবীয় পোশাক-পরিচ্ছদ থেকে সব সময় দূরে থাকবে, রৌদ্রে বসা ও পথ চলার অভ্যাস বজায় রাখবে। কেননা তা আরবদের হাম্মাম। সহনশীলতা, সহজ সরল জীবন, ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা ও মোটাসোটা কাপড় পরিধানে অভ্যস্ত থেকো। লাফিয়ে অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করার অভ্যাস রাখবে। নিশানাবাজিতে হতে হবে অব্যর্থ (বাগাবী)।"

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

ارموا بنى اسمعيل فان اباكم كان راميا ـ

"হে আরবের বনূ ইসমাঈল! তোমরা তীরন্দাযীর অনুশীলন কর। আর তা এজন্য যে, তোমাদের পিতৃপুরুষ হযরত ইসমাঈল তীরন্দায ছিলেন (বুখারী)।"

অন্যত্র বলেন ঃ

الا ان القوة الرمى الا ان القوه الرمى-

"মনে রেখ, (কুরআন মজীদে যেই শক্তির প্রস্তুতির কথা বলা হয়েছে এবং তজ্জন্য তাকীদ দেওয়া হয়েছে) সেই শক্তি হলো তীরন্দাযী করা (মুসলিম)।"

শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ বিভাগের দায়িত্বশীল কর্মকর্তাদের এও অপরিহার্য দায়িত্ব যে, তারা এমন প্রতিটি জিনিস ও বিষয়ের মুকাবিলা করবেন যা পৌরুষ ও শৌর্য-বীর্যের প্রাণ-সত্তাকে দুর্বল করে এবং দুর্বলতা ও কাপুরুষতা সৃষ্টি করে। নগ্ন সংবাদিকতা, অশ্লীল ও খোদাদ্রোহী সাহিত্যের প্রতিরোধ করবেন যা তরুণ ও যুবকদের মধ্যে কপটতা, নির্লজ্জতা, অনাচার, পাপাচার ও যৌনতা প্রচার করছে। ঐসব পেশাদার লোকদেরকে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের ফৌজী ক্যাম্পে প্রবেশ করতে দেবে না যারা মুসলিম বংশধরদের হৃদয় ও চরিত্রে অনাচার ও অরাজকতা সৃষ্টি করতে চায় এবং অন্যায় ও অশ্লীলতাপ্রিয়তাকে কতকগুলো তুচ্ছ পয়সার বিনিময়ে খুবসূরত ও সুসজ্জিত করে পেশ করে।

ইতিহাস সাক্ষী যে, যখন কোন জাতির মধ্যে শৌর্য-বীর্য ও মানবীয় মর্যাদাবোধের পতন ঘটেছে, নারীরা তাদের নারীত্ব ও মাতৃপ্রকৃতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ধ্বনি তুলেছে; পর্দাহীনতার পথ ধরেছে, প্রতিটি ক্ষেত্রে পুরুষের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামার কসরত চালিয়েছে, পারিবারিক জীবনের প্রতি ঘৃণা ও অলসতা বৃদ্ধি পেয়েছে, জন্ম নিয়ন্ত্রণের প্রতি উৎসাহ সৃষ্টি হয়েছে অমনি সেই জাতির সৌভাগ্য তারকা অস্তমিত হয়ে গেছে এবং ক্রমান্বয়ে সে জাতির নাম-নিশানা পৃথিবীর বুক থেকে মুছে গেছে, তাদের অস্তিত্ব শেষ হয়ে গেছে। গ্রীক, রোমক ও পারসিক জাতিগোষ্ঠীর পরিণতি এই হয়েছে। আজ য়ূরোপও সে পথেই অগ্রসর হয়েছে যা তাদেরকেও উল্লিখিত পরিণতির দিকেই টেনে নিয়ে যাচ্ছে। আরব জাহানকে ভয় পাওয়া উচিত যেন তাদের অবস্থাও এমনটি না হয়।

শ্রেণী বৈষম্য ও অপচয়ের মুকাবিলা

পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাবে এবং অন্যান্য আরও অনেক কারণে আরবদের মধ্যে আরাম-আয়েশ ও ভোগ-বিলাস, জীবনের অনাবশ্যক ও অপ্রয়োজনীয় জিনিসের প্রতি সীমাতিরিক্ত গুরুত্ব প্রদান, অপচয়, ফূর্তি, প্রবৃত্তির চাহিদা পূরণ, অহংকার ও সাজ-সজ্জার জন্য বাহুল্য খরচের অভ্যাস সৃষ্টি হয়ে গেছে। এই আরাম-আয়েশ, ভোগ-বিলাস ও প্রাচূর্য এবং বেদেরেগ খরচের পাশাপাশি সেখানে দারিদ্র, অনাহার ও বস্ত্রের অভাবও বিদ্যমান। একজন মানুষ যখন বড় বড় আরব শহরগুলোর দিকে চোখ তুলে তাকায় তখন তার চোখ অশ্রুপূর্ণ হয়ে ওঠে এবং লজ্জায় মাথা নত হয়ে আসে। সে দেখতে পায় যে, একদিকে সেই সব মানুষ যাদের হাজারে বেজার নেই, প্রয়োজনাতিরিক্ত খাদ্য, বস্ত্র কোথায় রাখবে সেই

চিন্তায় ব্যস্ত, অপরদিকে তার দৃষ্টি এমন সব বেদুঈনদের ওপরও পড়ে যাদের ঘরে এক বেলার খাবার নেই, পরনে নেই লজ্জা ঢাকার মত এক খণ্ড বস্ত্র। আরব ধনিক-বণিক ও ক্ষমতাসীন শাসকগোষ্ঠী যখন বায়ুবেগে ধাবমান মোটর যানে দীর্ঘ সফরে বের হয় ঠিক সে সময়ই হাড্ডিসার একদল শিশু চোখের সামনে এসে দাঁড়ায় জীর্ণ শীর্ণ বস্ত্র পরিহিত, যেসব শিশু একটা পয়সার জন্য ওদের মোটরের পেছনে দৌড়ুচ্ছে।

যতদিন আরব দেশগুলোতে আকাশচুম্বী প্রাসাদ ও সর্বোত্তম মডেলের গাড়ির পাশাপাশি দীনহীন ঝুপড়ি, জীর্ণশীর্ণ বস্তি ও সংকীর্ণ পরিসরের অন্ধকারপূর্ণ কুটির চোখে পড়বে, যতদিন অনাহার ও দারিদ্রক্লিষ্ট হাড় লিকলিকে মানুষের সারি একই শহরে দৃষ্টিগোচর হবে ততদিন কম্যুনিজমের জন্য দরজা উন্মুক্ত।[১] হৈ-হাঙ্গামা, লড়াই-ঝগড়া তখন অবধারিতভাবে দেখা দেবেই। কোন প্রচার-প্রোপাগান্ডা ও শক্তি প্রয়োগের দ্বারাই তাকে রোখা যাবে না। সেখানে যদি ইসলামী জীবনাদর্শ তার সৌন্দর্য ও ভারসাম্য নিয়ে প্রতিষ্ঠিত না হয় তবে আল্লাহর শাস্তি ও এর প্রতিক্রিয়া হিসেবে সেখানে জুলুম ও নিপীড়নের রাজত্ব অবধারিতভাবে কায়েম হবেই।

ব্যবসা-বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে স্বায়ত্তশাসন

মুসলিম বিশ্বের মতই আরব জাহানের জন্যও জরুরী হলো, আরব দেশগুলো তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য, অর্থনীতি, শিল্প, কৃষি ও শিক্ষার ক্ষেত্রে পরিপূর্ণরূপে স্বাধীন স্বাবলম্বী ও আত্মনির্ভরশীল হবে। সেখানকার বসবাসকারীরা সেই সব জিনিসই ব্যবহার করবে যা তাদের মাটিতে উৎপন্ন হয় এবং যেগুলো তাদের শিল্প ও শ্রমের ফসল। জীবনের প্রতিটি শাখা ও বিভাগে তারা পাশ্চাত্য থেকে মুক্ত ও স্বাধীন হবে। নিজেদের সব রকমের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি, শিল্পজাত সামগ্রী, খাদ্য-বস্ত্র, অস্ত্রশস্ত্র, মেশিনারিজ, সামরিক যন্ত্রপাতি কোন জিনিসের জন্যই তারা যেন অন্যের কাছে হাত না পাতে এবং কোনভাবেই তাদের করুণাভিখারী ও অনুগ্রহভোজী না হয়।

এই মুহূর্তে অবস্থা হলো, আরব জাহান যদি কতকগুলো অনিবার্য অবস্থানের দরুন পাশ্চাত্যের সঙ্গে যুদ্ধে নামতেই চায় তাহলে তারা এজন্যই যুদ্ধ করতে পারবে না, তারা তাদের কাছে ঋণী ও তাদের সাহায্যের মুখাপেক্ষী। যেই

১. মনে রাখতে হবে; যখন এ বই লেখা হয় তখন রাশিয়া ও চীনসহ বহু সংখ্যক দেশে প্রবল প্রতাপ নিয়ে কম্যুনিজম প্রতিষ্ঠিত। সে সময় একমাত্র কমুনিজমই প্রবল হুমকী হিসাবে বিরাজ করছিল। কম্যুনিজমের ব্যর্থতার পর সেই হুমকী কেটে গেছে। বর্তমানে পুঁজিবাদী বিশ্বের মোড়ল আমেরিকা বিভিন্ন মুখরোচক শ্লোগানের আড়ালে মুসলিম বিশ্বের সামনে আযাব ও গযব হিসেবে দেখা দিতে যাচ্ছে। —অনুবাদক।

কলমটি দিয়ে তারা চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করে সেই কলমটিও কোন পাশ্চাত্য দেশেরই তৈরী। যদি তারা মুকাবিলা করতেই চায় তবে যুদ্ধক্ষেত্রে সেই গুলিটাই ব্যবহার করবে যা পশ্চিমা দেশগুলোরই কোন না কোন কারখানাতে উৎপাদিত। আরব বিশ্বের নিমিত্ত এ এক বিরাট বড় ট্রাজেডী যে, তারা তাদের সম্পদের বিপুল ভাণ্ডার ও শক্তির উৎস থেকে ফায়দা লাভ করতে পারে না। জীবনের রক্ত তাদের উপকৃত করার পরিবর্তে তাদেরই শিরা-উপশিরা হয়ে অন্যের শরীরে গিয়ে পৌঁছে। তাদের সেনাবাহিনীর প্রশিক্ষণ জোটে পাশ্চাত্যের এজেন্ট ও তাদেরই সামরিক অফিসারদের হাতে এবং সরকারের অপরাপর শাখা ও বিভাগও তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন। আরব জাহানের জন্য জরুরী হলো, তারা তাদের প্রয়োজনের ক্ষেত্রে স্বয়ংসম্পূর্ণ, স্বাবলম্বী ও আত্মনির্ভরশীল হবে। ব্যবসা-বাণিজ্য, অর্থনীতিক সংগঠন, আমদানী-রফতানী, জাতীয় শিল্প, সামরিক প্রশিক্ষণ, যন্ত্রপাতি, সমরাস্ত্র তৈরির ব্যাপার সম্পূর্ণ নিজেদের হাতে থাকবে। এমন সব লোকের প্রশিক্ষণ দিতে হবে যারা হুকুমতের দায়িত্ব সামলাতে পারে এবং যারা সরকারী দায়িত্ব পরিপূর্ণ জ্ঞান, বিষয়গত নৈপুণ্য, সততা, আমানতদারী ও কল্যাণ কামনার সঙ্গে সম্পাদন করবেন।

মানবতার সৌভাগ্যের নিমিত্ত আরবদের ব্যক্তিগত কুরবানী

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের আবির্ভাব সে সময় হয়েছিল যখন মানবতার দুর্ভাগ্য চরম সীমায় গিয়ে উপনীত হয়েছিল। সে সময় মানবতার সংশোধনের সমস্যা ঐসব লোকের ক্ষমতার বাইরে ছিল যাদের জীবন বিলাস-ব্যসন ও প্রাচুর্যের মধ্যে অতিবাহিত হচ্ছিল, যাদের পরিশ্রম করবার, সইবার, জীবন ও সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি বরদাশত করার যোগ্যতা ও সামর্থ্য ছিল না এবং যাদের নিমিত্ত সার্বক্ষণিক ভোগ-বিলাস ও আমোদ-ফুর্তির উপকরণ বিদ্যমান ছিল। সে সময় মানবতাকে এমন সব লোকের দরকার ছিল যারা মানবতার খেদমতে নিজেদের ভবিষ্যত কুরবান করতে পারত এবং স্বার্থ চিন্তা থেকে মুক্ত হয়ে নিজেদের জান-মাল ও আরাম-আয়েশ এবং নিজেদের সব রকম জাগতিক স্বার্থকে বিপদের মুকাবিলায় পেশ করতে পারত। তাদের নিজেদের পেশা ও ব্যবসা-বাণিজ্যের মন্দা এবং যে কোন ধরনের আর্থিক ক্ষয়-ক্ষতি ও বিপদের কোনরূপ পরওয়া ছিল না। যাদের নিজেদের বাপ-দাদা, বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনদের প্রতিষ্ঠিত আশা-আকাঙ্ক্ষাকে হতাশায় পর্যবসিত করতে আদৌ কোন ইতস্তত বোধ ছিল না, ছিল না কোন প্রকার দ্বিধা কিংবা সংশয়। সালেহ আলায়হি'স-সালামকে তাঁর সম্প্রদায় যা কিছু বলেছিল সে কথাই তাঁদের সম্পর্কিত জনদের মুখে ফুঠে উঠত।

قَالُوْا يٰصٰلِحُ قَدْ كُنْتَ فِيْنَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هٰذَآ -

"হে সালেহ! এর আগে তুমি ছিলে আমাদের আশাস্থল।" (সূরা হূদঃ ৬২)

যতদিন দুনিয়ার বুকে এ ধরনের মুজাহিদ তৈরি না হবে ততদিন পর্যন্ত মানবতার স্থায়িত্ব ও মজবুতি এবং কোন গুরুত্বপূর্ণ আদর্শ ও দাওয়াতের পক্ষে সফলতা লাভ করা সম্ভব হবে না। এ ধরনের কর্ম সম্পাদনকারী হাতে গোণা কয়েকজন মানুষ যাদেরকে দুনিয়ার বুকে বঞ্চিত ও হতভাগা মনে করা হয়, তাদের উন্নত মনোবল ও কুরবানীর আবেগদীপ্ত প্রেরণার ওপরই মানবতার কল্যাণ, সফলতা, সুখ-শান্তি ও শ্রীবৃদ্ধি নির্ভর করছে। সেই হাতে গোণা কিছু লোক যারা নিজেদের জীবনকে বিপদের মুখে ঠেলে দিয়ে আল্লাহ্র হাজার হাজার বান্দাকে (আখেরাতের) চিরস্থায়ী মুসীবত থেকে বাঁচাবার উপলক্ষে পরিণত হন এবং দুনিয়ার এক বিরাট বড় গোষ্ঠীকে অকল্যাণ থেকে কল্যাণের দিকে টেনে নিয়ে আসেন। যদি কয়েক জন মানুষের বঞ্চনা ও ধ্বংস একটি গোটা জাতি ও সম্প্রদায়ের জন্য প্রাচুর্য ও সৌভাগ্যের কারণ হয় এবং সামান্য কিছু অর্থ-সম্পদ, ব্যবসা-বাণিজ্য ও কৃষির ক্ষয়-ক্ষতি যদি অসংখ্য ও অগণিত মানুষের ধর্মীয় ও পার্থিব কল্যাণের দরজা খুলে দেয় তাহলে একে সওদা হিসেবে সস্তাই বলতে হবে!

আল্লাহ তা'আলা যখন হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে দুনিয়ার বুকে প্রেরণ করেন তখন তিনি জানতেন, রোম ও পারস্য ও দুনিয়ার অপরাপর সভ্য জাতিগুলো যাদের হাতে তৎকালীন বিশ্বের (ক্ষমতার) চাবিকাঠি ছিল, কখনোই নিজেদের আরাম-আয়েশ ও আমোদ-ফুর্তি ছাড়তে পারত না। তারা তাদের বিলাসী জীবনকে বিপদের ঠেলে দিতে পারত না। অসহায় ও দুঃস্থ মানবতার খেদমত, দাওয়াত ও জিহাদের জন্য অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্ট ও বিপদ-মুসীবত সইবার ক্ষমতা তাদের ছিল না। তাদের ভেতর এমন সামর্থ্যও ছিল না, নিজেদের আড়ম্বর ও জৌলুসপূর্ণ জীবনের একটি মামুলী অংশও কুরবান করবে। তাদের মধ্যে এমন একজনও ছিল না, যে নিজের কামনা-বাসনাকে নিয়ন্ত্রণে রাখে, নিজের লোভ-লালসাকে রুখতে পারে এবং যে সভ্যতা-সংস্কৃতির আবশ্যকীয় অনুষঙ্গ ও ফ্যাশনের বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্ত হয়ে যেটুকু না হলেই নয়, কেবল তার ওপর নির্ভর করে চলতে পারে। এজন্যই আল্লাহ তাআলা ইসলামের পয়গাম ও নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের সাহচর্যের জন্য এমন এক জাতিগোষ্ঠীকে নির্বাচিত করলেন যারা দাওয়াত ও জিহাদের বোঝা ওঠাতে পারত এবং ত্যাগ ও আত্মোৎসর্গের প্রেরণায় উজ্জীবিত ছিল, ছিল ভরপুর। এরা ছিল সেই আরব কওম, যারা ছিল শক্তিশালী, সহজ, সরল ও

অনাড়ম্বর জীবনে অভ্যস্ত ও কঠোর পরিশ্রমী, যাদের ওপর কৃত্রিম সভ্যতা-সংস্কৃতির কোন আঘাতই কার্যকর হয়নি এবং দুনিয়ার চোখ ঝলসানো রঙীন চাকচিক্যের কোন যাদুই ক্রিয়া দর্শে নি। এ সমস্ত লোকই ছিলেন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের সাহাবা যাঁরা হৃদয় সম্পদে সম্পদশালী, জ্ঞান ও বিদ্যাবত্তায় ভরপুর এবং লৌকিকতা থেকে ছিলেন শত সহস্র যোজন দূরে।

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এই আজীমুশশান দাওয়াত নিয়ে দাঁড়ালেন এবং তিনি কঠোর চেষ্টা-সাধনা ও প্রাণান্তকর পরিশ্রমের হক পরিপূর্ণরূপেই আদায় করেন। তিনি এই দাওয়াতকে এমন সব কিছুর ওপর অগ্রাধিকার প্রদান করেন যা তাঁর জন্য বাধা ও প্রতিবন্ধকতার কারণ হতে পারত। তিনি কামনা-বাসনা থেকে সম্পূর্ণরূপে পৃথক ছিলেন। দুনিয়ার চিত্তাকর্ষক ও মন ভোলানো কোন কিছুই তাঁর চিত্ত বিভ্রম ঘটাতে পারে নি। এসবের কোন যাদুই তাঁর ওপর কোন ক্রিয়া করেনি। এগুলোই ছিল সেসব জিনিস যা দুনিয়ার জন্য 'সর্বোত্তম আদর্শ' (উসওয়ায়ে হাসানা) ও পথ-প্রদর্শনকারী হয়। কুরায়শ প্রতিনিধিবৃন্দ যখন তাঁর সঙ্গে কথা বলেছিল এবং সে সব জিনিসই তাঁর সামনে পেশ করেছিল যা একজন যুবকের চিত্ত বিভ্রম ঘটাতে এবং প্রবৃত্তির অধিকারী যে কোন মানুষের পরিতুষ্টি বিধান করতে পারত। যেমন ক্ষমতা ও রাজত্ব, ভোগ-বিলাস ও ধন-সম্পদ। তিনি সব কিছুকেই নির্দ্বিধায় প্রত্যাখ্যান করলেন। ঠিক তেমনিভাবেই যখন তাঁর চাচা তাঁর সাথে কথা বললেন এবং চাইলেন তাঁর দাওয়াত বিস্তারে ও এতে অংশ গ্রহণে বাধা প্রদান করতে তখন তিনি পরিষ্কার ভাষায় বলেন, "চাচাজান! আল্লাহ্‌র কসম, যদি এরা আমার ডান হাতে সূর্য এবং বাম হাতে চাঁদ এনে দেয় তখনও আমি আমার এই কাজ থেকে বিরত হব না এবং আমি ততক্ষণ পর্যন্ত আমার প্রয়াস চালিয়ে যাব যতক্ষণ না আল্লাহ তা'আলা আমাকে আমার এই প্রয়াসে সফলতা দান করেন এবং এই দাওয়াতকে বিজয়ী করেন অথবা এতেই আমি শেষ হয়ে যাই।" এই চেষ্টা-সাধনা ও ত্যাগ পার্থিব লাভ ও স্বার্থের সঙ্গে ছিল সম্পর্কহীন এবং আনন্দপূর্ণ জীবনের মুকাবিলায় কষ্টকর ও যাতনাপূর্ণ যিন্দেগীকে অগ্রাধিকার প্রদান দাওয়াত গ্রহণকারীদের জন্য চিরদিনের জন্য একটি নমুনা ও আদর্শে পরিণত হয়। তিনি এই ধারায় নিজের জন্য আরাম-আয়েশ ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের দরজা বন্ধ করে দেন। কেবল নিজের জন্যই নয়, বরং নিজের গোটা পরিবার-পরিজন, গৃহবাসী ও আত্মীয়-এগানার জন্যও আরাম-আয়েশ ও বিলাসী জীবনের মওকাগুলো থেকে উপকৃত হবার সুযোগ রাখেন নি। সে সব লোক যাঁরা ছিলেন তাঁর সর্বাধিক ঘনিষ্ঠ ও প্রিয়জন, জীবনের আরাম-আয়েশ ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ক্ষেত্রে তাঁদেরই অংশ ছিল সবচে' কম, অথচ জিহাদের ময়দানে ও কুরবানীর ক্ষেত্রে তাঁদেরই রাখা হয়েছিল সবার আগে।

যখন তিনি কোন জিনিস নিষিদ্ধ ঘোষণা করতে চাইতেন তখন তার সূচনাও করতেন নিজের গোত্র ও নিজের লোকদের দ্বারাই। যখন কাউকে তার প্রাপ্য অধিকার ও হক দিতে চাইতেন কিংবা কাউকে উপকৃত করতে চাইতেন তখন দূরের লোকদের থেকেই তা শুরু করতেন। এতে করে অনেক সময় তাঁর নিজের আত্মীয়-স্বজন ও গোত্রের লোকেরাই এ থেকে মাহরূম হয়ে যেত। যখন তিনি সূদী কায়-কারবার চিরতরে বন্ধ করার ইচ্ছা করলেন তখন সর্বপ্রথম তাঁর চাচা আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিবের কারবার বন্ধ করলেন এবং তাঁর সূদী কারবারের ভিত্তি উপড়ে দিলেন। এভাবেই জাহিলী যুগের প্রতিশোধ গ্রহণ ও দাবির প্রশ্ন যখন বাতিল করতে চাইলেন তখন রবী'আ ইবনে হারিছ ইবনে আবদুল মুত্তালিবের রক্তের দাবি সর্বপ্রথম বাতিল করলেন। যাকাতের বিধান কার্যকর করতে গিয়ে (যা ছিল আর্থিক মুনাফা আহরণের এক বিরাট বড় মাধ্যম এবং যা কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকার মত বিষয়) সর্বপ্রথম নিজের গোত্র বনী হাশিমের জন্য কিয়ামত অবধি যাকাত গ্রহণকে নিষিদ্ধ করলেন। মক্কা বিজয়ের দিন যখন আলী ইবনে আবী তালিব (রা) তাঁর কাছে বনী হাশিমের জন্য যমযমের পানির সাথে সাথে কা'বার চাবিরও অধিকার দাবি করলেন তখন তিনি তা প্রবলভাবে অস্বীকার করলেন এবং উছমান ইবনে তালহা (রা)-কে ডেকে কা'বার চাবি তাঁর হাতে তুলে দিলেন এবং বললেন, উছমান! দেখ, এই যে তোমাদের চাবি! নিয়ে নাও তুমি। আজ প্রতিদান ও সদয় ব্যবহারের দিন। আজ থেকে এটা তোমাদের পরিবারে সব সময় থাকবে, তোমাদের থেকে কেউ তা ছিনিয়ে নিতে পারবে না। তবে হ্যাঁ, কোন জালিম ছিনিয়ে নিতে চাইলে ভিন্ন কথা। তিনি তাঁর সহধর্মিনীদের যুহ্দ ও অল্পে তুষ্টি এখতিয়ারের এবং দুঃখ-কষ্টপূর্ণ ও স্বাদহীন স্ফূর্তিহীন জীবন অতিবাহিত করায় উৎসাহিত করেন এবং পরিষ্কার ভাষায় জানিয়ে দেন, যদি তোমরা অনাহার ও দারিদ্র্যক্লিষ্ট জীবন যাপনের জন্য তৈরী থাক তাহলে আমার সান্নিধ্যে অবস্থান করতে পার। অন্যথায় প্রাচুর্য ও আরাম-আয়েশ চাইলে আমার সঙ্গে সহাবস্থান সম্ভব নয়। এ সময় তিনি আল্লাহ্ তা'আলার এই নির্দেশ তাঁদের সামনে পাঠ করে শোনান!

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِىُّ قُل لِّأَزْوَٰجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا - وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَٱلدَّارَ ٱلْـَٔاخِرَةَ فَإِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَـٰتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا -

"হে নবী! আপনি আপনার স্ত্রীদেরকে বলুন, তোমরা যদি পার্থিব জীবন ও এর ভূষণ কামনা কর, তবে এস, আমি তোমাদের ভোগ-সামগ্রীর ব্যবস্থা করে দিই এবং সৌজন্যের সাথে তোমাদেরকে বিদায় করে দিই। আর যদি তোমরা

আল্লাহ, তাঁর রসূল ও আখিরাত কামনা কর তবে তোমাদের মধ্যে যারা সৎকর্মশীল, আল্লাহ তাদের জন্য মহাপ্রতিদান প্রস্তুত রেখেছেন” (সূরা আহযাব, ১৮-১৯ আয়াত)।

কিন্তু এই নির্বাচনে তাঁর গৃহবাসীরা আল্লাহ ও তাঁর রসূলকেই এখতিয়ার করেছেন। ঠিক তেমনি হযরত ফাতেমা (রা) যখন শুনতে পেলেন, তাঁর (আব্বার) কাছে কিছু গোলাম ও খাদেম এসেছে আর সে সময় যাতায় যব-গম পিষতে গিয়ে তাঁর হাতে ফোস্কা পড়ে গিয়েছিল। তিনি তাঁর আব্বা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের খেদমতে গিয়ে বললেন, আব্বা! আমাকে একটি খাদেম দিন যাতে করে আমার কষ্টের লাঘব হয় এবং আমি একটু আরাম পাই। তিনি তাঁকে তসবীহ ও তাহমীদ (তসবীহে ফাতেমী) পাঠের উপদেশ দিলেন এবং বললেন, এ তোমার জন্য খাদেমের থেকে অনেক ভাল হবে। আত্মীয়-স্বজন ও প্রিয়জনদের সঙ্গে এ রকমই ছিল তাঁর আচরণ। এক্ষেত্রে যিনি যত ঘনিষ্ঠ ও নিকটজন হতেন ঠিক সেই পরিমাণ তার দায়িত্বও বেড়ে যেত।

মক্কার লোকেরা যখন ঈমান আনল তখন তাদের অর্থনৈতিক অবস্থা ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। তাদের ব্যবসা মন্দার শিকার হয়, এমন কি অনেকে তাদের পুঁজিটুকুও খুইয়ে বসে যা ছিল তাদের সারা জীবনের সঞ্চয়। তাদের মধ্যে এমন লোকও ঈমান এনেছিল যারা আরাম-আয়েশ ও সাজ-সজ্জার উপকরণও শেষ করে ফেলেছিল, অথচ এর আগে তাদের বৈশিষ্ট্যসূচক অবস্থাই ছিল এমন, তারা আরাম-আয়েশ ও প্রাচুর্যপ্রিয় ছিল। তেমনি এমন লোকও অনেকে ছিলেন যাঁদের ইসলামের প্রচার-প্রসারে এবং এ পথের বাধা-প্রতিবন্ধকতা দূর করতে গিয়ে ব্যবসাই শেষ হয়ে যায়। আবার অনেকে পিতৃ সম্পদ থেকে বঞ্চিত হয়।

ঠিক তেমনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম যখন মদীনায় হিজরত করেন এবং আনসাররা তাঁকে সাহায্য-সহযোগিতা করল তখন এর প্রভাব তাদের ক্ষেত-খামার ও কৃষি কর্মের ওপর পড়ে। এ সময় যখন তারা এ সবের দেখাশোনা ও পরিচর্যার জন্য সময় চাইল তখন তাদের এতে অনুমতি মেলেনি। আল্লাহ তা'আলার তরফ থেকে তাদের উদ্দেশে সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়ঃ

وَاَنْفِقُوْافِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَا تُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ ـ

“আল্লাহ্র পথে ব্যয় কর এবং তোমরা নিজের হাতে নিজেদের ধ্বংসের মাঝে নিক্ষেপ কর না” (সূরা বাকারা, ১৯৫ আয়াত)।

একই অবস্থা হয়েছিল আরব ও সেই সব লোকের যারা এই আহবানে প্রভাবিত হয়েছিল এবং এর অনুসরণে কোমর বেঁধে লেগেছিল। অনন্তর জিহাদের কষ্ট-কাঠিন্য ও জানমালের ক্ষয়-ক্ষতি স্বীকারে তাদের হিস্যা এত বেশি ছিল যে,

দুনিয়ার বুকে এত বেশি হিস্যা আর কারো ছিল না। আল্লাহ তাআলা তাদের সম্বোধন করে বলেন ঃ

قُلْ اِنْ كَانَ اٰبَآءُكُمْ وَاَبْنَاءُكُمْ وَاِخْوَانُكُمْ وَاَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيْرَتُكُمْ وَاَمْوَالُ نِ اقْتَرَفْتُمُوْهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسٰكِنُ تَرْضَوْنَهَآ اَحَبَّ اِلَيْكُمْ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَجِهَادٍ فِيْ سَبِيْلِهٖ فَتَرَبَّصُوْا حَتّٰى يَاْتِىَ اللّٰهُ بِاَمْرِهٖ ط وَاللّٰهُ لَايَهْدِى الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ -

“বলুন, “তোমাদের কাছে যদি আল্লাহ, তাঁর রসূল এবং আল্লাহ্র পথে জিহাদ করা অপেক্ষা প্রিয় হয় তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তান, তোমাদের ভ্রাতা, তোমাদের স্ত্রী, তোমাদের স্বগোষ্ঠী, তোমাদের অর্জিত সম্পদ, তোমাদের ব্যবসা-বাণিজ্য যার মন্দা পড়ার আশংকা কর এবং তোমাদের বাসস্থান যা তোমরা ভালবাস, তবে অপেক্ষা কর আল্লাহর বিধান আসা পর্যন্ত। আল্লাহ ফাসিক সম্প্রদায়কে হেদায়েত করেন না” (সূরা তাওবাঃ ২৪)।

অন্যত্র বলেন ঃ

مَاكَانَ لِاَهْلِ الْمَدِيْنَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِّنَ الْاَعْرَابِ اَنْ يَّتَخَلَّفُوْا عَنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ وَلَا يَرْغَبُوْا بِاَنْفُسِهِمْ عَنْ نَّفْسِهٖ ط

“মদীনাবাসী ও ওদের পার্শ্ববর্তী মরুবাসীদের জন্য সঙ্গত নয় আল্লাহ্র রসূলের সহগামী না হয়ে পেছনে থেকে যাওয়া এবং তার জীবন অপেক্ষা নিজেদের জীবনকে প্রিয় জ্ঞান করা” (সূরা তাওবাঃ ১২০)।

আর তা এজন্যে যে, মানবীয় সৌভাগ্যের প্রাসাদ ঐসব লোকদের কুরবানীর খুঁটির ওপর প্রতিষ্ঠিত হবে এবং অবস্থার পরিবর্তনের ক্ষেত্রে এরই অপেক্ষা করা হচ্ছিল যে, এই সব মুহাজির ও আনসার নিজেদের অস্তিত্ব নিঃশেষ করে দিয়ে মানবতার সজীবতা এবং জাতিগোষ্ঠীসমূহের হেদায়েত ও কল্যাণের ফয়সালা লাভ করে নেবে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ط

“আমি তোমাদেরকে ভয়, ক্ষুধা ও ধন-সম্পদ, জীবন ও ফল-ফসলের ক্ষয়-ক্ষতি দ্বারা অবশ্যই পরীক্ষা করব” (সূরা বাকারা, ১৫৫ আয়াত)।

অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُّتْرَكُوْٓا اَنْ يَّقُوْلُوْا اٰمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُوْنَ -

"মানুষ কি মনে করে যে, 'আমরা ঈমান এনেছি' একথা বললেই ওদেরকে পরীক্ষা না করেই অব্যাহতি দেওয়া হবে?" (সূরা আনকাবূত, ২ আয়াত)।

এখন আরবরা যদি এই সম্মাননা গ্রহণ করতে ইতস্তত করত এবং মানবতার এই মহান খেদমতে দ্বিধার আশ্রয় নিত তাহলে দুর্ভাগ্য ও বিশ্বব্যাপী অরাজকতার মুদ্দত আরও দীর্ঘায়িত হতো এবং জাহিলিয়াতের ঘনঘোর অন্ধকার বহাল তবিয়তেই দুনিয়ার বুকে ছেয়ে থাকত। এজন্যই আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

اِلَّا تَفْعَلُوْهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِى الْاَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيْرٌ -

"যদি তোমরা তা না কর তবে দেশে ফেতনা ও মহাবিপর্যয় দেখা দেবে" (সূরা আনফাল, ৭৩ আয়াত)।

খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে দুনিয়া এক দো-মাথা পথের ওপর দাঁড়িয়েছিল। সে পথ দু'টোই ছিল। তার একটা হলো, আরবের লোকেরা তাদের জানমাল তথা জীবন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি ও সকল প্রিয়তম বস্তুকে বিপদের মুখে ঠেলে দিয়ে সম্মুখে অগ্রসর হবে এবং দুনিয়ার সর্বপ্রকার উৎসাহবর্ধক ও আকর্ষণীয় জিনিস থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে সামাজিক কল্যাণের পথে নিজেদের সব পুঁজি কুরবান করে দেবে। এর ফলে দুনিয়ার ভাগ্যে সৌভাগ্য লাভ ঘটত এবং মানবতার ভাগ্যের পরিবর্তন হতো, জান্নাতের প্রতি আগ্রহ ঠেলে উঠত, ঈমানের প্রভাত সমীরণ প্রবাহিত হতো অথবা তারা নিজেদের কামনা-বাসনা, কাঙ্ক্ষিত আনন্দদায়ক বস্তুসামগ্রী, নিজেদের ব্যক্তিগত আরাম-আয়েশ ও ভোগ-বিলাসকে মানবতার সুখ-সৌভাগ্যের ও কল্যাণের মুকাবিলায় অগ্রাধিকার দিত। এমতাবস্থায় দুনিয়া গোমরাহী, পথভ্রষ্টতায় ও দুর্ভাগ্যের পচা ডোবায় তলিয়ে যেত এবং গাফিলতি ও মাতলামীর মধ্যে পড়ে থাকত। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা মানুষের কল্যাণ চাচ্ছিলেন। এজন্যই তিনি আরবদের মধ্যে আশা ও উদ্দীপনার সঞ্চার করলেন। মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম তাদের মধ্যে ঈমানের রূহ সৃষ্টি করলেন এবং তাদেরকে আখেরাত ও এর অপরিমেয় সওয়াবের উৎসাহ দিলেন। এর ফলে তারা নিজেদেরকে মানবতার নিমিত্ত উৎসর্গ করবার জন্য পেশ করল এবং আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে সওয়াবের প্রতিশ্রুতি ও মানব জাতির সুখ-সৌভাগ্যের আশায় তারা দুনিয়ার যাবতীয় আরাম-আয়েশ থেকে চোখ বন্ধ করে নিজেদের জানমাল আল্লাহ্‌র রাস্তায় ঠেলে দিল এবং সে সমস্ত জিনিস থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল যেগুলোর দিকে মানুষ লোভাতুর দৃষ্টি

নিক্ষেপ করত। তাঁরা পরিপূর্ণ একাগ্রতা, নিষ্ঠা ও সততার সাথে নিজেদের জান-মাল আল্লাহ্‌র রাস্তায় বিলিয়ে দিল এবং মেহনত করল। তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাঁদেরকে দুনিয়া ও আখেরাতের সর্বোত্তম পুরস্কারে ভূষিত করলেন। "আর আল্লাহ্ সৎকর্মশীল বান্দাদেরকে ভালবাসেন।"

আজ দুনিয়া পেছনে হটতে হটতে আবার সেই একই জায়গায় গিয়ে উপনীত হয়েছে যেখানে সে খ্রিস্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে ছিল। আজ আবার দুনিয়া সেই একই রূপ দোমাথা রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে যেই দোমাথা পথের ওপর রসূলুল্লাহ্ (সা)-র আবির্ভাবের সময় ছিল। আজ আবার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে, আরব জাতি (রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে যাদের বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে) আবার ময়দানে নেমে আসবে এবং পুনরায় দুনিয়ার ভাগ্য বদলাবার জন্য জীবনের বাজী ধরবে এবং নিজেদের যাবতীয় আরাম-আয়েশ ও সম্পদ-সামর্থ্য, দুনিয়ার নে'মত, উন্নতি ও প্রাণ-প্রাচুর্যের অন্তহীন সম্ভাবনা ও সুখ-সৌভাগ্যের উপকরণরাজিকে বিপদের মাঝে ঠেলে দেবে যাতে দুনিয়া সেই বিপদ-মুসীবত থেকে নাজাত পায় যেই বিপদ-মুসীবতে সে গ্রেফতার এবং পৃথিবীর চিত্র পাল্টে যায়।

দ্বিতীয় সূরত হলো, আরবের লোকেরা নিয়মমাফিক নিজেদের নগণ্য স্বার্থ, ব্যক্তিগত উন্নতি-সমুন্নতি, পদ ও পদমর্যাদা, বেতন বৃদ্ধি, আয়-আমদানী বৃদ্ধি ও কায়-কারবারের শ্রীবৃদ্ধির চিন্তায় ডুবে থাকুক এবং আরাম-আয়েশ ও ভোগ-বিলাসের উপকরণাদির সরবরাহ নিয়ে মশগুল থাকুক। এর ফল হবে এই, দুনিয়া সেই বিষাক্ত ও পুঁতিগন্ধময় পুকুরে সাঁতার কাটতে থাকবে যার মাঝে সে শত শত বছর ধরে ধ্বংসের জাবর কাটছে। যদি ভাল ভাল মেধাবী ও তীক্ষ্ণধী আরব যুবকেরা বড় বড় নগর-বন্দরে প্রবৃত্তির গোলাম হয়ে বসে থাকে, যদি তাদের জীবনের লক্ষ্য ও কেন্দ্রবিন্দু হয় কেবল বস্তু ও পেট, এছাড়া যদি আর কোন চিন্তা-ভাবনাই তাদের না থাকে, যদি তাদের সকল চেষ্টা-সাধনা কেবল নিজেদের ব্যক্তিগত জীবন ও প্রচলিত দায়মুক্ত যিন্দেগীর চারপাশে কলুর বলদের মত কেন্দ্রীভূত হয়, তবে এমত অবস্থায় মানবীয় সৌভাগ্যের আশা করাটাও দুরূহ ও কষ্টকর। কোন কোন জাহিলী সম্প্রদায়ের যুবক তো এদের চেয়ে অনেক বেশি উদ্যমী ছিল এবং তাদের মন-মানস এদের তুলনায় অনেক বেশি সমুন্নত ছিল যারা নিজেদের পসন্দনীয় লক্ষ্যের পথে নিজেদের যাবতীয় আরাম-আয়েশ ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, এমন কি নিজেদের ভবিষ্যত পর্যন্ত কুরবান করে দিয়েছে। জাহিলী যুগের কবি ইমরুল কায়েস এদের তুলনায় অনেক বেশি হিম্মতের অধিকারী ছিল। সে বলতঃ

ولو انی اسعی لادنی معیشة
کفانی ولم اطلب قلیل من المال
ولکنما اسعی لمجد موثل
وقد یدرك المجد الموثل امثالی

“আমি যদি সাধারণ জীবনের জন্য চেষ্টা করতাম তাহলে অল্প সম্পদই আমার জন্য যথেষ্ট হত এবং সেজন্য এত কঠোর কঠিন প্রাণান্তকর পরিশ্রমের প্রয়োজন হত না।

“কিন্তু আমি তো এমনতরো সম্মান ও মর্যাদাপ্রার্থী যার গোড়া অত্যন্ত মজবুত। আর আমার মতো লোকেরাই এমনতরো মর্যাদা লাভ করে থাকে।”

দুনিয়ার সৌভাগ্য ও সফলতার মনযিল অবধি পৌঁছুবার জন্য জরুরী হল, মুসলিম তরুণ ও যুবকেরা নিজেদের কুরবানী দ্বারা একটি সেতু নির্মাণ করবে। সেই সেতু পার হয়ে দুনিয়া সর্বোত্তম জীবনের মনযিল পর্যন্ত পৌঁছুতে পারে। মাটি তার উর্বরা শক্তি বৃদ্ধির জন্য সারের মুখাপেক্ষী। কিন্তু মানবতার যমীনের সার যা দিয়ে ইসলামের ক্ষেত-খামার শস্য-শ্যামল হতে পারে তাহল সেই ব্যক্তিগত ও একক কামনা-বাসনা যা মুসলিম তরুণ ও যুবকেরা ইসলামের প্রাণ-প্রাচুর্য বৃদ্ধি এবং আল্লাহর যমীনে শান্তি ও নিরাপত্তার বিস্তার ঘটাবার জন্য কুরবান করবে। আজ মানবতার ঊষর ও অনুর্বর ভূমি সার চায়। এই সার হল আরাম-আয়েশ ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের নানা মওকা, ব্যক্তিগত উন্নতির সমূহ সম্ভাবনা ও বিলাস উপকরণ যেগুলোকে মুসলমানেরা বিশেষ করে আরব জাতিগুলো উৎসর্গ করার অভিপ্রায় গ্রহণ করুক। কয়েকজন মানুষের জীবনপণ চেষ্টা-সাধনা ও তাদের কুরবানীর দ্বারা যদি এই মানবীয় শস্য আগুনের পথ থেকে বেরিয়ে এসে শান্তি সুখের জান্নাতের পথ ধরতে পারে তাহলে এ হবে বড় সস্তা ব্যবসা। এজন্য যেই নে‘মত জুটবে তা হবে খুবই মুল্যবান ও দুর্লভ সম্পদ এবং এজন্য যাই কিছুই কুরবান করতে হোক তা হবে এর তুলনায় খুবই মামুলী।

اے دل تمام نفع ہے سودائے عشق میں
اک جاں کا زیاں ہے سواب ازیاں نہیں

মুসলিম বিশ্ব আরব জাহানের দিকে আশা-ভরসা নিয়ে তাকিয়ে আছে। আরব জাহান আপন বৈশিষ্ট্য, অবস্থানগত সুবিধা ও রাজনৈতিক গুরুত্বের দিক দিয়ে ইসলামের দাওয়াতের যিম্মাদারী কাঁধে তুলে নেবার হকদার। তারা মুসলিম বিশ্বের নেতৃত্বভার নিজেদের কাঁধে তুলে নিক এবং পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণের পরই কেবল তারা য়ূরোপের (বর্তমানে আমেরিকা –অনুবাদক) চোখে চোখ রেখে কথা বলুক এবং নিজেদের ঈমান ও দাওয়াতের শক্তি এবং আল্লাহর সাহায্যের ওপর ভরসা করে তাদের ওপর বিজয় লাভ করুক। অতঃপর দুনিয়াকে মন্দ থেকে

ভালোর দিকে, ধ্বংস ও বরবাদী থেকে শান্তি ও নিরাপত্তার দিকে নিয়ে আসুক ঠিক সেভাবে যেভাবে মুসলিম দূত ইয়ায্‌দাগির্দ-এর ভরা দরবারে বলেছিল ঃ

"মানুষের গোলামী ও দাসত্ব থেকে বের করে একক আল্লাহ্‌র ইবাদত-বন্দেগীতে, দুনিয়ার সংকীর্ণ কাল কুঠরী থেকে বের করে ধর্মের বিশাল বিস্তৃত অঙ্গনে এবং ধর্মের নামে কৃত জুলুম ও বেইনসাফী থেকে মুক্ত করে ইসলামের ন্যায় ও সুবিচারপূর্ণ জীবনে টেনে নিতে আমাদেরকে এখানে পাঠানো হয়েছে।"

সমগ্র মানব বিশ্ব আজ মুসলিম বিশ্বের দিকে মুক্তিদাতা ও ত্রাণকর্তা হিসেবে তাকিয়ে দেখছে আর মুসলিম বিশ্ব আরব জাহানের দিকে তাদের লীডার ও রাহবার হিসেবে চোখ তুলে চেয়ে আছে। মুসলিম বিশ্ব কি সমগ্র মানব জগতের আশা-ভরসা পূরণ করতে পারে এবং এবং আরব জাহান কি মুসলিম বিশ্বের প্রশ্নের জওয়াব দিতে পারে? দীর্ঘকাল থেকে নির্যাতিত ও নিপীড়িত মানবতা এবং ধ্বংসপ্রাপ্ত দুনিয়া ইকবালের ব্যথাপূর্ণ ও দরদ ভরা কণ্ঠে মুসলমানদের কাছে ফরিয়াদ জানাচ্ছে। তার আজও নিশ্চিত বিশ্বাস যে, যেই নিঃস্বার্থ ও নিষ্ঠাপূর্ণ হাতগুলো কা'বা নির্মাণ করেছিল সেই হাতগুলোই দুনিয়াকে নতুন করে গড়ার দায়িত্ব বহন করতে পারে।

তাঁর আহবান হলোঃ

কা'বার নির্মাতা তুমি ঘুম থেকে জেগে ওঠো ফের
হাতে তুলে নাও ফের দায়িত্ব গড়া এ বিশ্বের।

লখনৌর বিখ্যাত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দারুল উলুম নদওয়াতুল-উলামা-এর রেকটর, ভারতীয় মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ প্লাটফরম মুসলিম পার্সোন্যাল ল' বোর্ডের সভাপতি ছিলেন। তাঁর অস্তিত্ব কেবল ভারতীয় মুসলমানদের জন্যই নয়, গোটা বিশ্বের মুসলমানদের জন্যই এক বিরাট নেয়ামত ছিলেন। তাঁর বেশ কটি বই ইতিমধ্যেই বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে। একাধিকবার তিনি বাংলাদেশ সফরও করেছেন। তাঁর আত্মজীবিনীমূলক গ্রন্থ এ পর্যন্ত ৭ খন্ডে প্রকাশিত 'কারওয়ানে যিন্দেগী' শুধু তাঁর আত্মজীবনীমূলক নয়, এটা সমসাময়িক বিশ্বের অনেক তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা ও ব্যক্তির এক অপূর্ব আলেখ্যও বটে। তাঁর রচনায় আল্লামা শিবলীর অনবদ্যতা, আল্লামা সাইয়েদ সুলায়মান নদভীর সূক্ষ্মদর্শিতা, মাওলানা মানাযির আহসান গিলানীর সতর্কতা, মাওলানা আশরাফ আলীর থানবীর তাক্ওয়া, সর্বোপরি তাঁর পূর্বপুরুষ সাইয়েদ আহমদ বেরলভী (র)-এর দরদ প্রতিফলিত হয়েছে। শায়খুল হাদীস হযরত মাওলানা যাকারিয়া (র), মাওলানা মনযূর নোমানী (র), ও রঈসুত-তাবলীগ মাওলানা ইউসুফ (র)-এর অনেক মুল্যবান গ্রন্থে তাঁর লিখিত সারগর্ভ ভূমিকাগুলো পড়বার মতো। আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে তিনি মাওলানা আহমদ আলী লাহোরী (র) এবং মাওলানা আবদুল কাদির রায়পুরী (র)-এর খলীফা। বিগত হিজরী ১৪২১ সনের ২২ শে রমযান জুম'আর পূর্বে সূরা ইয়াসীন তেলাওয়াতরত অবস্থায় ইন্তিকাল করেন। রায়বেরেলীর পারিবারিক কবরস্থানে রওযায়ে শাহ্ আলামুল্লাহ্য় তাঁকে দাফন করা হয়।